ড্রাগ : সর্বনাশা নেশা

সুভাষ সমাজদার

সাহিত্য প্রকাশ
৫/১ রমানাথ মজুমদার স্ট্রীট, কলিকাতা-৭০০ ০০৯

DRUG : SARBANASHA NESHA

by

Subhas Samajder

প্রথম প্রকাশ : মাঘ, ১৩৫৭

প্রকাশক : প্রবীর মিত্র : ৫/১, রমানাথ মজুমদার স্ট্রীট : কলিকাতা-৯

প্রচ্ছদ : অমিয় ভট্টাচার্য

মুদ্রাকর : নারায়ণচন্দ্র ঘোষ : দি শিবদুর্গা প্রিন্টার্স

৩২, বিডন রো, কলিকাতা-৬

পঞ্চাশ টাকা

শ্রীজা
প্রিয়তমাষু,
অসতো মা সদ্গময়ঃ
তমসো মা জ্যোতির্গময়ঃ

আশ্চর্য ক্লেদাক্ত এক দুর্গন্ধ বাতাস
স্বদেশের মানচিত্র কুরে কুরে খায়।
বড়ো প্রয়োজন ছিল আলোর মিছিল
দৈন্যদশা অন্ধকার জীবনকে নিয়ে যাবে
স্বপ্নমায়া শস্যের অলিন্দে,
পার্শ্বচর নদী, শ্যামল সম্পন্ন মাঠ
মানুষের প্রয়োজনে হাত ধরে আলো
উঠোন পেরুবে।
সূর্য দেবে হাতছানি হেমন্তের নিষিক্ত শিশিরে।

: আমাদের প্রকাশিত লেখকের বই :

কলকাতা কলহকথা
বাইবেলের প্রেমকাহিনী
ভূত কি আজও আছে!
ডাইনীরা কি আজও আছে!
নগরসুন্দরী
হারেমের নায়িকা

নেশা।

স্মরণাতীত কাল থেকেই নেশার প্রতি মানুষের সহজাত আকর্ষণ কারণ সে রূঢ় বাস্তবকে ভুলে যেতে চায়, দৈনন্দিন জীবনের গ্লানি থেকে সে পালিয়ে সাময়িকভাবে স্বপ্নের কোন দূরে অজানা অলীক জগতে চলে যেতে চায়। তাই ড্রাগ তার জীবনে একান্ত প্রয়োজন। সুমেরীয়র এক পাহাড়ে পাওয়া গিয়েছে খৃষ্টের জন্মের প্রায় চার হাজার বছর আগের একটি প্রস্তর খণ্ডে উৎকীর্ণ করা পপিপ্ল্যান্ট বা আফিমগাছের ছবি। সোমরস বা সুরার উল্লেখ পাওয়া যায় বেদে, পুরাণে এবং বিভিন্ন ধর্মীয়গ্রন্থে।

বলা দরকার বর্তমান আলোচ্য গ্রন্থটি কিন্তু নেশার ইতিহাস এবং নেশার উপকরণ মদ, গাঁজা, সিদ্ধি, চরস এবং আফিমের সম্বন্ধে ক্লান্তিকর নীরস বিবরণ নয়। বইটির মুখ্য উদ্দেশ্য—Drug Abuse। ড্রাগের বিধ্বংসী এবং সর্বনাশা প্রতিক্রিয়া যা তিলে তিলে সমস্ত সমাজ সভ্যতাকে অনিবার্য ধ্বংসের দিকে নিয়ে যাচ্ছে তাকে প্রতিহত করা যায় কি না। আমেরিকায় বা মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে, গ্রেটবৃটেনে এবং ভারতে ড্রাগ অ্যাবিউসের চিত্রটি কেমন—এই বিষবৃক্ষের শিকড় কত দূরে ছড়িয়েছে, কোন্ কোন্ দেশে বিভিন্ন ড্রাগের নেশাখোরদের সংখ্যা কত এবং তাদের ড্রাগ খাওয়ার নানা বৈচিত্র-ময় টেকনিক ইত্যাদি ড্রাগ অ্যাবিউসের প্রধান প্রধান গুরুত্বপূর্ণ বিষয়গুলি সম্বন্ধে তথ্যভিত্তিক বিশদ আলোচনা। ন্যাশনাল লাইব্রেরির পুস্তক সংগ্রহের ভেতরে ড্রাগের ওপরে প্রায় সমস্ত মূল্যবান বিদেশী ড্রাগ বিশেষজ্ঞদের লেখা বই, পৃথিবীর প্রায় সমস্ত বিখ্যাত দৈনিকের নিউজ কাটিং, লালবাজার নার্কটিক কণ্ট্রোল অ্যান্ড প্রিভেনশন ব্যুরোর গোয়েন্দা বিভাগের অ্যাসিস্টান্ট কমিশনার, কলকাতার আবগারি বিভাগের কালেক্টর ইত্যাদির যাঁরা ফিল্ডে দাঁড়িয়ে শক্তিশালী ও ভয়ঙ্কর সেই হিংস্র শত্রু ড্রাগের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করছেন তাঁদের সঙ্গে দীর্ঘ সময় ধরে সাক্ষাৎকার করে তাঁদের প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতা এবং তাঁদের ফাইলের কনফিডেনশিয়াল রিপোর্ট এবং আরও অনেক সরকারি ডকুমেণ্ট থেকে উপাদান নিয়ে রচিত হয়েছে এই গ্রন্থ।

কিন্তু বলা প্রয়োজন অ্যাডিক্টদের সুস্থ করে তুলে স্বাভাবিক জীবনের আলোয় ফিরিয়ে নিয়ে আসা বা Rehabilition-এর ওপরেই খুব বেশি জোর দেওয়া হয়েছে। কেননা নেশাখোরদের কেসহিস্ট্রি এবং ডিঅ্যাডিকশান সেণ্টারের সায়াক্রিয়াটিস্টদের প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতায় দেখা যাচ্ছে—ড্রাগের নেশার জন্য মূলত দায়ী অর্থনৈতিক পরিস্থিতি, নিরন্তর অভাব এবং পারিবারিক অশান্তি বা ব্রোকেন ফ্যামিলির অভিশাপ। কিন্তু সবচেয়ে বড় কারণ এযুগের মানুষের অস্থির ও অশান্ত জীবন যা নিরন্তর নতুন নতুন সুখের বা ঐশ্বর্যের খোঁজে, নতুন কোন মিষ্টি স্বপ্নের খোঁজে হন্যে হয়ে মাথা কুটে চলেছে। এই প্রসঙ্গে এক ড্রাগ এক্সপার্ট বলেছেন—

With the help of Science, modern man has brought KAMDH-ENU on the earth, promising fulfillment of all needs of

mankind—but it also constitutes a future shock for modern man himself—DRUG is that Shock.

যতদূর সম্ভব বইটিকে constructive বা সমাজের কল্যাণ এবং ড্রাগের সর্বনাশা প্রভাব কেমন করে মুক্ত করা যায় সেই মহৎ উদ্দেশ্য সামনে রেখে লেখা হয়েছে—কিন্তু কতটুকু সার্থক হয়েছে তার বিচার পাঠকের দরবারে।

এবার বলা দরকার, বর্তমান গ্রন্থটির সামান্য নেপথ্য ইতিহাস আছে—১৯৮৫ সালে বেহালার সমাজসেবী প্রতিষ্ঠান বিবেকানন্দ এডুকেশান সোসাইটির কর্ণধার অনুজ-প্রতিম চন্দনগোপাল চন্দ্রের কাছ থেকে সাদর আমন্ত্রণ এল—হেরোইনের সর্বনাশা ও বিধ্বংসী প্রভাব নিয়ে একটি পুস্তিকা খুব দ্রুত লিখে দিতে হবে। এই হেরোইন, এল এস ডি, মেথাডোন ইত্যাদি ইদানিংকালের আরো বিধ্বংসী আরো শক্তিশালী ড্রাগ নিয়ে তথ্য সংগ্রহ করতে যেয়েই বলাবাহুল্য বর্তমান গ্রন্থের পরিকল্পনা মনে আসে। মূলত বলা যায়, বিবেকানন্দ এডুকেশান সোসাইটি তথা শ্রীমান চন্দনগোপাল চন্দ্রের নিরন্তর উৎসাহ এবং তাঁর সোসাইটির ডি-অ্যাডিকশান সেন্টারের সায়ক্রিয়াটিস্ট ডক্টর দেবাশীষ ভট্টাচার্য সাইকোলজিস্ট শ্রীমতী ভারতী বসু এবং সোনালী দে ও তাপসী বন্দ্যোপাধ্যায় প্রমুখদের অকুণ্ঠ সাহায্যেই সম্ভব হয়েছে বইটির রচনা। পশ্চিমবঙ্গ সরকারের সমাজকল্যাণ ও কারামন্ত্রী শ্রীবিশ্বনাথ চৌধুরীর সক্রিয় সহযোগিতা ও গভীর সহানুভূতিই আমাকে লেখায় উদ্দীপ্ত করেছে। কিন্তু সাহিত্য প্রকাশের স্বত্বাধিকারী অভিন্নহৃদয় বন্ধু শ্রীদিলীপ মিত্রের সৎ ও মহৎ উদ্দেশ্যে গঠনমূলক গ্রন্থ প্রকাশনার বলিষ্ঠ ও নির্ভিক মানসিকতাই এই গবেষণামূলক বিপুলায়তন কলেবরে গ্রন্থটির দিনের আলোয় আসা সম্ভব করেছে। আর প্রবীর মিত্র যেভাবে একাগ্র নিষ্ঠায় দ্রুত প্রুফ সংশোধন করে বইটির প্রকাশনায় সহায়তা করেছেন তা তার উদারতা ও আন্তরিকতার পরিচয় বহন করছে। মামুলী ধন্যবাদ দিয়ে তাঁর সহৃদয়তাকে খর্ব করব না। লালবাজারের নার্কটিক কন্ট্রোল অ্যান্ড প্রিভেনশান গোয়েন্দা ডিপার্টমেন্টের (ডি. ডি.) অ্যাসিস্টান্ট কমিশনার শ্রীরায়চৌধুরী, ক্যালকাটা এক্সাইজের প্রাক্তন কালেক্টর শ্রীঅমিয়ভূষণ চক্রবর্তী এবং কলকাতা পুলিশের ট্রানস্লেটার শ্রীসন্দীপ গুপ্ত যে অকৃপণ সাহায্য করেছেন তাতে পরিস্ফুট হয়ে ওঠে একটি শ্বাশ্বত সত্য—ড্রাগের প্রভাব থেকে মুক্ত এবং অবক্ষয়ী জীবনের গ্লানির অপচ্ছায়ার লেশমাত্র নেই এমন একটা সমাজের স্বপ্ন এখন দেখছে নিখিল বিশ্বের মানুষ। আর সেই মহৎ ও দূরপ্রসারী স্বপ্নকে বাস্তবে রূপায়িত করতে বিন্দুমাত্র সাহায্য যদি করতে পারে এই গ্রন্থ—তাহলেই বর্তমান লেখক তার শ্রমকে সার্থক মনে করবেন।

অনুমতিবিস্তারেণ—

সুভাষ সমাজদার

ড্রাগ : সর্বনাশা নেশা

ড্রাগ : সর্বনাশা নেশা

ড্রাগ : সর্বনাশা নেশা

এক

নেশাখোরদের জীবনটাকে চালিয়ে নিয়ে যায় ড্রাগ। আর নেশার ঘোরের অন্ধকার কারাগারে-ই তারা তিলে তিলে শেষ হয়ে যায়—

বয়স।

কত আর হবে। হবে আঠারো-উনিশ। কিন্তু উঠতি যৌবনের খরদীপ্তি নেই তার দুর্বল, ক্ষীণ চেহারার কোথাও। তার ধারালো মুখে কেমন শান্ত কমনীয়তা।

যদিও শীর্ণ। হঠাৎ দেখলে মনে হয় একটা জীবন্ত কঙ্কালের গায়ে যেন কোনরকমে কিছু মাংস জড়ানো। তবুও—তবুও—আশ্চর্য। তার নিটোল গাল দুটোতে গোলাপী আভা এখনও ঝিকমিক করে। মাথায় এক রাশ ঢেউ খেলানো সোনালী চুল। কিন্তু কেমন উসকো খুসকো—এখানে সেখানে জটপাকানো। কে জানে কতদিন—কতকাল চিরুনি পড়েনি মাথায়। একটা নোংরা লাল রিবন দিয়ে অবাধ্য চুলগুলোকে টেনে ঝুটি করে বাঁধা। পরণে ময়লা কোঁচকানো নীল স্কার্ট। কিন্তু তার রংটা যে সত্যিই নীল, সেটা বুঝতে সময় লাগে। গায়ে ছেঁড়া ফাটা ফাটা কলার তোলা সার্ট। যার রং মনে হয় একদিন সাদা ছিল।

তবুও।

তবুও মন টানে। তার বড় বড় ডাগর দুটো চোখে সমুদ্রের নীলিমা। আর কেমন সরল আর নিষ্পাপ দুটো চোখের উদাস দৃষ্টি দূরে সাগরের বিশাল জলরাশির দিকে ছড়িয়ে দিয়ে যেন কিসের চিন্তার ভেতরে মগ্ন হয়ে থাকে। তার নীল শিরার নকসাকাটা সরু সরু হাতদুটোর এখানে সেখানে সূঁচ ফোটানোর কালো কালো অসংখ্য দাগ। পাদুটো এবং গোড়ালিতে রাজ্যের ধুলোবালি আর কাদা।

নেশা।

নেশার শিকার সে। কড়া হেরোইনের (স্ম্যাক অথবা হর্স) নেশায় দিন রাত আচ্ছন্ন হয়ে থাকে এই তরুণী—

জিল।

প্রায় বছরখানেক ধরে গোয়ায় আনজুনা বীচের ধু ধু বালুচরে একটা ডেরায় দিন কাটাচ্ছে সে।

জিল চিকাগোর এক সঙ্গতিপন্ন ঘরের মেয়ে। বাবা মস্ত ব্যবসায়ি। সারা চিকাগো স্টেট জুড়ে বড় বড় শহরে তার পোশাকের দোকান এবং শোরুম। জমজমাট ব্যবসা। অঢেল পয়সা। অতএব—

যা হয়। হয়ে থাকে। একটার জায়গায় দুটো গাড়ি। ঘরে ঘরে এয়ার

ফ্রিডশান মেশিন। রান্নাঘরে এবং ডাইনিং হলে, দুই জায়গায় দুটো ফ্রীজ। একটা গাড়ি ব্যবহার করে বাবা। আর একটা বাড়িতেই মজুত থাকে। তার মা এবং তারা চার ভাইবোন, যার যখন দরকার নিয়ে বেড়িয়ে পড়ে।

বেশ স্বাচ্ছন্দ্য আর বিলাসীতার ভেতরেই বড় হয়েছিল জিল। বড়দা এবং তার পিঠে ছোট ছোট দুই বোনের ভালবাসায় মার স্নেহে দিনগুলো ভালই কাটছিল। কিন্তু জীবন কখনো সোজা সরলরেখায় চলে না। বাঁধানো পথ ধরে চলতে চলতে কখন যে সে হোঁচট খায় আর সকলের অলক্ষ্যে গড়িয়ে গড়িয়ে সর্বনাশের গহ্বরে পড়ে তলিয়ে যায় তা কেউ বলতে পারে না।

বড় মেয়ে। দেখতে শুনতে ডানাকাটা না হোক, সুন্দরীই বলতে হবে। তবুও কেন যেন তার বাবা তাকে কিছুতেই সহ্য করতে পারতেন না। অতি—অতি তুচ্ছ কারণে রূঢ় কর্কশ ব্যবহার করতেন। রেগেমেগে চিৎকার করে অনার্থ বাধাতেন। কেন যে বাবা তার ওপর এত চটে যেতেন, কেন সে তাঁর চক্ষুশূল হয়েছিল—জিল আজও ভেবে কোন কুলকিনারা পায় না।

পড়াশুনায় ফাঁকি দিয়ে বাইরে বাইরে টো টো করে ঘুরে বেড়ানো, ছেলেদের সঙ্গে আড্ডা—এসব কোন বেলাল্লাপনা-ই তার ছিল না। লেখাপড়াতেও সে অত্যন্ত ভাল ছিল। প্রত্যেক বছর ফার্স্ট স্ট্যাণ্ড করে প্রমোশন পেত। তার আর এক নাম ছিল—ফার্স্ট গার্ল।

তবুও বাবা খুশি হতেন না। যে কোন ছলে ছুতোয় তার ওপর ক্ষিপ্ত হয়ে উঠতেন। তার ওপর যেন কিসের একটা আক্রোশ ছিল।

পরীক্ষা এসে পড়েছে। টেবিলের ওপরে মাথা ঝুঁকে পড়াশুনা করছে জিল। হঠাৎ দুম করে ঘরে ঢুকলেন বাবা।

কি ব্যাপার—এমন সুন্দর মোজাইক করা মেঝে, তার ওপর এত গুটি গুটি কাগজের দলা কিসের?

ভুল হয়ে গেছে বাবা, আমতা আমতা করে বলে জিল, হাতের কাছে ওয়েস্ট পেপার বাসকেটটা—

মিথ্যে কথা বলো না, দাঁতে দাঁত চেপে ধরে চিৎকার করে উঠলেন তিনি। আর জিলের গালে একটা চড় কষিয়ে জুতোয় মস মস শব্দ তুলে ঝড়ের মত বেরিয়ে গেলেন। দূরে বারান্দা থেকে শোনা গেল তার গজরানো—নিজেদের মেহনত করে মাথার ঘাম পায়ে ফেলে তো বাড়ি করতে হয়নি—

কান্নায় ভেঙে পড়ে জিল।

তার পিঠে সস্নেহে হাত রেখে মা বলেন, মনে কিছু করিস না মা—কারবারে মন্দা যাচ্ছে তাই—

কিন্তু মা-র কথা মানতে পারে না জিল। মন শান্ত হয় না। দাদা রাতভোর সিগারেট চুরুট খেয়ে খেয়ে মেঝে ডাই করে রাখে। ছোট ছোট বোন দুটো তো আহ্লাদি পুতুল। স্কুল থেকে কি বাইরে থেকে বাড়িতে এসেই বিছানার ওপরে

জামা কাপড় ছেড়ে ছুঁড়ে ছুঁড়ে ফেলে দেয়। কৈ তাদের তো বাবা কখনো কিছু বলেন না। তাহলে বাবা কি চাইছেন না—সে বাড়িতে থাকে!

আরো একবার।

বাবা কি কারণে প্রচণ্ড রেগে উঠলেন। আর ক্ষেপে গিয়ে হঠাৎ তার বড় আদরের পুষি, বিড়ালছানাটার ওপরে ঝাঁপিয়ে পড়লেন। আর গলাটা দুমড়ে মুচড়ে জানালা দিয়ে বাইরে ছুঁড়ে ফেলে দিলেন। আর্তনাদ করে উঠল জিল। বাবা ভ্রূক্ষেপই করলেন না। তার দিকে একবারও না তাকিয়ে বেরিয়ে গেলেন।

দিনের পর দিন বাবার অত্যাচারে, নিষ্ঠুর পীড়নে সে যখন বিপর্যস্ত, মনমেজাজ অবসন্ন, চেতনা বিকল ঠিক সেই সময়—

সেই সময়! একদিন নিশিপাওয়া মানুষের মত নদীর ধারে সে ঘুরপাক খাচ্ছিল। বেশ বুঝতে পারছিল। তার নিজের ওপরে কোন বশ নেই। পাদুটো যেন তার নিজের পা নয়! মাঝে মাঝে মনে হচ্ছিল—বাড়িতে ফিরে যায়। কিন্তু—

বাবা!

বুলডগের মত ভারি মুখখানা মনের ভেতরে ভেসে উঠতেই থমকে দাঁড়িয়ে পড়ল। না। অসম্ভব! এ বাড়ির ত্রিসীমানা মাড়াবে না। কিন্তু—কোথায়—যাবে-ই বা কোথায়? এত বড় পৃথিবী। কোটি কোটি মানুষ। কিন্তু মা বাবা আর তিন ভাইবোন এই পাঁচটি প্রাণী ছাড়া কোথাও যে কাউকে চেনে না। জানে না। চোখের সামনে অন্ধকার। হতাশার পুঞ্জ পুঞ্জ অন্ধকার চেপে নেমে আসে।

তুই কি ভাবছিস রে?

চমকে যেন ঘুম থেকে জেগে উঠল জিল।

তার এক সহপাঠি এগিয়ে এল। হাসি হাসি মুখ।

তোর কি হয়েছে বল তো, সব সময় মনমরা হয়ে থাকিস—

জিল কথা বলে না। কয়েকবার ঢোক গিলে ঝাপসা গলায় বলল আমার কথা শুনে কি করবি বল—

তোকে আমি সাহায্য তো করতে পারি—

বলব না বলব না করেও জিল বলে বাবার নিষ্ঠুর অত্যাচারের কথা, কারণে অকারণে তাকে পীড়ণের সব কথা।

ও-এই ব্যাপার! সব শুনে হেসে হেসে তার দুশ্চিন্তা আর যন্ত্রণা যেন উড়িয়ে দিতে চাইল ছেলেটি। প্যান্টের হিপ পকেট থেকে পলিথিনের একটা প্যাকেট বের করতে করতে বলল, একটু দাঁড়া—তোকে এমন একটা জিনিস দিচ্ছি—তুই সব—সব ভুলে যাবি—

বাঁ হাতের তালুতে শুকনো কালো কালো পাতা নিয়ে বেশ জোরে ডলে ডলে একটা সরু পাইপে ভরে তাতে আগুন ধরিয়ে দিল। এবার ছেলেটি খুব জোরে জোরে কয়েকটা টান মেরে জিলকে দিয়ে বলল, নে-টান—জোর টান দে—দেখবি একেবারে অন্য একটা জগতে চলে যাবি—

জিনিসটা কি রে—কিসের পাতা ?

ওসব পরে হবে—আগে তুই টান না—

পাইপ মুখে লাগিয়ে টান দিতে লাগল জিল। নাক মুখ দিয়ে ধোঁয়া বেরুতে লাগল। তার চোখ মুখ লাল হয়ে উঠল। খক খক করে কাশতে শুরু করল। তাড়াতাড়ি করে পাইপটা বন্ধুর হাতে দিয়ে বলল। না রে পারব না—কী ভীষণ কড়া—

পারবি—পারবি। আমারও প্রথম প্রথম এরকম হয়েছিল—

তার উৎসাহে জিল দিব্যি পাইপ টানতে লাগল। তার মনে হল সে যেন আস্তে আস্তে ঘূর্ণি বাতাসের মত পাক খেতে খেতে ওপরে উঠে যাচ্ছে—অনেক—অনেক ওপরে। নিচে—বহু নিচে পড়ে রইল পৃথিবী। যেখানে ঘন অন্ধকারে মুখ থুবড়ে পড়ে রইল তার দুঃখ, তার যন্ত্রণা—তার অস্বস্তিকর জীবনের গ্লানি।

কয়েকমুহূর্ত পরেই সে ভুলে গেল তার বাবা তাকে ভালবাসেন না। তুচ্ছ কথায় তাকে কষ্ট দেন, ভুলে গেল পড়ার ঘরে নোংরা করার জন্য চড় মেরেছিলেন—ভুলে গেল তার বড় প্রিয় পোষা বিড়ালছানা পুষির গলা দুমড়ে মুচড়ে বাইরে ছুঁড়ে ফেলে দিয়েছেন তার বাবা—বেমালুম ভুলে গেল বাড়ি তার কাছে অসহ্য হয়ে উঠেছিল, দুঃসহ হয়ে উঠেছিল জীবন—

জিল ভাল করে কিছু বুঝবার আগেই নেশার শিকার হয়ে গিয়েছিল। সেই যে তার জীবনে ড্রাগের (Hash অর্থাৎ গাঁজা) বড়শি তার জীবনে বিঁধে গেল তাকে ধাপে ধাপে একেবারে সর্বনাশের অতল গহ্বরে নিয়ে গিয়েছিল।

যে মেয়ে দিনরাত বই মুখে করে বসে থাকত সেই জিল আর লেখাপড়ায় মন বসাতে পারে না। আর কলেজের ক্লাসের প্রগ্রেস রিপোর্টে মাস্টারমশাইয়ের কড়া কড়া মন্তব্য এবং বিভিন্ন সাপ্লিমেণ্টারি পরীক্ষার মার্কসীটে-ই পরিষ্কার বুঝতে পারা গিয়েছিল জিল পড়াশুনা প্রায় করে না বললেই হয়।

বাবা আরও বিক্ষুব্ধ—আরও হিংস্র হয়ে উঠলেন। তাতে অবশ্য জিলের আর কিছুই এসে যায় না। সে সর্বযন্ত্রণা আর দুঃখের উপশম হয় এমন আশ্চর্য সঞ্জীবনি সুধা পেয়ে গিয়েছে। তার বাবার অত্যাচারের মাত্রা যত বাড়ে সে তত বেশি করে নেশায় বুঁদ হয়ে থাকে।

জিলের হাত খরচ বরাদ্দ ছিল সপ্তাহে দশ ডলার। এই দিয়ে সে তার নেশার খরচ আর কুলিয়ে উঠতে পারে না কিছুতেই। এক ভরি গাঁজার দাম যে অনেক। বুধ-বৃহস্পতিবার আসতে না আসতেই তার হাত খালি হয়ে যায়। আর তখুনি হয়—

হয় সবচেয়ে মুস্কিল। গলা শুকিয়ে কাঠ হয়ে যায়। মুখে তেতো জল কাটতে থাকে। মাথার ভেতরটা টলে। পেটের ভেতরে কি যেন পাকিয়ে পাকিয়ে ওঠে, মনে হয় এখুনি যেন হড় হড় করে বমি হয়ে যাবে !

অন্তত ভরিখানেক হ্যাস না কিনলেই নয়। কিন্তু পয়সা—পয়সা পাবে কোথায় ? বাধ্য হয়েই জিল বাড়ির ছোট ছোট জিনিস সরিয়ে বাজারে বিক্রি করতে লাগল।

মা টের পেয়ে গেলেন। ছুটকো ছাটকা সব ছোট ছোট জিনিস আলমারিতে তালাচাবি দিয়ে রাখলেন। কিন্তু বাধা যত আসে ততই মরিয়া হয়ে ওঠে জিল। এই-বার সে বাড়ি ছেড়ে রাস্তায় নেমে এল। যেমন করেই হোক হ্যাসের পয়সা তাকে জোগাড় করতেই হবে। কিন্তু কেমন করে?

রাস্তা দিয়ে যেতে যেতে হঠাৎ তার চোখদুটো ধাঁধিয়ে গেল। আর্কল্যাম্পের উগ্র সাদা আলোয় ঝলমল করছে বাচ্চাদের খেলনার দোকান—টয় হাউস। শোকেসে সাজানো আছে থরে থরে রকমারি খেলনা। দোকানে ভিড় একেবারে উপছে পড়ছে।

জিল দোকানে ঢুকে পড়ল। খদ্দেরদের আড়ালে কিছুক্ষণ দাঁড়িয়ে রইল। যে কাউন্টারের সেলসম্যান খুব ব্যস্ত তার পাশ থেকে দুটো খেলনা তুলে নিয়ে চোখের পলকে কাস্টমারদের ভিড়ে মিশে গেল। তারপরে বেশ ধীরে সুস্থে রাস্তায় নেমে এল।

ধীরে ধীরে জিলের হাত পেকে গেল। সাহসও বেড়ে গেল। কিন্তু একদিন সে ধরা পড়ে গেল। কয়েকদিন হাজতে থেকে বেরিয়ে এল জিল।

এই জেলখানাতেই তার সঙ্গে আলাপ পরিচয় হল বেশ কয়েকজন পাকা অ্যাডিক্ট বা নেশাখোরদের সঙ্গে। তারা এক একজন ড্রাগের লাইনে বেশ পোড় খাওয়া। বহু ঘাটের জল খেয়েছে। ঘুরেছে দুনিয়ার বহু দেশ। তাদের ভেতরে আবার কেউ কেউ হ্যাস যেখানে মাঠেঘাটে বনে বাদাড়ে বুনোগাছের মতই অঢেল জন্মায় সেই ইন্ডিয়াও ঘুরে এসেছে।

মন্ত্রমুগ্ধের মত শোনে জিল সাগরপারের সেই দেশ—ভারতের কথা। তার চোখের সামনে ভেসে ওঠে মাঠের পর মাঠ জুড়ে হ্যাসিসের বা গাঁজার গাছ সবুজের নিস্তরঙ্গ সমুদ্রের মত গা এলিয়ে পড়ে রয়েছে। বাতাসে মাথা দোলাচ্ছে হ্যাসের মতই আরো একটি নার্কটিক ড্রাগ—সিদ্ধি বা ভাঙের গাছ!

যে দেশে গাঁজা আর সিদ্ধির ছড়াছড়ি সেই দেশে যাওয়ার জন্যে জিলের মন ব্যাকুল হয়ে ওঠে। কিন্তু যাব বললেই তো যাওয়া যায় না। অত টাকা তাকে কে দেবে? কোথায় পাবে—কেমন করে জোগাড় করবে যাওয়ার খরচ?

হ্যাঁ আছে। তার মত ভরা বয়সের মেয়েদের পয়সা উপায়ের একটাই রাস্তা আছে। শেষ পর্যন্ত সে রূপযৌবন বিকোবে। ছিঃ ছিঃ সে যে বড় নোংরা ব্যাপার। না—একটার পর একটা পুরুষের লালসার শিকার সে হতে পারবে না। অতএব—

একদিন সুযোগ বুঝে বাবার ব্রীফকেস খুলে পাঁচ হাজার ডলার চুরি করে উড়ে চলে এল ইন্ডিয়ায়।

এই পর্যন্ত বলে থেমে গিয়েছিল দীনেশ যাজ্ঞি।

মাথা নিচু করে কিছুক্ষণ কি যেন ভাবল। হয়ত জিলকে নিয়েই তার মনের ভেতরে তোলপাড় চলছে। স্পষ্টই বুঝতে পারা গেল। তার বুকের পাঁজর কাঁপিয়ে কাঁপিয়ে বেরিয়ে আসা দীর্ঘশ্বাস গঙ্গার শাঁ শাঁ বাতাসে মিশে গেল।

আমার সঙ্গে জিলের প্রথম দেখা হয়েছিল গোয়াতে। আমি তখন কখনো গোয়ার

পাজিমে কখনো আনজ্না বীচে প্রোপ্রি জাঙ্কি হয়ে পড়েছি। থাক আমার কথা—জিলের তখন কিন্তু শুধু হাসিসে-ই চলত। কিন্তু কিছুদিন পরেই—হঠাৎ থেমে গেল দীনেশ। তার মুখে ব্যথার ছায়া ফুটে উঠল। আর তীব্র যন্ত্রণায় তার মুখখানা কেমন এঁকে বেঁকে দুমড়ে দুমড়ে যেতে লাগল। মনে হল জিলের জীবনের করুণ পরিণতির কথা ভেবেই হয়ত কষ্ট পাচ্ছে।

ওর দেশের একটি মেয়ের পাল্লায় পড়ে জিল একদিন 'স্ম্যাক' অর্থাৎ হেরোইনের ধোঁয়া টানতে শিখল। ব্যস—থামল দীনেশ। একটু থেমে আবার বলেছিল, প্রথম দিনই—জিলের মনে হয়েছিল—গাঁজার থেকে অনেক—অনেক বেশি উত্তেজক—অনেক বেশি ঝাঁঝালো এই হেরোইন—আর সেদিন থেকেই গ্যার হেরোইনের কেনা বাঁদী হয়ে গিয়েছিল জিল—

তারপরে দীনেশ কখনো দারুণ উত্তেজনায় জ্বলতে জ্বলতে কখনো গভীর দুঃখে মুষড়ে যেয়ে বলেছিল চিকাগোর মেয়ে জিলের বৃত্তান্ত—

হেরোইনের প্রথম সটেই (এক ছিলাম বা এক টান) জিল যেন কেমন হয়ে গিয়েছিল। মাটির পৃথিবীর সঙ্গে, বাস্তবের সঙ্গে সংযোগ একেবারেই হারিয়ে ফেলল। তার মনে হল অনেক-অনেক দূরের একটা অজানা দেশের দিকে যেন ডানা মেলে উড়ে চলেছে। নিচে—বহু নিচে মাটিতে চারিদিক আলো করে রাশি রাশি হলুদ ফুল ফুটে রয়েছে—স্বপ্নের মত কী সুন্দর সেই দেশ—একটা অদ্ভুত আচ্ছন্নতার মধুর এক অনুভবের সুখে তার চেতনা কেমন আবিষ্ট হয়ে আসে।

তবুও যেই সময় কেটে যায়, নেশার জোর কমে আসে। আর মনের ভেতরে বাবার মুখখানা ভেসে ওঠে। সঙ্গে সঙ্গে তার বুকের ভেতরটা ব্যথায় টন টন করে ওঠে। অমনি হেরোইনের সাট নিতে বসে যায়। যতবার সেই নিষ্ঠুর মানুষটাকে তার মনে পড়ে ততবার সে এই ড্রাগের শরণাপন্ন হয়। তার মনে হয়—মনে হয়—বহুদিন বহুকাল পর সে যেন সব দুশ্চিন্তা আর যন্ত্রণা থেকে মুক্তির পথ খুঁজে পেয়েছে।

সাধারণত নেশাখোর বা অ্যাডিক্টরা ১৫ মিলিগ্রাম হেরোইন দিয়ে শুরু করে। তাতেই বেশ ঝিম ঝিম ভাব অর্থাৎ এফেক্ট হতে শুরু করে। তারপর দিনে দিনে একটু একটু করে মাত্রা বাড়তে থাকে। বাড়তে বাড়তে অ্যাডিক্টরা ২৫০ মিলিগ্রাম পর্যন্ত হেরোইন হয় টিনের পাতের ওপর নিয়ে তাতে আগুন ধরিয়ে ধোঁয়াটা খায় না হয় দেহের কোথাও নিজে নিজেই সূঁচ বিঁধিয়ে সিরিঞ্জে হেরোইন নিয়ে পুষ করে। অভিজ্ঞতা থেকে দেখা গিয়েছে ২৫০ মিলিগ্রাম পিওর হেরোইন একজন অ্যাডিক্টকে তীব্র নেশাগ্রস্ত করার পক্ষে যথেষ্ঠ। তার চেতনা একেবারে অসাড় হয়ে যায়। দিন না রাত দুপুর না বিকেল—সময়ের কোন হুঁস থাকে না। অদ্ভুত একটা অনুভূতির স্রোতে ভাসতে ভাসতে অনন্তকালের ভেতরে বিলীন হয়ে যায়।

যাহোক—জিলেরও ২৫০ মিলিগ্রাম না হলে চলতোই না। আড়াইশো মিলিগ্রামের একটা 'ফিক্স' (ডোজ) শরীরে ইনজেক্ট হয়ে বুঁদ হয়ে পড়ে থাকে। দেখতে দেখতে সে কেমন বেপরোয়া আর উচ্ছৃঙ্খল হয়ে উঠল। জীবনটাকে নিয়ে একটা বলেক

মত লোফালুফি করতে লাগল। কোন ভয় নেই, ভাবনা নেই, ভবিষ্যতের কোন চিন্তাই নেই। যেন রকেটের মত উদ্দাম বেগে ছুটে চলেছে।

কোনদিন হয়ত ডেরায় ফিরলই না। রাতভোর খোলা আকাশের নিচে ধু ধু বালুচরে পড়ে রইল। আবার কোনদিন বা হাঁটতে হাঁটতে আনজুনা বীচের সীমানা ছাড়িয়ে চলে যায় জেলেদের গ্রামে। কারো বাড়ির দাওয়ায় কি বাঁশের মাচার ওপর শুটকি মাছের গন্ধ শুঁকতে শুঁকতেই রাত কাটিয়ে দিল। সকালে চলে আসার সময় সেখানেই তার ঘাড়ে ঝোলানো ব্যাগটা ফেলে রেখে চলে এল। তাতে হয়ত বেশ কিছু টাকা পয়সাও ছিল। ছিল—ছিল! তাতে কি—ওসব পরোয়া করে না সে।

প্রায়ই তার জিনিসপত্র হারাতে লাগল। আজ কি টাকা গেল—কাল হয়ত সবচেয়ে দামী মসলিনের ওপরে বাটিকের কাজ করা স্কার্টটাই কোথায় ফেলে রেখে চলে এল আর পেলই না। তারপরে হেরোইনের আর একটা ফিক্সের সট নিতেই বেমালুম ভুলে গেল জামার কথা। আবার একটা কিনে ফেলল। টাকার তো অভাব নেই। তার কাছে তখনও অনেক—অনেক টাকা!

উঠতি বয়স। দেখতে শুনতেও মন্দ নয়। অতএব তার আশপাশে জাঙ্কিরা।* ঘুরঘুর করতে লাগল। তাদের সঙ্গে একসঙ্গে বসে নেশা করে। হৈহুল্লোড় করে। আবার খুশি হল তো ব্যাগ খুলে তাদের প্রত্যেককে দু'হাতে টাকা বিলোতে থাকে। জাঙ্কিরা মহাখুশি হয়ে জিলের সঙ্গে আরও ঘেঁসাঘেঁসি করে থাকে। জিলকে ঘিরে তারা অষ্টপ্রহর মৌমাছির মত গুনগুন করে।

জিলের একটা ধারণা ছিল—সে যেমন বন্ধুদের সাহায্য করছে তেমনি তার অসময়ে তারা তাকে নিশ্চয়ই দেখবে। বড়লোকের মেয়ে তো। জীবন সম্বন্ধে অভিজ্ঞতার তখনো অনেক—অনেক বাকি ছিল। তাই সে অমন অদ্ভুত আর অবাস্তব একটা বিশ্বাস নিয়ে নিজের পুঁজি উড়িয়ে দিচ্ছিল।

বিদেশ বিভুঁই। হাতে পয়সাকড়ি না থাকলে কি হবে—কি হতে পারে—এসব ভাবার তো তার সময় নেই। ক্ষমতাও নেই। সবসময়ে তো নেশার ঝোঁকে থাকে।

দিন কাটে। মাস যায়। জিলের ড্রাগের মাত্রাও বেড়ে চলে। আগে দিনে হেরোইনের একবার একটা ফিক্স বা আড়াইশো মিলিগ্রামের একটা সুট অর্থাৎ ইনজেকশান নিলেই মোটামুটি চলে যেত। এখন সারা দিনে রাতে চারবার চারটি ফিক্স না নিতে পারলে তার মাথার ভেতরটা আনচান করে। শরীরটা কেমন ঝিম ঝিম করে। অতএব চারটে ফিক্সে মোট দশ মিলিগ্রাম হেরোইন পুষ করে একেবারে তুরীয় অবস্থায় পৌঁছে যায়। অজানা একটা দেশের আনন্দলোকে বিপুল একটা সুখের অনুভবে আবিষ্ট হয়ে থাকে।

---

*ড্রাগের জগতের একটা খুব পরিচিত নাম। সাধারণত রাস্তাঘাটে ঘুরে ঘুরে বেড়ানো নেশাখোরদেরই জাঙ্কি বলে। কিন্তু শব্দটির অভিধানগত অর্থ হচ্ছে ড্রাগের কারবারী এবং অ্যাডিক্ট বা নেশাখোর।

এইখানে জেনে রাখা দরকার 'হেরোইন' বস্তুটির যেমন রকমারি নাম—তেমনি তাদের কোয়ালিটিরও রকমফের আছে। সাধারণত ভারতের বিভিন্ন শহরে হেরোইনের বাজার চলতি নাম হল—

টু ড্রাগনস।

গোল্ডেন স্পাইডার।

স্ট্যাগ।

হর্স।

এদের ভেতরে সেরা এক নম্বর। শতকরা ৯৬ ভাগ পিওর হেরোইন—ড্রাগের সাম্রাজ্যে সম্রাট হয়ে যে বিরাজ করছে তার নাম—

হেলথি নম্বর ফোর।

এর দাম প্রায় আকাশ ছোঁয়া। আর বড় রেয়ার—খুব সহজে পাওয়া যায় না। কচিৎকদাপে আফগানিস্থান থেকে পাকিস্থানের সীমান্ত পেরিয়ে আসা স্মাগলারদের কাছ থেকে সংগ্রহ করে থাকে এখানকার ড্রাগের কারবারি বা পেডলাররা।

তাই বলে টু ড্রাগনস গোল্ডেন স্পাইডার ইত্যাদি হেরোইনও কিন্তু দামের দিক থেকে খুব একটা কম যায় না। একটা ফিক্স বা ২৫০ মিলিগ্রাম হেরোইনের দাম পড়ে ২৫ থেকে ৩০ টাকা।

এবার জিলের অবস্থা চিন্তা করা যাক। সে পাকা অ্যাডিক্ট। ডেলী চারবারে অন্তত চারটি ফিক্স সুট না করলে তার চলে না। অতএব প্রতিদিন ১২০ টাকার ড্রাগ তার না কিনলেই নয়।

গড়িয়ে গড়িয়ে শুধু খেতে থাকলে কলসীর জলে শূন্য হয়ে যায়। বন্ধুদের দানখয়রাত তার ওপর ড্রাগের এই প্রচণ্ড খরচ। তার ভাঁড়ারে টান পড়ে। জিল একদিন একেবারে দেউলিয়া হয়ে যায়।

ওমা! কি আশ্চর্য যে জাঙ্কিরা গুড়ের মটকির গায়ে লেপটে থাকা মাছির মত তার সঙ্গে সঙ্গে থাকত, একদণ্ডও তার সঙ্গ ছাড়ত না তারা তাকে দেখেও মুখ ঘুরিয়ে চলে যায়। যেন চিনতেই পারে না। কোনদিন দেখেইনি।

সকালে ঘুম ভাঙ্গার পরে চোখ খোলার সংগে সংগে জিল হেরোইনের একটা ফিক্সের সুট নিয়ে নিত। শরীরটা সংগে সংগে বেশ চাংগা হয়ে উঠত। নিজেকে পাখির মত হালকা মনে হত! কিন্তু—

ভোর হয়। ঘুম ভাংগে। নেশা চাগিয়ে ওঠে। কিন্তু ড্রাগ কোথায়? খাওয়ার পয়সাটুকু পর্যন্ত নেই। একবেলা দু'বেলা না হয় না খেয়ে থাকতে পারবে। কিন্তু ড্রাগ না হলে যে বাঁচবে না।

মোটামুটি এমন এক জাঙ্কি বন্ধু আছে সব খুলে বলল জিল। তারপর তার পরামর্শ চাইল—কি করি বলো তো?

জাঙ্কি চোখের কোণা দিয়ে তার পাতলা জামার নিচে সুডৌল বুকের আভাসের দিকে তাকিয়েই মনে হল কটাক্ষ করল তোমার আবার পয়সার ভাবনা?

মাথা নিচু করল জিল। তীব্র—তীক্ষ্ণ একটা যন্ত্রণায় যেন বুকের ভেতরটা চিন চিন করে জ্বলে যাচ্ছে। তবে স্নায়ুতে স্নায়ুতে যেন আগুনের ঝড় বয়ে যেতে লাগল।

রাতের অপ্সরী সেজে রাস্তায় দাঁড়াতে হবে। আমিষ লোলুপ পশুদের সামনে নিজের মাংসের পসরা সাজিয়ে দিতে হবে! তার চোখ ফেটে জল এসে পড়ল। কিন্তু—

উপায় নেই। যা সে অন্তর দিয়ে ঘৃণা করে, যা ভাবতেও তার গা গুলিয়ে ওঠে সেই কুৎসিত কাজই তাকে করতে হবে। নেমে যেতে হবে নরকের অন্ধকারে। ড্রাগের ওপরে বিক্ষুব্ধ আক্রোশে জ্বলে উঠল। হঠাৎ ক্ষিপ্ত হয়ে ইনজেকশনের নিডল, সিরিঞ্জগুলো দুমদাম করে আছড়ে ভেঙ্গে ছত্রাখান করে ফেলল। তার সারা শরীর থর থর করে কাঁপতে লাগল। মনে হল—অসহ্য—অসহ্য আর দুঃসহ একটা যন্ত্রণা যেন পাক খেয়ে খেয়ে তার শিরদাঁড়া বেয়ে নামছে আর সেই জ্বালাই তার হাতে পায়ে খিঁচুনি ধরিয়ে দিচ্ছে। মুখের দু'পাশ দিয়ে সাদা সাদা গ্যাঁজলা গড়িয়ে পড়ছে। আর একেবারে বদ্ধ একটা পাগলের মত মেঝেতে কখনো বা দেওয়ালে মাথা ঠুকে যেতে লাগল। হয়ত সেদিন সে মরেই যেত। কিম্বা জ্ঞান হারাতো যদি—

হঠাৎ কোথায় থেকে এক জাঙ্কি বন্ধু এসে তাড়াতাড়ি হ্যাসের একটা সট দিয়ে তাকে মোটামুটি সুস্থ না করে তুলতো। কিন্তু যে ডেলী দশ মিলিগ্রাম হেরোইন শরীরে 'পুস' করে তার এক কি দুই ভরি গাঁজায় কি হবে? তাই—

সন্ধ্যার আবছায়া অন্ধকারে তাকে সী-বীচে এসে দাঁড়াতেই হল। গোয়ার পাঞ্জিম থেকে আরও নানা শহর থেকে বিলাসী বাবুরা এই আনজুনা বীচেই স্ফুর্তি'টুর্তি করতে আসে।

একটা উঁচু বালিয়াড়ির পাশে এসে দাঁড়ালো। পাশেই একটা রেস্টুরেন্ট কাম বার। সেখানে লোকজনের বেশ আনাগোনা অতএব খদ্দের জুটে যেতে দেরি হল না। কিন্তু—

সব দিন একরকম যায় না। কোনদিন হয়ত মেঘ করে। টিপটিপ বৃষ্টি পড়ে দু'এক ফোঁটা। সেদিন আর কেউ আসে না। ডাকে না অনেক রাত্ত পর্যন্ত দাঁড়িয়ে থেকে থেকে চলে আসতে হয়। কিন্তু ড্রাগের খরচ আসবে কোথায় থেকে?

তখন বাধ্য হয়েই তাকে পুরানো রাস্তা ধরতে হয়, সেই দোকানে ঢুকে জিনিস নিয়ে সরে পড়া অর্থাৎ শপ লিফটিং করতে হয়।

ড্রাগ—ড্রাগ—ড্রাগ।

ড্রাগের জন্য সে চুরি করে। কখনো বা কাউকে দু'দন্ড সঙ্গ দিয়ে টাকা আদায় করে দেহ বিক্রি করে। হেন নোংরা কাজ নেই যা সে করে না! লাজলজ্জা নীতি-শ্লীলতা সব-সব বোধ জলাঞ্জলি দিয়ে দেহে মনে এমন বিপর্যস্ত হয়ে গিয়েছিল যে তার সেই ভগ্নাবশেষকে আর জিল বলে চেনাই যায় না। পুরোপুরি জাঙ্কি হয়ে রাস্তাঘাটে ঘোরে কখনো বা নেশার ঝোঁকে বেহুঁস হয়ে কোথাও পড়ে থাকে হিপিদের মত। তার সেই নোংরা ছেঁড়া জামাকাপড় জট পাকানো চুল দেখে সে যে একদা চিকাগোর

এক ধনীর ঘরের কন্যা ছিল—তা ভাবাই যায় না।

কিন্তু একদিন হঠাৎ একটা কাণ্ড ঘটে গেল।

প্রতিদিনের মত সেদিন জিল সকালে ঘুম থেকে উঠেই আড়াইশো মিলিগ্রাম হেরোইনের একটা 'ফিক্স' পুষ করল। নিডল আর সিরিঞ্জটা বেশ করে পুঁছে রেখে দিল। আবার বেলা এগারোটা নাগাদ আর একটা ফিক্স নিতে হবে। কয়েক মুহূর্ত পরেই মাথাটা ঝিমঝিম করতে লাগল। আর মিষ্টি আর তীব্র একটা নেশার মৌতাতের ভেতরে একটু একটু করে তলিয়ে যেতে শুরু করলো। তার মনে হলতার সমস্ত সত্তাটাই যেন ভেংগে চুরে দীর্ণ বিদীর্ণ হয়ে গভীর কালো জলের স্রোতে কোথায় কুটোর মত ভেসে গেল। আর সে হয়ে গেল একটা পাখি। ডানা মেলে আকাশে উড়তে উড়তে হাজার হাজার মাইল পেরিয়ে অনেক অনেক নদী, বন, প্রান্তর, সমুদ্র আর পাহাড় ডিঙিয়ে পেঁাছে গেল চিকাগোয়! তার বাড়ি·· সুইট হোম! মা বাবা ভাইবোন···

কি রে জিল কেমন আছিস?

বহু-বহু কষ্টে নেশা আর ঘুমজড়ানো চোখের ভারি পাতাগুলো কোনরকমে খুলতেই সে শিউরে উঠল। ঘন কুয়াশার ভেতরে যেন ধোঁয়ার মত তার বাবারই সেই দীর্ঘ মূর্তি।

না—না অসম্ভব! বাবা কি করে এখানে আসবে? কোথায় গোয়া আর কোথায় —কিন্তু আবার হাতের চেটো দিয়ে চোখদুটো বেশ করে কচলে নিয়ে তাকাতেই যেন কটাং করে তার মাথার ভেতরের একটা শিরা ছিঁড়ে গেল। আর যেন মর্মতন্তু ছিঁড়ে ক'কিয়ে চিৎকার করে বলল—কেন—কেন—এসেছ—তুমি বলতে বলতেই হঠাৎ লাফিয়ে বাঁশের মাচার বিছানার ওপর থেকে নেমেই বীচের দিকে ছুটতে লাগল। পরণে একটুকরো কাপড়ের চিহ্ন পর্যন্তও নেই! সম্পূর্ণ উলংগ হয়ে বদ্ধ একটা উম্মাদিনীর মত উর্ধ্বশ্বাসে দৌড়াতে দৌড়াতে দু'হাতে বুক চেপে ধরে চিৎকার করতে লাগল—না—না—যাব না—আমি যাব না—না—না—না—

তার সেই মর্মান্তিক আর্তচিৎকারটা যেন সি-বীচ ছাড়িয়ে সমুদ্র ডিঙিয়ে পৃথিবীর সীমানা পেরিয়ে দিকদিগন্তে হাহাকারের মত বেজে যেতে লাগল—

থেমে গিয়েছিল দীনেশ। অনেকক্ষণ আচ্ছন্নের মত বসে রইল। ঘোর কেটে গেলে আস্তে আস্তে কেমন অস্পষ্ট আর ঝাপসা গলায় বলেছিল—জিল একটা উঁচু বালিয়াড়ির ওপরে উঠে সাগরের জলে ঝাঁপিয়ে পড়ে সুইসাইড করতে যাবে এমন সময় আমি আর একটা আমেরিকান মেয়ে ছুটে যেয়ে তাকে সাপটে ধরে নিয়ে আসি তার বাবার কাছে—হঠাৎ চুপ করে গেল দীনেশ।

তারপর?

বাবাকে দেখেই হিংস্র হয়ে উঠেছিল জিল। ক'কিয়ে চিৎকার করে কি একটা বলতে যেতেই হঠাৎ থেমে গিয়েছিল। তারপরেই জ্ঞান হারিয়ে টলে পড়ে গিয়েছিল—মাথা

নিচু করে বসে থাকল সে। নিজের মনের ভেতরে ডুব দিয়ে কি যেন ভাবতে লাগল। তারপরে যেন নিজেকেই শুনিয়ে শুনিয়ে অস্ফুটস্বরে বলেছিল দীনেশ নেপালে, মীরাটে, মানালিতে আরও কত জায়গায় কত ড্রাগ অ্যাডিক্ট কত জাঙ্কির কত ট্র্যাজেডি যে দেখেছি— ।

দীনেশই জানিয়েছিল জিল তার বাবার সঙ্গে চিকাগোতে ফিরে গিয়েছিল। গোয়াতে তার আমেরিকান বন্ধুদের চিঠিতে লিখেছে এখন একেবারে ড্রাগ খায় না সে। সপ্তাহে একবার বাবার সংগে ড্রাগ অ্যাডিক্টদের বিশেষজ্ঞ ডাক্তার বা সাইক্রিয়াটিস্টের চেম্বারে সিটিং দেয়।

তার বাবা না কি একেবারে পালটে গেছেন। মেয়েকে খুব ভালবাসেন।

দুই

কোথাও না কোথাও সুখ আছে—এই বিশ্বাস নিয়ে নেশাখোর জোসেফ বিশ্বপ্রাণ ঘর বেঁধেছিল জার্মান জাঙ্কি যুবতী প্যাটের সঙ্গে। তারপর ?

দীনেশ যাজ্ঞি !

পঁচিশ ছাব্বিশ বছরের পাঞ্জাবী যুবক হয়ত একদিন বেশ লম্বা চেহারাই ছিল। কিন্তু এখন কেমন শুকনো শুকনো মনে হয়। ঘাড় পর্যন্ত কালো কোকড়ানো ময়লা চুলের রাশি। তার জায়গায় জায়গায় আবার জট পড়েছে। গালের হাড়দুটো ঠেলে উঁচু হয়ে উঠেছে বলে গালদুটোকে জেটি বা গাড়ি বারান্দার মত মনে হয়। এক-সময় মুখশ্রী যে বেশ ভালই ছিল বুঝতে পারা যায়। কিন্তু অনেক অনেকদিন ধরে ড্রাগ খেয়ে খেয়ে সেই মুখের ভোলই পালটে গিয়েছে। কেমন ত্যাড়া বাঁকা ! অনেক-অনেকদিনের বহু ক্ষত আর জ্বালার দাগ ধরা সেই মুখের কোন অভিব্যক্তি বুঝতে পারা যায় না।

দীনেশের সঙ্গে আমার প্রথম আলাপ পরিচয় হয়েছিল কাশীতে। কিন্তু কি সূত্রে এবং কেমন করে—সে আর এক কাহিনী। সেসব পরে হবে।

দীনেশ প্রায়ই আমাকে নিয়ে তার প্রিয় জায়গা হরিশ্চন্দ্র ঘাটে বসত। গঙ্গার বুকে সন্ধ্যার অন্ধকার ঘন হয়ে নেমে আসত। শ্মশানের এখানে সেখানে চিতা জ্বলত। মড়া পোড়ানোর সেই উৎকট গন্ধ আর ধোঁয়া বয়ে নিয়ে আসা দমকা বাতাস থেকে থেকে নাকে ধাক্কা মারতো। দীনেশ অদূরে চিতার লকলকে আগুনের দিকে তাকিয়ে তার ড্রাগের জগতের বিচিত্র অভিজ্ঞতার কথা বলে যেত।

প্রথমদিনেই সে বলেছিল স্যার আপনি বয়সে বড়—কিন্তু গাঁজায় দু'একটা টান না দিলে আমি কথাই বলতে পারব না—আমি অনুমতি দিয়েছিলাম।

বিদেশী মেয়ে জিলের কথা তো শুনলেন। এবার শুনুন একটা মারাঠি ছেলের কথা—বলেই গাঁজার কলকিতে একটা জোর টান দিল। একমুখ ধোঁয়া ছেড়ে আস্তে আস্তে বলল, নেপালে, গোয়ায়, মীরাটে আরও কত জায়গায় কত রকমের অ্যাডিক্ট যে দেখেছি—চুপ করে গেল যাজ্ঞি। দেখতে দেখতে নেশার ঘোরে নিজের ভেতরে মগ্ন হয়ে গেল সে। স্পষ্ট বুঝতে পারলাম তার মনের ভেতরে আনাগোনা করছে আরও অনেক হতভাগ্য অ্যাডিক্টদের স্মৃতি।

দীনেশ এবার যে মারাঠি খ্রীষ্টান যুবকের বৃত্তান্ত বলেছিল তার নাম—জোসেফ। জোসেফ বিশ্বপ্রাণ দাতার। মা বাবা আর ছোট ছোট দুই বোনের বুক ভেঙে দিয়ে বাড়ি ছেড়ে পালিয়েছে।

বিশ্বপ্রাণ রীতিমত বোম্বাই বিশ্ববিদ্যালয়ের গ্র্যাজুয়েট। আর কলেজে বি. এ

ক্লাসে পড়তে পড়তেই নেশার খপ্পরে পড়েছিল। কিন্তু—কোথাও কোন ত্রুটি ছিল না। তার অভিভাবকদের কোন গাফিলতি কি কোন অবহেলা ছিল না।

বেশ স্বচ্ছল আর সম্পন্ন এক মধ্যবিত্ত পরিবারে তার জন্ম হয়েছিল। বাবার স্নেহে মার আদরে এবং ভাইবোনদের ভালবাসায় বড়ও হয়ে উঠেছিল। কখনো তার সঙ্গে বাড়ির কেউ একটা কটু কথা পর্যন্ত বলেনি।

আর বলবেই বা কেন? শান্ত মিষ্টি স্বভাবের ছেলে। বিনয়ী নম্র। গাঁজার নেশা না ধরা পর্যন্ত পড়াশুনায় ছিল ব্রিলিয়াণ্ট। বই যেমন ভালবাসতো, তেমনি ভালবাসতো গান বাজনা। বিশেষ করে পাশ্চাত্য সঙ্গীতে ছিল তার খুব ঝোঁক। বন্ধুবান্ধব নিয়ে আড্ডায় ছিল চৌকস—আসলে জীবনকেই ভালবাসতো।

তার আশা ছিল একদিন সে মস্ত গায়ক হবে। কিন্তু যেই গাঁজার নেশা ধরল অমনি বদলে গেল তার পৃথিবী। রামধনুর মত নানা রঙের ঝিলিমিলিতে রঙীন হয়ে উঠল তার জগৎ। নেশার ঘোরে তার আলোকোজ্জ্বল ভবিষ্যতের স্বপ্ন দেখতে লাগল। তার মনে হল—একদিন সে পৃথিবীর সমস্ত জীবিত শ্রেষ্ঠ গায়কদের ভেতরে সে একজন হবে। আবার তার চোখে নেমে এল স্বপ্ন—আলোঝলমলে এক প্রেক্ষাগৃহের সুসজ্জিত মঞ্চে দাঁড়িয়ে আছে সে। তার কাঁধে ঝুলছে গীটার। গীটারের ঝঙ্কারের সঙ্গে তার মধুর সুললিত কণ্ঠের অপরূপ সেই গানের সুরলহরীতে চারিদিক কেমন আচ্ছন্ন আর বিবশ হয়ে আসছে। শত শত দর্শক কেমন সম্মোহিতের মত বসে রয়েছে। তাদের অপলক চোখের মুগ্ধ দৃষ্টি সুগন্ধী গোলাপ জলের মত তার ওপরে ঝরে ঝরে পড়ছে। যেই গান শেষ হল, শ্রোতাদের সমবেত করতালির প্রবল ধ্বনির ভেতরেই পরিস্ফুট হয়ে উঠল তাদের উচ্ছ্বসিত অভিনন্দন—এই পর্যন্ত বলে হঠাৎ থেমে গিয়েছিল যাজ্ঞি।

দূরে অন্ধকার গঙ্গার বুকে আগুনের ফুলের মত ফুটে থাকা জেলে নৌকোগুলোর আলোর দিকে খর চোখে তাকিয়ে থাকতে থাকতেই আবার আচমকা বলে উঠল—জানেন স্যার—এসব স্বপ্নটপ্ন বা হলাসিনেশান—সব-সব হ্যাসের (গাঁজা) এফেক্ট—বলতে বলতেই হঠাৎ গাঁজার সরু কলকেটার গায়ে পরম আদরে হাত বুলিয়ে দিতে দিতে ভাঙ্গা ফ্যাস ফেসে গলায় বলল—এই নেশা কল্পনার পক্ষীরাজে চড়িয়ে একটা অসম্ভব স্বপ্নের রাজ্যে পেঁাছে দেয়। কেউ নিজেকে সসাগরা পৃথিবীর অধীশ্বর মনে করে, একটু হেসে আবার বলেছিল, কারো কারো আবার মনে হয় পাখির মত ডানা মেলে আকাশে ওড়া তার পক্ষে কঠিন নয়—আবার বুক উজাড় করে একটা দীর্ঘশ্বাস ফেলল দীনেশ। আবার ক্লান্ত কণ্ঠে বলল কিন্তু স্যার যেই নেশার মৌতাত কেটে যায় অমনি নিদারুণ ক্লান্তিতে শরীরটা যেন একেবারে ভেঙ্গে আসে। উঠে দাঁড়ানো যায় না—কথা বলতেও কষ্ট হয়—বলতে বলতে হঠাৎ থেমে যেয়ে কেন যেন গাঁজার কলকেটার দিকে হিংস্র প্রতিদ্বন্দ্বীর মত তাকিয়ে রইল।

বলো হরি-হরি বোল—

কাদের মড়া পোড়ানো শেষ হল। উচ্চকিত হরিধ্বনি দিয়ে শ্মশানবন্ধুরা চিতায় জল ঢালতে লাগল। বাতাসে ভেসে উঠল পোড়াকাঠ আর চিতার গন্ধ। আবার তার কাছেই আর একটা চিতা তখনো দাউ দাউ করে জ্বলছে। শবদেহটা পুড়ে পুড়ে ছোট একটা রবারের কালো পুতুলের মত হয়ে এসেছে।

সেইদিন—সেই রাত্রে সেই মৃত্যুর রাজ্যে বসেই পয়লা নম্বরের অ্যাডিক্ট, বহুদর্শী দীনেশ যে আশ্চর্য কতকগুলো কথা বলেছিল তার ভেতরে কিন্তু কোন নেশার প্রভাব ছিল না। বেশ সুস্থ শরীরে মুক্ত মন নিয়েই ধীরে ধীরে ভেবে যে কথাগুলো বলেছিল তা সংক্ষেপে এখানে বলা হল

যে যতই বলুক ড্রাগের অভিশাপ থেকে কখনো কোন দেশ মুক্ত হতে পারবে না। পৃথিবীর প্রায় সব দেশেই ধনী এবং প্রতাপশালী ব্যক্তিরা ড্রাগের গোপন চোরা-কারবারে লিপ্ত। দুনিয়ার দেশে দেশে সর্বনাশা এবং বিধ্বংসী এই নেশার জাল তারাই ছড়িয়ে রেখেছে। আবার এই দক্ষিণ পূর্ব এশিয়াতেই এমন অনেক ভূখণ্ড আছে, যেখানকার বনে পাহাড়ে, মাঠে মাঠে বুনোঘাসের মতই অপর্যাপ্ত জন্মায় গাঁজা বা হ্যাসিস এবং আফিম।

এই উপমহাদেশ ভারতের একেবারে ঘরের কাছে একটি দেশের পাহাড়ের ঢালুতে যেমন অঢেল চা গাছ তেমনি জন্মায় গাঁজা। তাই সেখানে গাঁজার কারবার বেআইনী নয়—কোন বাধা নিষেধ নেই। এই গুরুত্বপূর্ণ মাদকদ্রব্য—গঞ্জিকা দারুণ সস্তা সেখানে। মাত্র পাঁচ টাকায় পুরো এক তোলা কিনতে পাওয়া যায়। তাই সে-দেশের রাজধানীর পথে পথে দেখা যায় দুনিয়ার নানা দেশের অ্যাডিক্টদের। হিপিদের মত বড় বড় চুল। সারা গায়ে নোংরা। নেশার ঘোরে ঢুলু ঢুলু চোখ—সব মিলিয়ে মনে হয় যেন বহুদূরের কোন অজানা গ্রহ থেকে নেমে এসেছে কিম্ভূতকিমাকার এক ভাব। তাই এদেরকে 'ফ্রেক' বলে। সেই শহরে আছে আলাদা 'ফ্রেক মহল্লা' আছে ফ্রেক স্ট্রীট। ফ্রেক স্ট্রীটের দু'পাশের দোকানে থরে থরে সাজানো রয়েছে গাঁজা মেশানো চা—'হ্যাসটি' আছে হ্যাস কেক, আছে গাঁজার তৈরি সুস্বাদু পিঠে 'হ্যাস কুকি আর আছে পাতলা করে গাঁজার প্রলেপ দেওয়া পেস্ট্রি—'হ্যাস পেসট্রি'। জোরালো নিওন আলোয় জ্বলজ্বল করছে এই দোকানগুলোর মাথায় রঙিন সাইনবোর্ডে তাদের বিচিত্র এক একটি নাম—ইডেন হ্যাস সেণ্টার, বাহাদুর চরস ডিপো—ইত্যাদি—

বলা বাহুল্য এসব শহর নেশায় আসক্ত মানুষের কাছে স্বর্গ—A paradise to drug addicts—এইখানেই শেষ নয় হতভাগা অ্যাডিক্টদের একেবারে সর্বনাশের অতলে চুবিয়ে চুবিয়ে মারার পাকা ব্যবস্থাও আছে।

ফ্রেকরা প্রায়ই ড্রাগ কিনতে কিনতে ফতুর হয়ে যায়। আর হবে না-ই বা কেন? একমাত্র হ্যাসের দামই যা একটু কম। কিন্তু ড্রাগের জগতের কেষ্ট বিষ্টু আফিং-মর্ফিয়া, মারিজুয়ানা, হিরোইন, এল. এস. ডির দাম যে আকাশ ছোঁয়া। ফ্রেকরা হাতেখড়ি দেয় গাঁজা দিয়ে—হ্যাস তাদের প্রথম পাঠ—ফার্স্ট লেসন আর শেষ হয়—

হয় হেরোইন না হয় এল. এস. ডির মত ভয়াবহ ড্রাগ দিয়ে। এসব ড্রাগ আবার এমনি খেলে তাদের নেশা তেমন জমে না। তাই তারা সূঁচ বিঁধিয়ে বিঁধিয়ে শরীরকে ক্ষতবিক্ষত করে সিরিঞ্জের ভেতরে করে এসব ড্রাগ পুষ করে। আর তারপরেই তারা বিছানায় কিংবা রাস্তায় বা কোন গাছতলা কি গাড়ি বারান্দার নিচে অসাড় হয়ে পড়ে থাকে ঘণ্টার পর ঘণ্টা—

নেশার ঘোর কাটলে হয়ত দেখতে পায় তহবিল শূন্য। ট্যাঁকে একটা পয়সা নেই। কিন্তু ড্রাগ যে চাই-ই—চা-ই! ড্রাগ—যে কোনরকমের ড্রাগ যে পেটে একটু না পড়লে বাঁচার কোন উপায়ই নেই! গলা শুকিয়ে খটখটে হয়ে যায়। মুখে তিতে জল কাটে। শরীরের ভেতরটা আনচান করে। কারো কারো শুরু হয় খিঁচুনি—কেউ বা জ্ঞান হারিয়ে পড়ে থাকে।

প্রথম প্রথম আশপাশের *ফ্রেক বা জাঙ্কিরা দু-এক ছিলিম গাঁজার কি এক ডোজ হেরোইনের পয়সা দেয়। কিন্তু পচা সাঁকোয় ভিখারীও পা দেয় না! যেই দেখে পকেট ঠনঠন অমনি আর তার ধারে কাছেই ঘেঁসবে না। তখন বাধ্য হয়েই অ্যাডিক্টকে তার জিনিসপত্র বেচতে হয়।

মনে রাখতে হবে দেশী বিদেশী ফ্রেকরা প্রায় প্রত্যেকেই অবস্থাপন্ন ঘরের ছেলে-মেয়ে। সংগে থাকে দামী জিনিসপত্র—রেকর্ড প্লেয়ার, স্টিরিও, ভি সি আর, ক্যামেরা জিনসের ফুলপ্যান্ট, টেরিকটের সার্ট, পিঠে বাঁধা ব্যাগ বা রুকস্যাক, স্লিপিংব্যাগ ইত্যাদি একেবারে জলের দামে ফ্রেকস্ট্রীটের স্টেশনারি দোকানে বিক্রি করে চলে যায়। আর এইসব দোকানীরা তো এই মওকাটার জন্য একেবারে মুখিয়ে থাকে! সব-সব জিনিস বিকিয়ে দিয়ে নিঃস্ব হয়ে যায়। তখন হয় চুরি করে জেলে যায়, না হয় আত্মঘাতী হয়—

জোসেফ বিশ্বপ্রাণের বৃত্তান্ত জিলের থেকেও বিচিত্র। তবে মোটামুটি সব অ্যাডিক্টদেরই ধাপে ধাপে একেবারে সর্বনাশের অতলগহ্বরে নেমে যাওয়ার ধারাটি একইরকম।

বিশ্বপ্রাণও প্রথম গাঁজা ধরেছিল কলেজের বন্ধুদের পাল্লায় পড়ে আর অবাধে নেশা করার তাড়নায় জিলের মতই বাড়ি থেকে পালিয়েছিল। তবে তার মনের ভেতরে বারে বারে স্তম্ভের মত মাথা উঁচু করে দাঁড়িয়েছিল একটি বলিষ্ঠ শপথ—হ্যাস ছাড়া অন্য কোন ড্রাগ কখনো কোন অবস্থাতেই খাবে না—

জোসেফ বাড়ি থেকে বেরিয়ে প্রথমেই গিয়েছিল ফ্রেকদের উদ্দাম বেপরোয়া বেলাল্লা জীবন কাটানোর আইডিয়েল প্লেস—গোয়ায়। গোয়া থেকে বোম্বে, দিল্লী হয়ে এই বেনারসে—থেমে গিয়েছিল দীনেশ।

Freak (ফ্রেক) শব্দটির অভিধানগত অর্থই হচ্ছে—খেয়ালী কিম্ভূতকিমার—ইংরেজীতে বলে—Something abnormal এই অ্যাডিক্টদের সাধারণত ফ্রেক বলা হয়ে থাকে।

গঙ্গার জলের একটানা কলোল্লাস, শাঁ শাঁ বাতাসের কান্না আর শ্মশান বন্ধুদের থেকে থেকে উল্লসিত হরিধ্বনির উৎকট আওয়াজই যেন কিছুক্ষণ কান পেতে শুনে কেমন শুকনো গলায় বলেছিল—এই কাশীতেই বিশ্বপ্রাণ দাতারের সঙ্গে আমার প্রথম পরিচয় হয়েছিল, একটু থেমে কয়েকমুহূর্ত কি ভাবল। তারপরেই আচমকা বলল, জানেন এই জাংকদের ভেতরে সেক্সের ব্যাপারটা একটা বিরাট ফ্যাক্টর—তার গাড়ি-বারান্দার মত গালদুটো শক্ত হয়ে উঠল। আর তার রক্তবর্ণ দুটো চোখে ঘৃণার ধিক্কার জ্বলজ্বল করতে লাগল।

জোসেফ বিশ্বপ্রাণ দেখতে শুনতে ভাল স্মার্ট। পেটানো চেহারা। টকটকে গায়ের রঙ। দেখলে ছেলেদেরই মন টানে। মেয়েদের তো কথা-ই নেই।

একদিন টাঙ্গায় সারনাথে যেতে যেতে এক জাংক তরুণীর সঙ্গে তার আলাপ হল। মেয়েটি জার্মান। নাম—প্যাট। জিলের মতই পয়সাওয়ালা বড়ঘরের মেয়ে। বড্ড বেশি মেকানিক্যাল—যান্ত্রিক এবং বস্তুবাদী বা মেটিরিয়েল জীবনে বীতশ্রদ্ধ হয়ে ঘর ছেড়েছে। প্রথমে একটা রোমাঞ্চকর অভিজ্ঞতা বা থ্রিলের আকর্ষণে হ্যাস ধরেছিল। এখন পাড় নেশাখোর। মরফিন না হলে তার একটি দিনও চলে না।

সারনাথের চারিদিকে ছড়ানো বৌদ্ধ সংস্কৃতির নানা নিদর্শনের দিকে তাকিয়ে উচ্ছ্বসিত হয়ে উঠল প্যাট।

কী অদ্ভুত তোমাদের দেশ—বিশ্বপ্রাণ। হাজার হাজার বছরের পুরনো আর রীচ তোমাদের কালচার একটু থেমে আবার স্নিগ্ধ কণ্ঠে বলল সে—আই হ্যাভ প্রোফাউণ্ড রিগার্ড কর ইয়োর কাণ্ট্রি বলতে বলতেই হঠাৎ কিসের যেন যন্ত্রণায় ছটফট করতে লাগল। জোসেফের পিঠে হাত রেখে বলল, চল না—এই গাছটার নিচে একটু বসি—

একটা ঝাপড়া ছাতিমগাছের নীলাভ ছায়ায় বসে প্যাট ঝোলা থেকে সূঁচ, সিরিঞ্জ ইনজেকশানের সাজসরঞ্জাম বের করল। বেশ পাকা হাতে আস্তে আস্তে কয়েক মিলিগ্রাম মরফিন নিজের শরীরে পুস করল।

তুমি একটা সট নেবে না কি জোসেফ?

না—না প্যাট, বিশ্বনাথের যেন আগুনের ছ্যাঁকা লেগেছে। উত্তেজিত ব্যাকুল কণ্ঠে বলল—প্লী—জ প্যাট এই রিকোয়েস্ট তুমি করো না। আমি হ্যাস ছাড়া আর কোন ড্রাগ খাব না—খেতে পারব না।

কোন কথা বলল না প্যাট।

মারাঠি যুবকের চওড়া বুকে তার অনুরাগের দৃষ্টি খেলা করতে লাগল। যেন অনেক—অনেক দূর থেকে বিষন্নকণ্ঠে বলল ইণ্ডিয়াতে আমার কোন বন্ধু নেই জোসেফ। ভেবেছিলাম—তোমার সঙ্গে থাকব—ঘুরব—ফিরব কিন্তু—

কিন্তু কি প্যাট—বেশ তো থাকব তোমার সঙ্গে—আমি তো—

না—না—তুমি আমার একটা সামান্য রিকোয়েস্টই রাখতে পারলে না, ফাঁকা মাঠের অবিচ্ছিন্ন নির্জনতার ভেতরে তার কথাগুলো কেমন কাতর কান্নার মত শোনাল।

রাগ করো না—রাগ করো না প্যাট, কেমন চঞ্চল হয়ে উঠল জোসেফ। তার হাত-দুটো নিজের হাতে নিয়ে স্নিগ্ধ কণ্ঠে বলল, তোমার সব কথা—সব কথা শুনব প্যাট—

মুহূর্তে সেই কঠিন শপথের অটল স্তম্ভটা ছত্রাখান হয়ে ভেঙ্গে পড়ল।

সেই শুরু।

প্রথম দিনের প্রথম সটেই মরফিনের বন্ধনে যেমন বাঁধা পড়ল জোসেফ তেমনি জার্মাণ তরুণীর সম্মোহনের জালেও বন্দী হয়ে গেল। বিশ্বনাথের মন্দিরের কাছেই একটা খোলার ঘরে তারা স্বামী-স্ত্রীর মতই বাস করে। কোন লজ্জা নেই। সংকোচ নেই। বিবেক-বোধের কোন বালাই-ই নেই। তাই জোসেফের মনে হয়—মনে হয় হ্যাসের চেয়ে মরফিন অনেক—অনেক উঁচু দরের এবং খুব শক্তিশালী ড্রাগ। বিনা কারণে মা-বাবাকে কষ্ট দিয়ে বাড়ি ছেড়ে চলে আসার জন্য বিবেকদংশনের জ্বালা অবিবাহিত এক তরুণী বিদেশিনীর সঙ্গে এক ঘরে রাত্রি বাসের জন্য সংকোচ-লজ্জা সব—সব ভুলিয়ে দেয়—দিতে পারে এই মরফিন।

প্রতিদিন দশ থেকে পনের মিলিগ্রাম মরফিন নিতে শুরু করল জোসেফ। নিজের দেহে ইনজেকশন পুষ করতেও শিখিয়ে দিল প্যাট। ধীরে ধীরে এক সঙ্গে দু'শো পনের মিলিগ্রাম মরফিন একবারে নিয়ে প্যাটের কণ্ঠলগ্ন হয়ে অসাড় হয়ে পড়ে থাকে জোসেফ বিশ্বপ্রাণ। লুপ্ত হয়ে যায় তাদের বাইরের পৃথিবী। কখন দিন শেষ হয়ে রাত নামে। কখন রাত ভোর হয়ে আবার দিন শুরু হয়—সেসব তারা জানতে পারেনা—জানতে চায়ও না। প্রয়োজনও তো নেই।

তুচ্ছ দৈনন্দিন তার গ্লানিকর জীবন থেকে অনেক—অনেক দূরে এক অজানা জগতের অবরিত আনন্দলোকে বাস করে তারা। জোসেফের মনে হয়—মনে হয় বহু দিন—বহুকাল পর সে মুক্ত এবং মেকী সভ্য ভদ্র জীবনের বেড়াজাল থেকে বেরিয়ে এসে বিপুলব্যপ্ত আকাশের নিচে এক দিগন্তবিসারী প্রান্তরে এসে দাঁড়িয়েছে! কিন্তু কি নেশাখোর কি সাধারণ সুস্থ মানুষ—কারো জীবনই কখনো মসৃন হতে পারে না। হয় না।

প্যাট।

জোসেফ বিশ্বপ্রাণ দাতার।

দুইজনেই বড়লোকের ছেলেমেয়ে। বাড়ি থেকে পকেট বেশ ভারি করেই বেরিয়ে-ছিল। কিন্তু বসে খেলে রাজার ভাণ্ডারও একদিন শেষ হয়ে যায়। তারা একদিন দেখতে পেল, ড্রাগ কেনার পয়সা নেই। তাদের মাথায় আকাশ ভেঙ্গে পড়ল। চোখের সামনে ঘনিয়ে এল ঘন অন্ধকার।

বেনারসে গঙ্গার ঘাটে ঘাটে দেশীবিদেশী জাঙ্কিরা ঘুরঘুর করে। তাদের এক-জনের কাছে হাত পাতল জোসেফ। সে তার মুখের দিকে একবারও না তাকিয়ে রুক্ষকণ্ঠে বলল—হবে না—কেটে পড়ো—অন্য জায়গায় দেখ—

বাধ্য হয়েই জোসেফ নিজের দুটো জিনসের ফুলপ্যান্ট আর সার্ট বিক্রি করে সেই

টাকায় কিছু ড্রাগ কিনে ফেলল। সেইসব ড্রাগ আবার চড়া দামে চোরাবাজারে বিক্রি করে দুটো বেশি পয়সা রোজগার করতে চেষ্টা করল। পয়সার জোর না থাকলে মরফিন কেনা যায় না। আর মরফিন জোগাড় করতে না পারলে কিছুতেই তার প্রেয়সীকে বাঁচাতে পারবে না।

বিছানার সঙ্গে মিশে গিয়েছে প্যাট। দিন রাত চিঁ চিঁ করে বলে জোসেফ—প্লীজ—আমাকে মরফিন এনে দাও—দেয়ালে মাথা ঠোকে। কখনো বা ডুকরে ডুকরে কাঁদে। আবার কখনো বা আত্মঘাতী হতে যায়। এসব দেখেশুনেই চোরাকারবারের অন্ধকার পিছল পথে জোসেফকে পা বাড়াতে হয়েছিল।

বেচারী প্যাটকে ভালবেসেছিল।

ভালবাসলে অনেক ঝুঁকি নেওয়া যায়। নিতে হয়। যে-কোন বিপজ্জনক কাজে এগিয়ে যেতে কোন ভয় কি দুশ্চিন্তা হয় না।

কখনো গাঁজা এবং চরস বিক্রি করে বেশ দুটো পয়সা হচ্ছিল। সেই টাকা থেকে প্যাটের জন্য প্রতিদিন নিয়মিত না পারুক মাঝে মধ্যে মরফিয়ার ব্যবস্থাও করছিল। কিন্তু প্যাট ছিল অত্যন্ত আহ্লাদী। অবুঝ। একদিন মরফিন না নিয়ে শুধু হাতে ফিরে এলেই চিৎকার করে কেঁদে কেটে অনর্থ করত।

কিছুতেই কেন যে বুঝতে চায় না প্যাট, হ্যাস কি চরস বিক্রি করে মরফিয়া কেনা যায় না। সম্ভব নয়, আকুল হয়ে ভাবে জোসেফ বিশ্বপ্রাণ—কি করা যায়। কেমন করে প্যাটকে সুস্থ সজীব এবং হাসিখুশি রাখা যায়। আবার তখুনি তার মনে হয়, কেমন করে যে এই জার্মান মেয়েটির মোহে পড়ে গেল। না—ভুল হয়েছে—খুব ভুল হয়েছে। এখন তার মনে হয় যেন তার পায়ে বেড়ি পড়েছে! তার নিজের ওপরে রাগ হল। কিন্তু—

তখুনি সেই মুহূর্তেই তার মনের ভেতরে ভেসে উঠল প্যাটের সেই বড় বড় দুটো চোখ, যার ভেতরে সমুদ্রের নীলিমা। আল্পসের তুষারের মত সাদা ধবধবে তার গায়ের রঙ। দীর্ঘ সুঠাম দেহে অটুট স্বাস্থ্য আর খরযৌবনের জোয়ার—অমনি রাগ বিরক্তি-দুঃখ মিলিয়ে যায় তার।

একদিন দুপুরে অসময়ে ডেরায় ফিরে এল জোসেফ। হঠাৎ পাগলের মত প্যাটের বুকের ওপরে ঝাঁপিয়ে পড়ে চুমুতে চুমুতে তার মুখখানা আচ্ছন্ন করে দিয়ে বলল সে—আর কোন চিন্তা নেই প্যাট—এখন থেকে তোমাকে রেগুলার মরফিয়া—

সে কি—কেমন করে চনমন করে উঠল প্যাট।

তার কানে কানে ফিস ফিস করে কতগুলো কথা বলল দাতার। প্যাটের মুখখানা উজ্জ্বল হয়ে উঠল। কিন্তু কয়েকমুহূর্ত পরে সেই খুশির আলো নিভে গিয়ে সেখানে ভয়ের ছায়া ফুটে উঠল।

তুমি অত চিন্তা করো না ডার্লিং—

শুনেছি খুব ডেঞ্জারাস টাইপের ড্রাগ—খেলে না কি কেউ পাগল হয়ে যায়; কেউ

বা সুইসাইড করে—

আমরা তো আর খাচ্ছি না প্যাট—বিক্রি করছি—

দেখ—বি ভেরি কেয়ারফুল—চারিদিক দেখেশুনে চলবে—

ও ডোণ্ট ওরি প্যাট—সন্ধ্যার অন্ধকারে মিলিয়ে গেল জোসেফ বিশ্বনাথ।

বিশ্বনাথের মন্দিরে আরতির ঘণ্টা বাজতে লাগল—ঢং—ঢং—ঢং—ঢং—

বলা দরকার যে ড্রাগটি নিয়ে সেদিন বিক্রি করতে বেরিয়েছিল দাতার তার নাম হল—

এল. এস. ডি।

ড্রাগের জগতে কৌলীন্যের মহিমায় সে সম্রাটের মত বিরাজ করছে। পুরো নাম—লিসারজিক অ্যাসিড ডায়েথিল্যামইড, সংক্ষেপে এল. এস. ডি। এর সবচেয়ে বড় বৈশিষ্ট্য হল—A hallucinogenic drug অর্থাৎ যে ড্রাগ খেলে হ্যালুসিনেশান অর্থাৎ দৃষ্টিবিভ্রম এবং স্মৃতিবিভ্রম হয়ে থাকে। সাধারণত অ্যাডিক্টরা কৌতূহলী হয়ে কিম্বা একটু স্ফূর্তি করার জন্যই এই ড্রাগ খায়। কিন্তু পরিণতি হয় ভয়াবহ। এই ড্রাগ খেলেই খোয়াব দেখতে শুরু করে।

বাস্তব পৃথিবীর সঙ্গে সব সম্পর্ক হারিয়ে সে একটা অসম্ভব কল্পনার জগতে বিচরণ করতে থাকে। কেউ বা তীব্র আনন্দে ভেঙ্গে ভেঙ্গে পড়ে প্রচণ্ড অট্টহাসি হাসতে থাকে আবার কেউ বা দুঃখ আর হতাশার অন্ধকারে একটু একটু করে তলিয়ে যায় এবং শেষ পর্যন্ত আত্মহননের পথ বেছে নেয়।

আরও অদ্ভুত এফেক্ট আছে এই ড্রাগের। অসম্ভব খিদে পায়—কিন্তু সেটা False Appetite' পেটের ভেতরে এমন একটা কপট খিদের উদ্রেক হয় যাতে গোগ্রাসে বিশ্বব্রহ্মাণ্ড খেয়ে ফেলতে ইচ্ছে করে। আবার খাওয়ায় আসতে পারে দারুণ বিতৃষ্ণা। খাবার সামনে নিয়ে এলে হড় হড় করে বমি করে সারা ঘর ভাসিয়ে দিতে পারে।

কিন্তু জোসেফ বিশ্বপ্রাণের কি হল ?

দীনেশ যাচ্ছি আমার কথাটা যেন শুনতেই পেল না। তার চোখে মুখে ব্যথার ছায়া ফুটে উঠল। মনে হল কোন বেদনাদায়ক ঘটনা তার মনের ভেতরে ঘা দিচ্ছে—

এল. এস. ডি যে কী ভয়ঙ্কর ড্রাগ বুঝলেন স্যার—

কি রকম—

দেখতে কোনটা ছোট ছোট বলের মত। কোনটা আবার বিন্দুর মত—কোনটা আবার পিরামিডের মতও দেখতে হয়। একটু থেমে সে আবার বলল, যেমন নানা আকৃতির—তেমনি তাদের নানা রঙ—বেগুনি, নীল, কালো, ধূসর—আবার হঠাৎ থেমে গেল সে। চোখ মুখ উত্তেজনায় জ্বলজ্বল করতে লাগল।

তখনো বুঝতে পারিনি কেন এল. এস. ডি. সম্বন্ধে বলতে যেমন উৎসাহিত হচ্ছে তেমনি আবার উত্তেজিতও হয়ে উঠছে।

শুধু ট্যাবলেট নয়, লিকুইড ফরমেও পাওয়া যায়—আরও তীব্র আরও উত্তেজক। অ্যাডিক্টরা জিভের ওপরে একটা ড্রপ দেয় কিম্বা একখণ্ড চৌকো ব্লটিং পেপারের ওপরে এক ড্রপ এল. এস. ডি. ঢেলে সেটা মুখে রেখে চুষতে থাকে—তাতেই অ্যাকশান হয়। তবে সবচেয়ে বেশি এফেক্ট হয় শিরার ভেতরে এই ড্রাগের ইনজেকশান নিলে—অ্যাডিক্টদের ভাষায় টেরিবলি পোটেণ্ট—

প্রথম পাঁচটা থেকে দশটা ট্রিপ বা ট্যাবলেট খেলে তেমন এফেক্ট হয় না। হয়ত কিছুই ঘটবে না। কিন্তু তারপর আরও দু'একটা খেয়েছেন কি আপনার সর্বনাশ। আপনাকে নির্ঘাত পাগলা গারদে যেতে হবে কিম্বা আপনার মনে আত্মঘাতী হওয়ার সর্বনাশা বাসনা মাথা চাড়া দিয়ে উঠবে। হয়ত বা আপনার উর্ধ্বশ্বাসে ছুটতে ইচ্ছে হবে, এত জোরে ছুটে আপনি পাহাড়ের মাথায় উঠে পড়বেন যে আপনার আশেপাশের লোক চেষ্টা করেও আপনাকে ধরতে পারবে না। পাহাড়ের নিচে উত্তাল সমুদ্রের নীল জলকে আপনার মনে হতে পারে অগভীর শান্ত কোন জলাশয়। দিলেন এক ডাইভ—ব্যস—একেবারে সলিল সমাধি।

ঠিক এইরকম একটা ঘটনা ঘটেছিল দীনেশের চোখের সামনে। ছেলেটি ইতালীয়। নাম—পিটার। পাকাপোক্ত জাঙ্কি নয়। শখ করে কখনোসখনো এক আধটু গাঁজা খায়। অন্য কোন ড্রাগ নয়—জোর জবরদস্তি করলেও খাওয়ানো যেত না তাকে।

পিটার তার বান্ধবী লুসিকে নিয়ে গিয়েছিল দেশীবিদেশী ফ্রেকদের সবচেয়ে আকর্ষণীয় জায়গা—গোয়ার কাছে আনজুনা বীচে। আনজুনা আর ভ্যাগাটর বীচের মাঝখানে প্রায় তিনশো ফিট উঁচু একটা খাড়া পাহাড়। তার নিচেই সমুদ্র।

পিটারের মতই পৃথিবীর আরও নানাদেশের জাঙ্কিরা জোড়ায় জোড়ায় বীচের এখানে সেখানে বসে নেশা করছে। কেউ উল্লাসে নাচানাচি করছে আবার কেউ বা হ্যাস টেনে বুঁদ হয়ে তুরীয় অবস্থায় শিবনেত্র হয়ে বসে আছে।

পিটার তার রেকর্ড প্লেয়ার নিয়ে গিয়েছিল। উদ্দাম একটা বাজনার ক্যাসেট চাপিয়ে দিয়ে লুসির চারিদিকে গোল হয়ে ঘুরে ঘুরে ধেই ধেই করে নাচতে লাগল। হঠাৎ তার সঙ্গিনীর ঝুলি থেকে বের করে আরও দুটো ট্যাবলেট মুখে ফেলে দিয়ে নাচতে নাচতেই হেঁড়ে গলায় গান জুড়ে দিল।

কি করছ পিটার—অস্ফুটস্বরে বলল লুসি। তার চোখে ভয়ের ছায়া পড়ল।

ঠিক তারপরেই কাণ্ডটা ঘটে গেল। হঠাৎ যে কি হল—মনে হল দারুণ যন্ত্রণায় পিটারের সারা শরীর কেমন এঁকে বেঁকে দুমড়ে উঠল। আর যেন সেই বিষযন্ত্রণা কমানোর জন্যই চোঁচা এক দৌড় লাগালো।

পি—টা—র—কোথা—য় যা-চ্ছো—ভয়ে চেঁচিয়ে উঠল লুসি।

আর পিটার। তাকে যেন ভূতে পেয়েছে। বিদ্যুত গতিতে ছুটছে সে। কিছুক্ষণ পরই দেখা গেল সেই পাহাড়ের মাথার ওপরে যেন একটা কালো ছায়া দুলে উঠল মুহূর্তের জন্য। তারপরেই চোখের পলকে সেই ছায়ার টুকরো যে কোথায় মিলিয়ে

গেল আর দেখাই গেল না—চুপ করে গেল যাজ্ঞি। তার দুটো চোখে কেমন একটা বিভীষিকা ফুটে উঠল। সেদিনের সেই ভয়ংকর ঘটনাটা যেন সে দেখতে পাচ্ছে।

আমরা ছুটে গিয়েছিলাম পাহাড়ের ওপরে সেখানে পিটারের কোন চিহ্নই নেই। একটু থেমে আবার কেমন ঝাপসা অস্পষ্ট গলায় বলল যাজ্ঞি—আমরা নিচে তাকালাম—শরীরের ভেতরটা শির শির করে উঠল—সেখানে সাগরের উথাল পাথাল ঢেউ। আমরা সকলেই মত্ত অবস্থায় ছিলাম। তাই আমরা কেউই সেখানে যেতে সাহস করলাম না—চুপ করে গিয়েছিল দীনেশ।

তারপর দীনেশ তার অভিশপ্ত নেশাখোর জীবনের প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতা থেকে জানিয়েছিল—পিটারের এই অদ্ভুত আচরণের ব্যাখ্যা কখনো কেউ দিতে পারবে না। হয়ত আত্মহত্যার প্রবণতা তাকে চাবুক মেরে ছুটিয়ে নিয়ে গিয়েছিল সেই পাহাড়ের চূড়োয়। হয়ত সাগরের অগাধ জল তার মনে হয়েছিল মাত্র কয়েক ফিট নিচে, দিই না একটা ডাইভ, কিছুক্ষণ সাঁতার কেটে শরীরটা বেশ চাঙ্গা করে নেওয়া যাবে। আবার এমনও হতে পারে পিটার হয়ত ভেবেছিল সে পাখির মত ডানা মেলে উড়তে পারবে—এল. এস. ডি-র প্রভাবে সব কিছুই সম্ভব হতে পারে—Such unpredictable behaviour is typical of L. S. D victims—অর্থাৎ এল. এস. ডি-তে আসক্ত লোকই এইরকম আকস্মিক অদ্ভুত কাণ্ড করে থাকে।

আরো একজন। থমাস কুরুভিল্লা। বেশ লম্বা চওড়া স্মার্ট চেহারা। পঁচিশ কি ছাব্বিশ বছর বয়স হবে। কেরালার এক বেশ বর্ধিষ্ণু এবং অভিজাত খ্রীষ্টান পরিবারের ছেলে। সিনেমার জগতের মানুষ। মিউজিক কম্পোজার। ফিল্মের জন্য গান লিখে বেশ দুটো পয়সা করেছে। বোম্বাইতেই থাকত। বোম্বাই থেকে গোয়ায় এসেছিল উইক এণ্ড করতে। কিন্তু আশ্চর্য! রবিবার শেষ হয়ে সোম-মঙ্গলও পেরিয়ে গেল। কুরুভিল্লার যাওয়ার নাম নেই। যাবেই বা কি করে? পেটে যে এল. এস. ডি. পড়তে শুরু করেছে। নেশা ধরে গেছে। ফিল্ম, গান লেখার কমিটমেণ্ট সব—সব ভুলে মেরে দিল সে।

একদিন একটা আশ্চর্য দৃশ্য দেখল দীনেশ। গোয়ার বীচে বেশ মুনিঋষিদের মত পদ্মাসনে বসে রয়েছে কুরুভিল্লা। আর তাকে ঘিরে ধরে ফ্রেকরা মৌমাছির মত ভন ভন করছে।

কী ব্যাপার! মধুর গন্ধ না পেলে তো মৌমাছি আসে না। কৌতূহলী হয়ে যাজ্ঞি এগিয়ে এল। আর একেবারে থ হয়ে গেল। খস খস করে এক একটা একশো টাকার ট্যাভেলারস চেকে সই করছে আর এক একজন জাঙ্কিকে বিলিয়ে দিচ্ছে!

দীনেশেরও লোভ হল। হাত পাতল। কিন্তু কেন যেন তার দিকে কটমট করে তাকিয়ে মুখের ওপর 'না' করে দিল। এল. এস. ডি-র ঘোরে সবই সম্ভব—আপনাকে নিষ্ঠুর, হিংস্র ও নির্মম করে তুলতে পারে যেমন তেমনি আবার অতিরিক্ত উদার বা ওভারজেনারসও করে দিতে পারে—

বলো হরি—হরি বোল।

বলো হরি—হরি বোল।

যুগল প্রসাদজী অমর রহে—

শ্মশান যাত্রীদের উচ্চকিত হরিধ্বনিতে কেঁপে উঠল হরিশচন্দ্র ঘাট।

শ্মশানের বাতাসে মড়া পোড়ানোর সেই উৎকট গন্ধ, ধোঁয়া, ছাই—সব কিছু ছাপিয়ে দামী আতর কি ওডিকোলোনের তীব্র সুগন্ধে বাতাস ভারি হয়ে উঠল।

রাশি রাশি ফুল দিয়ে সাজানো সুন্দর ও দামী খাট থেকে নামানো হল শবদেহ। হয়ত বেনারসেরই কোন মহল্লার বেশ পয়সাওয়ালা মাতব্বর লোক এই যুগলপ্রসাদ!

কেন যেন দীনেশ স্থির দৃষ্টিতে তাকিয়ে রইল। বেলী আর হাসনুহানা ফুলের মোটা মোটা মালা পরানো এবং রক্তচন্দনের তিলক আঁকা যুগলপ্রসাদজীর ফ্যাকাশে মুখের দিকে। বুক উজাড় করে একটা দীর্ঘশ্বাস ফেলে ভাঙ্গা ভাঙ্গা অস্পষ্ট গলায় বলল, মৃত্যুতেও কত অনুষ্ঠান—কত সমারোহ দেখুন, একটু থেমে হঠাৎ দারুণ উত্তেজিত হয়ে বলল, জানেন অ্যাডিক্টদের ওয়ার্ল্ডে এসব কিছু নেই—

কি রকম?

মার্থা। নিউজিল্যাণ্ডের মেয়ে। ইণ্ডিয়াতে এসেছিল জাহাজের গভরনেস হয়ে। কেমন করে যেন ঘুরতে ঘুরতে গোয়ায় এসে পড়েছিল। গোয়াতে দীনেশের সঙ্গে তার পরিচয় এবং ঘনিষ্ঠতা হয়েছিল। মার্থা তার মন টেনেছিল অনেক কারণে—মার্থার চেহারাটা মিষ্টি। আরো বেশি মিষ্টি ছিল তার ব্যবহার। জাঙ্কিদের সঙ্গে মেলামেশা করে—কিন্তু নিজে জাঙ্কি নয়। মরফিয়া হেরোইন এমন কি গাঁজা পর্যন্ত স্পর্শ করত না। আর সবচেয়ে বড় গুণ ছিল লোকের আপদে বিপদে বুক দিয়ে পড়তো।

একবার দীনেশই ড্রাগ কিনতে কিনতে ফতুর হয়ে গিয়েছিল। সে না খেয়ে আছে শুনে মার্থা ছুটে এসে দোকান থেকে খাবার কিনে এনে বেশ কয়েকবারই পেট পুরে খাইয়ে দিয়েছিল।

আর একবার দীনেশের অসুখ করেছিল। তেড়ে জ্বর এল। বেহুঁস হয়ে ঘরে পড়ে রইল। ডাক্তার ডাকার পয়সা নেই, পয়সা নেই ওষুধ কেনার। কার মুখে জানতে পেরে চলে এল মার্থা। দ্রুত উত্তেজিত কণ্ঠে বলল তুমি আমাকে কেন বলনি বাস্টার্ড—অভিমানে তার মুখখানা ভারি হয়ে উঠল।

ডাক্তার নিয়ে এল। সঙ্গে সঙ্গে ছুটে গিয়ে ওষুধও কিনে নিয়ে এল। দীনেশের মনে হয়েছিল—মনে হয়েছিল মার্থাকে যেন কোন দেবী স্বর্গ থেকে নেমে এসেছে!

সেই মার্থা। বিপদের বন্ধু 'ফ্রেণ্ড ইন নিড'! মার্থাকে ভীষণ ভাল লাগত। না—তার সঙ্গে কখনো কোন সেক্সুয়াল কণ্ট্যাক্ট বা দৈহিক সম্বন্ধ হয়নি। তবে এল. এস. ডি কি মরফিন কিম্বা হেরোইন পেটে পড়লে কেন যেন ওকে নিয়ে অনেক অন্তরঙ্গ ছবি ভেসে ভেসে উঠতে থাকে মনের ভেতরে—মার্থাকে বুকের ভেতরে পরম আদরে জড়িয়ে ধরে ওর দুই গালে পাগলের মত চুমু খেয়ে চলেছে…আস্তে আস্তে কেমন

আচ্ছন্ন আর অবশ হয়ে আসছে মার্থার সারা শরীর। আবার কখনো দেখি নির্জন ঘরে সাদা ধবধবে বিছানায় ঠিক একটা জ্যোৎস্নার রেখার মত গা এলিয়ে শুয়ে রয়েছে মার্থা। তাকে দেখেই উচ্ছ্বসিত হয়ে ঝাঁপিয়ে পড়ল তার বুকে। সে-ও আর নিজেকে সংযত করতে পারল না···কিন্তু—

এসব স্রেফ খোয়াব এবং এল. এস. ডি-র মাহাত্ম্যেই এসব ভাবনা মনে আনাগোনা করত। কিন্তু আসলে দীনেশ তাকে শ্রদ্ধা করত—সমীহ করত। ভালও নিশ্চয়ই বাসত। কিন্তু তার ভেতরে সেক্সের নামগন্ধও ছিল না। তবে বেশিদিন কাছাকাছি থাকলে কি হত বলা যায় না।

একদিন দীনেশ গোয়া ছেড়ে চলে এল কাশীতে। মার্থা গোয়াতেই থেকে গেল। বেনারসে এসেও কিন্তু দীনেশের খুব মনে হত মার্থার কথা। কিন্তু একদিন এক জাঙ্কি—মার্থার এবং তার বন্ধু অর্থাৎ এক কমন ফ্রেন্ডের কাছে তার খবর শুনে রীতিমত শকড হল দীনেশ—যে মেয়ে কখনো কোন ড্রাগ ছুঁয়েও দেখত না—সেই মার্থা না কি এখন মরফিয়ার নেশায় দিনরাত বুঁদ হয়ে থাকে। কিন্তু—

তখনো দীনেশের আরও মর্মান্তিক আঘাতের বাকি ছিল। কিছু দিন পরে আবার একদিন এক জাঙ্কি গোয়া থেকে ফিরে এসে জানাল মার্থা না কি এক সঙ্গে চল্লিশটা এল. এস. ডি. ট্যাবলেট খেয়ে তার ঘরেই মরে পড়েছিল। আশপাশের কোন ফ্রেক কেসে জড়িয়ে যাবে ভয়ে পুলিশকে কিছুই জানায়নি। রাতের অন্ধকারে তারা মার্থার লাসটাকে পাহাড়ের ওপরে ফেলে দিয়ে আসে। পরদিন ঝাঁক ঝাঁক শকুন এসে খুবলে খুবলে খেয়ে ফেলে তার দেহটা—থামল দীনেশ।

শ্মশান ঘাটের সেই তরল অন্ধকারে মনে হয়েছিল যেন তার চোখদুটো চিক চিক করছে। দু'হাতে বুক চেপে ধরে একটা দীর্ঘশ্বাস চাপতে চাপতে ভাঙ্গা ভাঙ্গা গলায় বলল—এই হল ড্রাগ অ্যাডিক্টদের পরিণতি স্যার। আবার একটু থেমে আস্তে আস্তে যেন অনেক—অনেক দূর থেকে বলল মাদকসেবীদের জগত মানেই পাগলের জগত। সেখানে কারো জন্যে কারো এতটুকু দয়া নেই, মমতা নেই, সহানুভূতি নেই—স্বার্থপর নিষ্ঠুর হিংস্র তীব্র উত্তেজনায় তার চোখদুটো দপদপ করতে লাগল। মনে হল যেন নিদারুণ যন্ত্রণায় জ্বলে পুড়ে খাক হয়ে যাচ্ছে। দুই হাঁটুর ভেতরে মাথাটা ঝুলিয়ে বসে রইল।

কিছুক্ষণ পর নিজের মনের ভেতরে ডুব দিয়ে আবার বলল জানেন, মৃত্যু, রক্তপাত, খুন, জখম—ইত্যাদি ভয়ংকর সব ঘটনা মাত্র কয়েক ঘণ্টার ভেতরে বেমালুম ভুলে মেরে দেয় ফ্রেকরা। আর একবারও সেসব কথা তাদের মনের কোণে উঁকিও দেয় না—Such incidents were forgotten within a couple of hours and never thought of again.

বিশ্বপ্রাণ জোসেফ দাতার এবং তার ভালবাসার সেই জার্মান মেয়ে প্যাটের বৃত্তান্তের শেষটুকুও জানিয়েছিল দীনেশ ঘাজি! কিন্তু না জানলেই যেন ভাল হত। নিউজি-

ল্যাণ্ডের মেয়ে মার্থার মত বীভৎস এবং করুণ হয়ত নয়—কিন্তু ভয়ানক নিষ্ঠুর এবং বড় দুঃখের অকল্পনীয় তাদের পরিণতি।

ড্রাগের চোরাকারবার করতে করতে বেশ পাকা হয়ে গিয়েছিল বিশ্বপ্রাণ। কোন্ ক্লাসের লোক কি ড্রাগ খায়, কতটা ডোজ খায়—সব সুলুক সন্ধান জেনে গিয়েছিল সে!

ড্রাগের জগতে এল. এস. ডি যেমন কেউ কেটা—তেমনি নামী দামী লোকরাই এই সাংঘাতিক মাদকদ্রব্যটির নেশা করে থাকে। ইউনিভারসিটির ছাত্রদের ভেতরে খুব চলে মরফিয়া আর হেরোইন। কিন্তু বিশ্বপ্রাণ জানে—বেশ ভালভাবেই জানে হেরোইন যারা খায় তারা এল. এস. ডি পেলে একেবারে লুফে নেবে। তাই—

সন্ধ্যার আবছায়া অন্ধকারে একটা ঝাপড়া দেবদারু গাছের নিচে নিজেকে আড়াল করে এক দুরভিসন্ধির প্রেতের মত দাঁড়িয়ে রইল। ছাত্ররা ছোট ছোট দলে ভাগ হয়ে গাছের নিচে দাঁড়িয়ে জটলা করছে। কেউ কেউ আবার দেওয়ালের গায়ে পোস্টার সাঁটছে—কোথাও বা পলিটিক্সের উত্তেজিত আলোচনা চলছে।

জোসেফের তীক্ষ্ন আকুল দৃষ্টি তাদের প্রত্যেককে ছুঁয়ে ছুঁয়ে যাচ্ছে। যারা দু-একবার তার কাছে মরফিন কি হেরোইন কিনেছে তাদের কাছেই অ্যাপ্রোচ করতে হবে!

গাছের নিচে ঘন অন্ধকার থেকে একজন বেরিয়ে এল। আলো আঁধারিতে তার মনে হল তার হেরোইনের খদ্দের। তার বুকের ভেতরটা দুলে উঠল!

মোট কয়টা ট্রিপ (ট্যাবলেট) নিয়ে এসেছ?

কেন স্যার সব নেবেন? আগ্রহে জোসেফের চোখদুটো জ্বলজ্বল করতে লাগল। একসঙ্গে বিকিয়ে দিতে পারলে তাড়াতাড়ি প্যাটের কাছে যেতে পারবে। তার—প্যা—ট—

কি ভাবছ, কয়টা ট্রিপ আছে বললে না? কেন যেন ছাত্রটি খরচোখে তার পা থেকে মাথা পর্যন্ত দেখে নিল।

একশোটা—

এ-ক-শো! পার ট্রিপ কত করে নেবে?

কোন কথা বলল না বিশ্বপ্রাণ। সে কিনেছে এক একটা ট্যাবলেট দশ টাকায়। লোকটার আগ্রহ দেখে দাও মারার জন্য চারিদিকে একবার দেখে নিয়ে বলল, এল. এস. ডি তো চট করে পাওয়া যায় না। দাম একটু বেশিই পড়বে—

শুনিই না কত?

কত আর পার ট্রিপ পঁচিশ টাকা করে দেবেন।

পঁচিশ টাকা! দাম বড্ড বেশি বলছ—

আপনাকে তো বলেছি—রেয়ার টাইপের অ্যাসিড—

কৈ দাও—আমার যখন দরকার—

জোসেফ ঝুলির ভেতর থেকে পলিথিনের প্যাকেটে সযত্নে জড়ানো টিকটিকির ডিমের মত একশোটা ট্যাবলেট যেই তার হাতে দিল অমনি লোকটা তার ঘাড় ধরে

প্রচণ্ড জোরে ঝাঁকি দিয়ে বলল, এবার আমার সঙ্গে থানায় চলো তো বাছাধন—

কি ? থানায় যাব কেন—

জাস্ট সি—প্যান্টের হিপ পকেট থেকে আইডেণ্টিটি কার্ড বের করে দেখিয়ে দিল লোকটা—

নারকটিক প্রিভেণ্টিভ ইনটেলিজেন্স ডিপার্টমেন্টের ইনস্পেক্টার।

জেল হয়ে গেল বিশ্বপ্রাণের। জেলে ড্রাগের বেশ কয়েকজন আন্তর্জাতিক চোরা-কারবারিদের সঙ্গে দোস্তি হল। স্মাগলিং-এর অন্ধিসন্ধি আরও ভাল করে শিখে নিল। কিন্তু—

মুস্কিল হল। জেলের ভেতরে বহু চেষ্টা করেও মরফিন আমদানী করতে পারল না জোসেফ। মরফিন তো দূরের কথা গাঁজার কি সিদ্ধির একটি কণাও জেলের ভেতরে গলতে পায় না। অতএব—

যা হওয়ার তাই হল। পাড় ড্রাগ অ্যাডিক্ট ড্রাগের অভাবে অসুস্থ হয়ে পড়ল। জেলার সাহেব তাকে হাসপাতালে পাঠিয়ে দিল। তেমন একটা ইমপ্রুভমেণ্ট হল না। হবে কি করে ? ডাক্তার—নার্সরা তো আর তাকে ড্রাগ সাপ্লাই করবে না ?

হাসপাতাল থেকে প্রিজনারদের ওয়ার্ডে ফিরে এসে ভয়ানক অশান্তি শুরু করল জোসেফ। হড় হড় করে বমি করে ঘর ভাসায়। আবার কোনদিন এমন খিচুনি ওঠে অন্যান্য বন্দীরা তাকে সামলাতে পারে না।

বাধ্য হয়েই কর্তৃপক্ষ তাকে বণ্ড লিখিয়ে নিয়ে ছেড়ে দিল। মেয়াদের অনেক আগে ছাড়া পেয়ে পাগলের মত ছুটল জোসেফ সেই বিশ্বনাথের মন্দিরের কাছে খোলার ঘরের দিকে যেখানে আছে তার সংসার, আছে তার দুর্মর স্বপ্ন, আছে তার বহু বিনিদ্র রাত্রির একমাত্র চিন্তা—তার প্রেয়সী প্যাট!

প্যাট কি কোনভাবে মরফিন জোগাড় করতে পেরেছে ? হয়ত আরও বেশি অসুস্থ হয়ে ঘরে পড়ে আছে। বেঁচে আছে তো ? তার বুকের ভেতরটা মুচড়ে উঠল। আবার মনের ভেতরে বিষধর সাপের মত ছোবল মারল একটা কুটিল সন্দেহ—মেয়েরা অভাবে পড়লে যা করে পয়সা উপায় করে, তাই করে আবার মরফিন সংগ্রহ করেনি তো প্যাট—বন্য একটা হিংসা ধু ধু করে জ্বলতে লাগল তার মাথার ভেতরে।

এ কী! ঘরের সামনে এসে থমকে দাঁড়িয়ে পড়ল জোসেফ দাতার। দরজা হাট করে খোলা। ছুটে ভেতরে এল—মেঝেতে ভাঙ্গা একটা কাপ কয়েকটা ত্যাড়া বাঁকা নিডল, ভাঙ্গা একটা সিরিঞ্জ চারিদিকে ছড়িয়ে ছিটিয়ে পড়ে রয়েছে। যে দড়িতে প্যাট তার স্কার্ট ব্লাউজ ঝুলিয়ে রাখত সেটা ছিঁড়ে মরা সাপের মত দুলছে। তার জামাকাপড়, স্লিপিং ব্যাগ, রুকস্যাক যেমন কিছু নেই—তেমনি কোথাও প্যাটের কোন চিহ্ন পর্যন্ত নেই।

ছুটে বাইরে এল জোসেফ। উদভ্রান্তের মত গলির জনস্রোতের দিকে তাকিয়ে দাঁড়িয়ে রইল।

সাহেব—আপকো চিড়িয়া উড় গয়ী—তাদের ডেরার লাগোয়া পান বিড়ির

হিন্দুস্থানী দোকানি খোঁজিয়ে হাসতে হাসতে বলল, জওয়ানী আওরতকী ছোড় কর যানা ঠিক নহী—

কোথায় গেল—কার সঙ্গে গেল—কোনদিকে গিয়েছে বলতে পার?

তীব্র উত্তেজনায় থর থর করে কাঁপতে লাগল সে।

আপকা মাফিক এক ছোকরা সাহেব কো সাথ কয় রোজ খুব ঘোরাফেরা করনেকে বাদ উসকো সাথ এক রোজ ভেগে গেল সাহেব—

কয়েকমুহূর্ত কাঠ হয়ে দাঁড়িয়ে রইল জোসেফ।

তারপরেই হঠাৎ ঝড়ের মত ছুটে চলে গেল মন্দিরের গলির দিকে। দিনকতক এখানে সেখানে গঙ্গার ঘাটে ঘাটে অলিগলিতে ঢুঁড়ে খুঁজল তার প্যাটকে। কোথাও তাকে আর দেখতে পেল না। কখনো দেওয়ালে মাথা ঠুকে ঠুকে রক্তারক্তি কাণ্ড করত—কখনো হিংস্র আক্রোশে চিৎকার করত। দেখতে দেখতে বদ্ধ উন্মাদ হয়ে গেল সে। তার জীবনের যত জ্বালা যন্ত্রণা হতাশা-সব-সবকিছুকে একদিন চিহ্নহীন বিস্মৃতির ঘন অন্ধকারের স্রোত কোথায় ভাসিয়ে নিয়ে গেল—থেমে গেল দীনেশ যাজ্ঞি।

তিন

ড্রাগ খাওয়ার দুর্বার বাসনাই হয়ত মানুষের সবচেয়ে বড় বৈশিষ্ট্য যা তাকে অন্যান্য সমস্ত প্রাণী থেকে আলাদা করেছে।

নেশা।

সভ্যতার একেবারে গোড়া থেকে নেশার প্রতি মানুষের ছিল সহজাত আকর্ষণ—মাদক বিশেষজ্ঞ প্রবীন বক্তা উদ্দীপ্ত কণ্ঠে বলতে লাগলেন, অনায়াসেই কল্পনা করা যায় লক্ষ লক্ষ বছর আগে আমাদেরই অতীত পুরুষ গহন অরণ্যের আনাচে কানাচে, পাহাড়ের খাঁজে খাঁজে হয়ত হঠাৎ সন্ধান পেয়ে গিয়েছিল এমন গাছগাছড়ার যার নির্যাস তাকে নেশার মৌতাত জুগিয়ে ছিল। সেই উত্তেজক রস আকণ্ঠ পান করে অদ্ভুত একটা আনন্দের শিহরণে আবিষ্ট হয়ে গিয়েছিল।

বড় হলঘরে গম গম করছে বক্তার গলার স্বর। শ্রোতারা শুনছে মন্ত্র মুগ্ধের মত। ভদ্রলোক বলতে বলতে হঠাৎ থেমে গিয়ে তর্জনী তুলে বেশ চড়া গলায় বললেন—ড্রাগের ইতিহাস গবেষকরা জানিয়েছেন—পৃথিবীর প্রাচীনতম সভ্যদেশ ব্যাবিলন বা সুমেরীয় প্রথম সুরাসার তৈরির কৌশল উদ্ভাবন করেছিল এবং সেই সুরা বা মদ তারাই প্রথম নেশার উপকরণ হিসেবে ব্যবহার করেছিল খ্রীষ্টাব্দ শুরু হওয়ার সাড়ে তিন হাজার বছর আগে। আর তারও হাজার খানেক বছর পরে মিশরও শিখল মদ তৈরি করতে। তার অনেক—অনেক পরে আর্যরা এসে বসতি করল সিন্ধুনদ এবং তার পাঁচটি উপনদী দিয়ে ঘেরা সপ্তসিন্ধু উপত্যকায়। তখন ভারতের উত্তর পূর্বের কাবুল থেকে পূর্ব পাঞ্জাব পর্যন্ত বিস্তৃত ভূখণ্ডকে বলা হত সপ্তসিন্ধু। বৈদিক সাহিত্যে সোমরস এবং সুরার উল্লেখ আছে বলেই নিশ্চিত হওয়া যায় তখনকার দৈনন্দিন জীবন—এই দুইটি নেশার উপকরণের বহুল প্রচলন ছিল। কিন্তু—

কি দিয়ে তৈরি হত সেই সুরা। প্রাচীন ভারতের ইতিহাস বিশেষজ্ঞ এবং উদ্ভিদ বিদ্যার পণ্ডিতেরা জানিয়েছেন অ্যাস্কেলে পিয়াস কিংবা সারকণ্টেম্মা নামে এক ধরনের বুনো গাছের রস ছিল দুধের মত সাদা। সেই রস থেকেই তৈরি হত নেশার সামগ্রী—উত্তেজক পানীয়—

সোমরস!

হাজার হাজার বছরের এপারে এসেও দেখা যায় আজও ভারতের দক্ষিণ সমুদ্র সন্নিহিত দেশে (তামিলনাড়ু, অন্ধ্র এবং বোম্বাই) তথা মহারাষ্ট্রের অধিবাসীরা ও ইরানের ইয়েজেদ ও কিরমান অঞ্চলের বাসিন্দারা এখনও দেবতাকে যে ভোগের অর্ঘ সাজিয়ে দেয় তার ভেতরে থাকে—

সোমরস!

খ্রীষ্টাব্দ গণনা শুরু হওয়ার প্রায় তিনশো আঠাশ বছর আগের লেখা এবং তখনকার এই উপমহাদেশের আর্থ সামাজিক বিষয়ে একমাত্র প্রামাণিক গ্রন্থ কৌটিল্যের অর্থশাস্ত্রেও বলা হয়েছে—সোমরসের গাছের চাষ করার জন্য ব্রাহ্মণদের নিষ্করভূমি দান করা হত।

ঠিক কি উপাদান থেকে সুরা তৈরি করা হত বেদে তার কোন তথ্য নেই। তবে বলা হয়েছে জলে ভেজান যব বা বার্লি'র গুঁড়ো থেকে তৈরি বিয়ারের মতই এক-রকমের মদ্য—

যেমন গুরুগম্ভীর তেমনি শুকনো খটখটে সাবজেক্ট। কিন্তু লোকে শুনছে বেশ মনযোগ দিয়ে। তাই বক্তারও উৎসাহে জ্বলে উঠল। তিনিও ইতিহাসের স্রোতে সাঁতার কেটে কেটে মদ থেকে আফিংএ, আফিং থেকে মরফিন—মরফিন থেকে পৌঁছে গেলেন এযুগের সবচেয়ে বিপজ্জনক ড্রাগ—হেরোইনে!

দক্ষিণ কলকাতার একটি বিখ্যাত সমাজ সেবাসমিতির উদ্যোগে আয়োজিত মাদক প্রতিরোধের সেই সভায় আরও বক্তা ছিলেন। এবারে মঞ্চে এলেন মাঝবয়সী এক মহিলা। ডক্টর গীতা রায়। চিকিৎসক এবং মানসিক রোগ বিশেষজ্ঞ। আর তিনি কাশীর একটি প্রাইভেট ডি-অ্যাডিকশান ক্লিনিক বা নেশাগ্রস্তদের চিকিৎসার জন্য নার্সিং হোমেরও অধ্যক্ষা। তিনি প্রথমেই বললেন অত্যন্ত মূল্যবান একটি কথা—

আজ থেকে চুয়াল্লিশ বছর আগে হিরোসিমা এবং নাগাসাকিতে অ্যাটম বোমা পড়েছিল। মানুষের হাতে তৈরি মানুষের সেই ভয়ঙ্কর মারণাস্ত্রের বিধ্বংসী ক্ষমতা নিয়ে সারা পৃথিবীতে কত হৈ চৈ পড়ে গিয়েছিল। কিন্তু কেউ কি কখনো মুহূর্তের জন্যও ভেবেছেন আপনাদের সকলের অলক্ষ্যে নিঃশব্দে অ্যাটম হাইড্রোজেন বোমার চেয়েও অনেক—অনেক বেশি শক্তিশালী আর একটি বোমার বিস্ফোরণ ঘটে গিয়েছে অনেকদিন আগে—ডক্টর রায় একটু থেমে আবার গম্ভীর গলায় বললেন সেই বোমাটির নাম—

ড্রাগ অ্যাডিকশান বা মাদকদ্রব্যের নেশা।

এইসব ড্রাগের ভেতরে এমন সব বিপজ্জনক মালমশলা আছে যা পৃথিবী জুড়ে কোটি কোটি মানুষকে ধ্বংস করছে কিংবা জীবনের সব আলো নিভিয়ে দিয়ে মানুষকে দুঃখ আর হতাশার অন্ধকারে ঠেলে দিচ্ছে। আমি—আমি প্রতিদিন সেই সর্বনাশা অবক্ষয়ের বীভৎসতা চোখের সামনে দেখতে পাচ্ছি……

বাঃ বড় সুন্দর আর সারগর্ভ বক্তৃতা করছেন তো! তাঁর কথাগুলো নোট করতে শুরু করলাম।

মনে রাখবেন ড্রাগের ভেতরে সবচেয়ে ক্ষতিকারক হল—হেরোইন। হেরোইনের নেশার পরিণতি যে কী ভয়াবহ—কত সর্বগ্রাসী তার কয়েকটি ঘটনা আমি আমার প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতা থেকে বলছি—

একদিন আমার ক্লিনিকে এল একটি ছেলে। সুন্দর ফুটফুটে চেহারা। আঠারো

কি উনিশ বছর হবে। কিন্তু তারুণ্যের কোন চিহ্নই নেই তার চেহারায়। চোখদুটো ঢুলুঢুলু। যেন ঘুমের ভারে জড়িয়ে আসছে। গর্তে ঢোকা দুটো লাল চোখ জলে ভরা।

হেরোইন কবে থেকে ধরেছ ?

বছর চারেক।

হেরোইনের কথা তুমি জানলে কি করে ?

কলেজের বন্ধুদের কাছ থেকে।

তাকে আমার কাছে নিয়ে এসেছিল তার বাবা। তিনি অত্যন্ত সংকুচিত হয়ে জানালেন ছেলের পাকা নেশাখোর হয়ে যাওয়ার বিচিত্র বৃত্তান্ত—

ছেলেকে ভর্তি করেছিলেন বেনারসেরই এক খুব নাম করা ইংলিশ মিডিয়াম স্কুলে। স্কুলের বন্ধুদের পাল্লায় পড়ে প্রথমে খেতে শুরু করেছিল সিগারেট। আর একটু উঁচু ক্লাসে উঠতেই ধরল গাঁজা। স্কুলের পড়া শেষ করে কলেজে এসেই আরও উঁচু দরের ড্রাগ অর্থাৎ হেরোইনে পোক্ত হয়েছিল।

স্কুলে পড়ার সময়ে হাত খরচের পয়সা থেকেই সিগারেট এবং গাঁজার খরচ চলে যেত। কিন্তু হেরোইনের দাম অনেক বেশি। তখন বাড়ি থেকে পয়সা চুরি করে হেরোইন কিনত। সকাল দুপুর সন্ধ্যা—সারাদিনে নিয়ম করে চারবার সে হেরোইন খেত আর এই অপকম্মোটি সে করত বাথরুমে বসে।

প্রথম প্রথম বাড়ির কেউ বুঝতে পারত না—বাথরুমে ঢুকে ও এতক্ষণ কি করে ? একদিন ওর মা অনেক জেরা করে জানতে পেরেছিলেন বাথরুমে বসে সে নেশা করে—হেরোইনের নেশা, ভদ্রলোক এই পর্যন্ত বলে থেমে গিয়েছিলেন। আবার একটা দীর্ঘশ্বাস ফেলে বলেছিলেন—ওর মা সমস্ত ব্যাপারটা চেপে গিয়েছিলেন আমি ছেলেকে বকাবকি করব—মারধোর করব—

আপনি কেমন করে জানতে পেরেছিলেন ?

একদিন হঠাৎ আমার নজরে পড়ল কলেজে না গিয়ে শুয়ে রয়েছে। না—ঠিক ঘুম নয়—কেমন আচ্ছন্নের মত পড়ে রয়েছে। আমি চিৎকার-চেঁচামেচি শুরু করে দিলাম। তখন আমার স্ত্রী এসে বললেন সন্তু প্রায়ই কলেজ যায় না। একদিন যায় তো সাত-আটদিন আর ওমুখো হয় না—জিজ্ঞাসা করলে বলে শরীর খারাপ। সন্তু নিজে আমার কাছে স্বীকার করেছে—ও হেরোইন না কিসের যেন নেশা করে—বলতে বলতে তিনি কান্নায় ভেঙ্গে পড়েছিলেন।

ভদ্রলোক চুপ করে গেলেন। স্থির দৃষ্টিতে তাকিয়ে রইলেন আমার চেম্বারের দেওয়ালে টাঙ্গানো একটা পোস্টারের দিকে যার ভেতরে লাল কালিতে বড় বড় হরফে লেখা এই কথাগুলো জ্বলজ্বল করছিল—

H—Heaven (স্বর্গ)

H—Hell (নরক)

H—Heroin (সর্বনাশা ড্রাগ)

স্মরণ রাখবেন ইংরেজীর এই একটি অক্ষর H নেশাগ্রস্তদের জীবনে ওতপ্রোত ভাবে জড়িত।

বাঃ খুব দামী কথা তো। ভদ্রলোক যেন নিজের মনেই বিড়বিড় করে বললেন। গীতাদেবী বেশ গল্পের মত করে রসিয়ে রসিয়ে বলছেন। খবরের কাগজের রিপোর্টার থেকে শুরু করে আমার মত আরো অনেক শ্রোতাও নোট করে চলেছে।

সেই হেরোইন অ্যাডিক্ট ছেলের বাবা প্রসঙ্গে জানালেন—তিনি নাকি নেশাখোর ছেলের ওপরে ড্রাস্টিক স্টেপ নিয়েছিলেন। দিন রাত বাড়িতে তাকে আটকে রাখতেন। তার স্ত্রীকে বলে দিয়েছিলেন—ছেলের কলেজের পাট তো চুকে গিয়েছে। তার হাতে যেন একটা পয়সা না পড়ে।

কিন্তু কিছুই হয়নি—কিছুই করতে পারেননি তিনি। হেরোইনের জন্যে পাগল হয়ে গিয়েছিল তার ছেলে। মায়ের পায়ে পড়ত পয়সার জন্য। শেষ পর্যন্ত পাড়া প্রতিবেশীদের বাগানে ঢুকে নারকেল চুরি করতে শুরু করল। ডাব বা নারকেল বাজারে বিক্রি করে সন্তু তার ডেলি ডোজের ব্যবস্থা করতে শুরু করল।

একদিন ডাব চুরি করতে গিয়ে ধরা পড়ল সন্তু। এখন সে দাগী আসামী। পরপর তিন তিনবার জেল খেটে এসেছে। কিন্তু এতটুকু পরিবর্তন হয়নি। তার ফিক্সের ডোজ আরও বেড়ে গেল। শেষ পর্যন্ত হেরোইন স্মাগলারদের দলে ভিড়ল। একদিন তার কাছে চোরাই হেরোইন পেয়ে পুলিশ তাকে গ্রেপ্তার করল। পুরো একটি বছর জেলে কাটিয়ে ফিরে এল সন্তু।

কিন্তু না ফিরলে যেন ভাল হত। এখনও সুযোগ পেলেই পয়সা চুরি করে হেরোইন খায়। তার সারা গায়ে পাচড়ার মত ঘা। হাত-পাগুলো ফোলা ফোলা। যখন তখন কম্প দিয়ে জ্বর আসে—ভদ্রলোক কাঁদো কাঁদো হয়ে বলেছিলেন—এই নেশাটা ছাড়িয়ে দিয়ে আমার ছেলেকে বাঁচাতে পারেন না ?

আরো একজন অ্যাডিক্টের কথা জানালেন বেনারসের প্রাইভেট ডি-অ্যাডিকশন ক্লিনিকের ইনচার্জ ডক্টর রায়।

একটি নাম করা এক্সপোর্ট কোম্পানি বা রপ্তানী সংস্থার সিনিয়র রিপ্রেজেন্টেটিভ। সুদর্শন তরুণ যুবক দীপক। মোটা মাইনের চাকরি। কিন্তু—

গাঁজা খেতে শুরু করেছিল চাকরিতে আসার আগে। কিন্তু যেই চাকরিটা পেল। হাতে পড়ল কাঁচা টাকা। ড্রাগের স্ট্যাটাসও বেড়ে গেল। ধরল মরফিন। দিন রাত মরফিনের ইনজেকশন নিয়ে বুঁদ হয়ে থাকে। কোনদিন বহু কষ্টে অফিসে যেত —আবার হয়ত সাতদিনই অফিসের চৌকাঠ মাড়াল না। অতএব—

যা হওয়ার তাই হল তার চাকরিটি গেল। এখন মরফিন না নিলে কেমন পাগল পাগল লাগে। মনে হয় সে বাঁচবে না। তাই—

একদিন বাস কণ্ডাক্টারের ব্যাগ থেকে পয়সা চুরি করল দীপক। জেলে বসে বসে এক্সপোর্ট কোম্পানির সিনিয়র এক্সিকিউটিভ গভীর লজ্জা আর তীব্র অনুশোচনার সঙ্গে ভাবত—কণ্ডাক্টারের ব্যাগ থেকে পয়সা চুরি করেছিল।

জেল থেকে বেরিয়েই দীপক চলে এসেছিল গীতাদেবীর ক্লিনিকে। বলেছিল ব্যাকুল হয়ে—কি করে মরফিনের নেশাটা ছাড়া যায়—তার একটা ব্যবস্থা করে দিন—তা নাহলে যে আবার চুরি করতে হবে—

আরও কত অ্যাডিক্টের কত বিচিত্র আর অদ্ভুত বৃত্তান্ত বলে তার দীর্ঘ ভাষণ শেষ করলেন।

আশ্চর্য! ডক্টর গীতা রায় কিন্তু কোন কেসের ক্ষেত্রেই বললেন না—কেন—কিসের জ্বালায়—কিসের দুঃখে তারা ড্রাগের নেশার কবলে পড়ে। আর অন্ধকারের জগতে কোথায় হারিয়ে যায়। আর কেনই বা অনেক চেষ্টা করলেও তাদের কিছুতেই ড্রাগ ছাড়ানো যায় না—এসব অর্থাৎ অ্যাডিক্টদের মনের ভেতরটা উন্মুক্ত করে বা ডিসেকশান করে কিছুই বললেন না। যেমন বলেছিল দীনেশ ঘাঞ্জি—আমেরিকান মেয়ে জিলের কথা। বাবার অহেতুক অত্যাচারে দিনের পর দিন নিষ্ঠুর ব্যবহারে অতিষ্ঠ হয়ে গিয়েছিল, জীবন ঘিরে নেমেছিল হতাশা ড্রাগ খেয়ে সেসব কিছু ভুলতে চেয়েছিল।

জোসেফ বিশ্বপ্রাণ দাতার। জীবনকে প্রচণ্ড বেশি ভালবাসতো। যাদের আসক্তি বেশি—দুঃখ তাদের অনিবার্য। তার ওপর তার ছিল উচ্চাশা সে একদিন পৃথিবীর জীবিত শ্রেষ্ঠ গায়কদের ভেতরে হবে অন্যতম। স্বপ্ন দেখা মানুষগুলো খুব মুডি হয়। যেই গাঁজায় দম দিতে শিখল অমনি তার স্বপ্নের পক্ষীরাজ দুরন্ত বেগে ছুটতে লাগল।

না। তাকে কোন তেপান্তরের মাঠে নিয়ে গেল না। নিয়ে গেল সেখানে যেখানে ড্রাগ নেশাখোরদের নিয়ে যায়—যেখানে যাওয়া তার অনিবার্য পরিণতি।

দীনেশ নিজে অ্যাডিক্ট। তাই হয়ত জিলের এবং বিশ্বপ্রাণের মনের একান্তের গোপন ব্যথা বেদনার কথা জানতে পেরেছিল। কিন্তু ভদ্রমহিলা তো ডাক্তার। মানসিক রোগ বিশেষজ্ঞ। অ্যাডিক্টদের মনের বৃত্তান্ত না জানলে তিনি মনের চিকিৎসা করেন কি করে? আছে আছে—নিশ্চয়ই আছে থরে থরে সাজানো পেসেণ্টদের কেস হিস্ট্রি।

সভার শেষে নিরালায় তার সঙ্গে দেখা করে আমার সমস্যাটা বললাম। তিনি তীক্ষ্ন চোখে আমার দিকে তাকিয়ে মৃদুকণ্ঠে বললেন, কেন এসব খোঁজ খবর করছেন জানতে পারি কি?

এবার আমি অসুবিধায় পড়ে গেলাম। কিন্তু গীতাদেবীকে খোলাখুলি না বললে যে আমি কিছুই করতে পারব না! তাই বলব না—বলব না করে বললাম। বলতেই হল—

ম্যাডাম যে সমাজ সেবাসমিতির উদ্যোগে আজ এই মাদক প্রতিরোধের সভা হল—তাদেরই অনুরোধে আমি ড্রাগের ওপরে একটা বই লেখার কাজে হাত দিয়েছি—

বাঃ বেশ—কিন্তু ড্রাগের কোন অ্যাস্পেক্টটা নিয়ে লিখবেন?

আপনাকে এসব বলা ধৃষ্টতা ম্যাডাম—আপনি নিশ্চয়ই স্টেনলি আইনস্টাইনের (Stainly Einstein) এর লেখা 'বিয়ণ্ড দি ড্রাগস' (Beyond the Drugs)

পড়েছেন ?

স্টেনাল আইনস্টাইন ? যিনি নিউইয়র্কের ইনস্টিটিউড ফর দি স্টাডি অফ ড্রাগ মিসইউজ (Institute for the study of Drug Misuse) এর এক্সিকিউটিভ ডিরেক্টর তো ?

আইনস্টাইন সাহেব ড্রাগের নেশার প্রসঙ্গে এক জায়গায় বলেছেন Narcotics in and of themselves do not cause moral spiritual, Psychological or Social deterioration. Rather it is the way the person has lived prior to and subsequent to his involvement with narcotics অর্থাৎ কোন মাদকদ্রব্যের বা ড্রাগের ভেতরে বা তাদের নিজস্ব এমন কোন শক্তি নেই যা মানুষের নৈতিক, আত্মিক, মনস্তাত্বিক অথবা সামাজিক অবনতি এবং অবক্ষয় ঘটাতে পারে। বরং বলা যায় ড্রাগ ব্যবহার করার ঠিক আগে এবং ঠিক পরে মাদকাসক্ত লোকটি যেমন কাটিয়েছে এবং জীবন কাটবে তার ওপরে নির্ভর করবে তার ভবিষ্যৎ—আমি থেমে গেলাম। মনে হল মাথার ভেতরে যেন সব জট পাকিয়ে যাচ্ছে।

তারপর ?

নেশা করার আগে ও পরের জীবনটা যদি আমরা ইণ্টিমেটলি জেনে নেই এবং পালটে দিতে পারি বা চেষ্টা করতে পারি তাহলে—

বাঃ বাঃ—ভেরি গুড—দি আইডিয়া—

আরো—আরো একটা পয়েণ্ট মাথায় আনাগোনা করছে ডক্টর রায়—আধুনিক বিজ্ঞান মানুষকে উপহার দিয়েছে আশ্চর্য এক কামধেনু। তার দৌলতে সে জল, স্থল অন্তরিক্ষে প্রচণ্ড দাপটে প্রভুত্ব করে বেড়াচ্ছে। তার চাঁদে যাওয়ার স্বপ্ন সার্থক হয়েছে। আর যে হারে রকেট ওড়াচ্ছে—বিভিন্ন গ্রহের খোঁজ খবর নিচ্ছে তাতে হয়ত একদিন দূরে কোন গ্রহে তার উপনিবেশ স্থাপনের স্বপ্নও সত্যি হয়ে যাবে। কিন্তু—

কিন্তু কি থামলেন কেন ?

ম্যাডাম পৃথিবীর বড় বড় সায়েণ্টিস্টরা, রাষ্ট্রনায়করা কখনো কি ভেবেছেন জীবনবিনাশী যেসব ড্রাগ তিলে তিলে ধ্বংস করছে যুবকদের যাদের ওপরে নির্ভর করছে আগামী দিনের মানব সভ্যতার ভবিষ্যৎ, সেই যুবসমাজকে ড্রাগ শক থেকে রক্ষা করার কোন উপায় ?

একটা কথাও বললেন না গীতাদেবী।

গভীর চিন্তার ভেতরে তলিয়ে যেতে যেতে ডটপেন দিয়ে টেবিলে ঠুক ঠুক আওয়াজ করতে লাগলেন।

কিন্তু অ্যাডিক্টদের সঙ্গে সরাসরি কথা বলতে চাইছেন কেন ?

ম্যাডাম—ড্রাগ শকের ইণ্টেনসিটি—তার তীব্রতা, তার সর্বনাশা বীভৎসতা তুলে ধরতে চাই—

ভেরি গুড—ভেরি গুড—চলে আসুন বেনারসে, উচ্ছ্বসিত হয়ে বললেন ডক্টর রায়—I will give you all possible assistance.

চার

মরফিনে আসক্ত উগ্র যৌবনবতী সরস্বতীযাব জীবনের ট্র্যাজেডির জন্য দায়ী কে?

কলকাতা থেকে কাশি।

অনেক—অনেক দূর। কলকাতাতেই কি নেশাখোরের কিছু অভাব আছে? এই সেদিন কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের ডিপার্টমেণ্ট অফ অ্যাপ্লায়েড সাইকোলজির তরফ থেকে সমীক্ষায় বলা হয়েছে এই শহরে ড্রাগ অ্যাডিক্টের সংখ্যা—৬৮,০০০। তার ভেতরে শতকরা পঞ্চাশ ভাগই পনের থেকে পঁচিশ বছরের। আর শতকরা চল্লিশ হল পনের থেকে চল্লিশের ভেতরে। পনের বছরেরও কম ছেলেমেয়ে শতকরা পাঁচ ভাগ।

মেয়েরাও এখন অনেকেই অল্পবিস্তর ড্রাগে আসক্ত। তাদের সংখ্যা হল চার দশমিক পাঁচ। এই সারভে রিপোর্টের শেষে মন্তব্য করা হয়েছে—নেশাখোরদের সংখ্যা দিনে দিনে আরও বাড়ছে। কলকাতার পুলিশ কিন্তু পরিস্কার বলে দিয়েছে—নেশাগ্রস্তদের এই পরিসংখ্যান সঠিক নয়—নির্ভুল হতে পারে না। কেন না—

কোকেনই হোক কি হেরোইনই হোক আর মরফিন কি এল. এস. ডি-ই হোক না কেন—কোন ড্রাগই নেশাখোররা প্রকাশ্যে সিগারেট-বিড়ির মত রাস্তায় যেতে যেতে কখনো খায় না। অতএব কে কোকেনে—কে হেরোইনে আসক্ত বের করা কঠিন।

আরও একটা কারণ হল—ড্রাগের নেশাটা ক্রমশঃ উঁচুতলা থেকে বা উচ্চ মধ্যবিত্ত কিম্বা মধ্যবিত্ত শ্রেণী থেকে গড়িয়ে গরীব দিনমজুর অর্থাৎ পভার্টি লাইনের দিকে ছড়িয়ে পড়ছে। তারা কে কোথায় বসে সস্তা হেরোইন কি গাঁজা খাচ্ছে, তার খোঁজ পাওয়া একেবারেই অসম্ভব।

তেমনি অসম্ভব মাদকসেবীদের সঙ্গে কথা বলা। তারা ড্রাগ খায় লুকিয়ে চুরিয়ে আড়ালে আবডালে। মনে পড়ে গেল এক ইংরেজ ড্রাগ বিশেষজ্ঞ কিয়েভ আরির (Kiev Ari) লেখা 'ড্রাগ এপিডেমিক' বইতেই বোধহয় পড়েছিলাম—ড্রাগের জগতটাই রহস্যময় অন্ধকারে আচ্ছন্ন একটা জগৎ। আফিং-এর চাষ থেকে শুরু করে রাস্তার খুচরো খরিদ্দার পর্যন্ত ড্রাগের সমস্ত কর্মযজ্ঞটাই যে চলে লোকচক্ষুর আড়ালে। তার একটা সুন্দর গ্রাফও দিয়েছেন কিয়েভ সাহেব। সেই চিত্র-লেখা বা গ্রাফটি নিচে দেওয়া হল—

আফিং-এর উৎপাদক বা কৃষক
|
একমাত্র গভর্ণমেণ্ট অনুমোদিত বাগান ছাড়া অধিকাংশ চাষই হয় গোপনে
|
রসায়নবিদ বা কেমিষ্ট
|
নানা রাসায়নিক মিশিয়ে তৈরি করে হেরোইন মরফিন ইত্যাদি গোপনে
|
চোরাকারবারি
↓
ড্রাগ দেশ দেশান্তরে পাচার করে গোপনে
↓
মাদকসেবীরা ড্রাগ খায় গোপনে

এক কথায় বিশাল এক Underground Empire. এই গোপন সাম্রাজ্যের কুশীলবদের এবং নেশাগ্রস্তদের সঙ্গে যোগাযোগ করার কোন উপায়ই নেই। আর এই শহরের মুষ্টিমেয় যে কয়েকজন চিকিৎসক ড্রাগ অ্যাডিক্টদের চিকিৎসা করে থাকেন তারা মাথা ঝাঁকিয়ে বললেন—নেশাগ্রস্তরা অত্যন্ত 'সেকী' হয়—এদের সম্বন্ধে কিছু বলা সম্ভব নয়—উচিতও নয়। অতএব—

নিরুপায় হয়ে কাশী যেতেই হল। দশাশ্বমেধ ঘাটের কাছেই তাঁর প্রাইভেট ডি-অ্যাডিকশান চেম্বার। বারান্দায় উঠতেই হোঁচট খেলাম। দেওয়ালে দগদগে লালরঙে আঁকা মড়ার মাথার খুলি, তার ঠিক নিচে আড়াআড়ি ভাবে দুটো হাড়। সেই ভয়ানক ছবির পাশে বড় বড় হরফে লেখা—

SMASH THE HEROIN DENS—হেরোইনের ডেরা ধ্বংস করো।

BUILD THE DRUGFREE SOCIETY—মাদকদ্রব্যশূন্য সমাজ গড়ো।

LOVE LIFE AND STOP DRUG ABUSE—জীবনকে ভালবাস, খেও না জীবনবিনাশী ড্রাগ।

বারান্দা পেরিয়ে রোগীদের বসার ঘর। তারও চারিদিকের দেওয়ালে মাদক প্রতিরোধের নানা মূল্যবান এক একটা বাণী—

হেরোইনের ডেরা—সর্বনাশের ব্যাঙ্ক—তুমি সেখানে নিজেকে জমা দিয়ে রেখেছ।

হেরোইন —তোমার চরিত্র, তোমার আত্মসংযম নষ্ট করছে।

হেরোইন —তোমার স্বাস্থ্য, তোমার সম্মান গোল্লায় নিয়ে যাচ্ছে।

মনে রেখ—নেশা কিন্তু তোমার দুঃখ কষ্ট লাঘব করতে পারে না। বরং আরও যন্ত্রণা আরও বিপদ ডেকে নিয়ে আসে।

আরও সুন্দর আর দামী—এবং জুৎসই আরো অনেক বাণী ছিল। কিন্তু পড়া হল না—

আঃ—উ—উ—বহুত তকলিফ—বহুত দর্দ হো রহী হ্যায়—মেয়েলী গলার তীক্ষ্ণ চিৎকারে চেম্বারের নিস্তব্ধতা যেন খান খান হয়ে ভেঙ্গে পড়ল। লাল আলোর অক্ষরে লেখা এনগেজডে'র মুকুট মাথায় নিয়ে থাকা ডাক্তারের কনসাল্টিং রুম থেকেই মনে হল যেন আর্ত চিৎকারটা ভেসে এল। স্পষ্ট কানে এল ভেতরে ধ্বস্তাধ্বস্তির শব্দ শোনা যাচ্ছে। চাপা উত্তেজিত গলায় বলছেন গীতাদেবী বাঁধো—বাঁধো—ওকে বেঁধে রাখো—

হয়ত ড্রাগের শিকার—কোন উদ্দাম পাগল পেশেন্ট দেখছেন। ডিফিকাল্ট কেস। গীতাদেবীর সঙ্গে দেখাই তো করতে পারব না চট করে। কোনভাবে যদি একবার তাঁকে জানানো যেত—কলকাতা থেকে পেঁছে গিয়েছি—এসব ভাবতে ভাবতেই তাঁর সহকারী এসে আমার শ্লিপ নিয়ে ভেতরে গেল। আর প্রায় সঙ্গে সঙ্গেই ডেকে পাঠালেন। তাঁর ঘরে ঢুকেই থমকে দাঁড়ালাম।

বাইশ তেইশ বছরের একটি মেয়ে কালো কুচকুচে গায়ের রঙ। পেটানো স্বাস্থ্য। হঠাৎ দেখলে মনে হয় একটা বাঘিনী। তার হাতদুটো লোহার শিকল

দিয়ে বাঁধা। পায়ে ডান্ডা বেড়ি। বড় বড় দুটো লাল টকটকে চোখ থেকে যেন ঝলকে ঝলকে আগুন ঝরছে।

ডাক্তারনীজি—উল্টি রুখনেকী দাওয়াই দিজিয়ে—তুরন্ত মেয়েটি হঠাৎ ককিয়ে চিৎকার করে উঠল।

মরফিন অ্যাডিক্ট। আড় চোখে তাকিয়ে অস্ফুটস্বরে বললেন ডক্টর রায় ভেরি ইন্টারেস্টিং অ্যান্ড সিরিয়াস কেস।

জেরা মাফিয়া কী সুই দিজিয়ে ডাক্তারনীজি—আপকী গোড় লাগি—গোড় লাগি তার করুণ আকুতি কান্নার মত শোনাল আর মনে হল যেন ভেতরের নিদারুণ যন্ত্রণায় তার দেহটা এঁকে বেঁকে কেমন দুমড়ে দুমড়ে উঠতে লাগল।

মরফিন বন্ধ করে দেওয়া হয়েছে। উইথড্রয়ালের জন্যে কষ্ট পাচ্ছে, আর—আরও কি যেন বলতে চাইছিলেন ডাক্তার। কিন্তু ঠিক পাগলা হাতির মত হুড়মুড় করে ঢুকে পড়ল এক মাঝবয়সী মহিলা। ভারি দলমলে চেহারা। গোল গোল মার্বেলের মত চোখের নিচে সুর্মার প্রলেপ। মাংসল মুখের এখানে সেখানে পাউডারের ছোপ দুই গালে রুজের উৎকট লালিমা—যা এই বয়সে বেমানান—

মৈনে তো কয়দফে কহিথী—ডাগদারনীজি উঃ বহুত খতরনাক বেতমিজ বদমাস আছে, রোগিনীর দিকে কড়া চোখে তাকিয়েই বিদ্যুতগতিতে মুখ ঘুরিয়ে নিল সেই মহিলা। দাঁতে দাঁত চেপে ধরে বলল—উসকো—ওই হারামজাদি কো ইলেকটিরি শক দিজিয়ে—দাওয়াইসে কুছ নহী হোগী—

তুমি ভেতরে এসেছ কেন? মিসেস রায় বিরক্ত হয়ে বললেন যাও বাইরে যাও—

কেঁও আপলোগ ইলেকটিরি শক—

তাহলে তুমিই আমার এই চেয়ারটায় এসে বসো, একটু থেমে তাকে ধমকে বললেন কাজের সময় বিরক্ত করো না—বাইরে যাও—

হিন্দুস্থানী সেই রমনী তার মেদবহুল দেহটাকে কোনরকমে টেনেটুনে নিয়ে যেতে যেতে থমকে দাঁড়িয়ে পড়ল। মরফিনে আসক্ত অসুস্থ সেই মেয়েটির দিকে একবার কঠিন ঘৃণার দৃষ্টি ছুঁড়ে বেরিয়ে গেল।

She is the root cause of her tragedy--অর্থাৎ মেয়েটির এই দুঃখজনক পরিণতির জন্যে এই মহিলাই দায়ী—অস্ফুটস্বরে বললেন গীতাদেবী।

কি রকম?

সেসব পরে হবে। বেনারসে কখন পেঁছিলেন—কোথায় উঠেছেন—তাই তো শোনা হল না—

উঃ—ওয়াক—বিকট শব্দ করে বমি করতে শুরু করল পেশেন্ট। বমি করে চেম্বার ভাসিয়ে দিল সে।

এতটুকু বিচলিত হলেন না ডক্টর রায়। বিরক্ত তো নয়ই। দেখলাম মানসিক রোগীর চিকিৎসকের কী অদ্ভুত নৈপুণ্য! চেয়ার থেকে উঠে ধীর পায়ে তার কাছে

গেলেন। পরম আদরে রোগিণীর মাথায় হাত বুলিয়ে দিতে দিতে স্নিগ্ধ মৃদুকণ্ঠে বলতে শুরু করলেন—সরস্বতীয়া—তুমি একটু শান্ত হও মা—একটু শান্ত হও। তোমার কিছু হয়নি—তোমার—গীতাদেবীর কণ্ঠস্বর ক্রমশ খাদে নেমে এল। মনে হল যেন বহু বহু দূরে থেকে যেন অস্ফুট আর মৃদুকণ্ঠে কোন সুমধুর গানের এক অপূর্ব মূর্ছনায় চারিদিক কেমন আচ্ছন্ন হয়ে পড়ছে—

তোমার কোন অসুখ করেনি সরস্বতীয়া—তুমি—বিলকুল সুস্থ—

সরস্বতী কোন কথা বলছে না। মনে হল মধুর এক আবেশে তার চোখদুটো ক্রমশঃ জড়িয়ে আসছে।

তোমার কি তকলিপ আমাকে বলবে সরস্বতীয়া—আমি—আমি তো তোমার মা-র মত—

মেরী নিনদ নহী আ-তি ডাগদারনীজি—নিনদ—

আচ্ছা সরস্বতীয়া কাশিতে তোমার কোন্ জায়গা সবচেয়ে বেশি ভাল লাগে। একটু থেমে তার পিঠে আলগোছে হাত বুলিয়ে দিতে দিতে আবার বললেন মিসেস রায় একটু ভেবে বলো—

গঙ্গা কী কিনার!

বাঃ—সরস্বতীয়া—শোন তোমার যখুনি ঘুম আসতে চাইবে না—তখন তুমি এই কাশির গঙ্গার সেই অপরূপ ছবির কথা এক মনে ভাববে। সেই ঘাটে ঘাটে ভক্তদের গুঞ্জন তার ভেতরেই পুজোর ঘণ্টা বাজছে—বিশ্বনাথের জয়ধ্বনি উঠছে। আর—আর তন্দ্রাচ্ছন্ন সরস্বতীর কানের খুব কাছে মুখ নিয়ে এসে ফিস ফিস করে বললেন—সেই ঘাটগুলো কে ছুঁয়ে ছুঁয়েই গঙ্গা বয়ে চলেছে—বয়ে চলেছে—কত যুগ—কত কাল ধরে—

ঘুমিয়ে কাদা হয়ে গেল সরস্বতী।

সরস্বতী—তার মা-র অসামাজিক জীবনের বলি।

বাতাসিয়া—তার মা পতিতা। ঠিক রেজিস্টার্ড প্রস কিন্তু নয়। দস্তুরমত বিয়ে হয়েছিল। তার স্বামী ছিল ডালমণ্ডির রইস আদমি অর্থাৎ বেশ পয়সাওয়ালা স্ফূর্তিবাজ লোক। অহল্যাবাঈঘাটের ওপরেই তার মিষ্টির দোকান ছিল। খুব ভাল চলত দোকানটা। চার-পাঁচজন কর্মচারি সকাল থেকে রাত পর্যন্ত খাটতে খাটতে হিমসিম খেয়ে যেত।

বেশি পয়সা হলে যা হয়। মিঠাইওয়ালা বাসুদেব তেওয়ারি অল্পসল্প গাঁজা খেত। জুয়া খেলত। বাতাসি কখনো কিছু মনে করেনি। কিছু বলেওনি। মর্দানা লোগো কো এসব দোষ একটু আধটু থেকেই থাকে। এমন কি কেদার-ঘাটের কাছে এক খুপসুরৎ রাণ্ডির (বারবনিতা) ঘরে যে তার স্বামী মাঝে মধ্যে যেত তাও অজানা ছিল না বাতাসির। হয়ত তার বুকের ভেতরটা একটু চিন চিন করে জ্বালা করত—কিন্তু কখনো বাসুদেবকে কিছু বলেনি। অভিমানে দুঃখে মুখ

কালো করেনি। আর করবেই বা কেন?

বাসুদেব তাকে ভালবাসে। ভালবাসে গভীর ভাবে। টাকা পয়সা গহনা শাড়ি দেয় তাকে দু'হাত ভরে। কোথাও কোন কমতি রাখেনি তো সে! কিন্তু এখন সে যদি বাইরে বাইরে ঘুরে একটু মুখ বদলাতে চায়—চাক না। তার তো কিছু এসে যাচ্ছে না। কিন্তু—

জল যেমন নিচের দিকে গড়িয়ে যায়—তেমনি পাপও নিম্নগামী। দিনে দিনে তার বেগ আরও বাড়ে। বড় বেশি বাড়াবাড়ি শুরু করল বাসুদেব। প্রায়ই রাত্রে আসে না। বাতাসি ঝগড়া করত। চিৎকার করত—দেওয়ালে মাথা ঠুকত। কিন্তু—

কিছুই হল না। বাতাসি ফেরাতে পারল না বাসুদেবকে। হাল ছেড়ে দিল। কিন্তু যেদিন বাসুদেব সেই রূপসী রূপজীবিণীকে বাড়িতে এনে তুলল সেইদিনই কোলে ছয় মাসের সরস্বতীকে নিয়ে ঘর ছাড়ল বাতাসি।

গোড়ার দিকে কোন বাড়িতে রান্না কোন বাড়িতে বাসন মাজার কাজ করে পেট চালাত বাতাসি। বিশ্বনাথের মন্দিরের কাছে পাণ্ডা মহাদেব ষড়ঙ্গীর মস্ত বড় বাড়ির গাড়িবারান্দার নিচে থাকত রাত্রে। তাকে দেখেই তেড়ে এসেছিল মহাদেব। কিন্তু তার আপাদমস্তকে চোখ বুলিয়ে কেন যেন থেমে গেল। বলল—থাকো—কিন্তু নোংরা টোংরা করো না—ভাড়াটাড়া দিতে হবে না—কিন্তু দু'বেলা বাসন মাজতে হবে—পয়সা পাবে না—বলেই জুতো মসমসিয়ে চলে গেল। যেতে যেতে বেশ গলা চড়িয়ে বলল, আরে বাবা বিশ্বনাথের কাশিতে একটা অবলা জীব দুধের বাচ্চা নিয়ে রাস্তায় পড়ে থাকবে—তাই কি হয়?

আরও পাঁচ বাড়িতে খেটে রাত্রে ডেরায় ফিরেই সরস্বতীকে বুকে চেপে ধরে শুয়ে পড়ে। ক্লান্তিতে দেহ অবশ হয়ে আসে। তবুও—তবুও স্বপ্ন দেখে সরস্বতীকে স্কুলে পড়াবে—অনেক অনেক বড় হবে—রাজঘাটের বাবুদের বাড়ির পরীর মত সুন্দরী মেয়েটার মত হাতে মোটা মোটা খাতা বই নিয়ে কলেজে যাবে—ঘুমের উত্তাল ঢেউ এসে স্বপ্নটাকে ধাক্কা মেরে কোথায় তলিয়ে নিয়ে যায়। তার চোখ থেকে জল গড়িয়ে পড়ে দু'গাল বেয়ে।

দিন কাটে। মাস যায়। হাতে দুটো পয়সাও জমিয়ে ফেলে বাতাসিয়া।

কেন যে এত খেটে খেটে হাড় কালি করছিস বাতাসি, তারই মত বাড়িতে বাড়িতে ঠিকে কাজ করা লছমী বলে—তোর এই গতর—

ইঙ্গিতটা বুঝতে পারে বাতাসি। বুকের ভেতরটা যন্ত্রণায় পুড়ে যায়। যেসব বাড়িতে কাজ করে—সেইসব বাড়ির ছেলে ছোকরা থেকে শুরু করে বুড়োহাবড়ারা পর্যন্ত তার আশেপাশে কেমন ছোঁক ছোঁক করে। আর কতদিন—কতদিন যে নিজেকে শক্ত রাখতে পারবে বুঝতে পারে না।

কয়েকদিন পরেই এমন একটা কাণ্ড ঘটে গেল, বাতাসিকে আবার রাস্তায় নামতে হল।

সেদিন কাজের বাড়ি থেকে ফিরতে রাত হয়েছিল। বাড়িতে বড়ছেলের বিয়ের

বৌভাত ছিল। ভালমন্দ খেয়ে ছাঁদা বেঁধে নিয়ে এসেই মেয়েকে নিয়ে শুয়ে পড়ল। খেতে দিয়েছে ঠিকই। কিন্তু গরুর মত খাটিয়ে নিয়েছে। ক্লান্তিতে শরীর ভেঙে এল। দেখতে দেখতে গাঢ় ঘুমে তলিয়ে গেল।

ঘুমের ভেতরেই বাতাসির মনে হল যেন খুব ভারি-ভারি একটা বোঝা তার বুকের ওপরে চেপে বসেছে। তার নিশ্বাস বন্ধ হয়ে আসছে। শরীরের সমস্ত শক্তি দিয়ে তাকে সরিয়ে দিল। কিন্তু সে তাকে বুকের ভেতরে জাপটে ধরে একতাল ময়দার মত ঠাসতে ঠাসতে বলল ফিসফিস করে, ডরে মাৎ প্যারে—বহুত—বহুত রুপেয়া বলতে বলতেই বাতাসির দেহে তার লালসার বিষ ঢালতে লাগল।

বেরিয়ে যাওয়ার সময় ভর পেট খেয়ে পরম তৃপ্তিতে ঢেকুর তোলার মত শব্দ করে চাপা গলায় বলল, বাবা বিশ্বনাথের পরম ভক্ত পাণ্ডা মহাদেব ষড়ঙ্গী বিনা ভাড়ায় তোমাকে থাকতে দিয়ে বাবা বিশ্বনাথের এই কাশিতে তোমাকে আমার কাছে ঋণী রেখে পাপের ভাগী তো হতে পারি না—

লছমীর কাছেই এসে উঠল বাতাসি—

তোকে বলেছিলাম তুই পারবি না রে বাতাসি—তোর মাংস খুবলে খুবলে খেয়ে ফেলবে, বলল লছমী। তারপর তার কানে কানে বলল কতগুলো কথা।

সেই শুরু। সন্ধ্যার পর সেজেগুজে মুখে পাউডার ঘসে গালে রঙ মেখে রাতের অপ্সরী সেজে কোনদিন মণিকর্ণিকারঘাটে, কোনদিন হরিশ্চন্দ্রঘাটে দাঁড়াতে শুরু করল বাতাসি।

কাশির এই গঙ্গার ঘাটে ঘাটে হাজার হাজার পুণ্যার্থী। দণ্ডী কথক এবং ভক্তদের ভিড়ের ভেতরে কিছু নারীমাংস লোলুপ লোকও তো থাকে। অতএব খদ্দের জুটতে লাগল। জুটবেই।

হিন্দুর পরমতম পুণ্যতীর্থ এই কাশি। এখানে ভিখারী বিশ্বনাথের ক্ষুধার্ত করপুটে অমৃত ঢেলে দেন স্বয়ং অন্নপূর্ণা! এখানে কেউ উপোসি থাকে না—হঠাৎ কেন যেন থেমে গেলেন ডক্টর রায়।

আপনি বোর ফিল করছেন না তো!

না—না—বলেন—কি—

মানসিক রোগী নিয়ে আমার কারবার। সরস্বতীর মনের জট খোলার জন্য ওর মার হিস্ট্রিটা আমাকে ডিটেলসু জানতে হয়েছিল—থামলেন গীতাদেবী। মনে হলু তাঁর মনের ভেতরে কোন কিছু নিয়ে নাড়াচাড়া চলছে।

কিন্তু সরস্বতী মরফিন অ্যাডিক্ট হল কি করে?

আবার কি—ফ্রাস্ট্রেশান—

সেটার কারণ কি—ওর মা?

অবশ্যই। তবে বাতাসি আরো অনেক বেশি ভুল করে ফেলেছিল। সেই ভুলের খেসারত দিচ্ছে তার মেয়ে—

বাতাসি তার মেয়েকে স্কুলে ভর্তি করে দিয়েছিল। পড়াশুনায় সরস্বতীর বেশ মাথা ছিল। দেখতে দেখতে নিচের ক্লাসগুলো ভালভাবে টপকে টপকে উপরে উঠতে লাগল। দূর থেকে শুনে খুশি হত বাতাসি। আর স্বপ্নের রঙীন সুতো বহু-বহু দূরে ছড়িয়ে দিত—আরও দু'তিনটা পাশ দেওয়াবে। বড় চাকরি পাবে। তারপর ওর সেই বেতমিজ বদমাস বাপটাকে উচিৎ শিক্ষা দেবে। তার সারি জিন্দেগী পরিসানের বদলা নেবে। হয়ত—

হত। বাতাসি যা ভেবেছিল সবই হত। ভূত ভবিষ্যৎ ভেবে বেশ আটঘাট বেঁধেই সবকিছু করেছিল সে। সরস্বতীর জ্ঞান হওয়ার পরই তাকে গঙ্গার ওপারে রামনগরের একটা স্কুলের কিণ্ডারগার্টেন সেকশনে ভর্তি করে দিয়েছিল বাতাসি। বড় হয়েও সেই স্কুলেই পড়াশুনা করত সরস্বতী। বিশ্বাসী লোক দিয়ে টাকাপয়সা পাঠাত। নিজে পারতপক্ষে যেত না যদি কেউ চিনে ফেলে। কিন্তু—

পাপ কখনো চাপা থাকে না। বাতাসে ছড়ায় তার খবর। কোন সূত্রে জানতে পারে সরস্বতী তার মা-র কথা। সঙ্গে সঙ্গে যেন সব রহস্য—সব কুয়াশা পরিষ্কার হয়ে যায়—এইজন্যেই মা তাকে বাড়িতে কখনো নিয়ে যেতে চায় না—এইজন্যেই মা নিজেও সহজে তার কাছে আসে না।

ইতিমধ্যেই স্কুলের কয়েকটি বড়লোকের মেয়েদের পাল্লায় পড়ে সিগারেট ফুঁকতে শুরু করেছিল সরস্বতী। পড়াশুনা শিকেয় উঠল। সারাদিন গঙ্গার শানবাঁধানো ঘাটে বসে থাকে। আর একটার পর একটা সিগারেট খেয়ে যায়।

তার সহপাঠী এক বন্ধু এসে বলল তুই এটা খা। সব দুঃখ ভুলে যাবি বলেই সরস্বতীকে মরফিন দিল। মধুর এক আবেশে কেমন আবিষ্ট হয়ে এল সরস্বতীর চেতনা।

সেই শুরু। দিনে দিনে সরস্বতীর ডোজ বাড়তে লাগল। স্কুল কর্তৃপক্ষ জানতে পেরে তাকে তাড়িয়ে দিল।

বাতাসির মাথায় আগুন জ্বলে উঠল। দরজা বন্ধ করে মেয়েকে বেধড়ক মারধোর করল। সরস্বতীর পিঠ কেটে রক্ত ঝরল। ঠোঁট থেতলে গেল। কিন্তু তার মুখে এক কথা—থোরা ড্রাগ তো দিজীয়ে আপকী গোড় লাগি মা—

দিনের পরদিন না খাইয়ে রাখল মেয়েকে। আশ্চর্য খিদেয় পেট চোঁ চোঁ করলেও খেতে চায় না। শুধু বলে ড্রাগ এনে দাও—

বাতাসির বুকের ভেতরটা হাহাকার করে ওঠে কেন যে মেয়েকে স্কুলে পাঠিয়ে বিদ্যেধরী করতে চেয়েছিল।

শেষ পর্যন্ত সেই লছমীই বাতাসিকে দিল একটা শলাপরামর্শ—বাতাসি মরফিন কিনে নিয়ে এসে মেয়েকে আদর করে পিঠে হাত বুলিয়ে বলল—শোন তোর ওষুধ নিয়ে এসেছি মা—এসব ছাইভস্ম বেশি খাস না—আবার মেয়ের চিবুকে আলতো করে স্পর্শ করে বাতাসি বলল আমি যা বলব—শুনবি তো মা—

সেইদিনই রাত্রে সরস্বতীর ঘরে এল গালপাট্টা চাপ দাড়িওয়ালা একটা লোক।

কানে আতর মাখানো তুলো গোঁজা। গায়ে ফিনফিনে আরদির পাঞ্জাবি।

নেশায় আচ্ছন্ন হয়ে শুয়েছিল সরস্বতী। লোকটাকে দেখেই আতঙ্কে চিৎকার করে উঠেই তাকে ধাক্কা মেরে ফেলে দিয়ে ছুটে বেরিয়ে গেল। মুহূর্তে জলের মত পরিষ্কার হয়ে গেল কেন মা অত আদর করে তাকে ড্রাগ এনে দিয়েছিল।

সরস্বতী কিছুতেই তার মার পঙ্কিল জীবনে যেতে চায় না। ড্রাগও ছাড়তে চায় না। বসে বসে খাবে। তার ওপর তার ড্রাগের খরচ জোগাতে হবে। তা তো আর হয় না। সংসার বড় কঠিন জায়গা—থেমে গেলেন গীতাদেবী।

কয়েক মুহূর্ত কি ভেবে আবার বললেন—ড্রাগ পুরো বন্ধ করে দিয়ে মেয়েকে ঘরে আটকে রেখে দিল বাতাসি। উন্দাম হয়ে উঠল সরস্বতী। একটু থেমে মৃদুকণ্ঠে বললেন অ্যাডিক্টদের ড্রাগ উইথড্র করে দিলে যা হয়। কিন্তু বাতাসি ভাবল মেয়ে পাগল হয়ে গিয়েছে। হাতে পায়ে শেকল বেঁধে রাখল—

অ্যাডিক্টদের সঙ্গে সরাসরি কথা বলার ব্যাপারে তাঁর প্রতিশ্রুতির কথা স্মরণ করিয়ে দিলাম।

ডক্টর মিসেস রায় কোন কথা বললেন না। তাঁকে কেমন ক্লান্ত আর অবসন্ন মনে হল। বললাম—আজ না হয় থাক। কাল পরশু আসব—

বসুন—বসুন—অতদূর থেকে এসেছেন—

তাঁর সেক্রেটারিয়েট টেবিলের দেরাজ থেকে এক পাঁজা কার্ড বের করলেন। পেশেন্টদের রেকর্ড! পাঁচ ইঞ্চি মত লম্বা আর ইঞ্চি চারেক চওড়া কার্ডে এক একটি পেশেন্টের নাম, বাবার নাম, ঠিকানা কেস হিস্ট্রি। ক্লিনিকে আসার আগের সিসটেম এবং এখনকার অবস্থা ইত্যাদি বিবরণ লেখা আছে।

জগৎ মাঝি।

কৃষ্ণাচারী আচার্য।

তপতী মাখিজানী।

তপন গোবি।

আনন্দীরাম—

আরও কত পেশেন্টের—কত নাম। এক একজনের ড্রাগের কবলে পড়ার কত অদ্ভুত ইতিহাস।

এরা আপনার ক্লিনিক থেকে সুস্থ হয়ে ফিরে গিয়েছে?

চুপ করে থাকলেন গীতাদেবী। কেমন শুকনো গলায় বললেন ডি-অ্যাডিক্ট করিয়ে ছেড়ে দিয়েছি। এখন আবার নেশা করবে কি করবে না—সেটা নির্ভর করবে তার পারিপার্শ্বিকের ওপরে—

এদের কারো—হুয়ার অ্যাবাউটস জানেন?

মাথা ঝাঁকালেন গীতাদেবী। অস্ফুটস্বরে বললেন—কি করে সম্ভব?

কিন্তু আবার কেন যেন কার্ডগুলো আনমনে ঘাঁটতে ঘাঁটতে বললেন তবে জানতে

খুবই আগ্রহ হয়—এরা কে কোথায় আছে—কে কি করছে। একটু থেমে আবার ঝাপসা গলায় বললেন—কিন্তু কোন উপায় তো নেই—হঠাৎ থেমে গেলেন।

কিছুক্ষণ পর যেন একটা দারুণ জিনিস পেয়ে গিয়েছেন এমন করে বলে উঠলেন হ্যাঁ—পেয়েছি যা খুজছিলাম, একটা কার্ডের দিকে চোখ রেখেই বললেন কথাগুলো।

এই ছেলেটি আমার ক্লিনিকে এসেছিল বছর তিনেক আগে। হেরোইন অ্যাডিক্ট। একটু থেমে আবার বললেন কিন্তু গুণ ছিল অনেক—চমৎকার ইংরাজী বলতে পারে—দস্তুর মত সিনিয়র কেম্ব্রিজ পাশ। আমি পুরোপুরি ডি-অ্যাডিক্ট করিয়ে দিয়েছি—

এখন সে কোথায় ?

তা বলতে পারব না—ক্লিনিকের খাতায় তো বেনারসেরই ঠিকানা আছে—এদের তো কোন ঠিকঠিকানা থাকে না। মাথায় পোকা উঠল তো আবার নেশা করে কোথায় বেহুঁশ হয়ে পড়ে রইল—একটু থেমে বললেন, তবে শুনেছি ছেলেটি নাকি তার বাবার দোকানের কাজকর্ম দেখাশোনা করে—

দোকানটা কোথায় ?

হরিশ্চন্দ্রঘাটের গা দিয়ে যে বড় রাস্তাটা চলে গিয়েছে তার ওপরে একটাই হ্যান্ডলুমের কাপড়ের বিরাট দোকান, একটু থেমে আবার বললেন ডক্টর রায় বাবার দোকান হয়ত দেখবেন ক্যাশে বসে আছে ছেলেটি—তাকে আমার রেফারেন্স দেবেন—

সত্যিই তাঁতবস্ত্রের বিপুল সম্ভারে সাজানো বিশাল দোকান।

খরিদ্দারদের ভিড়ে গমগম করছে। আট দশজন কর্মচারি সমানে খাটছে। কেউ র‍্যাক থেকে কাপড়ের গাঁটরি নামাচ্ছে, কেউ বা শাড়িটা খুলে বহর মেপে দিচ্ছে। আর—

ক্যাশে বসে আছে এক যুবক ঠিক যেন পাথুরে মূর্তি। কেমন ভাবলেশহীন নির্বিকার মুখ ঘাড় পর্যন্ত কালো কোঁকড়ানো ময়লা চুলের রাশি। তার এখানে সেখানে জট ধরেছে। গালের হাড়দুটো ঠেলে উঠেছে গীতাদেবীর বর্ণনার সঙ্গে বেশ মিলে যায়—

পাঁচ

যুব সমাজ পাগলের মত ড্রাগের দিকে ছুটছে। কেন? বিশেষজ্ঞরা বলেন শতকরা ৭০ ভাগই দায়ী বাবা-মা এবং অভিভাবকরা—

বলাবাহুল্য এই ছেলেটিই সেই।

দীনেশ যাজ্ঞি।

যাজ্ঞির সঙ্গে আমার যোগাযোগের এই হল বৃত্তান্ত।

আমার উদ্দেশ্য শুনেই দীনেশের মুখখানা শক্ত হয়ে উঠল। তার চোয়াল দুটো খিলের মত এঁটে বসল দুই গালে।

আমার মনে দুলে উঠল অস্বস্তির ছায়া—সে কী রুষ্ট হল আমার কথায়? কিন্তু মুখে কিছু বলল না। রঙ বেরঙের তাঁতের শাড়ি আর ধুতিতে ঠাসা বড় বড় র‍্যাকের দিকে চোখ দুটো ছড়িয়ে দিয়ে আস্তে আস্তে বলল, কি আর বলব স্যার দিদি ডাক্তারনীজি আমার নতুন জন্ম দিয়েছেন। একটু থেমে আবার বলল, তিনি আপনাকে পাঠিয়েছেন—আপনাকে মদত দিতে হবেই—

দোকান ভর্তি ক্রেতাদের গুঞ্জন, টুকরো টুকরো কথা আর সেলসম্যানদের হাঁকডাক লক্ষ্য করে চাপা গলায় আমাকে বলল দীনেশ, সন্ধ্যার পর পিতাজী ক্যাশে এসে বসবেন, তখন আমার ছুটি—আপনি হরিশচন্দ্রজীর ঘাটের শ্মশানে চলিয়ে আসুন—একটু থেমে আবার অস্ফুটস্বরে বিড় বিড় করে বলল হুঁ! অ্যাডিক্টদের নিয়ে কেতাব লিখবেন—

বলাবাহুল্য দীনেশ যাজ্ঞি প্রথমে আমার সঙ্গে ভাল ব্যবহার করেনি। রীতি মত রূঢ় এবং কর্কশ ব্যবহারই করেছিল বলা যায়। পরে তার জীবনের অদ্ভুত বৃত্তান্ত শুনে মনে হয়েছিল তাকে দোষ দেওয়া যায় না। বহু কষ্টে তার মনটাকে একটু নরম করতে পেরেছিলাম। সে বুঝতে পেরেছিল—বেশ সচ্ছল ঘরের ছেলে হয়েও কেমন করে ড্রাগের জগতের অন্ধকারে পিছলে গিয়েছিল—শুনে আমার মন তার প্রতি সহানুভূতিতে ভরে উঠেছিল। তখন সে আমাকে যেমন জিল এবং জোসেফ বিশ্বপ্রাণের তেমনি বলেছিল ভেরোয়ার কোকেনখোর রবের মর্মান্তিক পরিণতির কথা, বলেছিল সুইজারল্যান্ডের রূপসী তরুণী সুর উদ্দাম উচ্ছৃঙ্খল জীবনের কথা, বলেছিল ইতালীর জাঙ্কি মেয়ে ক্যারোলের যৌনতাড়না এবং ড্রাগের চোরাকারবারের বিচিত্র কৌশল। তার অ্যাডিক্ট জীবনের ইতিহাস বলেছিল দিনের পর দিন একেবারে মন উজাড় করে।

সন্ধ্যার অন্ধকার ঘন হয়ে নেমেছিল হরিশচন্দ্রঘাটে। শ্মশানে চার পাঁচটি চিতা জ্বলছিল। চিতার লকলকে আগুনের উল্টো ছায়া গঙ্গার ঢেউয়ে ভেঙ্গে ভেঙ্গে দূরে

ছড়িয়ে পড়ছিল।

গঙ্গার বুকে চোখ দুটো ছড়িয়ে দিয়ে চুপ করে বসেছিল দীনেশ। আমাকে দেখেই রুক্ষ কর্কশকণ্ঠে বলল বসুন—তরল অন্ধকারে তার দু'চোখে যেন আগুন ঝিকিয়ে উঠল।

ড্রাগ অ্যাডিক্ট নিয়ে কেতাব লেখার মতলব হল কেন আপনার? একটু থেমে আবার বলল, আপনি কি মনে করেন কোন নেশাখোর আপনাকে খোলাখুলি কখনো বলবে—কেন তারা ড্রাগ খায়? হঠাৎ থেমে গেল দীনেশ। আমার মনে হল—তার কথাগুলোর ভেতরে বহুদিনের অনেক—অনেক জ্বালা ফুটে উঠল। ইম্পসিবল! কোন কিছু ঘোষণা করার মত করে বলল সে—এই সাবজেক্টে কখনো বই লিখতে পারবেন না আপনি—

কেন বলো তো?

বারুদের স্তুপে যেন জ্বলন্ত দিয়াশালাইয়ের কাঠি পড়ল। অন্ধকার গঙ্গার দিকে ঘুষি পাকিয়ে দ্রুত উত্তেজিত গলায় বলল—কোন অ্যাডিক্ট কি নিজেই জানে—জানে কেন তারা ড্রাগ খায় কোন্ দুঃখে, কোন্ হতাশা তাদের তাড়িয়ে নিয়ে আসে এই অন্ধকারের জগতে? থামল সে। নিজেকে সংযত করার চেষ্টা করল। শান্ত গলায় আবার বলল, আর জানলেও তারা আপনার কাছে কখনো মুখ খুলবে না—জেনে রাখবেন এরা অন্ধকার জগতের মানুষ—অন্ধকারের আড়ালেই নিজেকে লুকিয়ে রাখতে চায়—

কোন অ্যাডিক্টই যে বলবে না—আমি জানি—তোমার ডাক্তারনীজি গীতাদেবীও জানেন। আমি আস্তে আস্তে তাকে বললাম তাই তো তোমার কাছে এসেছি—একটু থেমে আবার বললাম ডক্টর গীতা রায়ের খুব আশা—তুমি অন্তত আমাকে হেল্প করবে—

মনে হল, একটু যেন বরফ গলল। অ্যাডিক্টদের সম্বন্ধে কি জানতে চান?

তোমার প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতা থেকে যা বলবে—তাতেই কাজ হবে। একটু থেমে আবার বললাম—তবে ড্রাগের জন্য নেশাগ্রস্ত মানুষের ট্র্যাজেডি—

ট্র্যাজেডি। যেন ক'কিয়ে চিৎকার করে হঠাৎ থেমে গেল যাজ্ঞি, কত শুনবেন—কয়জনের দুঃখ কষ্টের কথা শুনবেন—কত লিখবেন—

বলা দরকার এই সময় দীনেশ চিকাগোর মেয়ে জিল আর বোম্বাইয়ের জোসেফ দাতারের বৃত্তান্ত দিয়েই তার অভিজ্ঞতা বলতে শুরু করেছিল।

বাতাসে চিতার অস্ফুট গন্ধ। সামনে গঙ্গার কলোল্লাস। আবছায়া অন্ধকারে ঘেরা হরিশচন্দ্রঘাট।

জিলকে তার বাবা উড়ে এসে নিয়ে গিয়েছিল' সবে নিভে যাওয়া একটা চিতার রাশি রাশি আগুনের ফুলের মত অঙ্গারগুলোর দিকে স্থির চোখে তাকিয়ে বলল দীনেশ, ডাক্তারবদ্যি করে মেয়েকে সুস্থও করেছেন—এরকম কপাল—কিন্তু অ্যাডিক্টের

বড় একটা দেখা যায় না, থামল সে। হয়ত তার মনের অন্ধকারে গুড়ি মেরে বসে থাকা আরও অনেক—অনেক নেশাখোরদের ঝাপসা হয়ে যাওয়া মুখগুলো মনে করার চেষ্টা করতে করতে বলল—জোসেফ কে দেখুন—কোথায় যে হারিয়ে গেল—

এবার তোমার কথা বলো দীনেশ—অবশ্য যদি আপত্তি না থাকে—

কোন কথা বলল না দীনেশ।

তার উঁচু হয়ে ওঠা গালের হাড়ে গাড়িবারান্দার মত মুখে যন্ত্রণার চিহ্ন ফুটে উঠল। ঝাপসা গলায় বলল আমার কথা কি বলব বলুন আমি নিজেই জানি না বুঝতে পারি না—কেন এরকম হল? থামল দীনেশ। আবার কিছুক্ষণ নিজের মনের ভেতরে ডুবে থেকে আস্তে আস্তে বলল, কোন পতন—কি কোন সর্বনাশের কারণ কি কখনো বুঝতে পারা যায়। অনেক সময় চেষ্টা করলেও কোন হেতুই খুঁজে পাওয়া যায় না—দূরে ওপারের অন্ধকার দিগন্তে রামনগরের আলোগুলোর দিকে তাকিয়ে চুপ করে বসে রইল সে।

সেই সন্ধ্যায় দীনেশের কথার ভেতরে প্রচুর বাড়তি ভাবাবেগ এবং উচ্ছ্বাস ছিল। সেসব বাদ দিয়ে এখানে সংক্ষেপে বলা হল তার কথা—

দশাশ্বমেধঘাটের কাছে তাঁতের কাপড়ের দোকানটা হল দীনেশের বাবা—সুরেশ যাজ্ঞির সাইড বিজনেস। তিনি ছিলেন প্রতিরক্ষা বা ডিফেন্স ডিপার্টমেন্টের কমিশনড র‍্যাঙ্কের অফিসার। মস্ত চাকরি। ফ্রি কোয়ার্টার। গাড়ি। কখনো দিল্লী—কখনো মীরাট কখনো আজমীর এবং আরো অনেক জায়গায় ঘুরে ঘুরে চাকরি করেছেন।

বদলির চাকরি। সুরেশ তার দুই ছেলেকে ভর্তি করে দিয়েছিলেন দিল্লীর এক মিশনারী স্কুলে। স্কুলের হোস্টেলে থাকত। হোস্টেলে তাদের সঙ্গে যারা থাকত তারা সব দিল্লীর বেশ খানদানী পয়সাওয়ালা ঘরের ছেলে। পড়াশুনা তারা খুব কমই করত যেটুকু না করলে নয়। দিনরাত আড্ডা আর হৈ-হুল্লোড় আর লুকিয়ে লুকিয়ে সিনেমা দেখা।

প্রথম নেশা করার দিনটার কথা এখনও মনে আছে দীনেশের। সেদিন রাত্রে সুপারিন্টেডেন্ট সাহেব রাউন্ড দিয়ে তাঁর ঘরে চলে যেতেই দারোয়ানকে ঘুস দিয়ে তারা চারজন বেরিয়ে পড়েছিল। তাদের পালের গোদা হল—এক একটা ক্লাসে তিন-বার করে ফেল করা ছেলে—ট্যান্ডন। ট্যান্ডন তাদের নিয়ে গেল নাইট শোতে।

এখনকার ব্লু ফিল্মের মত। সেক্সের ছড়াছড়ি। তখন মেয়ে পুরুষের দৈহিক ব্যাপারটা সম্বন্ধে স্পষ্ট কোন ধারণা হয়নি। তবে চেতনার ভেতরে ছায়াবাজির খেলার মত কতগুলো রোমাঞ্চকর অনুভূতি জেগে উঠল।

সিনেমার পর হোস্টেলে ফিরতে ফিরতে ট্যান্ডন পকেট থেকে সিগারেট বের করে বলল—নে—খা—ধর—

না—ভাই সিগারেট খাব না—

ওরে আমার ধর্মোপুত্তুর রে—বলে খেঁকিয়ে হাসতে হাসতে দীনেশের মুখে সিগারেট গুঁজে দিল। নিজেই খস করে লাইটার জ্বালিয়ে সিগারেট ধরিয়ে দিল।

আর সবাই তখন নাক মুখ দিয়ে ভর ভর করে ইঞ্জিনের মত ধোঁয়া ছাড়ছে। বাধ্য হয়ে সিগারেটে টান দিতেই হল। মুখটা কেমন তেতো বিস্বাদ হয়ে গেল। খক খক করে কাশতে লাগলাম। একটু পরেই সব ঠিক হয়ে গেল। মনের ভেতরে বেশ আমেজ ছড়িয়ে পড়ল।

সেই শুরু।

তখন দীনেশ ক্লাস সিক্সে পড়ে। সপ্তাহ খানেক পরেই প্যাকেট প্যাকেট সিগারেট খেতে লাগল। ঠোঁটে জ্বলন্ত সিগারেট ঝুলিয়ে আয়নায় নিজের মুখ দেখলে নিজেকে বেশ বড় বড় মনে হয়। মনে হয় গ্রোন আপ হয়ে উঠেছে।

অধঃপাতের গতি হল জলের নিম্নগতির মত। যত এগোয় তত তার বেগ বেড়ে যায়। তীব্র হয় গতি। ট্যাণ্ডনের সঙ্গে সে একদিন এল হোস্টেলের কাছেই একটা চায়ের দোকানে। এক কোণে বসে ট্যাণ্ডন পকেট থেকে একটা প্যাকেট বের করল। সেটা খুলে শুকনো শুকনো আর একটু সবজেটে পাতা হাতের তালুতে নিয়ে বেশ ডলে ডলে লম্বা আর সরু কলকেতে পুরে আগুন ধরিয়ে দিল। জোরে জোরে কয়েকটা টান মেরে নাক দিয়ে ধোঁয়া ছাড়তে ছাড়তে কলকেটা তার হাতে দিয়ে বলল—নে—টান—জোরে জোরে টানবি—দেখবি কী মজা—

না—আমি খাব না—জিনিসটা কী?

আরে ইয়ার—মেলা ফ্যাচ ফ্যাচ করিস কেন? ট্যাণ্ডন গর্জন করে বলে—নে টান দে না—

কলকেতে মুখ চেপে ধরে টান লাগাল দীনেশ। মাথাটা ঝিম ঝিম করে উঠল। মনে হল চায়ের দোকানটা, সামনের রাস্তাটা, তার ধারের সারি সারি বাড়িগুলো সব-সব যেন দুলছে। তার মাথার ভেতরে সব-সব তাল গোল পাকিয়ে যাচ্ছে।

নে—আর টানিস না—প্রথমদিন স্পষ্ট মনে আছে এই কথাগুলো বোধহয় বলেছিল ট্যাণ্ডন। কলকেটা হাত থেকে নিয়েও গিয়েছিল। কিন্তু নিলে কী হবে? তখন ড্রাগের এফেক্ট শুরু হয়ে গিয়েছে।

তার মনে হয়েছিল—মাটির এই পৃথিবী থেকে সে যেন ধীরে ধীরে অনেক-অনেক ওপরে একটা অজানা জগতের দিকে চলেছে। সেখানে রামধনুর মত রঙবেরঙের আলোর ছটা—তারপরে কি হয়েছিল—কেমন করে হোস্টেলে ফিরে এসেছিল এসব আর এখন মনে নেই দীনেশের।

গাঁজা বা হ্যাস খেতে শিখল দীনেশ। আর তার ভেতরে কেমন ওলটপালট হয়ে গেল। পড়াশুনায় মন বসে না। লাস্ট বেঞ্চে বসে ঝিমোয়। শুধু মনে হয়—মনে হয় কতক্ষণে ক্লাস থেকে বেরিয়ে একটা জয়েণ্ট (এক ছিলিম গাঁজা) চড়াবে।

দেখতে দেখতে কয়েকটা বছর পেরিয়ে যায়। সিনিয়র কেমব্রিজের ফাইনাল পরীক্ষার সময় এগিয়ে আসে। দীনেশ ততদিনে আরও পোক্ত হয়ে উঠেছে। হ্যাসের ডোজ বেড়েছে দিনে অন্তত কম করে চারবার চারটে জয়েণ্ট না নিলে শরীরের ভেতরটা কেমন অস্থির লাগে।

ইতিমধ্যে একদিন যে চায়ের দোকানে বসে তারা গাঁজা টানত সেই দোকানদার কথায় কথায় বলল—দুনিয়াতে যদি কোন জায়গা থাকে তো—সে হচ্ছে—নেপাল —সেখানে মাঠে মাঠে বুনো ঘাসের মতই গাঁজার গাছ জন্মায়। যার যত খুশি তুলে নাও—খাও—

সেদিন থেকেই—দীনেশের মনে বাসা বাঁধল একটা বাসনা—নেপাল যেতে হবে—সেখানে ১ তোলা বা ১০ গ্রাম গাঁজার দাম মাত্র তিন টাকা—সেই গাঁজাই এই দিল্লীতে, মীরাটে ১ তোলা বিশ টাকা।

দীনেশের ডোজ বেড়েছে। বাবা যে কয়টি টাকা পাঠায় তা থেকে হোস্টেলের খরচ খরচা দিয়ে হ্যাস কিনতে পারে না। অতএব বাধ্য হয়েই কোনদিন কিছু বই বা কলম টুকটাক বিক্রি করতে থাকে। একদিন তার বাবার দেওয়া অটোমেটিক হাত-ঘড়িটাই জলের দামে দিল বিক্রি করে।

এসব যে করছে তারজন্য এতটুকু লজ্জা বা সঙ্কোচ হল না। বিবেকের কামড়ের যন্ত্রণা তো নয়ই।

এগুলো কেন হয় জানেন? এসব হল হ্যাসের ইনফ্লুয়েন্স। গাঁজা খেলে আত্ম-সম্মান বোধ থেকে শুরু করে বুদ্ধি বিবেচনা বিবেক সব-সব কোথায় তলিয়ে যায়।

এখানে বলা দরকার দীনেশের বাবা সুরেশ যাজ্ঞির দুই ছেলে। বড়ছেলে মহেশ পড়াশুনায় ভাল। লেখাপড়া শেষ করে মিলিটারিতে ট্রেনিংএ আছে। মেজ দীনেশ। তারপরে এক মেয়ে। ছোট পরিবার—সুখী পরিবার।

সুরেশবাবুর পোস্টিং মীরাটে। দিনরাত অফিসের কাজ নিয়ে ব্যস্ত। স্ত্রী মীরাদেবী সমাজ সেবার কাজে ডুবে থাকেন। মীরাটের মহিলাদের ভেতরে নেতৃস্থানীয়। ছেলেমেয়েদের দিকে মনযোগ দেওয়ার সময় তাদের কারো-ই নেই। আর—

দরকারটাই বা কি? বড়টা দাঁড়িয়ে গেছে। মেয়ের জন্য গভর্নেস আছে, আয়া আছে। তারা মায়ের চেয়েও বেশি যত্ন করে। আর মেজছেলে দিল্লীর সবচেয়ে নাম করা মিশনারী স্কুলে পড়ছে। স্কুলের দারুণ নামডাক আছে। অতএব—চিন্তাটা কিসের। ছেলেমেয়েদের মানুষ করার জন্য তারা তো যথেষ্ঠই করছেন—আত্মতৃপ্তির একটা সৌধের ভেতরে বাস করেন তারা।

তবুও—তবুও দীর্ঘ আটবছরের ভেতরে বোধহয় বার দুয়েক সুরেশ যাজ্ঞি ছেলের স্কুলে এসেছিল। আসতে হয়েছিল বাধ্য হয়ে। প্রিন্সিপাল সাহেব তাঁকে চিঠি দিয়েছিলেন দীনেশের লেখাপড়ায় মন নেই—প্রতিটি টিউটোরিয়ালের পরীক্ষায় রেজাল্ট খারাপ করছে—

এসেছিলেন সুরেশবাবু। দুইবারই এসেছিলেন। প্রিন্সিপাল সাহেবের ঘরে যথারীতি তার ডাকও পড়েছিল। একদিকে তার বাবা আর একদিকে প্রিন্সিপাল—দুজন দুদিকে দাঁড়িয়ে প্রচণ্ড বকাবকি করলেন। প্রিন্সিপাল সাহেব এগিয়ে গেলেন আরও এক ধাপ—চার-পাঁচ ঘা বেতের বাড়ি দিলেন হাতে।

ব্যস হয়ে গেল। তাঁদের কথাগুলো দীনেশের এক কান দিয়ে ঢুকল আর এক

কান দিয়ে বেরিয়ে গেল—থেমে গেল দীনেশ। তাকে অবসন্ন আর ক্লান্ত বলে মনে হল।

জানেন স্যার—ইয়ং ছেলেমেয়েরা যে ড্রাগ অ্যাডিক্ট হয় বেশ খানিকটা জ্বালা মিশিয়ে বলে উঠল দীনেশ তারজন্য অন্তত সত্তর ভাগ দায়ী হল মা-বাবা বা অভিভাবকরা—

কেন বলো তো ?

দেখবেন ডাক্তারবাবুরা রোগী পরীক্ষা করে তার সিমটম দেখে এক এক রোগের এক এক রকম ওষুধ দেন, একটু থামল দীনেশ। আবার তাচ্ছিল্যের একটা চাপা হাসি ঝিকমিক করতে লাগল তার মুখে। মৃদুকণ্ঠে বলল ছেলেমেয়েদের শাসন করার দাওয়াই কিন্তু একটাই—বকাবকি বা তর্জন-গর্জন—কখনো সখনো—দু'এক ঘা বেতের বাড়ি থেমে গেল দীনেশ।

তিনচারটি চিতার রাঙ্গা আলোয় দীর্ঘছায়া ফেলে মাথায় পাগড়ি বাঁধা চণ্ডাল লম্বা বাঁশ দিয়ে পুড়ে পুড়ে একটা রবারের পুতুলের মত হয়ে যাওয়া মড়াটা খোঁচাচ্ছে। সেদিকে তাকিয়ে আস্তে আস্তে বলল দীনেশ এখনকার মা-বাবারা বড় বেশি ব্যস্ত। ছেলেমেয়েদের দিকে তাকানোর সময় নেই তাদের—দ্রুত উত্তেজিত কণ্ঠে বলতে লাগল—কেন লেখাপড়ায় মন নেই, কেন বদখেয়ালে মেতে আছে, কাদের সঙ্গে মেলামেশা করছে সে—এসব খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে দেখার সময় নেই তাঁদের—ইচ্ছাও নেই। চুপ করে গেল দীনেশ। দুই হাঁটুর ভেতরে মাথাটা ঝুলিয়ে দিয়ে চুপ করে বসে রইল।

জানেন আমার বাবা মা, দুজনেই আসতেন। আবার দূরে অন্ধকার গঙ্গার দিকে চোখদুটো ছড়িয়ে দিয়ে বলল সে—স্কুলের বার্ষিক উৎসবে প্রিন্সিপাল সাহেব তাদের নেমন্তন্ন করতেন। কেন যেন, হঠাৎ থেমে গেল। আর তার চোখের কোণায় কোণায় ঝিকিয়ে উঠল আগুন। তার ভেতরের কোন কঠিন যন্ত্রণা সহ্য করতে করতে বলল তাঁরা এসেই ভি. আই. পি—মিনিস্টার সেক্রেটারি হোমরা চোমরাদের সঙ্গে গা ঘেসা ঘেসি করতে ব্যস্ত হয়ে উঠতেন। তারই ফাঁকে আমার দিকে তাকিয়ে ভ্রূদুটো নাচিয়ে বলতেন—কি রে ভাল আছিস তো, পড়াশুনা করছিস তো ? কথাগুলো আমার দিকে ছুড়ে দিয়েই তাঁরা ছেলের প্রতি তাঁদের কর্তব্য শেষ করতেন—থামল দীনেশ। সারি সারি চিতার লকলকে আগুনের আভা তার চোখে মুখে আগুনের জ্বালার মত জ্বলতে লাগল। বিষাক্ত কণ্ঠে বলল—জানেন মা কি বাবা—দুজনের একজনও লক্ষ্যই করলেন না—কেন আমার চোখদুটো ঢুলু ঢুলু—কেন আমার চোখের মণি দুটো ছোট হয়ে এসেছে। কথা বলছি জড়িয়ে জড়িয়ে—থামল দীনেশ। বুক উজাড় করে একটা দীর্ঘশ্বাস ফেলে আবার আস্তে আস্তে বলল, শুনেছি মেয়েদের চোখের নজর নাকি খুব তীক্ষ্ন হয়—আমার মা পার্টিতে এসে ভি আই পি এবং হোমরা চোমড়া মহিলাদের নিয়ে এমন ব্যস্ত হয়ে রইলেন যে লক্ষ্যও করলেন না দিল্লীর দারুণ গরমেও কেন লম্বা হাত জামা পরে আছি—একটু থেমে আবার বলল সারা হাতে ইনজেকশানের সুঁচের অসংখ্য দাগগুলোকে ঢাকার জন্যই তা মা কল্পনাই করতে পারেন না—

সেদিন প্রহরে প্রহরে রাত বেড়েছিল। দীনেশ তার নেশাগ্রস্ত জীবনের এমন অনেক—অনেক ঘটনা বলেছিল। সেগুলো যেমন বিচিত্র তেমনি রোমাঞ্চকরও। আবার এক একটা বৃত্তান্ত তো রীতিমত অবিশ্বাস্য, শরীর শিউরে ওঠে। আর বলা দরকার তার বিবরণের ভেতরে এমন একটা অন্ধকার অজানা জগতের ছবি পরিস্ফুট হয়ে উঠেছিল যেখানে নিঃশব্দে সকলের অলক্ষ্যে চলছে খুন জখম আত্মহত্যা আর অবাধ যৌনব্যভিচার। বলাবাহুল্য সেই জগত—

ড্রাগের জগৎ—ড্রাগ ওয়ার্ল্ড!

দীনেশের মা বাবার উদাসীনতার প্রসঙ্গেই মনে পড়ছে বিখ্যাত ইংরেজ ড্রাগ বিশেষজ্ঞ মার্টিন প্যান্টের (Martin Pant) সেই বিখ্যাত উক্তি—Whatever the reasons tensions and stresses are increasing throughout the World. The impatient younger generation in a big way rushed towards the drugs as they can see no Solutions to their problems···Drugs give them a false sense of peace. অর্থাৎ সারা পৃথিবীতে যে কোন কারণেই হোক মানসিক চাপ এবং জীবনের বিবিধ ক্ষেত্রে অস্বাভাবিক পীড়ন এবং জোরজবরদস্তি বেড়েই চলেছে। অস্থির যুবসমাজ পাগলের মত মাদকদ্রব্যের দিকে ছুটে চলেছে—ড্রাগে আসক্ত হচ্ছে কারণ তারা তাদের জীবনের সমস্যার আর কোন সমাধানের পথ খুঁজে পাচ্ছে না। মাদকীয় ওষুধ তাদের একটা মিথ্যা শান্তির আবেশে আচ্ছন্ন রাখে।

তাই প্যান্ট সাহেব আধুনিককালের মা বাবা এবং অভিভাবকদের কাছে আবেদন জানিয়ে বলেছেন—ছেলেমেয়েদের শুধু শাসন করলেই হবে না তাদের স্বভাব চরিত্র জানলেই হবে না—নিচের তথ্যগুলো মাথায় রেখে তাদের স্বাস্থ্যের দিকে কড়া নজর রাখতে হবে—

(১) ড্রাগের নেশায় আসক্ত হলে তাদের নড়াচড়া অন্যদের চেয়ে শিথিল হবে।

(২) নেশাখোরের গায়ে চুলকোনি হবে—বিশেষ করে নাকের দুপাশে।

(৩) হাড় জিরজিরে কঙ্কালসার চেহারা হবে।

(৪) যৌন দুর্বলতা দেখা দেবে—এব্যাপারটা অভিভাবকদের পক্ষে ধরা কঠিন। মেয়েদের ঋতুঘটিত গোলমাল দেখা যাবে?

(৫) হেরোইন ছাড়া অন্য ড্রাগ যেমন গাঁজা, মারিজুয়ানা, মরফিন ইত্যাদি খেলে তার চোখের মণিটি প্রসারিত হয়ে যাবে—

আর সারা পৃথিবীতে যে ড্রাগটি সবচাইতে বিধ্বংসী এবং নেশাখোরদের দুর্বার আকর্ষণ—সেই হেরোইনের অ্যাডিক্টদের সিমটম বা লক্ষণগুলো (নিচে বলা হল) জানিয়ে দিয়ে সতর্ক করে দিয়েছেন—ড্রাগবিশেষজ্ঞ স্ট্যানলি আইনস্টাইন—

(ক) চর্মরোগ অনিবার্য।

(খ) হাত পা ফুলে ফুলে যাওয়া।

(গ) চামড়ার রোমকূপের রন্ধ্রে রন্ধ্রে পুঁজ জমে যাওয়া।

(ঘ) স্ট্যাফি লোক্যাল (Staphy Loccal) নামে একরকমের চামড়ার রোগ।

(ঙ) রক্তদুষ্টি এবং ম্যালেরিয়া ও ধনুষ্টঙ্কার হলেও তার আত্মীয়পরিজনের বিচলিত ও বিস্মিত হওয়ার কিছু নেই।

কিন্তু কখন এসব রোগে আক্রান্ত হয়ে থাকে নেশাগ্রস্ত মানুষটি তাও বিশদ বলেছেন আইনস্টাইন সাহেব—যখন নোংরা এবং অপরিশুদ্ধ (unsterilised) সূঁচ এবং সিরিঞ্জ ব্যবহার করা হয় এবং রাস্তার কলের জল কিম্বা সাধারণের জন্য প্রস্রাবাগারের জল ফুটিয়ে হেরোইন গরম করা হয়ে থাকে তার যখন বোতলের নোংরা মুখ বা ক্যাপে হেরোইনের মিকশ্চার রাখা হয় ও অপরিষ্কার তুলো ব্যবহার করলেই এসব রোগ হয়ে থাকে।

(চ) যেসব নেশাখোর হেরোইন এবং অন্যান্য ড্রাগ ইনজেকশান করে দেহের ভেতরে পুস করে এবং যারা বিশেষ করে রাস্তায় বাস্তায় ঘোরা মাদকসেবী অর্থাৎ জাঙ্কিরা প্রায়ই ভয়াবহ যৌন রোগে আক্রান্ত হয়ে থাকে। অধিকাংশ ক্ষেত্রেই অ্যাডিক্টের বা রমন সুখের সাঙ্গনী (Sexual partner) যৌনব্যাধিটি তাকে অতিরিক্ত বোনাস বা লভ্যাংশ স্বরূপ দিয়ে থাকে। আর তার নেশা করার সহচব বা বন্ধুটি যিনি আনস্টে-রিলাইজড সূঁচটা এবং সিরিঞ্জ ব্যবহার করছেন —তিনি যৌনরোগটিকে বেশ ভাল করেই জমিয়ে তোলেন।

(ছ) যারা দীর্ঘকাল ধরে মাদকে আসক্ত, যাদের শরীর হয়ে গিয়েছে দুর্বল, ওজন গিয়েছে কমে, অপুষ্টি যাদের নিত্যসঙ্গী তাদের সামান্য ঠাণ্ডা লাগলেই নিউমোনিয়ায় আক্রান্ত হয়ে যায়। ক্ষয়রোগ এবং শ্বাসকষ্টজনিত হাঁফানি ও বিভিন্ন ঋতুতে ঋতুতে নানাবিধ ব্যাধিতে তারা জর্জরিত হয়ে জীবন কাটায়।

হেরোইন এবং অন্যান্য ড্রাগে আসক্তদের কতগুলো লক্ষণ বাইরে থেকে ধরা যায়। মা বাবা এবং অভিভাবকরা একটু নজর দিলেই ধরতে পারবেন যেমন ইনজেকশানের দাগ লুকোবার জন্য লম্বা হাতার সার্ট, চোখ ছোট হয়ে যাওয়া, মণি লুকোনোর জন্য রঙীন চশমা পরা, অত্যধিক মিষ্টি খাওয়ার অভিলাষ, পুষ্টিহীন দুর্বল এবং ভেঙ্গে পড়া চেহারা।

তখুনি সতর্ক হতে হবে আপনাকে যখন দেখবেন আপনার ছেলে বা মেয়েটি একা একা আপন মনে থাকতে ভালবাসছে—কেননা নেশাগ্রস্তরা নিজের কল্পনার রঙীন জগতে বাস করতে পছন্দ করে। আপনাকে অত্যন্ত সাবধান হতে হবে তখন যখন দেখবেন আপনার ছেলে বা মেয়ে বাথরুমে অস্বাভাবিক দীর্ঘ সময় কাটাচ্ছে। সাধারণত হেরোইনের শিকারর বাথরুমে বসেই সকালের এবং সন্ধ্যার দুটো ফিকস ডোজ তৈর করে নেশাটাও এখানেই সেরে নেয়।

নেশাখোরদের স্বাস্থ্য এবং তাদের চলাফেরার বাহ্যিক লক্ষণেরই প্রসঙ্গে বলা দরকার—

দীনেশেরই জীবনের একটা ঘটনা—

সিনিয়র কেমব্রিজ পরীক্ষায় ফেল করে লেখাপড়ার পাট চুকিয়ে দিয়ে বেনারসে তাদের বাড়িতে চলে এসেছিল দীনেশ। শান্ত সুবোধ বালকের মত বাবার হ্যাণ্ডলুমের দোকানে বসেছিল। কিন্তু সে তখন পাকা গাঁজাখোর। সকাল সন্ধ্যা শুধু দিনে দুইবার নয় আরও অন্তত বার চারেক হ্যাসের জয়েন্ট বা ছিলিম না চড়ালেই নয়।

এতবার করে নেশা করলে বার বার দোকান ফেলে রেখে যায় কি করে? তাই দোকানে তার চেম্বারে বসেই গাঁজা টানত। চেম্বারের বাতাসে হ্যাসের উগ্র ঝাঁঝাল গন্ধ ভেসে বেড়াত।

দীনেশের টেবিলে অ্যাসট্রের আশেপাশে রাজ্যের টুকরো টুকরো শুকনো পাতার কুচি পড়ে থাকত। তার বাবা সুবোধবাবু আসতেন—অদ্ভুত সেই গন্ধটা পেতেন। তাঁর সন্দেহ হত দীনেশ সিগারেট ছাড়া অন্য কিছুর নেশা করে। কিন্তু—

জিনিসটা কি তা তিনি জানতেন না—My father was completely ignorant about drugs.

ছয়

ড্রাগ কখনো নেশাখোরকে এক জায়গায় স্থির থাকতে দেয় না।! নেশার তাড়নায় দীনেশ ঘর ছেড়েছিল—

একবার ড্রাগের প্যাঁচে পড়ে গেলে আর কিছুতেই সুস্থ জীবনে ফিরে আসা যায় না স্যার, মাথা নিচু করে আস্তে আস্তে বলেছিল দীনেশ, কিন্তু ওই সর্বনাশা ড্রাগ—ওই নেশা যে আমাকে কোন নরকে নিয়ে গিয়েছিল—

দীনেশের বাবা-মা, দুজনে যথেষ্টই ভালবাসতেন তাকে। বিশ্বাসও করতেন। তাই তাদের হ্যান্ডলুমের দোকানের ক্যাশে বসিয়েছিলেন। কিন্তু তাঁদের বিশ্বাসের মর্যাদা দিতে পারল না দীনেশ।

আর কি করেই বা পারবে? দিনে দিনে তার হ্যাসের ডোজ বেড়েছে। আর কাশী হল সাধুসন্ন্যাসীদের জায়গা। এখানে গাঁজার চাহিদা বেশি। তাই দাম বেশি। আর কাঁহাতক দোকানের ক্যাশ থেকে পয়সা সরিয়ে সরিয়ে হ্যাস কেনা যায়। ক্যাশ বইটাকে মিলিয়ে রাখাও একটা কঠিন ঝামেলা। প্রায়ই তার মনে হত—তার দম বুঝি বন্ধ হয়ে আসছে—

আরে সস্তায় গাঁজা টানতে হলে চলে যাও নেপাল—সেখানে মাঠে মাঠে বুনো ঘাসের মতই অঢেল গাঁজাগাছ···দিল্লীতে তাদের স্কুলের কাছে চায়ের দোকানে যে হ্যাস বিক্রি করতে আসত সেই বুড়ো নেপালি পেডলারের কথাগুলো তার কানে বাজত।

সেই থেকে—সেই স্কুলের দিনগুলো থেকেই একটা বাসনা তার মনটাকে কুরে কুরে খেয়ে ফেলত—যেমন করে হোক নেপাল যেতেই হবে। সেখানে মাঠে মাঠে অঢেল গাঁজা—

কাশীতে এই কাপড়ের দোকান আগলে বসে থাকা, রাত্রে ক্যাশ মেলানো—বিস্বাদ বিবর্ণ এই জীবনের ওপরে যত বেশি বিরক্ত হয়ে উঠেছিল ততই বেশি করে তার বুকের ভেতরে দাপাদাপি করছিল নেপাল যাওয়ার স্বপ্নটা।

একদিন সুযোগ এসে গেল। মিসেস যাজ্ঞি ছেলেকে পাঁচ হাজার টাকার চেক ভাঙাতে দিলেন। ব্যাঙ্ক থেকে চেক ভাঙিয়ে সোজা স্টেশনে এসে ট্রেনে চেপে বসল দীনেশ।

তখন তাকে চেনার কোন উপায়ই নেই। ঘাড় পর্যন্ত ঝোলা বড় বড় কালো চুলের গোছা। হঠাৎ দেখলে মনে হয়—একটা হিপি।

দুশোটাকা দিয়ে একটা পরচুলা বা হুইগ কিনে নিয়েছিল দীনেশ। বাবা চারিদিকে লোক পাঠাবেন। মা থানা পুলিশ করে হুলস্থুল করবেন, তাই এই ছদ্মবেশের আড়াল।

এই নকল চুল বা হুইগ বেশ অদ্ভুত জিনিস। এটা দিয়ে যে মানুষকে এত ধোঁকা দেওয়া যায় জানত না দীনেশ।

রেল চলছে হু হু করে। সবে রাত শেষ হয়ে ভোর হয়েছে। দীনেশ টয়লেটে গেল। যেই ফিরে এল তার বার্থে—সঙ্গে সঙ্গে তার সামনের বার্থের বৃদ্ধ দম্পতি কেন যেন উঠে দাঁড়ালেন। বুড়োর শুকনো মুখখানা ভয়ে ছাইয়ের মত সাদা। বুড়ি তার দিকে চোখ বড় বড় করে তাকিয়ে থর থর করে কাঁপতে লাগল।

দীনেশ ভ্যাবাচাকা খেয়ে দাঁড়িয়ে গেল। বুড়ো বিড়বিড় করে কি যেন বলতে চেষ্টা করল। বুড়ি তাড়াতাড়ি বেডিং গুছিয়ে নিয়ে পাশের কোন কামরায় চলে গেল। বৃদ্ধও কাঁপতে কাঁপতে স্ত্রীকে অনুসরণ করল।

তখন দীনেশের সম্বিৎ ফিরে এল। মাথায় হাত দিয়ে দেখল—মাথাটা খালি। রাত্রে পরচুলাটা খুলে সেই যে মাথার নিচে রেখে দিয়েছিল আর পরতে মনে নেই!

বুড়োবুড়ির মনে হয়েছিল সন্ধ্যারাত্রে যে মানুষের মাথায় এত লম্বা লম্বা চুল ছিল—এক রাত্রের ভেতরে তার মাথাটা ফরসা হয়ে গেল কি করে? লোকটা নিশ্চয়ই জীন!

সমস্ত ব্যাপারটা আঁচ করতে পেরে রেলের সেই নির্জন কামরায় বসে হো হো করে হেসেছিল দীনেশ। কিন্তু সে জানত না—কল্পনাও করতে পারেনি, নকল চুল পরে নিজের ভোল পালটানোর সঙ্গে সঙ্গে তার ভেতরের মানুষটাও, তার সত্বাটাও আমূল বদলে যাবে! সেই যারা, কে জানে কিসের তাড়নায় পথেঘাটে ক্ষ্যাপার মত ঘুরে ঘুরে বেড়ায়—সেই লম্বা লম্বা চুলওয়ালা নেশাখোর হিপিদের সঙ্গেই কখনো খোলা আকাশের নিচে, কখনো পোড়া বিড়ির টুকরো ছড়ানো নোংরা মেঝেতে তাকে থাকতে হবে অনেক—অনেকগুলো বছর। কিন্তু এখন থাক সে সব কথা।

না। দীনেশকে কেউ চিনতে পারল না। কেউ তার পিছু নিল না। লক্ষ্ণৌ হয়ে সে নির্বিঘ্নে পেঁৗছে গেল গোরক্ষপুরে। তখন রাত্রি এক-টা। সারা গোরক্ষপুরের গায়ে তখন থকথকে কাদার মত ঘুম লেগে রয়েছে।

খোঁজ খবর নিয়ে জানতে পারল এখান থেকে বাসে বা ট্যাক্সিতে যেতে হবে ভারত নেপাল সীমান্তের চেকপোস্ট ভৈরোয়াতে। ভৈরোয়া থেকে বিমানে মাত্র আধঘণ্টা উড়লেই হিমালয়ের কোলে সেই রূপকথার রহস্যময় দেশ নেপালের রাজধানী শহর—
কাঠমাণ্ডু।

দীনেশের বুকের ভেতরে হঠাৎ যেন ভূমিকম্প হতে শুরু করল। হ্যাসের দেশ—যেখানে অপর্যাপ্ত গাঁজায় আইনের কোন খবরদারি নেই সেই নেপালের এত কাছে সে। কিন্তু যেতে পারবে না। তার হাত দুটো নিসপিস করতে লাগল।

দ্রুত পায়ে ট্যাক্সি স্ট্যাণ্ডে এল সে। সারি সারি গাড়ি এক একটা জন্তুর মত ঘাপটি মেরে দাঁড়িয়ে রয়েছে। ড্রাইভাররা যে যার গাড়ির সিটে ঘুমিয়ে কাদা হয়ে রয়েছে। অনেক কাকুতি মিনতি করল। বেশি টাকার লোভ দেখাল তারা কেউ যেতে

চায় না। হতাশ হয়ে দাঁড়িয়ে রইল দীনেশ।

আমি কি তোমাকে কোন সাহায্য করতে পারি ?

লম্বা সাপের মত হিলহিলে চেহারার এক সাহেব তার সামনে এসে দাঁড়াল। দীনেশের মনে হল 'জাঙ্কি'! তাকে সমস্যাটা বলতেই সাহেব হাত পাতল আমার টিপস ?

ডোণ্ট ওরি—কোন চিন্তা করো না ব্রাদার দীনেশ বলল তুমি ট্যাক্সি ঠিক করে দাও—তোমাকে খুশি করে দেব—

সাদা চামড়ার মাহাত্মই আলাদা। সাহেব গিয়ে বলতেই এক ট্যাক্সিওয়ালা সেই রাত্রেই ভৈরোয়াঁ যেতে রাজি হয়ে গেল। তবে ভাড়া একটু বেশি—দুশো পঞ্চাশ টাকা। আর টাকার জন্য দীনেশের চিন্তা কি, তার পকেটে প্রচুর টাকা তখন গজ গজ করছে।

ধীরে সুস্থে বেশ আমেরিচালে দীনেশ গাড়িতে উঠে বসল। কালো ঘুটঘুটে অন্ধকারে দীনেশের মনে হল সাহেবের চোখ দুটো জ্বল জ্বল করছে। কি দেখছে—কি লক্ষ্য করছে তার ভেতরে!

শোন—হ্যাস নেবে সাহেব—ফ্রেস হ্যাস—

ধুর—ওসব তো বাচ্চাদের ড্রাগ—

তাহলে কি পেলে তুমি খুশি হও—খোলাখুলি বলে ফেল না—তুমি কিছু টাকা দিয়ে যাও। আমি আমার ড্রাগ কিনব—

কি তোমার ড্রাগ ?

তার কথা যেন শুনতে পেল না সাহেব। কেমন করুণ সতৃষ্ণ চোখে গাড়িটার দিকে একবার চোখ বুলিয়ে বলল—তুমি তো ভৈরোয়াঁ যাচ্ছ—তুমি সেখানকার খবর জান ?

না—তো—আমি তো এইমাত্র ট্রেন থেকে নামলাম—

হঠাৎ একটা কাণ্ড করে বসল সেই সাহেব। কেমন উদভ্রান্তের মত একবার দীনেশের আর একবার ঘন অন্ধকারে মোড়া ভৈরোয়াঁর দূরে বিসর্পিল রাস্তাটার দিকে তাকিয়েই হুড়মুড় করে উঠে পড়ল গাড়িতে। দীনেশের পাশে বসেই হুকুম দিল ড্রাইভার—চালাও গাড়ি—

ব্যাপার কি বলুন তো ? ড্রাগ কেনার টাকা নেবে। আবার ভৈরোয়াঁ পর্যন্ত ফোকটে লিফট ?

প্লী—জ কঁকিয়ে চিৎকার করে বলল সাহেব—আর দেরি করো না—বিড় বিড় করে আবার নিজের মনেই বলল এতক্ষণ সেখানে যে কি হচ্ছে—

ড্রাইভার—গাড়িতে স্টার্ট দাও—দীনেশ এবার হুকুম দিল।

কালো পিচের মত অন্ধকারের বুক চিরে গাড়ি ছুটতে লাগল।

সাহেব বেশি কথা বলল না।

হয়ত বলতে চাইলও না। পিছনের সিটে গা এলিয়ে চোখ বুঁজে বসে রইল। মনে হল যেন একটা আচ্ছন্নতার ঘোরের ভেতরে তলিয়ে আছে।

দীনেশের মনে হল ড্রাগের অ্যাকশন চলছে। কিন্তু কোন্ ড্রাগ হেরোইন না—মরফিন?

গাড়ি চলছে। হেডলাইটের উগ্র সাদা আলো দুটো সামনের কালো অন্ধকারটাকে গ্রেহাউণ্ডের মত তাড়া করতে করতে চলেছে।

ভৈরোয়াঁতে কি হচ্ছে?

কোন কথা বলল না সাহেব। কিছুক্ষণ পর ঝাপসা গলায় বলল, গেলেই দেখতে পাবে—

দীনেশের লোকটাকে রহস্যময় বলে মনে হল। ড্রাগ কেনার পয়সা চাইছে। অথচ খুব একটা দুরাবস্থা দেখে তো মনে হয় না। ভৈরোয়াঁতে তাড়াতাড়ি যাওয়ার জন্য ছটফটই বা কেন করছে?

অনেকক্ষণ ধরে খুঁচিয়ে খুঁচিয়ে দীনেশ জানতে পারল ভদ্রলোক আমেরিকান। নাম রব। কলোরাডোর বাসিন্দা। ঘর ছেড়েছিল যখন তখন তার বয়স মাত্র পনের। তারপর আর কখনো একদিনের জন্যও তার দেশে ফেরেনি। আজ চল্লিশের সীমানায় পা দিয়েও দুনিয়ার দেশে দেশে ঘোরা তার শেষ হয়নি। পৃথিবীর বহু দেশ ঘুরেছে। তাই ইংরেজী ছাড়াও ফরাসী, জার্মানি, ডাচ এবং ইতালির ভাষায় কথা বলতে পারে অনর্গল। আরও—আরও একটা অদ্ভুত আর অসামান্য গুণ ছিল—সেটা পরে জানতে পেরেছিল দীনেশ।

তিন—তিনটি কয়লা খনির মালিকের ছেলে সে। অগাধ প্রাচুর্য আর বিলাসীতার ভেতরে ডুবে থাকা একঘেয়ে জীবনে বীতশ্রদ্ধ হয়ে ঘর ছেড়েছিল। ঘর ছেড়েছিল রব—বৈচিত্রময় রোমাঞ্চকর আর অভিনব এক জীবনের স্বপ্ন নিয়ে কিন্তু সেই অসম্ভব স্বপ্নই তাকে ড্রাগের খপ্পরে ফেলে দিয়েছিল।

গাড়ি চলছে ঝড়ের বেগে। নেপালী ড্রাইভার স্টিয়ারিং-এ হাত রেখে গুনগুন করে গান গাইছে। আর গাড়ির ভেতরের ডিমলাইটের স্বল্প আলোয় হঠাৎ দীনেশের নজরে পড়ল রবের সেই ঘোর ঘোর আচ্ছন্ন ভাবটা কেটে গিয়েছে। গানের তালে তালে গাড়ির সিটে তাল ঠুকছে।

রব—আমার কাছে হ্যাস ছাড়াও আরও ড্রাগ আছে—দেব?

কি?

কিছু হেরোইন আর সামান্য মরফিন—

ও সব চলবে না আমার—প্লী—জ—ড্রাইভারকে আরও একটু জোরে চালাতে বলুন, ভেতরে ভেতরে নিদারুণ একটা অস্থিরতায় যেন ভেঙ্গে পড়ল রব। পকেট থেকে কালো কালো কোন শুকনো পাতার গুঁড়োর মত কি বের করে খুব জোরে চিবতে লাগল। যেন জিনিসটা এখুনি খেয়ে ফেলতে পারলে বাঁচে!

কি খাচ্ছ রব?

কোন কথা বলল না সে। তার চোখ দুটো অস্বাভাবিক উজ্জ্বল বলে মনে হল।

গাড়ি এগোয়। ততই রবের অস্থিরতা বাড়তে থাকে। কখনো মুখ উঁচু করে

হেডলাইটের উগ্র আলোর জালে মুহূর্তের জন্য বন্দী হয়ে আবার সাঁ সাঁ করে ছুটে পালিয়ে যাওয়া মাইল পোস্ট দেখছে আবার কখনো গলা উঁচিয়ে ড্রাইভারের সামনে আলোকিত স্পীডোমিটারের কাঁটা লক্ষ্য করছে।

দীনেশের মনে হল রবের ভেতরে যেন হাজার হাজার ভোল্টের বৈদ্যুতিক শক্তি বা এনার্জি নিঃশব্দে তরঙ্গায়িত হয়ে চলেছে। আর সেই অফুরান শক্তিতেই সে যেন টগবগ করে বেড়ায়—

রব তুমি কি কোকেন অ্যাডিক্টেড ?

নট ওনলি দ্যাট—কোকেন ডিলারও—দপ করে জ্বলে উঠল রবের চোখ দুটো। দ্রুত উত্তেজিত কণ্ঠে বলল—গত ত্রিশ বছর ধরে ইণ্ডিয়ার বড় বড় শহরে আমি কোকেন সাপ্লাই করেছি—একটু থেমে বলল বাজারে সস্তা ভেজাল হেরোইন, মরফিন আসায় কোকেন মার খেয়ে গেল—এখন আমার খুবই মন্দা যাচ্ছে। হঠাৎ থেমে গিয়ে ড্রাইভারকে উদ্দেশ্য করে একেবারে উন্মাদের মত চিৎকার করে বলল নেপালী ভাষায় —তুমি কি এর চেয়ে জোরে গাড়ি চালাতে জানো না—রাস্তা তো ফাঁকা—

বেশ কিছুক্ষণ গাড়ির সিটের ওপরেই এপাশ ওপাশ করল—। তারপরেই দু'হাত তুলে নিজের শরীরটাকে ডাইনে বাঁয়ে আঁকিয়ে বাঁকিয়ে দোমড়াতে লাগল। মনে হল রবের গায়ে কে যেন বিছুটি লাগিয়ে দিয়েছে।

জানেন—ভৈরোয়াঁতে যেতে দেরি হচ্ছে বলে আমার যে কি প্রচণ্ড ক্ষতি—জ্বলতে জ্বলতেই বলল রব। আরও কি যেন বলতে যাচ্ছিল। কিন্তু তীব্র উত্তেজনার আবেগে তার গলা আটকে এল। কিছুই বলতে পারল না। শুধু নিদারুণ আক্ষেপে হাত দুটো কচলাতে লাগল।

ভৈরোয়াঁতে কি আছে—কি থাকতে পারে রবের। এই আধপাগলা সাহেবের সঙ্গে যেয়ে বিদেশ বিঁভুইতে আবার কোন বিপদে পড়বে না তো? দীনেশ ভাবে।

সাহেব—ভৈরোয়াঁ—আসিয়ে গেছে—ড্রাইভার কথাটা ছুড়ে দিল।

দীনেশ দেখল ভৈরোয়াঁর দিকের অন্ধকার আকাশটা আলোর ছটায় উজ্জ্বল হয়ে উঠেছে। আর বহু বহু দূর থেকে সমুদ্রের গর্জনের একটা আওয়াজ ভেসে আসছে। ভৈরোয়াঁ কি খুব বড় সিটি—শব্দটা কিসের ?

না—না—শহর খুব ছোট, রব দূরে আকাশের আলোর দিকে চোখ রেখে বলল— একটা মাত্র বড় রাস্তা—একটি হোটেল, একটা ব্যাঙ্ক—ব্যস বলেই দীনেশের পিঠটা চাপড়ে দিল।

দীনেশ বুঝতে পারল ভেতরে ভেতরে উল্লাসে ফেটে পড়ছে রব।

শোন ব্রাদার, বহুকালের অন্তরঙ্গ বন্ধুর মত রব বলল—তুমি আমার সঙ্গে প্রথমে ভৈরোয়াঁতে পোঁছেই যাবে এয়ারপোর্টে—একটু থেমে আবার বলল তুমি তো নিশ্চয়ই কাঠমাণ্ডু যেতে চাও ?

হ্যাঁ—নিশ্চয়ই—

দু'তিনদিন পর পর কাঠমাণ্ডুর ফ্লাইট। যদি ফ্লাইট না থাকে তোমার লাগেজ

হোটেলে তুলে দেব—তুমি তুমি হোটেলে থাকবে রব কথাগুলো বলছে ঝেঁকে ঝেঁকে। ভেতরের তীব্র উত্তেজনা চেপে রাখতে পারছে না।

গাড়ি শহরের কাছে এসে পড়ল। সেই দূরাগত গর্জন আরও তীব্র—আরও উতরোল হয়ে উঠল। আর সেই আওয়াজের ভেতরে স্পষ্ট হয়ে উঠল একটা বিদেশী অর্কেস্ট্রা বা ঐকতানের উদ্দাম শব্দ লহরী!

ইস্—যন্ত্রণায় অস্ফুট আর্তনাদ করে উঠল রব। গাড়ির ভেতরেই উঠে দাঁড়াল। তাকে কেমন অবসন্ন আর হতাশ বলে মনে হল।

আমার—আমার অনেক দেরি হয়ে গেল, কেমন জড়িয়ে জড়িয়ে বলল—কি করব বলো—তুমি বিদেশী বন্ধু—আমার অনেক উপকার করেছ—

দীনেশ কোন কথা বলল না। সাগরপারের সেই জাঙ্কি, কোকেন অ্যাডিক্টের জন্য গভীর সহানুভূতির রসে তার মনটা কেমন ভিজে উঠল।

গাড়ি ভৈরোয়া—ভারত নেপাল সীমান্ত শহরে পেঁছে গেল। পূবের আকাশে ভোরের রেখা। গাছে গাছে পাখি ডাকছে।

রব তাকে সোজা নিয়ে এল এয়ারস্ট্রিপে। একটা মাত্র ঘর। সেটা আবার বাঁশ-বাতা আর মাটি দিয়ে তৈরি মেটে ঘর। আর চারদিকে ধু ধু ফাঁকা মাঠ। বিমান-বন্দর বলে চিনতে কষ্ট হয়।

রব খোঁজ নিয়ে এল—তিনদিন পরে কাঠমাণ্ডুর ফ্লাইট! তার আগে সেখানে যাওয়ার কোন উপায় নেই। সঙ্গে সঙ্গে রব তাকে শহরের একমাত্র হোটেলে নিয়ে এল। অসম্ভব সস্তা—ড্যাম চিপ্।

এবার আমি—আমি যাই বন্ধু—কেমন উদভ্রান্তের মত বলেই ছুটে বেরিয়ে গেল রব। দীনেশের মনে হল যেন একটা আগুনের হলকা বাতাসের সঙ্গে পাল্লা দিয়ে ছুটছে।

দীনেশের কৌতূহল হল।

তাকে অনুসরণ করল। কিন্তু না করলেই বোধহয় ভাল হত। তাহলে তাকে দেখতে হত না। অদ্ভুত আর মর্মান্তিক সেই দুর্ঘটনার বিভৎস দৃশ্য!

অর্কেস্ট্রার সেই তুমুল বাজনার দিকে কান রেখে হাঁটতে শুরু করল দীনেশ। আরও এগিয়ে যেতেই তার কানে এল উচ্চণ্ড একটা সঙ্গীতের শব্দ। অনেক—অনেক-গুলো গলা একসঙ্গে গাইছে। কিন্তু ভাষা বুঝতে পারা যায় না।

আরও কিছুটা যেতেই থেমে গেল দীনেশ। থামতে হল! অদ্ভুত নারকীয় সেই দৃশ্য!

বাঁশের বেড়া দিয়ে ঘেরা একটা বড় মাঠে নাচগানের জমজমাট আসর বসেছে। বেশির ভাগই সাহেব—

কিছু মেমসাহেবও আছে।

তারা নাচছে উদ্দাম এলোপাথাড়ি। কারো পায়েই যেন কোন বশ নেই। যার যা খুশি, যেমন খুশি নেচে চলেছে। তার সঙ্গে চলছে সমবেতকণ্ঠে বেসুরো গান।

কারো সঙ্গে কারো গলা মেলানোর কোন বালাই নেই। গানের যেমন তাল নেই, ছন্দ নেই, তেমনি নাচেরও কোন মাথামুণ্ডু নেই।

বেড়ার বাইরে দাঁড়িয়ে দেখছে ভৈরোয়ার কিছু স্থানীয় লোক। ব্যাণ্ড বাজছে, বাজছে ক্যারিওনেট, বাজছে ফ্লুট। তার সঙ্গে তাল মিলিয়ে বাজছে ড্রাম! কিন্তু— সেই মধুর সুরের ঐকতানের সঙ্গে নাচের কোন যোগ নেই।

দর্শকদের ভেতর থেকে শোনা যাচ্ছে টুকরো টুকরো কথার গুঞ্জন।

বাহাত্তর ঘণ্টা ধরে নেচে চলেছে রে বাবা—

প্রত্যেকটা সাহেব বেহেড মাতাল—নেশাখোর—

আরে নেশার ধক না থাকলে এইরকম সারারাত সারাদিন নাচা যায়?

দু'তিনজন আবার এল. এস. ডি. কি আফিং খেয়ে বেহুঁস হয়ে পড়ে আছে মাটিতে। তাদেরকে মাড়িয়েই দুটো যুবতী মেমসাহেব কেমন আচ্ছন্নের মত নেচে চলেছে। তাদের কারো স্কার্ট ছিঁড়ে নিচে ঝুলে পড়েছে, কারো ব্লাউজ পিঠের দিকে ছিঁড়ে ফালা ফালা হয়ে গিয়েছে। তাদের কোন ভ্রূক্ষেপই নেই।

সেই বেআব্রু পোশাকের আড়ালে তাদের উদ্ধত যৌবন চিহ্নগুলো অবারিত হয়ে গিয়েছে। কামনান্মোত্ত নেশাখোরের দল নাচতে নাচতে তাদের চারিদিকে ছোঁক ছোঁক করছে। কেউ কেউ আবার কোন মেয়ের কোন পিঠে খোঁচা মারছে কারো বা মাথায় চাঁটি দিচ্ছে। মেয়েরা কখনো হেসে হেসে এ ওর গায়ে ঢলে পড়ছে আবার কখনো ঠাস ঠাস করে তাদের গালে চড় কষিয়ে দিয়েই বাজনার তালে তালে নেচে চলেছে—

ইফ উইণ্টার কামস—ক্যান স্প্রীং বি ফার বিহাইণ্ড—আবেগদীপ্ত মধুর কণ্ঠে এক সাহেব হঠাৎ ভিড়ের ভেতর থেকে গেয়ে উঠল। মুহূর্তে সেই হট্টগোল, সেই এলোপাথাড়ি চিৎকার সব-সব স্তব্ধ হয়ে গেল।

সাহেবের দিকে তাকিয়েই চমকে উঠল দীনেশ। আরে রব। এত সুন্দর সুরেলা তার গানের গলা! চারিদিক থেকে রব উঠল—গেয়ে যাও—গেয়ে যাও—রব—তুমি থেম না—প্লীজ—তুমি থেম না—

গানের সঙ্গে সঙ্গে নেচে নেচে ব্যাঞ্জো বাজাতে লাগল রব।

বাহবা—বাহবা! উচ্ছ্বসিত হয়ে উঠল নাচিয়ে সাহেবরা। একটা মেমসাহেব তো কাণ্ডই করল। মোটাসোটা দেহটা নিয়ে কোনরকমে টলতে টলতে এসে হঠাৎ তিড়িং করে একটা লাফ মেরে রবের গলা ধরে তার বুকে মাকড়সার মত ঝুলতে লাগল। রব তাকে এক ঝটকায় মাটিতে আছড়ে ফেলে দিল। মেয়েটা বাচ্চাদের মত ডুকরে কাঁদতে লাগল।

আঃ কী মাথামুণ্ডু বাজাচ্ছ—ফ্লুটের বাজনদারের দিকে তাকিয়ে খেঁকিয়ে উঠল রব। পাগলের মত ছুটে গিয়ে তার হাত থেকে কেড়ে নিয়ে ফ্লুট বাজাতে লাগল সে। অপরূপ মধুর এক সুরের ইন্দ্রজাল ছড়িয়ে পড়ল বাতাসে।

তুমি—তুমি কী সুন্দর বাজাতে পার রব, এক সুন্দরী অল্পবয়সী মেমসাহেব রবের দিকে মুগ্ধ আর অপলক চোখে তাকিয়ে বলল।

ও তাই নাকি! কি হল কে জানে, ফ্লুটটাকে ছুড়ে ফেলে দিয়ে ছুটে এসে মেয়েটিকে জড়িয়ে ধরে তাকে হাটুর ওপর বসিয়ে নিয়ে গান জুড়ে দিল রব—

ও—ব্রাইট ফ্লাওয়ার। হু জ হোম ইজ এভরিহয়্যার···মেয়েটা আহ্লাদে গদগদ হয়ে রবের বুকে গা এলিয়ে দিল।

হচ্ছে না—হচ্ছে না—কিছু হচ্ছে না—হঠাৎ বিরক্তিতে ফুঁসে উঠল রব। বঙ্গো বাজিয়েকে ধাক্কা দিয়ে সরিয়ে দিল। নিজেই বঙ্গো বাজাতে লাগল।

ফ্যানট্যাসটিক—অদ্ভুত অস্ফুট কথা দুটো দীনেশের মুখ থেকে বেরিয়ে গেল। রব যে কোন বাজনা বাজাতে পারে—কী সুন্দর গান করতে পারে—জিনিয়াস! শ্রদ্ধায় ভালবাসায় তার চোখ দুটো কেমন গভীর আর অগাধ হয়ে ওঠে।

বঙ্গোর দ্রুত জলদ বাজনায় নাচিয়েদের রক্তে যেন আগুন ধরে যায়। মুখে সিটি বাজিয়ে তারা উদ্দামবেগে নাচতে থাকে!

হঠাৎ এক সাহেব আছড়ে পড়ে মাটিতে মাথা ঠুকতে লাগল। হাউ হাউ করে সে কী কান্না!

ড্রাগের অ্যাকশান দীনেশের মনে হল—আর সেই ড্রাগ—ডেফিনিটলি—কোকেন—কোকেন অ্যাডিক্টকে বন্য আর উদ্দাম করে তোলে। কোকেনের অ্যাকশান না থাকলে টানা বাহাত্তর ঘণ্টা সমানে নেচে যাওয়া সম্ভব নয় কখনো—

এই শালা—তুমি কোকেন দেবে বলে আমার কাছে অ্যাডভান্স টাকা নিয়েছিলে, বেঁটে মোটা হোঁদল কুতকুতের মত চেহারার এক সাহেব রুখে এসে দাঁড়াল রবের সামনে। গোল গোল চোখ দুটো ঘুরিয়ে ঘুরিয়ে বলল, আবার তিনদিন পরে মাল দেওয়ার কথা ছিল—কিন্তু তুমি শালা টাকা নিয়ে সেই যে ভেগে পড়লে—

কী যা তা বকছ? বঙ্গো রেখে উঠে দাঁড়াল রব। অল্প আলোয় পুঁথি পড়ার মত করে তীক্ষ্ম চোখে তার দিকে তাকিয়ে বলল-কত গ্রাম কোকেন টেনেছ—মার্থার—

বাজে কথা বলো না—হয় কোকেন না হয় আমার টাকা ফিরিয়ে দাও—

কী আশ্চর্য পোখারার হোটেলে তোমাকে আমি তোমার কোকেন ফিরিয়ে দিয়েছি—

মিথ্যে কথা—ডাহা মিথ্যে—তুমি দিলে আর আমি ভুলে যাব?

গল—রবের লম্বা দেহটা এবার সাপের মত দুলে উঠল। তীব্র আক্রোশে ফুসতে ফুসতে বলল তোমরা স্প্যানিশরা দিনদুপুরে পুকুর চুরি—

কি বললি—শালা—জাত তুলে কথা, যদিও রব তার চেয়ে দ্বিগুণ লম্বা—কিন্তু এক ধাক্কায় তাকে মাটিতে ফেলে দিল।

তবে রে শালা বাস্টার্ড! ধুলো ছেড়ে উঠে দাঁড়াল রব। হিংস্র বাঘের মত গজরাতে গজরাতে যেই সেই স্প্যানিশ সাহেবের গলাটা চেপে ধরতে গেল—অমনি মর্মান্তিক এক আর্তনাদ করে মাটিতে পড়ে গেল রব।

সেই স্প্যানিয়ার্ড তার উরুতে ছুরি বসিয়ে দিয়েছে। আরো কয়েক ঘা দিয়েছে তার পিঠে। তাজা রক্তে মাটি ভিজে গেল।

আশ্চর্য রব বুঝতেই পারল না—তাকে ছুরি মেরেছে। প্রচুর রক্ত ঝরেছে। কিন্তু কোকেনের নেশার ঘোর যখন একটু একটু করে ফিকে হতে লাগল তখন উরুদেশে হাত দিয়ে যন্ত্রণায় চিৎকার করতে শুরু করল।

নাচিয়ে সাহেব মেমরা ব্যাপারটা দেখেও দেখল না। তারা রক্তের ভেতরে লুটিয়ে পড়ে থাকা রবের দিকে তাকিয়ে একে একে চলে যেতে লাগল।

দীনেশ ডাক্তারের জন্য অনেক ছুটোছুটি করেছিল। কিন্তু—নতুন মানুষ। জায়গাটার হাল হকিকৎ জানে না। অনেক ঘুরে—ডাক্তার যখন নিয়ে এল, তখন সব শেষ—থেমে গিয়েছিল দীনেশ। তার চোখদুটো কেমন ছলছল করতে লাগল।

জানেন স্যার নেপাল থেকে কখনো মীরাট, কখনো দিল্লী বোম্বাই গোয়ায়—আরও কত জায়গায় গিয়েছি আবেগভরা কণ্ঠে বলল দীনেশ—কত অ্যাডিক্ট—কত জাঙ্কির সঙ্গে মেলামেশা করেছি। কিন্তু—আচমকা থেমে গেল সে। আবার নিজের মনেই অস্ফুটস্বরে বলল, রবের মত আমি আর কাউকে দেখিনি—

তোমার কি মনে হয় দীনেশ এসবই কি কোকেনের অ্যাকশান?

সার্টেনলি—রব থেকে শুরু করে নাচিয়ে সাহেব মেমরা প্রত্যেকে হেভি ডোজের কোকেন অ্যাডিক্টেড—

সাত

কোকেন নেশাখোরকে বন্য আর উদ্দাম করে তোলে। পটপার্টিতে রবের মর্মান্তিক পরিণতির জন্য দায়ী কি কোকেন নয়?

"Cocaine sometimes produce very wild effects." অর্থাৎ কোকেন কখনো কখনো রক্তের ভেতরে আদিম একটা বন্য প্রবৃত্তি জাগিয়ে তোলে—কথাটা বলেছেন নিউইয়র্কের ইনস্টিটিউট ফর দি স্টাডি অফ ড্রাগ মিসইউজের এক্সিকিউটিভ ডিরেক্টর এবং প্রবীন ড্রাগ বিশেষজ্ঞ স্টেনলি আইনস্টাইন। আরও জানিয়েছেন তিনি—কোকেন এমন একটি ভয়াবহ ড্রাগ যা মানুষের কেন্দ্রীয় স্নায়ুতন্ত্রকে উত্তেজিত করে তোলে। তার ল্যাটিন নাম এরিথ্রক্সিলন কোকো (Erythroxylon Coco)। দক্ষিণ আমেরিকার আন্ডিজ পর্বতের ঢালুতে ছোট ছোট এক ধরনের গাছ জন্মায়—তাকেই বলা হয় কোকো প্ল্যান্ট। এই গাছটিকে দক্ষিণ আমেরিকার আদিবাসী ইংকাস এবং আজটেকরা তাদের ধর্মীয় ক্রিয়ানুষ্ঠানের পবিত্র একটি উপকরণ মনে করত।

শুধু ধর্মীয় ধ্যানধারণাতেই নয়। দিনে দিনে কোকোর আরও অনেক আশ্চর্য গুণের কথা জানা গেল। কোকো বেশি খেলে জিভ এবং দেহের চামড়া আস্তে আস্তে অবশ হয়ে আসে।

১৮৮০ খ্রীষ্টাব্দে দেহের কোন কোন বিশেষ জায়গা অসাড় করা বা লোক্যাল অ্যানেস্থেসিয়ার জন্য কোকোকে অ্যানেসথেটিক ড্রাগ হিসেবে সুপারিশ করা হল। তার দীর্ঘ চার বছর পর কোকো নিয়ে চিকিৎসকদের ভেতরে মাথা ঘামানো শুরু হল।

শুনলে কেমন আশ্চর্য হয়ে যেতে হয় এই ড্রাগটিকে নিয়ে সবচেয়ে বেশি পরীক্ষা-নীরিক্ষা করেছিলেন ভুবন বিখ্যাত মনোবিজ্ঞানী—

ফ্রয়েড—সিগমুন্ড ফ্রয়েড।

কোকো নিয়ে দিনরাত গবেষণা করতে করতে দুটো কাজ তিনি করেছিলেন—

তাঁর এক সহকর্মী ছিলেন মরফিনে আসক্ত। তাকে তিনি কোকেনের সাহায্যে মরফিন ছাড়িয়েছিলেন। হয়ত সেই প্রথম কোকেনকে ওষুধের মত ব্যবহার করা হয়েছিল—অর্থাৎ Medically induced Cocaine dependence…

আর একটা কাজ হল—সিগমুন্ড ফ্রয়েডের এক ঘনিষ্ঠ বান্ধবীকে লেখা তাঁর চিঠি থেকে জানা যায়—কোকেন সম্বন্ধে যুগযুগান্তরের যে জনশ্রুতি—যে অলীক বিশ্বাস—কোকেন যৌনক্ষুধাকে আরো তীব্র—আরো উগ্র করে তোলে অর্থাৎ তার অ্যাফ্রো-ডিসিয়াক* বৈশিষ্ট্যকে তিনি বলিষ্ঠ কণ্ঠে সমর্থন করেছিলেন এবং দুনিয়ার দেশে

---

* অ্যাফ্রোদিতি—গ্রীক পুরাণে প্রেম ও সৌন্দর্যের দেবী।
অ্যাফ্রোদিসিয়া—যৌনসুখ বা আনন্দ।
অ্যাফ্রোদিসিয়স অফ অ্যাফ্রোদাইট—যৌনকামনাকে উদ্দীপ্ত করা।
অ্যাফ্রোদিসিয়াক—যৌনকামনাকে জাগিয়ে তোলার বৈশিষ্ট্য।

দেশে প্রচারও করেছিলেন।

ফ্রয়েডের এক ঘনিষ্ঠ সহকর্মী ডক্টর কোলার (Dr. Kollar) কোকেনকে লোক্যাল অ্যানেসথেসিয়ার বা শরীরের বিশেষ কোন জায়গাকে অসাড় করার কাজে প্রয়োগ করলেন। তারপরেই দাঁতের চিকিৎসায় কোকেনকে ব্যবহার করতে খুব বেশি দেরি হল না। আর এই শতাব্দীর শুরুতে (১৯০৫ খৃষ্টাব্দে) বৈজ্ঞানিক আইনহর্ন (Einhorn) বিভিন্ন বস্তুর মিশ্রণে কোকেনের বদলি বা সাবস্টিটিউট হিসেবে তৈরি করলেন 'প্রোকেইন'।

কিন্তু বলা প্রয়োজন, কোকোর ঐতিহ্য আরও সুদূর কালের। দক্ষিণ আমেরিকার আদিবাসীদের দৈনন্দিন জীবনচর্যায় তাদের সংস্কৃতি ও ধ্যানধারণায় কোকোর অবদান অসামান্য। পেরু, বলিভিয়া, কলম্বিয়া এবং আর্জেন্টিনার রেড ইন্ডিয়ানরা তীব্র হিমেল আবহাওয়া থেকে আত্মরক্ষার জন্য এবং জীবনধারাকে সহজ ও মসৃণ করার জন্য কোকোর পাতা চিবিয়ে খেত। হাজার হাজার বছর ধরে বংশপরম্পরায় রেড-ইন্ডিয়ানদের ভেতরে প্রচলিত ছিল একটা বিশ্বাস—কোকোর ছোট ছোট ফল চিবিয়ে খেলে তারা তীব্র ক্ষুধা এবং অবসন্নতাকে জয় করতে পারবে।

কালের ব্যবধানে এসে কোকেনের কিন্তু অনেক রদবদল হয়েছে। আজ আর ধর্মীয় ক্রিয়াপ্রকরণের উপকরণ হিসেবে কোথাও কোকেন ব্যবহৃত হয় না। হয় না দেহের কোথাও অসাড় করার জন্য বা লোক্যাল অ্যানেসথেটিক হিসেবে তার ব্যবহার।

আইনস্টাইন সাহেবের বই 'Beyond the Drugs-এ লেখা কোকেন প্রসঙ্গে এই কথাগুলো মনে পড়ে গেল দীনেশের কাছে শোনা কোকেনখোরদের সেই ভয়াবহ খুনোখুনির মর্মন্তুদ ঘটনায়।

কোকেনের বিষময় পরিণাম সম্বন্ধেও এখানে কিছু বলা প্রয়োজন—

(১) কোকেন খেতে খেতে হঠাৎ বন্ধ করে দিলে নেশাগ্রস্ত গভীর হতাশায় এবং অবিচ্ছিন্ন একটা বিভ্রান্তি বা মতিভ্রমে আচ্ছন্ন হয়ে যায়।

(২) কোকোর পাতা চিবুলে লোকটির মুখের ভেতরটা চিন চিন করে জ্বলে যায় আর তারপরেই মনে হয় মুখখানা বুঝি অসাড় হয়ে যাচ্ছে—ড্রাগের অ্যানে-সথেটিক অ্যাকশান বা অবশ করে দেওয়ার ক্রিয়া শুরু হয়ে যায়।

(৩) কোকেন খেলে সাময়িকভাবে বেশ সুস্থ ও গভীর মনে হয় এবং কোকেনে আসক্ত মানুষটি দেহে ও মনে অবসন্নতাবোধ নাও করতে পারে।

(৪) নস্যির মত করে নাক দিয়ে কোকেন নিলে কিম্বা দেহের কোথাও যদি ইনজেকশান করে দেওয়া হয়—তাহলে নেশাগ্রস্ত তীব্র আর অস্থির উত্তেজনায় যেন টগবগ করে ফুটতে থাকে। তার মনে হয়—তার বোধহয় অফুরন্ত শক্তি বা আন-লিমিটেড এনার্জি। অবশ্যই বলতে হবে এটাই হল কোকেনের বিপজ্জনক পরিণতি নেশাখোরের যা প্রকৃত ক্ষমতা সে তার চেয়ে অনেক বেশি—অতিরিক্ত ভাবে অর্থাৎ ওভার এস্টিমেট করে।

(৫) কিছু সময়ের জন্য সত্যিই সে অনেক—অনেক বেশি কাজ করতে পারে—তার মানে এই নয়—তার শক্তি বা এনার্জি বেশি। এই ড্রাগের প্রভাবে সে ক্লান্তি বা অবসন্নতা বোধ করে না।

(৬) শার্লক হোমসের স্রষ্টা স্যার আর্থার কনান ডয়েল নিজে কোকেন খেতেন। সেইজন্যেই কোকেনের প্রভাবটি বা তার অ্যাকশানটি পরিস্ফুট করে তুলেছেন শার্লক হোমসের ভেতরে। এক একটি অত্যন্ত জটিল রহস্যের সমাধান করার জন্য শার্লক হোমস অফুরন্ত শক্তিতে নিরলস পরিশ্রম করে চলেছেন—

Sherlock Homes, presumably got his instant energy this way...

কোকেনের কুফল সম্বন্ধে আরও বলেছেন মাদক বিশেষজ্ঞ স্টেনলি আইনস্টাইন—উদ্বেগ, মিথ্যা সন্দেহ, অলীক বিশ্বাস, প্রলাপ বকা, দৃষ্টিবিভ্রম, শ্রুতিবিভ্রম, তড়কা বা খিঁচুনি, হজমের গোলমাল, বমিবমি ভাব, মাথাধরা, অরুচি, খিদে এবং ঘুম নষ্ট হয়ে যাওয়ার জন্য ধীরে ধীরে শুকিয়ে যাওয়া আর সর্বদা অত্যন্ত বেশি করে নিজের ভেতরে গুটিয়ে বসে থাকা বা অস্বাভাবিক অন্তর্মুখীনতা ইত্যাদি কোকেনের নেশায় আসক্তদের অনিবার্য পরিণতি।

আইনস্টাইন সাহেব কোকেন কোথায়, কিভাবে ব্যবহৃত হয়—সেই প্রসঙ্গও জানিয়েছেন—

হেরোইনের নেশাকে তীব্র এবং আরও প্রলম্বিত করার জন্য হেরোইনের বড়ি বা স্পীড বলে কোকেন মেশানো হয়।

কিন্তু কোকেনের ক্রিয়া বা অ্যাকশনের মেয়াদ যেহেতু অত্যন্ত কম এবং রাস্তায় রাস্তায় বিক্রি করা দামী ড্রাগও (Street Drugs) নয়—তাই শুধু কোকেনের ব্যবহার অন্য ড্রাগের তুলনায় খুব কম।

অর্থনৈতিক এই দিকটা ছাড়াও শুধু কোকেনের প্রয়োগ হয় কশ্চিৎকদাপে তার একমাত্র কারণ হল কোকেনের মারাত্মক উত্তেজক গুণ বা স্টিমুলেটিং এফেক্ট মানুষকে এমন সাংঘাতিক উদ্দীপ্ত বা উত্তেজিত করে তোলে যে নেশার ঘোর কেটে গেলেই সে একেবারে স্তিমিত এবং অবসন্ন হয়ে পড়ে অথবা গভীর একটা হতাশার অন্ধকারে একটু একটু করে তলিয়ে যায়।

অতিরিক্ত কোকেন খেলে শ্বাসপ্রশ্বাস বিঘ্নিত হয়ে মৃত্যু পর্যন্ত ঘটতে পারে। বিষ হিসেবে কোকেনের ব্যবহারের পরিণতি অতি ভয়াবহ। এক ধরনের কোকেন আছে, যা বেশি খেলে এমন তীব্র নেশা হয় যার ফলে নেশাগ্রস্ত লোকটি মরে যেতে পারে। কারণ, কোকেনের মাদকতার তীব্র ঘনত্ব (High concentration) এমনভাবে আর এত দ্রুত মানুষের দেহযন্ত্রের প্রতিটি তন্ত্রে (system) মিশে যায় যে হৃদযন্ত্রটি মারাত্মকভাবে আক্রান্ত হয় ফলে ডাক্তার ডেকে ভাল করে পরীক্ষা করার আগেই রোগী মারা যায়।

কোকেনের সম্বন্ধে এসব কথা কিন্তু আমি দীনেশকে বলিনি। বলা প্রয়োজন মনে

করিনি। কারণ, বেশ কিছুদিন তার সঙ্গে ঘনিষ্ঠভাবে মেলামেশা করে এবং অনেক আলাপ আলোচনা করে আমার মনে হয়েছে ড্রাগের জগতের এমন কিছু নেই যা তার অজানা। অত্যন্ত বুদ্ধিমান এবং গুণী ও নলেজেবল ছেলে সে!

শুধু যে গাঁজা, চরস, মারিজুয়ানা, আফিং, মরফিন, হেরোইন, এল. এস. ডি ইত্যাদি ড্রাগের খবর জানে, তা নয়। কোন্ ড্রাগের কি কি উপাদান আছে, খেলে কি হয়—অর্থাৎ তার এফেক্ট কি—সেসব কিছু সম্বন্ধে তার অভিজ্ঞতা একেবারে প্রত্যক্ষ। থিয়োরেটিক্যালের কোন ব্যাপারই নেই।

দেখলেন তো, রাত এক-টায় গোরক্ষপুরে নেমে দীনেশ ভারত-নেপাল সীমান্তের শহর ভৈরোয়াতে পাড়ি দিয়েছিল। সেই গভীর রাতের ঘনকালো অন্ধকারে তার সেই বিপজ্জনক নৈশযাত্রার সহযাত্রী ছিল যে—

সে কোকেন অ্যাডিক্টেড!

শুধু তাই নয় সে কোকেনের স্মাগলারও। তার সঙ্গেই কোকেনের নেশাগ্রস্তদের সেই নাচগানের আসরে গিয়ে নিজের চোখে দেখল—কোকেন মানুষকে আপাত কী অসামান্য শক্তি বা এনার্জি দিতে পারে—যার দৌলতে সে টানা তিনদিন তিনরাত বাহাত্তর ঘণ্টা ধরে ধেই ধেই করে নাচতে পারে। দেখল, কোকেন মানুষকে কত সামান্য কারণে কী রকম ভয়ঙ্কর হিংস্র করে তুলতে পারে—যার ফলে খুন করতেও এতটুকু দ্বিধা বোধ করে না—হাত কাঁপে না—জাগে না মনের কোণে কোণে এতটুকু অপরাধ বোধ।

কোকেন যে শুধু মানুষের রক্তে উগ্র বন্যতা জাগিয়ে দেয়, তাকে উদ্দাম আর হিংস্র করে তোলে তা নয়—মানবিক বোধ পুরোপুরি নষ্ট করে দিয়ে তাকে করে দেয় জন্তু—Shattering all human faculties, Cocaine makes a man-beast…কথায় কথায় দীনেশই বলেছিল কথাটা।

ড্রাগ অ্যাডিক্টরা কেমন জানেন স্যার?

কেমন?

জ্ঞান পাপী! তারা জানে কোকেন খেলে কি হয়, ভালভাবে জানে হেরোইন খেলে তার কি পরিণাম, তবুও তারা খায়। খাবেই। সেই যে স্যার আপনাদের ট্যাগোরের কি একটা গান আছে না—আমি জেনেশুনে বিষ করেছি পান…থেমে গেল দীনেশ। মাথা নিচু করে কিছুক্ষণ কি যেন ভাবল। মুখ তুলে বলল—একদিন কি হয়েছিল জানেন স্যার—কাঠমাণ্ডুর ফ্রেকস্ট্রীট ধরে হন হন করে হাঁটছি। সন্ধ্যার অন্ধকার বেশ ঘোর হয়ে এসেছে—হঠাৎ কেন যেন থেমে গেল সে। বলল সরি—কাঠমাণ্ডুর ফ্রেকস্ট্রীটের কথা আমি আপনাকে জোসেফ বিশ্বনাথ দাতারের কথা বলতে বলতে বলেছি—মনে আছে নিশ্চয়ই আপনার।

হ্যাঁ—খুব মনে আছে—যেখানে হ্যাসটি হ্যাস পেসট্রি—

হ্যাস—কুকি—

ঠিক বলেছেন—একটু থেমে আবার বলল সে ও আপনাকে একটা কথা বলা হয়নি—রাস্তাটার আসল নাম কিন্তু 'জোচেন' স্ট্রীট—কিন্তু বিদেশীরা সহজে 'জোচেন' কথাটা উচ্চারণ করতে পারে না—ফ্রেকদের যাতায়াতের রাস্তা বলে—'ফ্রেকস্ট্রীট' নামটাই লোকের মুখে মুখে চালু হয়ে গিয়েছে—

তুমি যেন কি বলছিলে—সন্ধ্যার অন্ধকারে ফ্রেকস্ট্রীট ধরে যাচ্ছিলে।

সূত্র ধরিয়ে দিলাম।

কোন কথা বলল না দীনেশ।

ব্যথার ছায়া ফুটে উঠল তার বড় বড় দুটো চোখে। মুখখানা থমথম করতে লাগল।

কি বলব স্যার—সেই ঘটনা মনে হলেই আমার বুক ভারি হয়ে ওঠে। একটু থেমে আবার বলল, ফ্রেকস্ট্রীট ধরে যেতে যেতে আমি যখন বাহাদুর চরস ডিপোর কাছে এসেছি ঠিক তখন—

স্যার—প্লীজ—হ্যাভ এ মার্সি ফর মি—চিঁচিঁ করে বলল এক মেমসাহেব—গিভ মি অ্যাট লিস্ট ওয়ান রুপি—স্টার্ভিং হোল ডে—

তার নীলশিরার নক্সাকাটা প্যাকাটির মত সরু হাতটা আমার সামনে বাড়িয়ে দিল।

আমি চমকে উঠলাম। হাতে যে শুধু ইনজেকশানের সূঁচের কালো কালো কালো দাগ তা নয়—হাত-পাগুলো কেমন ফুলো ফুলো। আর সারা গায়ে খোস-পাঁচড়ার কেমন দগদগে ঘা। মনে হল তার রোমকূপের রন্ধ্রে রন্ধ্রে যেন পুঁজ জমেছে—একটু থেমে আবার বলল, সে বড় করুণ দৃশ্য স্যার—পুঁজ গড়িয়ে পড়ছে—তার সারা গা বেয়ে। তাতে মাছি উড়ে উড়ে এসে বসছে। মেয়েটি থেকে থেকে যন্ত্রণায় কাতরাচ্ছে—

রাস্তার দুদিকে দোকানের আলোয় তার মুখের দিকে তাকিয়ে আমার মনে হল স্যার—আমি এই 'জাঙ্কি' মেয়েটিকে কোথায় যেন দেখেছি—।

তাকে দুটো টাকা দিলাম। সঙ্গে সঙ্গে মেমসাহেব একটা কাণ্ড করে বসল স্যার—খপ করে আমার হাতদুটো ধরে খুশিতে দুলে উঠে বলল—তুমি-তুমি—আমাকে চিনতে পারছ না ?

আমি মনের ভেতরে ডুব দিয়ে হাতড়াতে শুরু করলাম।

সেই ফ্রেকস্ট্রীটে বাঁশের মই বেয়ে উঠতে হয়—কাঠের তৈরি দোতলা হোটেল—মেয়েটি বলল। বলতে বলতে হঠাৎ আমার গলাটা জড়িয়ে ধরে আবার থেমে গেল দীনেশ। মুখে সংকোচের ছায়া পড়ল।

আর স্যার কি বলব ?—আপনি আমার বাবার বয়সী—বলেই মাথাটা নিচু করে বসে রইল দীনেশ।

বসে রইল অনেকক্ষণ। মনে হল পুরানো কোন ঘটনা তার মনে আলোড়ন তুলেছে। আমার মত একজন বয়স্ক লোককে দীনেশের পক্ষে যতটুকু বলা সম্ভব—

ঠিক ততটুকুই সে বলেছিল—

সব তো মারা গেল দীনেশের মন ভার। পরদিনই ভৈরোয়া ছেড়েছিল সে। সোজা উড়ে চলে এসেছিল কাঠমাণ্ডু। বিমানবন্দর থেকে ট্যাক্সিতে উঠেই ড্রাইভারকে হুকুম দিয়েছিল—চল ফ্রেকস্ট্রীট—

যদিও কাঠমাণ্ডুর সবচাইতে ব্যস্ত এবং প্রধান রাস্তা কিন্তু বড়ই সংকীর্ণ। পাশাপাশি দুটো ট্যাক্সি যেতে পারে না। সেই নোংরা সরু রাস্তাটাকে সারা দুনিয়ায় বিখ্যাত করে দিয়েছে ফ্রেকরা। দুনিয়ার যত নেশাখোর এখানে এসে জড়ো হয় সস্তা গাঁজার লোভে! রাস্তার দু'পাশে বেশ কিছু সরকারি গাঁজার দোকানও আছে, কারণ নেপালে গাঁজা বেআইনী নয়। এইসব দোকানের সামনে ঘুর ঘুর করছে লম্বা লম্বা চুলওয়ালা সাহেব জাঙ্কিরা। তাদের কেউ কেউ আবার একেবারেই উদ্দেশ্যহীন ভাবে সেই রাস্তার এমাথা থেকে ওমাথা ধীর পায়ে পায়চারি করে চলেছে। কেমন ঘোর ঘোর আচ্ছন্ন ভাব তাদের চোখেমুখে। হঠাৎ দেখলে মনে হয় কতগুলো রোবট যেন রাস্তায় ভেসে ভেসে বেড়াচ্ছে।

দীনেশ দেখল কয়েকজন ফ্রেক আবার বেশ জমিয়ে রাস্তার ওপরই বসে পড়েছে আর গাঁজা টানছে। হাতে হাতে গাঁজার কল্কি ঘুরছে। কিন্তু—

তাদের পোশাক-আসাকের দিকে তাকিযে দীনেশ একটু অবাক হল। তাদের প্রত্যেকের পরণে তালিমারা ছেঁড়া জিনসের প্যাণ্ট। নোংরা সার্ট। চুলে কতকাল চিরুণী পড়েনি তা কেউ বলতে পারে না।

দীনেশের নজরে পড়ল কয়েকজন ফ্রেক রাস্তায় দাঁড়িয়ে ভিক্ষা করছে। সাহেব জাঙ্কিরা তো বড়লোকের ঘর থেকেই এসে থাকে—এদের এরকম দৈনদশা কেন?

কিন্তু তখনো দীনেশের অভিজ্ঞতার অনেক বাকি ছিল। কেন এরা এত শ্রীহীন—কিসের জন্য এরা মনুষ্যত্বের এক একটি বিকৃত ভগ্নাংশ সেটা পরে তার সমস্ত অন্তর দিয়েই বুঝতে পেরেছিল। কিন্তু এখন থাক সে সব কথা—

দীনেশ এক জাঙ্কিকে প্রশ্ন করল—একটু সস্তার হোটেল কোনদিকে পাব বলতে পারেন।

আপনি কী মশায়, কাঁধ দুটো একটু ঝাঁকিয়ে আর পিঠ পর্যন্ত ছাপিয়ে পড়া চুলগুলো এক ঝটকায় সামনে নিয়ে এসে হেসে হেসে বলল—তুমি কি রকম লোক হে—ওই লম্বা বাঁশের মইটা দেখতে পাচ্ছ না? ওটা বেয়ে ওপরে উঠে যাও—

লোকটা কি বলতে চাইছে দীনেশ বুঝতে পারল না। তার মনে হল—নেশার ঘোরে বুঁদ হয়ে আছে সে।

তা হোক—দেখাই যাক না—মই দিয়ে কিছু ওপরে উঠতেই একটা কাঠের সিঁড়ি পেল দীনেশ। সিঁড়ি বেয়ে এল একটা দোকানের দোতলায়। কিন্তু দরজা ভেতর থেকে বন্ধ।

ঠক—ঠক—ঠক—দরজায় ধাক্কা দিতে শুরু করল দীনেশ। কিন্তু ভেতর থেকে কোন সাড়া শব্দ এল না। আবার সে ধাক্কা দিল—দরজা খুলল না। তখন বাধ্য

হয়েই কি-হোলে চোখ রেখে ভেতরের অবস্থাটা দেখতে চেষ্টা করল দীনেশ।

ঘরের ভেতরে ঘন থিকথিকে অন্ধকার। অন্ধকারটা তার চোখে সয়ে যেতে দেখল—দুটো ছেলে একটি মেয়ে—তিনটি ফ্রেকের দেহের আভাস যেন একটু একটু করে স্পষ্ট হয়ে উঠল। পোড়া বিড়ি আর সিগারেটের টুকরো ছড়ানো নোংরা মেঝেতে ছেঁড়া মাদুর বিছিয়ে শুয়ে রয়েছে তাদের একজন। তাকে মনে হল ছেলে। আর একটি ছেলে ও মেয়েটি দুজনে দুজনের গা ঘেসে দেওয়ালে ঠেস দিয়ে বসে আছে। তাদের চোখে কেমন শূন্য দৃষ্টি।

অন্ধকার ঘরে সেই তিনটি প্রাণীকে দেখে দীনেশের মনে হয়েছিল বহু বহু দূরের কোন অজানা গ্রহ থেকে নেমে এসেছে তিনটি আজব জীব! লম্বা লম্বা চুলে জট পড়েছে। গায়ে বেশ ইঞ্চিকয়েক পুরু এমন নোংরা পড়েছে যে তাদের গায়ের সাদা রঙটাই পাল্টে গেছে। সপ্তাহ দুয়েক তারা স্নান করেনি মনে হল দীনেশের।

তাদের সরু সরু হাতের এখানে সেখানে ইনজেকশানের সূঁচের ক্ষত চিহ্ন। আর তাদের একেবারে কঙ্কালসার দেহের ওজন হবে বড় জোর ৩০ থেকে ৩৫ কিলো। মেয়েটির হয়ত আরও কম হবে।

ঘরটা খুবই ছোট। মাত্র একটা জানালা—তারও আবার খড়খড়িটা নামানো। তাই কেমন একটা ভ্যাপসা গরম হাওয়া ভেসে আসছে ঘরের ভেতর থেকে। সেই সাফোকেটিং বা দম আটকানো পরিবেশেও কিন্তু তাদের ড্রাগের নেশা একটুও দমে যায়নি।

মেয়েটি টলতে টলতে উঠে দাঁড়াল। টলমল করতে করতে এল ঘরের এক কোণে—যেখানে একটা টিনের বালতিতে জলভরা আছে। তার পাশেই একটা টুলের ওপরে একটা সিরিঞ্জ ও, একটা মোমবাতি আর কয়েকটি হাইপোডারমিক নিডল (যে সূঁচ চামড়ার নিচে বিঁধিয়ে দেওয়া যায়)।

মেয়েটি এবার বালতি থেকে এক চামচে ভর্তি করে জল নিয়ে তাতে কি একটা সাদা গুঁড়ো মিশিয়ে দিল। তারপর মোমবাতি ধরিয়ে চামচেটা তার ওপর ধরল। জল যখন বেশ টগবগ করে ফুটে উঠল তখন সে সিরিঞ্জটা মোমের আলোয় ঘুরিয়ে ঘুরিয়ে কিছুক্ষণ দেখল। তারপরে খুব সন্তর্পণে সূঁচটাকে আলোর সামনে তুলে ধরে তীক্ষ্ণ চোখে দেখতে লাগল। এবার সে সামান্য একটু তুলো ফেলে দিল চামচের ভেতরে এবং সিরিঞ্জের ভেতরে টেনে নিয়ে নিল চামচের সেই ওষুধ বা ড্রাগ মেশানো জলটুকু। তারপর সূঁচটাকে মুখে পুরে একটু চেটে নিল—না বেশ ভালই স্টেরিলাইড বা পরিশুদ্ধ হয়েছে—সে খুশি হল। এইবার—

এইবারই শুরু হল আসল খেলা। মেয়েটা শক্ত করে তার বাঁ হাতে বাঁধল একটা কাপড়। শিরার ভিতরে প্যাঁক করে সূঁচ বিঁধিয়ে দিল। গল গল করে রক্ত বেরিয়ে এল—সেটা সে চেটে খেয়ে নিল। কিন্তু সে হাতে ইনজেকশান দেওয়ার মত শিরাই খুঁজে পেল না।

এবার সে পাগলের মত এলোপাথাড়ি পায়ের এখানে সেখানে ইনজেকশানের সূঁচ

বিঁধিয়ে বিঁধিয়ে শিরা খ‍ুঁজতে লাগল। তাকে কেমন পাগলের মত মনে হল—যেমন করে হোক—শিরা তাকে খ‍ুঁজে পেতেই হবে—একটু ড্রাগ শরীরের ভেতরে না গেলে সে বাঁচবে না। মাথার ভেতরটা ঘ‍ুরছে—পেটের ভেতর থেকে ঠেলে উঠে আসছে বমি—

হঠাৎ থেমে গেল দীনেশ। আবার একটা বড় নিশ্বাস ছেড়ে আস্তে আস্তে বলল—এই সময়টা অ্যাডিক্টরা কেমন হিংস্র হয়ে ওঠে স্যার—খ‍ুনখারাপি পর্যন্ত করে ফেলে—কত দেখেছি—

তারপর মেয়েটি কি করল বলো—

বহ‍ু চেষ্টা করেও শেষ পর্যন্ত ডান পায়ের গোড়ালিতে একটা শিরা খ‍ুঁজে পেল মেয়েটি। এবার ইনজেকশান প‍ুস করে সমস্ত ড্রাগট‍ুকু দেহের ভেতরে নিল। এখন তাকে খ‍ুব খ‍ুশি খ‍ুব পরিতৃপ্ত মনে হল।

রক্ত মাখা সিরিঞ্জটা দ‍ূরে ছ‍ুঁড়ে ফেলে দিয়ে একটা বিড়ি ধরিয়ে টলতে টলতে এসে তার সঙ্গী ছেলেটির গায়ের ওপর নিজের দেহটাকে ফেলে দিল। ছেলেটিও দ‍ু'হাতে জড়িয়ে তাকে ব‍ুকের ভেতরে টেনে নিল—থেমে গেল দীনেশ। মাথা নিচু করে বসে রইল। আর একটা কথাও বলল না—হয়ত বলতে পারলও না—

তুমি কোন সংকোচ করো না দীনেশ—অ্যাডিক্টদের সব কিছ‍ুই আমাকে জানতে হবে—

কি আর বলব স্যার—ড্রাগ খেলে মান‍ুষ আর মান‍ুষ থাকে না, একট‍ু থেমে আবার বলল, লজ্জা, ভয়, বিবেকের কামড়ানি, পাপ-প‍ুণ্য, ন্যায়-অন্যায় বোধ সব—সব লোপ পেয়ে যায়। একট‍ু থেমে আবার বলল, আপনি আমার বাবার বয়সী—সেদিন সেই অন্ধকার ছোট ঘরটায় যে অশালীন কুৎসিত দ‍ৃশ্য দেখেছিলাম তা আপনাকে কিছ‍ুতেই বলতাম না—কিন্ত‍ু যেহেতু আপনি নেশাখোরদের নিয়ে বই লিখছেন—

হ‍্যাঁ-হ‍্যাঁ কোন লজ্জা করো না দীনেশ—

মেয়েটি পট পট করে ব্লাউজের বোতাম খ‍ুলল। এক টান মেরে স্কার্ট খ‍ুলে দ‍ূরে ছ‍ুঁড়ে ফেলে দিল। নিজেকে প‍ুরোপ‍ুরি নেকেড করল—হঠাৎ থেমে গেল দীনেশ। তীব্র উত্তেজনায় তার চোখ দ‍ুটো দপ দপ করতে লাগল। তার কণ্ঠ র‍ুদ্ধ হয়ে এল। আর একটা কথাও বলতে পারল না।

অনেক অনেকক্ষণ পরে নিজেকে বহ‍ু কষ্টে সংযত করে শ‍ুধ‍ু বলেছিল—সবচেয়ে আশ্চর্য—সেই ঘরেরই পোড়া বিড়ির ট‍ুকরো ছড়ানো মেঝের ওপরে শ‍ুয়ে আছে যে সঙ্গী—তাকে একট‍ুও আমল না দিয়ে তার সামনেই তারা যৌনসঙ্গমে লিপ্ত হল। একট‍ু থেমে আবার আস্তে আস্তে বলেছিল—অ্যাডিক্টদের যৌন জীবনটা একেবারে আদিম, বাধাবন্ধনহীন—একেবারে পশ‍ুর মত—

সেই হোটেলের সেই ঘরেরই পাশের ঘরে জায়গা পেয়েছিল দীনেশ। একটা কাঠের তক্তাপোষ। প্রতিদিন দ‍ুই টাকা ভাড়া।

পরদিন সকালের আলোয় সেই মেয়েটিকে দেখল দীনেশ। অসম্ভব স‍ুন্দরী।

দীর্ঘ চেহারাটা হঠাৎ দেখলে রজনীগন্ধার দীর্ঘ ডাঁটার মত মনে হয়। গায়ের রঙ এত বেশি ফরসা যেন মনে হয় টোকা দিলেই বুঝি ফিনকি দিয়ে রক্ত বেরোবে।

মেয়েটির সঙ্গে দীনেশের আলাপ পরিচয় হল।

নাম—সু।

সুইডেনে বাড়ি। জাংকিরা—বিশেষ করে চিকরা (জাংক মেয়েরা) যেমন হয়—খুব বড়লোকের ঘরের মেয়ে। দেশে একঘেয়ে বৈচিত্র্যহীন জীবন। শুধু রোমাঞ্চকর একটা জীবনের স্বাদ নিতেই হ্যাসের দেশ ইন্ডিয়ায় পাড়ি দিয়েছিল বছর পাঁচেক আগে।

হেরোইন ধরেছিল সুইডেনে থাকতেই কলেজে পড়তে পড়তে। কথায় কথায় আরও বলেছিল দীনেশকে—জানো ইন্ডিয়াতে আসার পর আমার ডোজ আরও বেড়ে গিয়েছে। একটু থেকে আবার ভার ভার গলায় অনেক—অনেক দূর থেকে বলল, জানো—একদিনও হেরোইন না খেলে থাকতে পারি না—

সু-র সহজ সরল ব্যবহার দীনেশকে আকৃষ্ট করেছিল। বেশ ভাবসাবও হয়ে গিয়েছিল। একদিন দীনেশের গলা জড়িয়ে ধরে বলেছিল—একটু হেরোইন খাবে দীনেশ—খাও না—বেশি না—মাত্র একটা সট—

না—না খবরদার দীনেশ, হাঁ হাঁ করে ছুটে এসে তাদের মাঝখানে দাঁড়িয়েছিল দীনেশের রুমমেট—তার জার্মান বন্ধু, মার্ক বলেছিল একবার ধরলে আর ছাড়তে পারবে না—once hooked—hooked forever—

সেইদিনই তাকে আড়ালে ডেকে নিয়ে মার্ক সু সম্বন্ধে বলেছিল কতগুলো ভয়ংকর কথা। অবাক হয়ে গিয়ে দীনেশ বলেছিল—সত্যি বলছ?

আরো কয়েকদিন থাক না—সব বুঝতে পারবে, মার্ক হেসে হেসে বলেছিল।

কিন্তু সু-কে লক্ষ্য করে এবং কষ্ট করে কিছু বুঝতে হল না। এমনি সু মানুষটা ভাল। কিন্তু তার ভয়ানক উচ্ছৃংখল বেপরোয়া চালচলন এবং বিশেষ করে মেয়েপুরুষের দৈহিক সম্বন্ধের ব্যাপারটায় তার কোন লজ্জা বা সংকোচের বালাই না থাকা—একটা মাদী জন্তুরও যে স্বাভাবিক লজ্জা আর ভয় থাকে—সেটুকুও তার না থাকা—তার আচরণের এই বৈশিষ্ট্যগুলো থেকে দীনেশের মনে হল—মার্কের কথাগুলো ঠিক। সু সম্বন্ধে সে একটা কথাও বাড়িয়ে বলেনি।

সু-কে হাড়ে হাড়ে চিনতে পারল দীনেশ সেইদিন—যেদিন ভরদুপুরে ঘটে গিয়েছিল সেই কাণ্ডটা—

দুপুরের নিস্তব্ধতায় ফ্রেকস্ট্রীটের গমগমে বাজারটাও যেন ঝিমিয়ে পড়েছিল। বাজারের ওপরে সেই হোটেলটার বাড়িটাও দুপুরের চড়া রোদে ধুঁকছিল।

জাংকিরা এদিকে ওদিকে বেরিয়ে গিয়েছিল। শুধু—দীনেশই একা ছিল। বেশ কয়েক ছিলিম গাঁজা টেনে একেবারে বুঁদ বা জাংকদের ভাষায় স্টোনড হয়ে তার তক্তাপোষে গা এলিয়ে পড়েছিল। ঘুমের এবং নেশার ঘোরের আচ্ছন্নতার ভেতরে একটু একটু করে তলিয়ে যাওয়ার আগে মুহূর্তের জন্য দীনেশের মনে হয়েছিল—'সু' কোথায়? ঘরে কি আছে—সাড়াশব্দ তো পাওয়া যাচ্ছে না··· তারপরেই নেশার

মৌতাত তাকে অচেতন করে দিয়েছিল।

দড়াম করে ঘরের দরজা খুলে গেল। টলতে টলতে এল সু।

টকটকে লাল দুটো চোখে কামনার জ্বালায় দপ দপ করছে। কোন ভূমিকা না করে ঝাঁপিয়ে পড়ল দীনেশের বুকে। চুমুতে চুমুতে তার মুখখানা আচ্ছন্ন করে দিয়ে ফিস ফিস করে বলল—প্লী—জ—দীনেশ ফিরিয়ে দিও না—

আঃ কি করছ তুমি, এক ঝটকায় তাকে মাটিতে ফেলে দিল দীনেশ—আমাকে—আমাকে আর সব জাঙ্কিদের মত চিপ—

দীনেশ—তুমি জানো না—ডুবন্ত মানুষের মত বহু—বহু দূর থেকে ক্ষীণ অস্ফুটকণ্ঠে বলল সু—আমি ড্রাগন চেজ করেছি[১]—এখন—সাংঘাতিক—হিট।[২] ফিল করছি দীনেশ—তোমাকে—তোমাকে আমার এখন ভীষণ দরকার—বলতে বলতেই স্কার্ট ব্লাউজ খুলতে লাগল। নিজেকে পুরোপুরি নিরাবরণ করে বাঘিনীর মত হিংস্র লোলুপ উল্লাসে জড়িয়ে ধরল দীনেশকে। কোনরকমে সেই দৃঢ় আলিঙ্গন থেকে নিজেকে মুক্ত করে দরজা খুলে ছুটে পালাল সে। দূর থেকে কানে এল সু-র কঠিন ধিক্কারের কথাগুলো তুমি কী—তুমি কী—ছিঃ ছিঃ—

আর এখানে নয়—এবার অন্য কোথাও—অন্য কোন ঠাঁই—দীনেশ হাসতে হাসতে বেশ সহজ গলায় বলেছিল, জানেন স্যার এটাও ফ্রেকদের একটা অদ্ভুত বৈশিষ্ট্য—সবসময় বাজিং—মানে ?

ও বাজিং হল জাঙ্কিদের ভাষা—অর্থাৎ ড্রাগের তীব্র উত্তেজনা বা Drug Sensation, একটু থেমে আবার সে বলেছিল এই উত্তেজনা—এই জ্বালা কোথাও তাকে এক জায়গায় বেশিদিন স্থির থাকতে দেয় না স্যার—থেমে গিয়েছিল সে। মাথা নিচু করে তার বিচিত্র অ্যাডিক্ট বা জাঙ্কি জীবনের স্মৃতির ভেতরে হয়ত অবগাহন করছিল—

কী ভাবছ দীনেশ ?

অনেকদিন থেকেই আমার রুমমেট মার্ক আমাকে খোঁচাচ্ছিল।

আমার কথাটা যেন শুনতেই পেল না সে।

বলতে শুরু করল—মার্ক প্রায়ই আমাকে বলত, চল—অন্য কোথাও চলে যাই—এখানকার অ্যাটমসফেয়ারটা বড় বাজে।

একদিন আমরা বেরিয়ে পড়লাম। একটা ট্রাকের ওপরে বসে চলে এলাম পোখারায়—নিজেকে বহুদিন—বহুকাল পরে বেশ যেন 'ফ্রি' মনে হচ্ছিল। বেশ বোহেমিয়ান—বোহেমিয়ান লাগছিল—

পোখারা। কাঠমাণ্ডুর পশ্চিমে একটি ছোট্ট সুন্দর শহর। একটি মাত্র বড় রাস্তা।

---

১ চেজিং দি ড্রাগন—অর্থাৎ হেরোইন গরম করে খাওয়া। এইভাবে খেলে যৌনকামনা তীব্র হয়ে ওঠে।

২. হিট—সেক্সুয়াল ইণ্টারকোর্স করার বা সঙ্গমের প্রবল বাসনা—

সেই রাস্তার ধার ঘেঁসে কাকচক্ষুর মত টলটলে জলের এক বিশাল দীঘি। স্থানীয় লোকরা তাকে বলে 'লেক'। লেকের জলে রাস্তার ধারের বাড়িগুলোর উল্টোছায়া বাতাসে থর থর করে কাঁপছে। লেকের ওপারে প্রহরীর মত দাঁড়িয়ে রয়েছে নীলাভ একটি পাহাড়। দীঘির ঠিক মাঝখানে শ্বেতপাথরের একটি মন্দির। সব মিলিয়ে মনে হয় যেন পোস্টকার্ডে আঁকা সুইজারল্যাণ্ডের কোন শহরের ছবি, যা তার বাবা একদিন তাকে ইউরোপ থেকে পাঠিয়েছিলেন।

রাস্তার ওপরেই খুব কম করে দশটা ছোট ছোট বেশ সস্তার হোটেল। মাথাপিছু ডেলি মাত্র দু'টাকা।

এইরকম একটা হোটেলে উঠে পড়ল তারা দুই বন্ধু। হোটেলের জানালা দিয়ে পাহাড়ের যেদিকে তাকানো যায় অপর্যাপ্ত গাঁজাগাছের অফুরন্ত বিস্তার। পোখারায় গাঁজার ওপরে আইনকানুনের কোন কড়াকড়ি নেই। দারুণ সস্তা হ্যাস।

অতএব এখানকার জাঙ্কিরা যা করে—তাই করে তাদের দিন কাটতে লাগল। রাত দিন দেদার অ্যাঞ্জেল ডাস্ট[1] খেয়ে একেবারে পুরো স্টোন হেড[2] হয়ে বসে থাকা—না হলে পটপাটিতে[3] রাতভোর নাচগানের হুল্লোড়ে মেতে থাকা—একটানা এই আনন্দের ভেতরে কানের কাছে ভোমরার বিরক্তিকর গুঞ্জনের মত একটা চিন্তা—বাবা কি পুলিশকে জানিয়েছেন—পুলিশ কি জানতে পেরেছে সে নেপালে আছে—কিন্তু সঙ্গে সঙ্গে ডোপের[4] একটা সট নিয়ে নিলেই বাড়ির সেই ফালতু চিন্তাটা মন থেকে উবে যায়।

দিন কাটছিল মহা-আনন্দে। জলের মত টাকাও খরচ হচ্ছিল। খরচের তো কোন দোষ নেই। দীনেশ এখন তো আর লারনার অ্যাডিক্টদের মত সেই হ্যাসিসে থেমে নেই। পোখারায় এসে সে মরফিন খেতে শুরু করেছে—সময় সময় জয় পাউডারও[5] ট্রাই করে থাকে। এসব হল মাদক জগতের কেষ্টবিষ্টু। খুব কস্টলি। হাই গ্রেড ড্রাগ—জাঙ্কিরা বলে ডিনামাইট[6] এই ডিনামাইটের পেছনেই সে টাকা উড়িয়েছে একেবারে ঝরাপাতার মত।

দীনেশ আর মার্ক দুজনে মিলে বসে ঠাণ্ডা মাথায় হিসেব করে দেখল, আর তিনচার দিনের ভেতরে টাকার ব্যবস্থা করতে না পারলে না খেয়ে থাকতে হবে।

তাই তো—কি করা। দুজনে ভাবতে বসল। প্রথমে কয়েকদিন এ দোকান, সে দোকানে সেলসম্যান এবং হোটেলে বয়ের কাজ খুঁজল তারা। কিন্তু দুজনেই পাঁড় নেশাখোর—কে দেবে তাদের চাকরি?

ইতিমধ্যেই ঘটে গেল আর এক বিপদ। মার্ককে পুলিশ ধরে নিয়ে গেল। তার পাশপোর্টে না কি গোলমাল আছে। কাঠমাণ্ডু থেকেই তাকে পাকড়ানোর জন্য ওঁৎ

---

(১) অ্যাঞ্জেল ডাস্ট—হ্যাস বা গাঁজা—রাস্তায় ঘোরা জাঙ্কিদের ভাষা।
(২) স্টোন হেড—গাঁজা টেনে বুঁদ হয়ে বসে থাকা।
(৩) পটপটি—গাঁজাখোরদের আড্ডা; (৪) ডোপ—গাঁজার আর এক নাম।
(৫) জয় পাউডার—হেরোইন (৬) ডিনামাইট—কড়াপ্রকৃতির ড্রাগ।

ওঙ্ক ছিল পর্নলিশ।

একেবারে একা। অগাধ জলে পড়ে গেল দীনেশ।

পোখারায় সন্ধ্যার অন্ধকার ঘোর হয়ে এল। লেকের মাঝখানে শিবমন্দিরে আরতির ঘণ্টা বাজতে লাগল—ঢং—ঢং—ঢং—

টাকা-পয়সা নেই। পকেট ধর্ধর্। খাওয়ার সংস্থান নেই। কি হবে পটপাটিতে গিয়ে? সেখানে গিয়ে গাঁজা টানলে তো তাদেরও পাল্টা দিতে হবে। কি করে দেবে?

ব্ল্যাস্ট পার্টিতে[১] বোধহয় যাওয়া ঠিক হবে না। সেখানে জাঙ্কিরা ড্রাগ খেয়ে রাতভোর নাচগান করবে, যার যত খর্শি সেক্স এনজয় করবে। সেই পার্টিতে ইয়ং জাঙ্ক মেয়েরাও তো ঝাঁকে ঝাঁকে আসে। তাদের কোন বাছ-বিচার নেই। (অতিরিক্ত ড্রাগ গিললে সেসবের বালাই থাকেও না)। যার সঙ্গে খর্শি, যতক্ষণ খর্শি পশর্র মত আদিম কামনার পাঁকে ডুব দেয়। আসলে ব্ল্যাস্টপার্টির মোদ্দা কথাই হচ্ছে—বল—To ball[২] কিন্তু—

এসব স্ফর্তি'টুর্তি তো ফোকটে হয় না। ট্যাকের জোর থাকা দরকার। তাই দীনেশ ঠিক করল ব্ল্যাস্টপার্টিতে সে যাবে না। কিন্তু আচমকা তার মনে পড়ে গেল—এই ব্ল্যাস্টপার্টিতে দেশবিদেশের অনেক জাঙ্কিরা আসে—তাদের কাউকে দিয়ে যদি তার কোন হিল্লে হয়ে যায়। তাই আশা নিরাশায় দর্লতে দর্লতে ব্ল্যাস্টপার্টির আলোকোজ্জ্বল আসরের দিকে আস্তে আস্তে পা ফেলে হাঁটতে লাগল। কিন্তু—

কয়েক পা যেতেই দাঁড়িয়ে পড়ল দীনেশ। দাঁড়িয়ে পড়তেই হল—হেঁড়ে গলায় উচ্চণ্ড সঙ্গীত আর তার সঙ্গে এলোপাথাড়ি জগঝম্পা বাজনার তুমর্ল শব্দে তার কানে তালা ধরে গেল। কেউ হ্যাস, কেউ মরফিন, কেউ হেরোইন আবার কেউ বা মারিজর্য়ানা খেয়ে জাঙ্কিরা মেয়েমরদে মিলে ধেই ধেই করে নেচে চলেছে। সেই সঙ্গে যে যার ভাষায় যেমন পারছে গান গেয়ে যাচ্ছে। ইংরেজী, ফরাসী, জার্মান, ইতালিয় স্প্যানিস সব মিলিয়ে যেন এস্প্যারেণ্টো বা বিশ্বজনীন একটা ভাষায় গানের মহড়া চলছে—

হর্র—রা—ফ্লিপ—চিক—এসে—গি—য়ে—ছে রে—গানবাজনার তুমর্ল শব্দকেও ছাপিয়ে আসর থেকে যেন ফুঁড়ে উঠল একটা উল্লসিত চিৎকার—হর্র—রা—ফ্লিপ—চিক—ক—ন—গ্র্যাচুলে—শান—

একটি নাদর্সনর্দর্স গোলগাল চেহারার যর্বতীকে ঘিরে জাঙ্কিরা কলরব করতে লাগল। এই মেয়েটিই ওদের ফ্লিপ চিক[৩]। কিন্তু ফ্লিপ চিক কেন? ভাল করে ঠাহর করে দেখল তাকে দীনেশ।

ছোট ছোট আর ধারাল নর্নের মত চোখ। ঘাড়ের ওপর দর্লছে ছোট ছোট

(১) ব্ল্যাস্টপার্টি—ড্রাগের নেশায় মত্ত জাঙ্কিদের সমাবেশ। সারারাত সেখানে নাচগান চলে এবং চলে অবাধ যৌনলীলা।

(২) 'বল'—Too ball—মৈথুন বা যৌনসঙ্গমে লিপ্ত হওয়া।

(৩) ফ্লিপ চিক—ক্রেজি—অর্থাৎ রগচটা বা আধপাগল।

কালো উসকোখুসকো চুল। হঠাৎ দেখলে মনে হয়—কালো কালো কতগুলো কেউটের বাচ্চা যেন তার ঘাড়ের ওপরে কিলবিল করছে—

এই আমার ওপরে শকুনের মত হুমড়ি খেয়ে পড়লি কেন দু'হাতে বুক চেপে ধরে পাগলির মত চিৎকার করে উঠল সেই ক্লিপচিক। তার লাল লাল দুটো ছোট ছোট চোখে যেন আগুন ঝরতে লাগল।

ভয়ে দু'পা পেছিয়ে গেল জাঙ্কিরা। তাদের বাজিংয়ের[১] ঘোরটাও যেন চটে গেল।

ক্যারোলে—মানি—টাকা--একজন কোনরকমে কি একটা বলতে যেতেই—

তুই তো ষাট টাকা নিয়ে বসে আছিস রে হারামজাদা কষে ধমক লাগাল ক্যারোলে, এক পয়সা সুদ দিসনি—আবার—

আমাকে আমাকে—

আমি তোমার সব শোধ দিয়ে দিয়েছি—জাঙ্কিরা হৈ হৈ করে করে উঠল।

ক্যারোলে একটা উঁচু ঢিপির ওপরে বসল ছোট বটুয়ার ভেতর থেকে করকরে নতুন নোট বের করে কাউকে পঞ্চাশ কাউকে ষাট আবার কাউকে একশো টাকাও দিতে লাগল। হঠাৎ দেখলে মনে হবে কোন দস্যুদলের সর্দারণীই বুঝি ডাকাতি করা টাকা তার সহযোগিদের বিলি করছে!

কত টাকা! দীনেশের বুকের ভেতরটা গুর গুর করে উঠল। হাত পাতবে না কি!

খোঁজখবর নিয়ে জানতে পারল দীনেশ—ক্যারোলে ইতালির মেয়ে। সুদের কারবার করে। ধার নিয়ে ঠিক মত শোধ না করতে পারলে গলায় পা দিয়ে টাকা আদায় করে। কিন্তু—

শুয়ে শুয়ে টাকা যে ধার দিচ্ছে ক্যারোলে, সে টাকাটা পাচ্ছে কোথায় থেকে? তার কোন স্পষ্ট উত্তর কোন জাঙ্কিই দিতে পারে না। কেউ বলে কোন ব্যবসা-ট্যবসা করে হয়ত; আবার কেউ বলে আরে চোরাচালানের পৃথিবী জোড়া চক্রের সঙ্গে মাগীর যোগাযোগ আছে—

টাকার খুব দরকার থাকলেও, এসব শুনে দীনেশের আর সাহস হয় না তার কাছে টাকা চাইতে। শুধু তাই নয়, আরো যেসব কথা কানে পড়ল তা সাংঘাতিক। পয়সাওয়ালা স্ফূর্তিবাজ লোকেরা যেমন নিত্যনতুন কেপ্ট রাখে—কয়েকদিন মজা লুটে তাকে তাড়িয়ে দেয়। তেমনি ক্যারোলেও কিছুদিনের জন্য এক একটা মরদ পোষে। একটু পুরনো হলেই তাকে ঘাড় ধরে বের করে দেয়।

না। টাকার দরকার তার যতই থাক, এইরকম মেয়েমানুষের কাছ থেকে সে টাকা নেবে না। বিদেশবিভুঁই। কোথায় কোন বিপাকে পড়ে যাবে।

কিন্তু সে না চাইলেও দীনেশের সঙ্গে তার যোগাযোগ হয়ে গেল। দীনেশ তার জিন্সের প্যান্ট, সার্ট, রুকস্যাক—যা যা ছিল—সর্বস্ব বিক্রি করে কিনেছিল কিছু হেরোইন, কিছু মরফিন এবং পর্যাপ্ত পরিমানে হ্যাস। আবার বেশ মার্জিন রেখে

---

(১) বাজিং—নেশার উগ্র অনুভূতি বা তীব্র ঘোর।

সেসব খুচরোখাচরা বিক্রির পেডলারদের কাছে বেচতে লাগল। দুটো পয়সা হতে শুরু করল। এমন সময়—

জানতে পারল, জাঙ্কিদের ফ্লিপচিক নাকি ড্রাগেরও কারবার করে। ভয়ে ভয়ে রগচটা মেয়েমানুষটার কাছে গেল। ড্রাগের ড বলতেই ক্যারোলের দুটো নরুণ চোখে হাসি ঝিকিয়ে উঠল, উত্তেজিত হয়ে বলল। কৈ—কৈ—কোথায় তোমার মাল নিয়ে এস—

দরদাম কিছুই করতে হল না। দীনেশকে অবাক করে দিয়ে বেশ চড়াদামে তার সব ড্রাগ কিনে ফেলল ক্যারোলে।

এইভাবে মাসখানেক কেটে গেল। লেনদেন করতে করতে ক্যারোলের সঙ্গে বেশ ভাবসাবও হল তার। কোনদিন হয়ত দীনেশের হাতের পেশিগুলো টিপে টিপে বলে বাঃ তোর হাতের মাসলগুলো তো দারুণ রে—তুই ব্যায়াম-ট্যায়াম করতিস না কি? আবার কোনদিন তার মাথার ঘন চুলে বিনি কাটতে কাটতে বলে ক্যারোলে—ইস—তোর মাথায় কী ঘন চুল!

কিন্তু যত ভাবভালবাসাই থাক, ক্যারোলে ব্যবসার ব্যাপারে দারুণ সেয়ানা। দীনেশ একদিন মুখ কালো করে এসে বলল, সেরা মাল পাইনি বলে কিনিনি—টাকাও খরচ করে বসে আছি—ক্রেডিটে কিছু ড্রাগ দেবে আমাকে—

যা ভাগ—ক্রেডিটে কোন বিজনেস ক্যারোলে করে না। খেয়ো কুকুরের মত দুর দুর করে তাড়িয়ে দিল ক্যারোলে। আবার কি মনে করে পিছু ডাকল—এই শুনে যা—

ভয়ে ভয়ে কাছে এল দীনেশ।

ওরে ফোকটে কোন কাজ আমি করি না—আলত করে তার চিবুকটা ধরে ঝাঁকিয়ে দিয়ে বলল ক্যারোলে। হঠাৎ তার কানের কাছে মুখ নিয়ে এসে চাপা—খুব চাপা গলায় ফিসফিস করে বলল—

শোন আমার সঙ্গে পর-পর তিনরাত্রি থাকতে হবে তোকে—আমার সঙ্গে বল[১] করে আমাকে স্যাটিসফাই করতে হবে—

না—না—ওসব আমাকে দিয়ে হবে না—বলেই ছুটতে লাগল দীনেশ। তার কান-দুটো লাল হয়ে উঠছে। মাথার ভেতরটা ঝাঁ ঝাঁ করছে।

শোন—শোন—এইভাবে চলে যাস না ভাল হবে না বলছি—চিৎকার করে শাসিয়ে দিল ক্যারোলে।

ভয় পেয়ে থেমে গেল দীনেশ। সাংঘাতিক মেয়েমানুষ। কোথায় কি করে বসবে। গুটি গুটি ফিরে এল সে।

তখনো কামনার জ্বালায় ক্যারোলের চোখদুটো দপদপ করছে। কিন্তু শান্ত সংযত কণ্ঠে শুধু বলল দীনেশকে—তুই খুব ভাল ছেলে—বলেই ব্লাউজের ভেতরে হাত ঢুকিয়ে একটা পলিথিনে মোড়া প্যাকেট বের করল। এদিকে ওদিকে তাকিয়ে চাপা গলায় বলল, তাহলে তুই আমার এই কাজটা করে দে—এই প্যাকেট নিয়ে

(১) বল—সেক্সুয়াল ইণ্টারকোর্স বা যৌনসঙ্গম।

কাঠমাণ্ডু-পোখারা রোডের মোড়ে যাবি। একটা গাড়ি—মারুতির স্টেশন ওয়াগন এসে দাঁড়াবে—একটু থেমে আবার বলল, তার ড্রাইভারকে এই প্যাকেটটা দিয়ে দিবি—পারবি না?

কি আছে? চোরাই মাল!

মুখে আঙুল চাপা দিল ক্যারোলে। বলল—নো কোশ্চেন—কাজটা করে এস—রেমুনারেশন পাবে—

এইভাবেই দীনেশ ক্যারোলের ড্রাগের স্মাগলিং-এর সহযোগি হয়ে উঠল। কিন্তু একদিন এমন একটা ভয়ানক কাণ্ড ঘটে গেল যে দীনেশকে পোখরা ছেড়ে পালাতে হল—এই পর্যন্ত বলে চুপ করে গেল দীনেশ। তাকে কেমন অবসন্ন আর ক্লান্ত মনে হচ্ছিল।

বেশ খানিকক্ষণ চুপ করে থেকে আবার মাথা নিচু করে আস্তে আস্তে বলেছিল, ড্রাগঅ্যাডিক্ট হয়ে দেশবিদেশের জাঙ্কিদের সঙ্গে মেলামেশা করে কত আশ্চর্য অভিজ্ঞতা যে হয়েছে—সব আপনি লিখে শেষ করতে পারবেন না স্যার—

তুমি বলে যাও না—লেখার দায়িত্ব তো আমার—

দীনেশ বুঝতে পেরেছিল দারুণ গাড্ডায় পড়ে গিয়েছে। যে কোনদিন—যে কোন মুহূর্তে কপের[১] খপ্পরে পড়তে হবে। কিন্তু ক্যারোলের খাঁচা থেকে ছাড়া পাওয়ার কোন উপায়ও তো নেই—খাবে কি?

তবুও—তবুও দীনেশ কোন একটা ছুতো ধরে পালাতে চেষ্টা করছিল অনেক কারণে। প্রথম হল ক্যারোলে যেমন পয়লা নম্বরের ক্রোকার[২] তেমনি হার্ডস্টাফের[৩] পাকা নেশাড়ু। কিন্তু মরফিন কি হেরোইন যাই থাক—গান[৪] ছাড়া তার চলে না। তার ক্ষতবিক্ষত হাত দুটোর দিকে তাকালে বুঝতে পারা যায় ব্লোয়িং দি ভেইনের[৫] নমুনা। অতএব সবসময় তার দেহেমনে জ্বলছে হিট[৬]।

যখন তখন তাকে বড় জ্বালাতন করত ক্যারোলে। প্রায়ই যেন তার বুকের ভেতরের অসহ্য জ্বালায় জ্বলতে জ্বলতে বলত আজ পর্যন্ত এমন একজনও মরদ পেলাম না যে বলে আমাকে তৃপ্তি দিতে পারে।

আর একটা কারণ হল সবচেয়ে বিপজ্জনক। ক্যারোলের ডেরার আশেপাশে কপদের আনাগোনা শুরু হল।

সেদিন সকাল থেকেই ক্যারোলে কেন যেন ছটফট করছিল। ভরদুপুরে ঝড়ের

---

(১) কপ—জাঙ্কিরা পুলিশকে কপ বলে।
(২) ক্রোকার—ড্রাগের চোরাকারবারি।
(৩) হার্ডস্টাফ—হেরোইন, কোকেন এবং মরফিন অর্থাৎ কড়া ড্রাগ।
(৪) গান—ইনজেকশনের সূচ আর সিরিঞ্জ।
(৫) ব্লোয়িং দি ভেইন—বার বার ইনজেকশান দিতে দিতে শিরা ফেটে যাওয়া।
(৬) হিট—ড্রাগের প্রভাবে যৌনকামনার তাগিদ।

মত ছুটে বেরিয়ে এল পোখারার বাজারের দিকে। আবার কিছুক্ষণ পরই হন্তদন্ত হয়ে ফিরে এসে চাপা গলায় ফিস ফিস করে বলল, শোন এখানকার পাততাড়ি গুটিয়ে আমি কাঠমাণ্ডু চলে যাচ্ছি—রাত আটটায় গাড়ি—তুই সঙ্গে থাকলে ভাল হয়—বলতে বলতেই তার জিনিসপত্র গোছগাছে ব্যস্ত হয়ে পড়ল। আবার উত্তেজিত দ্রুত কণ্ঠে বলল—এখন তোর হোটেলে চলে যা—ঠিক সাতটা নাগাদ চলে আসবি—

সন্ধ্যার অন্ধকার নেমে এল পোখারা শহরে। লেকের ধারে সেই উঁচু পাহাড়টাকে আকাশের গায়ে আঁকা অতিকায় ঘাতকের মুখের মত মনে হতে লাগল। ঠিক সাতটার মুখে মুখে ক্যারোলের বাড়ির সামনে আসতেই দীনেশের বুকের ভেতরটা ধক করে উঠল।

বাড়ি ঘেরাও করেছে পুলিশ। সঙ্গে সঙ্গে টুক করে অন্ধকারে অদৃশ্য হয়ে গেল দীনেশ। ক্যারোলের ঘরের পিছনে ঠিক জানালার নিচে পচা জলের নর্দমার ওপরে বসে রইল সে।

পুলিশরা ক্যারোলের ঘরের জিনিসপত্র লণ্ডভণ্ড করে খানাতল্লাসী করছে। আর থেকে থেকেই অসুরের মত চিৎকার করে বলছে এই মাগী কোথায় রেখেছিস সেই মাল—বের কর—

বলছি তো আমি সুদের কারবার করি—হিংস্র আক্রোশে চিৎকার করে বলছে ক্যারোলে ওসব জিনিস আমি কখনো চোখে দেখিনি—

সোজা আঙুলে ঘি উঠবে না—হেডকনস্টেবল ঘেঙিয়ে হাসতে হাসতে বলল। তার সঙ্গীদের চোখের ইসারা করল। তারা ছুটে এসে শক্ত করে ক্যারোলের হাতদুটো দড়ি দিয়ে বাঁধল। মুখে অল্প করে কাপড় গুঁজে দিল, যেন চিৎকার করতে না পারে। চোখদুটো মোটা তোয়ালে দিয়ে বেঁধে দিল।

বাইরে ঘন অন্ধকারে দীনেশের বুকের ওপর দিয়ে যেন রেলগাড়ির চাকা চলেছে গুরু গুরু ধ্বনি তুলে। তারপর পুলিশরা যা করল তাতে লজ্জায় ভয়ে উত্তেজনায় একেবারে মাটির সঙ্গে মিশে গেল দীনেশ।

চারিদিকে পুলিশ। পালাতে গেলেই ধরে ফেলবে। তাই বাধ্য হয়েই তাকে দেখতে হয়েছিল সেই লজ্জাকর বিভৎস দৃশ্য।

সেই পুলিশী কাণ্ডকারখানার কথা আজকেও খোলাখুলি বিশদ বলতে পারেনি দীনেশ। আমি বয়স্ক মানুষ। হয়ত তার শালীনতায় বেধেছিল। ঠারে-ঠুরে, আকারে, ইঙ্গিতে, আভাসে যেটুকু বলতে চেষ্টা করেছিল আর তা থেকে যা বুঝতে পারা গিয়েছিল তা এখানে বলা হল—

ক্যারোলের স্কার্ট এবং জাঙ্গিয়া খুলে পুলিশ তাকে পুরো উলঙ্গ করেছিল। স্কার্টের দুদিকের পকেট তন্ন-তন্ন করে দেখল—কিছু পেল না। হেডকনস্টেবল মরিয়া হয়ে ক্ষিপ্ত জন্তুর মত বলল, এখনো বল মাগী—মাল কোথায় রেখেছিস ?—

বলছি তো আমি ওসব করি না—

কিন্তু তার কথা শেষ হওয়ার আগেই একটা সাংঘাতিক কাণ্ড করে বসল হেডকনস্টেবল। ইউট্রাস বা জরায়ুর ভেতরে দুটো আঙুল চালিয়ে দিয়ে টেনে বের করে নিয়ে এল টেস্টটিউবের মত দেখতে ইঞ্চি চারেক লম্বা একটা নল—কনডম! সেটা ভেঙে ফেলতেই বেরিয়ে পড়ল—সবচেয়ে খাঁটি হেরোইন—

হেলথি নং ৪ (Healthy No. 4)।

তার শতকরা ৯৬ ভাগই খাঁটি। ড্রাগের ম্যানুয়েলে লিখছে—Very rare. Sold some—Smoked some—। ওজন করে দেখল পুলিশ—৫ গ্রামের কিছু বেশি।

দীনেশ সঙ্গে সঙ্গে অন্ধকারের সঙ্গে নিজেকে মিশিয়ে ছুটল পোখারা বাস স্টাণ্ডের দিকে। রাস্তার ধারে একটা ট্রাক দাঁড়িয়েছিল। তার ওপরে উঠে মাল ঢাকা দেওয়া ত্রিপলের নিচে শুয়ে থাকল।

কিছুক্ষণ পরেই গাড়ি চলতে শুরু করল। ভোরে পেঁছে গেল কাঠমাণ্ডু। শিখ ড্রাইভার তাকে দেখেই খেপে উঠল। কুৎসিত ভাষায় গালাগাল করতে শুরু করল।

দীনেশ তার অবস্থার বিবরণ দিয়ে যেই বলল সেও শিখ, অমনি ড্রাইভার—সর্দারজীর রাগ জল হয়ে গেল।

তিন মাস পর কাঠমাণ্ডুতে ফিরে এল দীনেশ।

তার কয়েকদিন পরেই ফ্রেকস্ট্রিটের সেই ঘটনা। সন্ধ্যার অন্ধকার ঘন হয়ে নামছিল। ফ্রেকস্ট্রিট ধরে হন হন করে হাঁটছিল সে। যেই বাহাদুর চরস ডিপোর কাছে এল অমনি—

স্যার—প্লীজ হ্যাভ এ মার্সি ফর মি, চিঁ চিঁ করে বলল এক মেমসাহেব—গিভ মি অ্যাট লিস্ট ওয়ান রুপি—স্টাভিং হোল ডে—

সেই মেমসাহেব যার নীল শিরা ওঠা হাত দুটো ইনজেকশানের সুঁচে ক্ষতবিক্ষত এবং ফুলো ফুলো, যার সারা গায়ে খোসপাচড়ার দগদগে ঘা—দোকানের আলোয় তার মুখ ভাল করে দেখেই হু হু করে উঠেছিল দীনেশের বুকের ভেতরটা।

মেয়েটি আর কেউ নয়—

স্থু!

প্রচণ্ড ব্যাভিচারি উচ্ছৃঙ্খল জীবনের পরিণাম।

আট

সুইডেনের মেয়ে সু। ইতালির উদ্দাম যুবতী ক্যারোলে—ফ্রাস্ট্রেট। ফ্রাস্ট্রেশান ছাড়া কি ড্রাগের শিকার হওয়ার আর কোন কারণ নেই।

এই পর্যন্ত লিখে পাণ্ডুলিপি জমা দিতে হল কলকাতার সেই বিখ্যাত সমাজসেবী সংস্থার কাছে। বলাবাহুল্য আমার মনে বিলক্ষণ দ্বিধা ছিল। সংকোচ ছিল—

কলকাতার সেই মাদক প্রতিরোধের সভায় কাশীর সেই ডাকসাইটে এবং ডি—অ্যাডিকশান ক্লিনিকের ইনচার্জ গীতাদেবীর সঙ্গে পরিচয়। আর তাঁর মাধ্যমেই দশাশ্বমেধঘাটের সেই হ্যাণ্ডলুমের দোকানের মালিকের ছেলে দীনেশ যাজ্ঞির সঙ্গে আলাপ এবং ঘনিষ্ঠতা।

দীনেশ যাজ্ঞি!

সেই দীনেশ বেশ পয়সাওয়ালা ঘরের ছেলে। সঙ্গ দোষে এবং কিছুটা মা বাবার ওপরে অভিমানেই ড্রাগের শিকার হয়েছিল। তার নেশাখোর জীবনের অভিজ্ঞতাও তার ঝুলিতে ছিল প্রচুর। শুধুমাত্র সেই দীনেশের মুখেই তো ঝাল খাওয়া হয়েছে। আর কোন ড্রাগ অ্যাডিক্টের কোন কথাই নেই—সেইজন্যেই আমার মনে একটা অস্বস্তির কাঁটা বিঁধছিল।

যা ভেবেছি তাই। সমাজসেবী সংস্থার ডিরেক্টর স্ক্রিপ্ট পড়ে বললেন—এর সবটুকুই তো দীনেশ যাজ্ঞির এক্সপিরিয়েন্স—আর কোন অ্যাডিক্টের কথাই নেই, থেমে গেলেন তিনি।

পরে অবশ্য ভেবে ভেবে আরও অনেক কথাই জানিয়েছিলেন। যেমন জিল, চিকাগোর মেয়ে! বেশ বড়লোকে। কিন্তু তার বাবা তার মেয়ের ওপরে অকারণে অত্যাচার করত। খামোকা মারধোর করত। বাড়িতে শান্তি নেই। কি করে—কোথায় যায়—এমন সময় তার এক বন্ধু এসে তাকে হ্যাস ধরাল।

মারাঠি খ্রীস্টান যুবক জোসেফ বিশ্বনাথ দাতার। অত্যন্ত বেশি অ্যাম্বিশান ছিল। উচ্চাশার ঘোড়া ছুটিয়ে যেতে যেতে পা মচকে গিয়েছিল। শুধু তার কল্পনার রথ কোন নিরুদ্দেশ শূন্যে উধাও করিয়ে দেওয়ার জন্যই নেশা করতে শুরু করেছিল। আর দীনেশের সংস্পর্শে যত দেশিবিদেশী অ্যাডিক্ট এসেছিল—সেই কোকেনখোর রব, ইতালির মেয়ে ড্রাগ স্মাগলার ক্যারোলে, সুইডেনের মেয়ে সু, জার্মান মেয়ে প্যান্ট, ইতালির লুস, নিউজিল্যাণ্ডের মার্থা থেকে শুরু করে গীতা রায়ের চেম্বারের সেই লুনাটিক ইয়ং মেয়ে সরস্বতীয়া পর্যন্ত—সব—সব ফ্রাস্ট্রেটেড! বর্তমান জীবনে বীতশ্রদ্ধ এবং হতাশ হয়ে তারা নতুন কিছু পাওয়ার আশায় ড্রাগ ধরেছিল।

কিন্তু ড্রাগের খপ্পরে পড়ার এই একটাই কি কারণ? নিশ্চয়ই আরও অনেক—অনেক রিজন আছে—এই পর্যন্ত বলে থামলেন সংস্থার—অধ্যক্ষ।

শুনুন—আপনাকে আরও ঘুরতে হবে, যেখানে যেখানে অ্যাডিক্টদের বেশি আনা-গোনা—সেই গোয়া। গোয়ার বিভিন্ন সী বীচ, মানালি, দিল্লী ইত্যাদিতে যে যে অ্যাডিক্টদের সঙ্গে মিট করে তাদের কথাও লিখতে হবে। ডিরেক্টর একটু থেমে আবার বললেন, তাহলে বইখানা বেশ কমপ্রিহেনসিভ হবে—

আবার কিসের যেন গভীর চিন্তার ভেতরে তলিয়ে গেলেন বহুদর্শি সমাজসেবী অধ্যক্ষ অপূর্ব চন্দ। তাঁর যেমন ব্যাপক পড়াশুনা, তেমনি অত্যন্ত বিদগ্ধ মানুষ।

দূরে ওয়েলফেয়ার সোসাইটি বা সমাজ কল্যাণ সমিতির বাড়িটার দেওয়ালে লাল কালিতে বড় বড় করে লেখা—মাদক মানে ক্ষয়* ক্ষয় মানে মৃত্যু—কথাগুলোর দিকে অপলক চোখে তাকিয়ে কেমন ছাড়া ছাড়া গলায় বললেন, আর বেনারসের সেই সাই-ক্রিয়াটিস্ট মহিলা ডক্টর রায়ের সঙ্গে আপনার আলোচনার সময় আপনি যে বলেছিলেন stainly Einstein সাহেবের লেখা Beyond the Drugs থেকে কি যেন কথাটা—ও হ্যাঁ—ড্রাগটা কারণ নয়, আমি সূত্র ধরিয়ে দিলাম—মাদকসেবী ড্রাগ ধরার আগে কেমন ছিল তার জীবনযাত্রা এবং পরে কেমন জীবন কাটাবে তার ওপর নির্ভর করবে তার ভবিষ্যৎ—

তাহলেই দেখছেন, আরো বেশি করে—আরো ইন্টিমেটলি অ্যাডিক্টের সঙ্গে মিশতে হবে। চন্দসাহেব মাথা ঝাঁকিয়ে বললেন, আমাদের এই বইটিকে আরো বেশি করে কনস্ট্রাক্টিভ আউটলুক নিয়ে লিখতে হবে—একটু থেমে আবার নিজের ভেতরে ডুব দিয়ে বললেন আপনি বেরিয়ে পড়ুন—

ফ্রেকদের জানতে হলে, আপনাকে যেতে হবে গোয়ায়—

দীনেশের কথাগুলো কানের কাছে বাজতে লাগল। গোয়ার আনজুনা বীচ হল প্যারাডাইজ অফ দি জাঙ্কিস—

শুধুই নেশাখোরদের আকর্ষণে নয়। গোয়ার উদ্দেশে পাড়ি দেওয়ার আরও একটি সূত্রও ছিল। পানজিম ভেটারীনারি ইনস্টিটিউটের ডেপুটি ডিরেক্টর অসীম—অসীম ভট্টাচার্য আমার ছোট ভাই। সে অনেকবার গোয়ায় আসতে লিখেছিল। প্রায় প্রত্যেক চিঠিতেই লিখত—একবার এসেই দেখুন—এখানকার সী বীচের ন্যাচারাল বিউটি দেখলে চোখ জুড়িয়ে যাবে—

শুধু—তাই নয়। যাওয়ার ডাইরেকশানও দিয়েছে একেবারে ছবির মত। কলকাতা থেকে বোম্বে মেলে (ভায়া নাগপুর) আসবেন। বোম্বাই থেকে গোয়ায় আসার দুটো ট্রেন। একটা সকালে আর একটা বিকেলে। ট্রেনে এলে মাঝপথে মিরাজ জংশন স্টেশনে নেমে ছোট লাইনের গাড়ি ধরতে হবে। এই ট্রেন আপনাকে মারগাঁও বা ভাস্কো-ডা-গামা স্টেশনে পেঁছে দেবে। এখান থেকে ৩২ কিলোমিটার দূরে পানজিম।

আরও জানিয়েছিল অসীম—বোম্বাই থেকে ডাইরেকটলি জাহাজেও আসা যায়। জাহাজ একেবারে পানজিমের ঘাটেই ভিড়বে। সেখান থেকে একটা ট্যাক্সি নিয়ে

বলবেন—আলতিনো (Altinho) গভর্ণমেণ্ট কোয়াটার্স চল। সময় লাগবে মাত্র দশ মিনিট।

আলতিনো গোয়ানিজ ভাষা। মানে পাহাড়। আমরা পাহাড়ের ওপরে থাকি। আলতিনোতে মাইক্রো ওয়েভ টাওয়ারের পাশ দিয়ে রেডিও স্টেশন বাঁয়ে রেখে কমিউনিটি হল, পোস্টঅফিস ছাড়িয়েই পলিটেকনিক হোস্টেল। এই হোস্টেলের ঠিক পেছনেই আমাদের ফ্ল্যাট। ডি টাইপ কোয়াটার্স, নম্বর—১১ ইংরেজিতেও লিখে দিয়েছে—

D/11/c Govt Flat ALTINHO. PANAJI

সবশেষে অসীম লিখেছে—দাদা আপনি কবে আসছেন, কোন্ ট্রেনে আসছেন জানিয়ে পত্রপাঠ চিঠি দেবেন। গোয়ায় আপনাদের কোন অসুবিধা হবে না—বৌদিকেও নিয়ে আসবেন—

এমন আন্তরিক আমন্ত্রণ। আর মনের ভেতরে যেন প্রেতলোকের ছায়ামূর্তির মত জাঙ্কিরাও আনাগোনা করছিল। অতএব—

গোয়ায় রওনা হতেই হল। হাওড়া স্টেশনেই দেখলাম দল বেঁধে বেশ হৈ হৈ করতে করতে হিপিসাহেব-মেমদের একটা গ্রুপ বোম্বে মেলে চেপে বসল। তাদের লম্বা লম্বা জটধরা নোংরা চুলের রাশি পিঠের ওপরে দুলছে। পুরুষদের পরণে ফুটবলারদের মত শর্ট বা অত্যন্ত ছোট হাফপ্যাণ্ট। আর তাদের বেশির ভাগেরই খালি গা। মেয়েদের বেশবাসও এত অপ্রতুল যে তাকাতেও লজ্জা হয়।

আমার চোখের সামনে যেন দীনেশের সেই অদ্ভুত অভিজ্ঞতাগুলো একে একে যেন এক একটা প্রেতের মত মিছিল করে যেতে লাগল। সেই কোকেনখোর রব, যে গানে বাজনায় নিপুণ কিন্তু বেঘোরে প্রাণ দিতে হয়েছিল আর এক কোকেন অ্যাডিক্টের হাতে। সেই নিদারুণ উচ্ছৃংখল আর ব্যভিচারি মেয়ে সু, ইতালির মেয়ে ক্যারোলে যে তার গোপনাঙ্গে চোরাই হেরোইন রেখেছিল। এই বিদেশী মেয়েপুরুষের দল কি তাদেরই সমগোত্রীয়? কিসের আশায় আর কিসের দুর্বার আকর্ষণে আর কিসেরই বা মোহে এরা ঘরের নিশ্চিন্ত সুখের জীবন ছেড়ে পথে বেরিয়ে আসে। এরা কি সবাই মাদকসেবী? এসব সাতপাঁচ ভাবতে ভাবতেই কখন যে ঘুমের ঢেউ এসে তলিয়ে নিয়ে গিয়েছে আমাকে বলতে পারব না—

ঘুম ভেঙ্গে গেল। ঘুম ভাঙ্গল দারুণ একটা গোলমালে। মনে হল, কোন একটা স্টেশনের প্লাটফর্মে গাড়ি দাঁড়িয়ে রয়েছে। আর শেষ রাতের ফিকে অন্ধকারে যেন কতগুলো ছায়ামূর্তি এদিকে সেদিকে ছুটোছুটি করছে। মনে হল আমি যেন বহু-বহুদূরের কোন অজানা গ্রহে এসে পড়েছি।

জড়তা কাটিয়ে নেমে দেখি হৈ হৈ কাণ্ড। এক স্মাগলার ধরা পড়েছে। ড্রাগ স্মাগলার। তার জুতোর সুখতলির নিচে ছিল ২০০ গ্রাম গাঁজা। সেই একই লোকের রুকস্যাকের ভিতরে ছিল আরও ৮০০ গ্রাম গাঁজা। যার ভেতরে ভাঁজ করে বিছানাপত্র যাবতীয় জিনিস নেওয়া যায়।

ভিড়ের ভেতরে উঁকি দেয়ে দেখি সেই হিপিসাহেবদের ভেতরে যে সবচেয়ে বয়স্ক এবং বেশি বোম্বা বোম্বা চেহারা সেই লোকটাই আসামী। তারই রুকস্যাকে বেআইনি হ্যাস পাওয়া গিয়েছে।

পুলিশ তাকে জেরা করছে।

তার চারদিকে ভিড় জমেছে।

সাহেবের কিন্তু সেসব দিকে কোন ভ্রূক্ষেপই নেই। বামাল ধরা পড়ে একটা প্যাকিংবাক্সের ওপরে বসে মিটি মিটি হাসছে।

জলগাঁও স্টেশনের রেলপুলিশ তাকে মহারাষ্ট্র স্টেট এক্সসাইজ পুলিশের কাছে চালান করে দিয়ে গাড়ি ছেড়ে দিল। প্রায় হাজার গ্রাম গাঁজা নিয়ে সাহেব কোথায় যাচ্ছিল—বোম্বাই?

হয়ত বোম্বাইতে চড়া দামে হ্যাস বিক্রি করে ব্রাউন সুগার বা হেরোইন কিনবে, কি কিনবে এল.এস ডি কিম্বা আর কোন দামী ড্রাগ!

যাক এই সাহেবের সঙ্গে কয়েকদিন পরেই পুরানো গোয়ার প্রাচীন ক্যাথেড্রালে হঠাৎ দেখা হয়ে গিয়েছিল। কথায় কথায় আলাপ পরিচয় এবং যথেষ্ঠ ঘনিষ্ঠতাই হয়েছিল।

গোয়ার পর্তুগীজ গভর্ণর আলবুকেরখিব তৈরি সেই প্রায় চারশো বছরের পুরনো গীর্জার পবিত্র আর শান্ত সমাহিত পরিবেশে বসে সেই সাহেব—ইতালির কোন শহরের কলেজের অধ্যাপক ম্যাসিমোর বিচিত্র জীবন বৃত্তান্ত শুনে আমার মনে হয়েছিল—মনে হয়েছিল—ধর্ম বুঝি আর মানুষকে ধারণ করতে পারছে না। আর পারছে না আশ্রয় দিতে। আস্তে আস্তে ধর্মের সংজ্ঞা বা ডেফিনিশনও বুঝি এখন পাল্টে যাচ্ছে—

কিন্তু থাক ম্যাসিমোর কথা। নির্বিঘ্নেই বোম্বাই পেঁাছে গেলাম। জাহাজেই গোয়া যাওয়া ঠিক করলাম। কথায় কথায় দীনেশ একদিন বলেছিল ফ্রেকদের দল হৈ হৈ করে সাধারণত জাহাজেই যায়। দেশবিদেশের জাঙ্কিদের সান্নিধ্যে যেতে পারব মনে করে আমি ভি. এস. ডেম্পো অ্যান্ড কোম্পানির জাহাজেই গোয়ায় রওনা হলাম।

ডকের ঘোলা জলে রাজ্যের নোংরা ভাসছে। দূরে—বহু দূরে আরব সমুদ্রের জলে স্বচ্ছ নীলিম আভাস। ঢং ঢং-ঢং—তিনটি ঘণ্টা বাজল। সশব্দে নোঙর তোলা হল। জাহাজের নিচে জলে প্রচণ্ড আলোড়ন উঠল।

জাহাজ চলতে লাগলে।

দূরে ক্রমশ বিলীয়মান বোম্বাই শহরের আকাশ ছোঁয়া বাড়ি বা স্কাইস্ক্র্যাপারগুলোকে আকাশের গায়ে আঁকা ছবির মত মনে হচ্ছে। এক এক টুকরো বরফের মত সাদা ধবধবে সীগালগুলো উড়ে উড়ে চলন্ত জাহাজটিকে অনুসরণ করছে। হঠাৎ দেখলে মনে হয় সাগর পাখিগুলো যেন বাতাসে ভেসে ভেসে আসছে। আবার হঠাৎ থেকে থেকে তাদের কেউ কেউ সাঁকরে সমুদ্রের জলে ডাইভ দিয়ে মাছ ধরছে।

সেই বিপুলব্যাপ্ত আকাশের নিচে দূরদিগন্ত পর্যন্ত প্রসারিত সাগরের নীল জলরাশি

—সেই মহিমাময় বিশাল পটভূমিতে দাঁড়িয়ে মনটা কেমন উদার একটা অনুভবের ভেতরে আবিষ্ট হয়ে গিয়েছিল। ভুলে গিয়েছিলাম—সম্পূর্ণ বিস্মৃত হয়ে গিয়েছিলাম —কলকাতা থেকে গোয়ায় পাড়ি দেওয়ার উদ্দেশ্যই হল—জাঙ্কিদের স্টাডি করা, তাদের জীবনের ট্রাজেডির ইতিবৃত্ত জানা—কিন্তু—

আবার বাস্তবতম পরিবেশে ফিরে এলাম। ফিরে আসতেই হল। জাহাজের ইঞ্জিনের শব্দকেও ছাপিয়ে কানে এল এক উদ্দাম অর্কেস্ট্রার আওয়াজ। সেই সঙ্গে টুকরো টুকরো কথার ফাঁকে ফাঁকে হো হো করে অট্টহাসি।

কী ব্যাপার?

এদিকে-ওদিকে তাকাতেই নজরে পড়ল, লোয়ার ডেকে বসে এক ছোকরা সাহেব গাঁজা টানছে। তার পাশেই হয়ত তারই বেশ দামী রেকর্ড প্লেয়ারে ক্যাসেট বেজে চলেছে।

হ্যাসের উগ্র গন্ধ পেয়ে জাহাজের আর সব ফ্রেক গুটি গুটি জুটে গেল তার কাছে। তাকে ঘিরে গোল হয়ে বসে পড়ল তারা। রীতিমত হ্যাসের আসর বসে গেল জাহাজের ডেকে। বাজনা বাজছে।

বাজনার তালে তালে জাঙ্কিরা মাথা দোলাচ্ছে। কেউ কেউ আবার বেসুরো গলায় গান ধরেছে। আর প্রত্যেকের হাতে হাতে গাঁজার কল্কি ঘুরছে। বেশ কয়েক ছিলিম টেনে একেবারে স্টোনহেড হয়ে বসে আছে।

পশ্চিমের আকাশে রঙের সমুদ্রে ডুব দিয়ে সূর্য অস্ত যাচ্ছে। সাগরের জল তরল অগ্নিধারার মত জ্বলছে! আর কখনো লাল, কখনো নীল, কখনো সবুজ, কখনো বেগুনি আরও কত রকমের রঙের সমারোহ। আশ্চর্য আর অপরূপ হয়ে উঠল সাগরের জলরাশি।

দেখতে দেখতে শকুনের মত ডানা মেলে নেমে এল সন্ধ্যার অন্ধকার। তখনও পশ্চিমের আকাশে কুমকুমের টিপের মত জ্বলজ্বল করছে সূর্যাস্তের রক্তিম আভা।

সন্ধ্যার ম্লানায়মান অন্ধকারে জাঙ্কিদের নিকষ কালো ছোপের মত এক একটি ছায়ামূর্তির সেই জটলার দিকে তাকিয়ে আমার মনে হয়েছিল—এরা যেন বহু-বহু দূরের কোন অজানা গ্রহ থেকে নেমে এসেছে। এদের কোন দুশ্চিন্তা নেই, দুঃখ নেই, শোক নেই, নেই কেন হতাশা।

রেকর্ড প্লেয়ার বেজে চলেছে।

একটু একটু করে অন্ধকার ঘন হচ্ছে।

সাগরের বিশাল জলরাশি অন্ধকারে একটা ভোঁতা ছুরির মত ঝিকমিক করছে। কোথায় থেকে যেন ছায়াবাজির মত ছবির মত বেরিয়ে এল জোড়ায় জোড়ায় জাঙ্কি যুবক-যুবতীরা। এল হাতে হাত রেখে। গায়ে গা দিয়ে। কেউ কেউ আবার সঙ্গসুখের সঙ্গীনিকে বুকের ভেতরে জড়িয়ে ধরে অনর্গল কথা বলে চলেছে। তাদের হাসিতে কজনে গোটা ডেকটাই যেন কেমন মোহাচ্ছন্ন হয়ে উঠেছে।

আমার মনে হল যেন তারায় ভরা আকাশের নিচে সাগরের বুকে যেন জীবনের এক

বর্ণাঢ্য উৎসব শুরু হয়েছে, যে জীবন অফুরাণ আনন্দের, নিরবিচ্ছিন্ন সুখের—

ওদের দিকে তাকিয়ে কি দেখছেন ?

চমকে উঠলাম। আমার সামনে দাঁড়িয়ে সেই সাহেব, যে একটু আগে হ্যাসের নেশায় বুঁদ হয়েছিল। আশ্চর্য তার চোখেমুখে এতটুকু জড়তা নেই, নেই কোন ঘোর ঘোর আচ্ছন্নতা !

তার ঝকঝকে দুটো নীল চোখে খরদৃষ্টির প্রদীপ জেলে আমাকে কয়েক মুহূর্ত স্টাডি করে আস্তে আস্তে বলল, মনে হচ্ছে আপনি অ্যাডিক্টদের সম্বন্ধে ইন্টারেস্টেড, হঠাৎ থেমে গেল সে।

আপনার নিশ্চয়ই মনে হচ্ছে এরা কত সুখী, তাই না ? একটু থেমে আবার যেন ব্যঙ্গ করেই বলল, বেশ রোজি আর রোমান্টিক লাইফ এদের—

আপনার নাম ?

আমার কথা যেন শুনতেই পেল না। নিজের ভেতরে ডুবে থেকেই বলতে লাগল ; কিন্তু কি টেরিবল মিজারী—কী ভয়ানক দুঃখকষ্টে যে ছেয়ে থাকে এদের জীবন। সেই কষ্ট—সেই যাতনাকে এরা রঙীন নেশার আবরণে ঢেকে রাখে—

কিন্তু যদি কিছু মনে না করেন, তাহলে বলি। আপনিও তো অ্যাডিক্ট—

কী ! ধক করে জ্বলে উঠল তার চোখদুটো। নাটুকে ঢং-এ কোমরে হাত দিয়ে ডাইনে-বাঁয়ে দুলে দুলে আস্তে আস্তে ফিস ফিস করে বলল, আজ্ঞে স্যার—আমি গাঁজা খাই বটে—কিন্তু কখনো স্টোণ্ড হই না—একটু থেমে বিচারকের মত গম্ভীরকণ্ঠে বলল আবার, সো—আই অ্যাম নট অ্যাট অল অ্যাডিক্টেড--

আমি অবাক।

আমার ভ্যাবাচাকা খাওয়া মুখের দিকে তাকিয়ে হেসে বেশ সহজভাবে বলল, কী ব্যাপার আপনি আকাশ থেকে পড়লেন যে—

আলাপ হয়েছিল। বেশ ঘনিষ্ঠতাই হয়েছিল বলা যায়।

নাম—ফ্রাঙ্ক। ধাম—কলোরাডো, বয়স—চব্বিশ ছুঁই ছুঁই। দস্তুরমত রিসার্চ স্কলাররা তাদের স্টেটের কোন একটা শহরের ইউনিভারসিটির আণ্ডারে পি. এইচ. ডি থিসীস করছে। খুব শীগগীরই সে ডক্টরেট হয়ে যাবে।

চৌকস ছেলে। যেমন পড়াশুনা, তেমনি খেলাধুলোয়। স্কাউটে খুব ইন্টারেস্টেড। যে কোন রকমের গান, সাহিত্য আর রাজনীতিতেও তার আগ্রহ কম নয়। সাহিত্যের কথায় মুখে তার খৈ ফুটতে থাকে। আবার গান শুরু করল তো হয়ে গেল ! তন্ময় হয়ে একটার পর একটা গান করেই যাবে। রাজনীতিতে সে আমেরিকার লিবারেল সোস্যালিস্ট দলের একজন সক্রিয় সভ্য। প্রায়ই তাকে দেখা যায় রাস্তায় দাঁড়িয়ে হয় ডিমনেস্ট্রেশান করছে না হয় মিছিল লীড করে নিয়ে যাচ্ছে।

শুধু তাই নয়। পৃথিবীর কোথাও কোন দেশের এতটুকু অন্যায় বা অবিচার দেখলেই অস্থির আর উন্মন হয়ে ওঠে ফ্রাঙ্ক। আফ্রিকায় অ্যাপারথেডের শিকার হয়েছে

কালো মানুষ। তাদের ওপর বেধড়ক গুলি চালিয়েছে। ইঙ্গ-মার্কিন প্রশাসনের পুলিশ কিম্বা ভিয়েতনামে তাদেরই দেশের মানুষ বোমা ফেলেছে। গ্রামের পর গ্রাম মাঠজুড়ে ফসলের সম্ভারের ওপরে কেমিক্যালস ছড়িয়ে নষ্ট করে দিচ্ছে লক্ষ লক্ষ মানুষের মুখের ভাত।

দূরে কলোরাডোয় বসে ফ্রাঙ্ক উত্তেজনায় জ্বলে যায়। দু'হাতে বুক চেপে ধরে চিৎকার করে বলে—এসব কি হচ্ছে—না—আমি এখুনি—এখুনি চলে যাব আফ্রিকায় —যাব ভিয়েতনামে। দুঃখী মানুষগুলোর পাশে গিয়ে দাঁড়াবে, তীব্র আবেগের তোড়ে তার গলাটা আটকে যায়। তারপরে হাঁফাতে হাঁফাতে আবার বলে—আমি—আমি সারাজীবন ওদের সঙ্গে থেকে এদের সেবা করে আমার দেশের মানুষের পাপের প্রায়শ্চিত্ত করব—

এই হল ফ্রাঙ্ক। সবসময় এমোশানে টগবগ করে ফুটছে। যে কোন বিষয়ে তার গভীর জ্ঞান। বুদ্ধিমান। স্মার্ট ছেলে।

কিন্তু তুমি হ্যাস খেতে শিখলে কি করে? ভয়ে ভয়ে বললাম।

আর বলেন কেন, কেমন নিস্পৃহ আর নিরাশক্তভাবে বলল তখন বোধহয় সবে বি. এ. ক্লাসে উঠেছি। সেই আন্ডারগ্র্যাজুয়েট ক্লাসে পড়তে পড়তেই একদিন বন্ধুদের পাল্লায় পড়ে প্রথমে ক্যানাবিস বা সিদ্ধি খেয়েছিলাম, একটু থেমে আবার বলল, দেখলাম জিনিসটা মন্দ নয়—বেশ খানিকক্ষণ নিজের ভেতরে ডুবে থেকে যায়—হঠাৎ থেমে গেল সে।

অন্ধকার সমুদ্রের দিকে চোখদুটো ছড়িয়ে দিয়ে আবার যেন অনেক অনেক দূর থেকে মৃদুকণ্ঠে বলল, যাই বলুন স্যার ড্রাগ খাওয়ার ভেতরে বেশ থ্রিল আছে। শুধু এক্সপিরিয়েন্সের জন্যই একদিন হ্যাস খেলাম। খুক খুক করে হাসতে লাগল সে। যেন খুব একটা মজা করছে। আবার আমাকে রীতিমত অবাক করে দিয়ে, বলল, জানেন বার তিনেক এল. এস. ডিও খেয়েছি।

এল. এস. ডি! আমার কথাটা আর্তনাদের মত শোনাল। চোখের সামনে ভেসে উঠল দীনেশ ষাঙ্গির বন্ধু সেই হতভাগ্য পিটার, যে এল. এস. ডি খেয়ে সমুদ্রকে মনে করেছিল নিতান্তই একটা খাল আর পাহাড় থেকে ঝাঁপ দিয়ে সেই সাগরের জলে পড়ে বেঘোরে প্রাণ দিয়েছিল। ভয়ানক সর্বনাশ ড্রাগ এল. এস. ডি। বেশি ডোজে খেলে মানুষ মরেও যেতে পারে—

অমন করে চমকে উঠলেন কেন?

তুমি হ্যাস খেয়েছ—এল. এস. ডিও খেয়েছ। কিন্তু তবুও বলছ—তুমি অ্যাডিক্ট নও—

নো—সার্টেনলি নট, আবার ফ্রাঙ্কের চোখের কোণায় কোণায় ঝিকিয়ে উঠল আগুন, আমি নেশা করি—কিন্তু আজ পর্যন্ত কোন ড্রাগ আমাকে বশ করতে পারেনি—

কি রকম।

মাঝে মধ্যে ক্যাজুয়েলি খেয়ে থাকি। কোনটাই নিয়মিত নয়। একটু থেমে আবার বলল, আবার না খেলেও কোন অসুবিধা হয় না—

আশ্চর্য তো! আমার অস্ফুট কথাটা সমুদ্রের সাঁ সাঁ বাতাসে সে শুনতে পেল না।

রাত বাড়ছে।

জাহাজের প্রপেলার জল কেটে কেটে চলছে। প্রচণ্ড শব্দে আলোড়িত হয়ে উঠছে সাগরের জল!

ইঞ্জিনঘরের একটা জোরাল আলোর রেখা এসে বাঁকা হয়ে পড়েছে ফ্রাঙ্কের গায়ে। চারিদিকের মেটে মেটে অন্ধকারে তার আলোকিত মূর্তি'টা বেশ স্পষ্ট হয়ে উঠেছে।

শুধু কথাবার্তা এবং আচার আচরণে নয় তার চেহারাতে আর বেশবাসেও বেশ বৈশিষ্ট্য আছে। পরণে কোন্ মান্ধাতা আমলের পুরানো কাটিং-এর ফুলপ্যাণ্ট। মনে হল তা আবার খাকি। গায়ে বুকখোলা বুশসার্ট নয়, সাধাসিধে একটা টুইলের ফুলসার্ট। তার কব্জি পর্যন্ত বোতাম আঁটা।

তার মাথার চুলগুলোও কুস্তিগীরদের মত ছোট ছোট করে ছাঁটা। নাকে মুখে চোখে সমস্ত চেহারাটার ভেতরে একটা দৃঢ় আত্মপ্রত্যয়ের ছাপ।

ব্যাণ্ডপার্টি যেন আনন্দে ফেটে পড়ছে।

নাচগান আরও উদ্দাম হয়ে উঠেছে।

জানেন এদের দেখলে আমার কষ্ট হয়, জাঙ্কিদের দিকে তাকিয়ে আস্তে আস্তে বলল ফ্রাঙ্ক। এরা প্রত্যেকটা এল. এস. ডি গিলেছে, একটু থেমে আবার নিজের মনেই যেন বলল, এল এস ডি-র ধক না থাকলে ঘণ্টার পর ঘণ্টা কেউ এইরকম ধেই ধেই করে নাচতে পারে বলুন? আবার কয়েকমুহূর্ত পরেই ডাইনে-বাঁয়ে মাথা ঝাঁকিয়ে, অস্ফুটস্বরে বলল, না—না—এদের কোন আশাই নেই—ড্রাগ এদের একেবারে গ্রাস করেছে।

তুমি এল এস ডি টেস্ট করেছ।

আমি বললাম, ক্যানাবিস, হ্যাস সবই একটু একটু করে তো খেয়েছ—কিন্তু—নেশাখোর বা অ্যাডিক্টের হওনি—

হ্যাঁ—স্যার এই আশ্চর্য অঘটনের আড়ালেও আছে এক রমণী—হাসতে হাসতে বলল ফ্রাঙ্ক। তারপরেই কেন যেন ব্যস্ত হয়ে উঠল। বলল, আপনাকে পরে বলব, বলেই ডেকের আবছায়া অন্ধকারে কোথায় অদৃশ্য হয়ে গেল।

আবার একটা কাণ্ড ঘটে গেল। মাঝরাত্রি হবে। সমুদ্রের ধারের কোন গ্রামের ঘাটে জাহাজ থেমেছে। ডেকের জোরালো আলো সাগরের জলে ঝিকমিক করছে। মাথার ওপরে পিচের মত কালো আকাশে রাশি রাশি তারা জ্বলজ্বল করছে।

জাহাজঘাট থেকে কতগুলো কালো কালো বেঁটে মানুষ যেই জাহাজে এসে উঠল অমনি মার মার করে তাদের দিকে তেড়ে গেল একজোড়া জাঙ্কি! তারাই যেন শুধু জাহাজটা কেন, সারা পৃথিবীর অধীশ্বর, এমন ভঙ্গীতে দাঁড়িয়ে বলল দেখ—

আমরাই এই নতুন গ্রহের রাজা আর রানী। তোমরা কার হুকুমে এখানে এসেছে—হঠো—হঠো—হঠো—

তাদের প্রায় ধাক্কা দিয়ে জলে ফেলে দেয় আর কি—

তাদেরই এক দোসর জাঙ্কি টলতে টলতে এগিয়ে এসে ঘোষনা করার মত করে বলল, আমি—হ্যাঁ—আমিই সম্রাটের প্রধান সেনাপতি। তোমরা বেআইনীভাবে এখানে প্রবেশ করেছ—তোমাদের—তোমাদের বধ করব, বলেই ধারাল ঝকঝকে ছুরি বের করল—

দেহাতী মানুষগুলো ভয়ে আতঙ্কে একসঙ্গে চিৎকার করে উঠল। তাদের করুণ আর্তনাদে, কান্নাকাটিতে যেন মহাপ্রলয় নেমে এল।

ছুটে এল জাহাজের ক্যাপ্টেন। এল প্রধান স্টুয়ার্ড, এল সিকিউরিটি ফোর্সের বন্দুকধারী পুলিশ। অনেক কষ্টে বহু ধস্তাধস্তি করে সেই রাজারানী এবং সেনাপতিকে নিরস্ত করল।

দেখলেন এল এস ডি-র ইনফ্লুয়েন্স, কানের কাছে মুখ নিয়ে এসে ফিসফিস করে বলল ফ্রাঙ্ক, এল এস ডি-র মজাই হল আপনাকে একটা অবাস্তব পৃথিবীতে নিয়ে যাবে, হঠাৎ থেমে গেল সে। আবার পরমতৃপ্তিতে বলল, বাপ্বা—আমি বেঁচে গিয়েছি। থ্যাঙ্কস গড—থ্যাঙ্কস টু বারবারা—বারবারা?

ফ্রাঙ্ক আস্তে আস্তে বলেছিল। বলেছিল তার জীবন বৃত্তান্ত। মোটামুটি বেশ স্বচ্ছল ঘরের ছেলেই সে। বাবা ব্যাঙ্কার। ডাকসাইটে ইকনমিস্ট বা অর্থনীতিবিদ। তার থিসীসের সাবজেক্টও—ব্যাঙ্কিং, ডেভেলপমেন্ট ইন নর্থ আমেরিকা অর্থাৎ উত্তর আমেরিকায় ব্যাঙ্কিং-এর প্রসার।

বেশ ছককাটা পথেই চলছিল। কিন্তু কলেজের বন্ধুদের সঙ্গে সেই ভাঙ্গ বা ক্যানাবিসের শরবত থেকে শুরু করে হ্যাস এসে পেঁছোতেই সে নিজেই বুঝতে পারল, সে যেন কেমন হয়ে যাচ্ছে। নষ্ট হয়ে যাচেছ মনের ভারসাম্য।

ছুটল বারবারার কাছে। বারবারা তার শুধু সহপাঠি নয়। ছোটবেলার বন্ধুও বটে। বাল্যসঙ্গিনী। তাকে বলল সব। তারপরেই তার হাতদুটো জড়িয়ে ধরে বলল, তুমি আমাকে বাঁচাও—

ওসব ছাইপাঁশগুলো তোমার গেলার দরকারটাই বা কি? স্কুলের বড়দিদিমণির মতই গম্ভীর হয়ে বলল, একদম কোন ড্রাগ খাবে না—তোমার এইরকম ব্রিলিয়ান্ট কেরিয়ার—

না—না বারবারা, একেবারে স্টপ করতে বলো না—ড্রাগ টেকিং একটা থ্রিলিং এক্সপিরিয়েন্স—

চুপ করে থাকল বারবারা। কয়েকমুহূর্ত কি যেন ভাবল। হাতের কর গুণে-গুণে কিসের হিসেব করল। তারপরেই খুব গম্ভীর আর কঠোর গলায় বলল, শোন সপ্তাহে মাত্র দুইদিন হ্যাস খাবে—

আর এল এস ডি?

একটা কথাও বলল না বারবারা। চোখের দৃষ্টি কেমন স্নিগ্ধ আর মেদুর হয়ে উঠল। তার হাতদুটো জড়িয়ে ধরে ভার ভার গলায় বলল, এল এস ডি-টা কি না খেলেই নয়, একটু থেমে আবার নিজের মনকেই যেন শুনিয়ে শুনিয়ে অস্ফুটস্বরে বলল, শুনেছি—খুব হার্মফুল ড্রাগ—বেশি ডোজ হলে নাকি মানুষ মরেও যেতে পারে—

আচ্ছা বেশ, তুমি না বললে—আমি কোনদিনই খাব না—

বারবারা বুদ্ধিমতী। বেশ বুঝতে পারল, সে মন রাখা কথা বলছে। কি একটা বলতে গেল। কিন্তু তার আগেই সে বলল, জানো বারবারা—এল এস ডি কিন্তু ইনটেলেকচুয়াল কেপেবিলিটি বা বুদ্ধিবৃত্তিকে তীক্ষ্ন করে—আর সেডাটিভ অর্থাৎ মনটাকে প্রশান্তিতে ভরিয়ে দেয়—

বেশ বাবা—বেশ—ঠিক গুণে গুণে দুইবার খাবে—ছয়মাস পর পর—একটু থেমে বলল বারবারা, তার বেশি একবারও নয়। কিন্তু—এবার বারবারার গলার স্বরে বেশ ঝাঁঝ ফুটে উঠল—এই পর্যন্ত বলে থেমে গিয়েছিল ফ্রাংক।

অদূরে নেশায় বেহুঁশ জাংকিদের বেসামাল অবস্থার দিকে চোখ রেখে ফ্রাংক বলল, জানেন পাহাড়ি রাস্তায় ড্রাইভার যেমন অত্যন্ত সতর্ক হয়ে গাড়ি চালায় তেমনি খুব শক্ত হাতে স্টিয়ারিং ধরেছিল বারবারা—তাই—

গোয়ায় তোমাকে ছেড়ে দিল বারবারা—

ছাড়বে না কেন—সে খুব লিব্যারেল মাইণ্ডেড মেয়ে—বলে এক্সপিরিয়েন্স বাড়ানোর জন্য সবকিছুই করবে। কিন্তু খবরদার—ইনভলভড হবে না—

গোয়াতেও কি এক্সপিরিয়েন্স গ্যাদার করতেই যাচ্ছ?

সার্টেনলি! দপ করে জ্বলে উঠল তার বড় বড় চোখদুটো। কেন যেন প্রচণ্ড একটা আবেগে ছটফট করতে করতে বলল, স্যার—শুনেছি গোয়ার আনজুনা—আরামবল এবং দূরে দূরে সব সি বীচে নাকি জাংকরা বন্য আদিম জীবন কাটায়—কারো পরণে একটুকরো কাপড়ের চিহ্ন পর্যন্ত নেই—সব সব স্টার্ক নেকেড—একটু থামল সে। কেন যেন চাপা হাসির আলোয় তার মুখখানা উজ্জ্বল হয়ে উঠল। হঠাৎ আমার কানের কাছে মুখ নিয়ে এসে চাপা গলায় বলল, জোওয়ান বয়সের অতগুলো মেয়েপুরুষকে একেবারে দুমদুম ন্যাংটো দেখতে কেমন লাগে—সেই এক্সপিরিয়েন্স থাকা দরকার বলেই হো হো করে হেসে উঠল ফ্রাংক। তার অট্টহাসির শব্দ সাগরের উদ্দাম বাতাসের সওয়ার হয়ে চলে গেল দূরে—বহুদূরে।

গোয়ায় কতদিন থাকবে?

কতদিন আর? খুব বেশি হলে ফর্টনাইট, একটু ভেবে আবার বলল। নিশ্চিন্তে বেড়ানোর সময় কোথায়। থিসীসটা সাবমিট করেই চলে যাব নর্থ আমেরিকা—

সেখানে কেন?

একটা ব্যাংকে চাকরির অফার পেয়ে গিয়েছি—তার কেবিনের দিকে যেতে যেতে চেঁচিয়ে বলল সে।

ফ্রাংক উচ্চাভিলাষী।

সুখী। পরিতৃপ্ত। মনের কোন কোণে এতটুকু আক্ষেপ নেই। এরকম মানুষ সচরাচর দেখা যায় না। গোয়াতে যে কয়দিন ছিলাম কোথাও তার সঙ্গে আমার আর দেখা হয়নি। কে জানে, হয়ত তাড়াতাড়ি ট্যুর সর্টকাট করে উত্তর আমেরিকা পাড়ি দিয়েছে।

পূবের আকাশ ফরসা হয়ে এল।

দূরে পানজিমের ডকের জেটির ছোট বড় নৌকো জাহাজ ঘর বাড়ি সব—সব যেন কেমন ঘসা ঘসা ছবির মত মনে হচ্ছে।

জাঙ্কদের ব্ল্যাস্টপার্টি নাচগানের আসর থিতিয়ে পড়েছে। মাত্র তিন চারজন কোন মতে নেচে চলেছে। আর সব ডেকের ওপরেই কেঁচোর মত এ ওর গায়ের ওপরে জড়াজড়ি করে পড়ে রয়েছে। নেশার ধক আর ঘুমের ঘোর তাদের প্রত্যেককে একেবারে পাথর করে দিয়েছে।

আবার গোয়া বন্দরে জাহাজ থামতে থামতেই আর এক তুলকালাম কাণ্ড। জাহাজটা জেটিতে যাওয়ার আগে আস্তে আস্তে একটা চওড়া খাড়ির ভেতরে ঢুকল। দুলে দুলে জেটির দিকে এগোতে লাগল। আর ভোরের ঘুম ঘুম পরিবেশ। জলের একটানা কলোল্লাস শাঁ শাঁ বাতাসের আর্তনাদ সব—সব কিছুকে ছাপিয়ে জাহাজের সিটি বেজে উঠল—ভো—ও—ও—ও—

সেই গম্ভীর দূরাগত শব্দে সচকিত হয়ে কোন কোন জাঙ্ক ঘুম থেকে ধড়মড় করে উঠে বসল।

চিমনি দিয়ে ভক ভক করে কালো ধোঁয়া বেরোতে লাগল। জলো আর ভিজে ভিজে বাতাসের স্তর ভেদ করে ঘনকালো ধোঁয়ার কুণ্ডলী ওপরে উঠতে পারল না। আমাদের মাথার ওপরে কালো সামিয়ানার মত ঝুলতে লাগল—

আগুন—আগুন—জাহাজে আগুন ধরেছে আতঙ্কে চিৎকার করে উঠল কয়েকজন ফ্রেক। সঙ্গে সঙ্গে শুরু হয়ে গেল ছুটোছুটি। এক জাঙ্ক তো এল এস ডি-র ঘোরে সেই গভীর জলের খাড়িকে মনে করল সুইমিংপুল। সঙ্গে সঙ্গে মারল এক লাফ—

ঝপাং—

বাঁচাও—বাঁচাও—সাহেবকে বাঁচাও—চারিদিক থেকে আতঙ্কিত চিৎকারে আড়ষ্ঠ হয়ে গেল ভোরের বাতাস।

এই বেহেড মাতাল সাহেবগুলো যে কী জ্বালাতন করে। গজগজ করতে করতে ক্যাপ্টেন ছুটে এসে ডুবন্ত মানুষটার দিকে নিউম্যাটিক টিউব বা লাইফ বেল্ট ছুঁড়ে দিল।

সেই লাইফ বেল্ট আঁকড়ে ধরে বেশ কয়েক ঢোক জল খেয়ে আধমরা হয়ে যে জাঙ্ক উঠে এল তার মুখের দিকে তাকিয়ে আমি চমকে উঠলাম—আরে এ যে ম্যাসিমো। ইতালির কোন্ কলেজের লেকচারার। কিন্তু—তাকে যে জলগাঁও স্টেশনে রেলপুলিশ

বামাল গ্রেপ্তার করে মহারাষ্ট্র স্টেট এক্সসাইজে চালান করেছিল।

হয়ত কোন ভাবে ছাড়া পেয়েছে। কিন্তু তাকে নিয়ে মাথা ঘামানোর সময় ছিল না। জাহাজ জেটিতে ভিড়েছে। জাংকিরা হুটপাট করে নেমেই ছুটল বাসের দিকে। ঘাটের ওপরে দাঁড়িয়ে থাকা বাসগুলোর কনডাক্টর হাঁকছিল—আ—ন—জু—না—বীচ—আ—ন—জুনা—

আমার বুকের ভেতরটা গুরগুর করে উঠল—চলে যাব নাকি ডাইরেক্টলি আনজুনা বীচে—ফ্রেকদের দেখতেই তো এত দূরে আসা—

দাদা, পথে কোন কষ্ট হয়নি তো? সামনে দাঁড়িয়ে অসীম।

নয়

সারা দুনিয়ার সবচেয়ে লাভের ব্যবসা হল—ড্রাগের স্মাগলিং। বি এস. এফ. পুলিশের লোক, সন্ত্রাসবাদী এবং রাজনৈতিক নেতারা এই ব্যবসায় লিপ্ত হয়েছে—তার বহু নজির পাওয়া গিয়েছে

আমাকে দেখেই দূর থেকে উল্লসিত হয়ে চিৎকার করে উঠল খোকন ওরফে অসীম।

আ—ন—জু—না বীচ—আরাম—বেল—আরব সাগরের সাঁ সাঁ বাতাসে ভর করে কনডাক্টরদের চিৎকারটা আবার আমার কানে আছড়ে পড়ল।

কি ব্যাপার দাদা? আপনি সি বীচের বাসগুলোর দিকে তাকিয়ে কি দেখছেন। একটু থেমে আবার খুব ব্যস্ত সমস্ত হয়ে বলল চলুন—চলুন আপনার বৌমা কখন থেকে আপনার জন্য হা পিত্যেশ করে বসে রয়েছে। বলতে বলতেই প্রায় লাফিয়ে অটোতে উঠে পড়ল খোকন। আমার গোয়ায় আসার আসল উদ্দেশ্যটা আর বলতে পারলাম না।

যেতে যেতে যেন নিজের মনকেই শুনিয়ে শুনিয়ে বলল, এখানে এত কাজ। এখুনি গিয়ে দেখব হয়ত—ভিজিটরদের ভিড়ে ঘর ভরে গিয়েছে—

ভিজিটর?

আরে আমার পেশেন্ট গরু কুকুর ছাগলের মালিকরা—তার মুখখানা অপ্রসন্ন হয়ে উঠল। কিন্তু—

খোকন আমাকে নিয়ে ভেতরে যাওয়ার অবসরটুকু পর্যন্ত পেল না। ভিজিটরদের ঘর থেকে খোকনকে দেখেই ছুটে বেরিয়ে এল মাঝবয়সী এক ভদ্রলোক। টকটকে ফরসা রঙ। পরণে স্যুটপ্যান্ট। পুরোদস্তুর সাহেব।

ভট্টাচারিয়াজী মেহেরবাণী করে মেরা লাকি কো জেরা ধ্যানসে দেখিয়ে—বলতে বলতে কান্নার ইঙ্গিতে সাহেবের মুখখানা কেমন এঁকে বেঁকে দুমড়ে উঠল।

ডক্টর কুমার—প্লীজ একটু ওয়েট করুন, আমার দাদা—আমাকে দেখিয়ে খোকন বলল কলকাতা থেকে এসেছেন—তাঁকে আমি মিসেস ভট্টাচারিয়ার জিম্মায় দিয়ে এখুনি আসছি—

তপতী, খোকনের স্ত্রী ছুটে এসে প্রণাম করে বলল আজ আমাদের কী সৌভাগ্য দাদা—

তা—কেন বলছ—বরং আমিই বলব—আমার কথাটা শেষ হওয়ার আগেই তপতী কলকল করে বলে উঠল, কেন বলছি দাদা—এখানে কিছুদিন থাকলে বুঝতে পারতেন। কতদিন কতকাল দেশের লোক দেখতে পাই না—বাংলায় দুটো কথা বলতে পারি না—

সাহাব সেলাম—মনে হল খোকনের গোয়ানিজ ভৃত্য এসে দাঁড়াল। এক জগা-খিঁচুড়ি ভাষায় কি যেন বলল খোকনকে। তার আকার ইঙ্গিতে মনে হল বাইরের

সেই ভিজিটর ভদ্রলোক ব্যস্ত হয়ে উঠেছে—খোকনকে ডাকছে—

তুই তো ডেপুটি ডিরেক্টর—কিন্তু পশুদের চিকিৎসাটাও কি তোকেই হাতেকলমে করতে হয়—

না—না—করে আমার জুনিয়র সার্জেনরা। কিন্তু লোকটা বেশ পায়াভারি মানুষ কি না, একটু থেমে আবার মাথাটা নিচু করে বলল খোকন তার পেয়ারের কুকুরের চিকিৎসা আমি নিজে না করলে তো আমার নিস্তার নেই—

কে এই ভদ্রলোক ?

মস্ত অফিসার—গোয়ার ইণ্ডিয়া গভর্ণমেণ্টের নার্কটিক কণ্ট্রোল ব্যুরোর চীফ মি· বি ভি কুমার—

সে কী রে ? আমার বুকের ভেতরে যেন রক্ত চলকে উঠল।

আপনি কি চেনেন ওঁকে, খোকনের চোখে বিস্ময় ছটফট করে।

খোকন কুমারসাহেবের সঙ্গে আমার পরিচয় করিয়ে দিয়েছিল। অত্যন্ত দিলখোলা। গপ্পে মানুষ। অতএব বন্ধুত্ব বা ঘনিষ্ঠতা হতে বেশি দেরি হল না।

কিন্তু ড্রাগের ওপরে বই লিখছি এবং আফিং আর হেরোইন স্মাগলিং অপারেশন সম্বন্ধে—জানতে চাই। শুধু তাই নয় কারা এবং কেমন করে চোরাকারবার করে—সে সম্বন্ধেও তথ্য চাই শুনেই গম্ভীর হয়ে গেলেন কুমারসাহেব। মনে হল চিন্তার গভীরে তলিয়ে গেলেন—

কেঁউ—কেঁউ—কেঁউ—বাইরে থেকে কুকুরের আর্ত চিৎকার ভেসে এল। চঞ্চল হয়ে উঠে দাঁড়ালেন কুমারসাহেব।

ঘাবড়াবেন না—আপনার লাকিকে বোধহয় একজামিন করা হচ্ছে, খোকন বলল। আসুন আমার সঙ্গে, আউটডোরে দুজনেই ঝড়ের গতিতে বেরিয়ে গেল।

দাদা ভেতরে আসুন, তপতী এল। বলল একা বসে থেকে কি করবেন। কুমার-সাহেবের লাকি সুস্থ না হওয়া পর্যন্ত আপনার ভাইকে আর পাবেন না—

অগত্যা ভেতরে যেতেই হল। বলা দরকার তপতী রীতিমত বিদুষী। ইংরেজীর এম· এ। পানজিমের ইংলিশ মিডিয়াম একটি স্কুলের হেডমিসট্রেস।

দাদা একটা অনুরোধ করব, একবার যখন আপনাকে পেয়েছি ছাড়ছি না কিন্তু—হেসে হেসে বলল তপতী, কম করে মাস খানেক তো—

বলো কি ! কলকাতা ছেড়ে কি অতদিন থাকতে পারব। গুচ্ছের কাজ—

আপনার প্ল্যানটা কি শুনি ?

তোমাদের সঙ্গে কয়েকদিন কাটিয়ে যাব আনজুনা বীচে, সেখান থেকে—

আনজুনা বীচ ! অস্বস্তির ছায়া পড়ল তপতীর ভাসা ভাসা দুটো চোখে। আস্তে আস্তে বলল, সিনিক বিউটির তুলনা হয় না। কিন্তু—

কিন্তু কি তপতী ?

আপনার ভাইয়ের সঙ্গে পরামর্শ করে নেবেন, ব্যস্ত হয়ে উঠল তপতী, সি ফিস খান

তো দাদা—আপনি বসুন—আমি যাই আপনার খাওয়াদাওয়ার ব্যবস্থা করি—দ্রুত-পায়ে রান্নাঘরের দিকে চলে গেল। গেল আমাকে ধাঁধায় ফেলে।

আনজুনা বীচ শুনে চমকে উঠল কেন তপতী। শহর থেকে লোকালয় থেকে দূরে নির্জন বালুচর কি সমাজবিরোধী দুর্বৃত্তদের আড্ডা না কি নেশাগ্রস্ত ব্যক্তিদেরই স্থানীয় লোকরা বিপজ্জনক মনে করে।

খোকন এল।

কুমারসাহেব কি চলে গিয়েছেন?

কোন চিন্তা করবেন না দাদা। তাঁর আদরের ল্যাকিকে আমাদের সার্জেনরা অ্যাবসলিউট কারেক্ট ট্রিটমেন্ট করেছে। কুমারসাহেব খুব খুশি, একটু থেমে হেসে বলল খোকন স্ফূর্তির চোটে আপনাকে আর আমাকে তাঁর বাড়িতে চায়ের নেমন্তন্নই করে বসলেন।

তাই না কি—কবে?

আজই সন্ধ্যায়—আরও কি বলতে গিয়ে থেমে গেল খোকন। তাকে একটু চিন্তিত মনে হল—

কি হল—কী ভাবছিস?

কিছু না, বেশ সহজ ভাবে হেসে বলল খোকন, আমি কিন্তু যেতে পারব না দাদা। পেড্রো গিয়ে আপনাকে কুমারসাহেবের বাংলোতে দিয়ে আসবে—

সে কী রে—কেন?

আমার মিটিং আছে দাদা আর কুমারসাহেবের পাল্লায় একবার পড়লে আর উপায় নেই—

কেন?

ভীষণ হামবড়া ভাব। তাঁর নিজের কাজটাকে এত বড় বলে মনে করেন।

কি রকম?

কেউ গেলেই এশিয়ার ম্যাপ খুলে ডায়াগ্রাম এঁকে কোন্ রুট ধরে ড্রাগ স্মাগলাররা যেয়ে থাকে, চোরাকারবারিরা কেমন ছদ্মবেশ ধরে থাকে—তিনি কেমন কৌশলে তাদের বামাল ধরেছিলেন—

একটু থামল খোকন। হেসে বলল, এসব বাহাদুরীর গল্প বলতে আরম্ভ করলে আর থামবেন না—

আমি চুপ করে থাকলাম। বুকের ভেতরটা দুলে উঠল। মনে মনে বললাম কুমারসাহেবের ওসব অভিজ্ঞতার বিবরণই যে আমার দরকার।

কোন প্রয়োজন ছিল না। তবুও প্রসঙ্গটা পালটাতে এবং ভ্রাতাকে তার নিজের লাইনে নিয়ে এসে পরিবেশটাকে হালকা করতেই বললাম, কুমারসাহেবের কুকুরের কি হয়েছিল রে?

সে আর শুনে কি করবেন দাদা। কুমারসাহেবের কুকুরটার লস অফ অ্যাপেটাইট অর্থাৎ কিছুই খেতে চায় না—

তা তো অনেক কারণেই হতে পারে—

কুকুরটার কোন ডাইজেস্টিভ সিসটেমের গোলমাল, কি স্লো ফিভার—ওসব কোন সায়ান্টিফিক রিজন তিনি মানতে রাজি নন একটু থামল খোকন। বিরক্ত হয়ে বলল তার মনে গেড়ে বসে আছে একটাই কারণ—

কি—

কেউ শত্রুতা করে স্লোপয়েজন করেছে তার লাকিকে—

কার ওপর তাঁর সন্দেহ ?

আবার কার ওপরে—যাদের পিছনে তিনি দিনরাত ঘুরঘুর করছেন—ড্রাগ স্মাগলার—

হ্যাঁ তাদেরই কেউ তার লাকির খাবারের সঙ্গে কিছু মিশিয়েছে—এই তার ধারণা—

বড় বিচিত্র মানুষ কুমারসাহেব। দিলখোলা গপ্পোবাজ তো বটেই। কিন্তু মজা হল যে কোন কথার ভেতরেই তিনি যেমন করে হোক ড্রাগ আর ড্রাগ স্মাগলিং টেনে আনবেনই। মনে হয় তার সমস্ত নিশ্বাস প্রশ্বাসের ভেতরে যেন মিশে রয়েছে ড্রাগ।

খোকন ঠিকই বলেছিল। ম্যাপ বের করে তাদের চোরাকারবারিদের রুট এঁকে বলেছিলেন কেমন করে তারা সারা দেশের শহরে গ্রামে বিধ্বংসী বিষ ছড়াচ্ছে! কিন্তু—

স্মাগলিং অপারেশান সম্বন্ধে বলতে শুরু করার আগে তিনি হঠাৎ দুম করে জিজ্ঞাসা করে বসলেন—ড্রাগের সম্বন্ধে বই তো লিখছেন—খুব খুশি হলাম। কিন্তু পেডলারদের ব্যাপারে কিছু—জানেন ?

আমার তো সবই থিয়োরেটিক্যাল নলেজ কুমারসাহেব, সসঙ্কোচে বললাম, জেমস উইলসের Addicts Drugs and Alchol re-exemined বইতে পড়েছি—the person who sells the drugs to addicts for the personal gain is regarded by the society as a menace অর্থাৎ নিজের ব্যক্তিগত লাভের জন্য যে নেশাগ্রস্ত মানুষের কাছে মাদকদ্রব্য বিক্রি করে তাকে সমাজের দুষ্টগ্রহ বা অভিশাপ মনে করা হয়—

আর কি বলেছেন ?

পাইপে ধোঁয়া ছাড়তে ছাড়তে বললেন কুমারসাহেব বলেছেন, সারা পৃথিবী জুড়ে এই দুর্বৃত্তদের চক্র ছড়ানো—

চক্র। আমার মুখের কথা কেড়ে নিয়ে বলে উঠলেন ভারতের পশ্চিমাঞ্চলের নার্কটিক কন্ট্রোল ব্যুরোর চীফ—তাচ্ছিল্যের হাসি ফুটে উঠল ভারি মাংসল মুখে।

হুঁ—অদ্ভুত একটা শব্দ করে আপনার জেমস উইলসসাহেব কখনো কল্পনাও করতে পারবেন না—সেই চক্র—ড্রাগ স্মাগলারদের সেই চক্র কতদূর ছড়ানো আর কী ভয়ানক। বলতে বলতে হঠাৎ থেমে গেলেন বহুদর্শি কুমারসাহেব। মাথা নিচু করে

যেন নিজের ভেতরে তলিয়ে গেলেন।

এই দেখুন হঠাৎ ফাইল খুলে নিচের ডায়াগ্রামটা দেখালেন।

আফিং

↓

উৎপাদক জানে কী সর্বনাশা জিনিসের চাষ করছে

↓

কেমিস্ট

↓

আফিং উৎপাদকদের নিযুক্ত কেমিস্ট জানেন কোন্ কোন্ উপাদান মিশিয়ে বিধ্বংসী ড্রাগ—হেরোইন তৈরি করছেন।

↓

চোরাকারবারি বা বেআইনি মাদকদ্রব্যের বিক্রেতা জানে কী ভয়ঙ্কর বিষ তারা বিক্রি করছে

↓

পেডলার বা বিক্রেতারা আবার রাস্তায় কি পানের দোকানে বিক্রি করার আগে হেরোইন কি মরফিনের সঙ্গে কোন্ কোন্ ক্ষতিকর জিনিস মেশায়—তা তারা বেশ ভালই জানে—

বুঝলেন কিছু? বলে নিজেই উত্তেজিত হয়ে বলে উঠলেন, আপনাদের জেমস উইলসসাহেব যে বলেছেন পেডলাররাই শুধু দোষী তা নয়—ড্রাগের ব্যবসার প্রত্যেকটি ধাপের সঙ্গে যুক্ত প্রত্যেকেই সোশ্যাল মিনেস বা সমাজের শত্রু থামলেন। আবার মাথা নিচু করে যেন নিজের মনকেই শুনিয়ে শুনিয়ে বলল, কিন্তু একমাত্র ওপিয়াম গ্রোয়ার বা আফিমের চাষীরা বা ক্ষেতের মালিকরা প্রকাশ্য দিবালোকে সকলের চোখের সামনেই মরফিনের মূল উপাদানটি চাষ করে থাকে। একটু থেমে কুমার-সাহেব একটা দীর্ঘশ্বাস ছেড়ে আবার খুব আস্তে আস্তে বললেন, তাছাড়া ড্রাগের প্রতিটি পর্যায়ের কর্মীরা সবকিছু করে—রাতের অন্ধকারের আড়ালে। স্মাগলিংএর পুরো অপারেশনটাই চলে লোকচক্ষুর অন্তরালে আর—কি যেন বলতে বলতে হঠাৎ থেমে গেলেন নার্কটিক কন্ট্রোলব্যুরোর বোম্বে শাখার প্রধান কুমারসাহেব।

আর কি?

একটা কথা সব সময় মনে রাখবেন—Trafficking in narcotics an immensely profitable enterprise has become a key element in global lawlessness…অর্থাৎ ড্রাগের চোরাকারবার দারুণ লাভের ব্যবসা হয়ে দাঁড়িয়েছে বলেই পৃথিবীজুড়ে সমাজবিরোধী এবং ভয়ঙ্কর অন্যায় কাজের প্রধান এবং এক নম্বর বিষয় হয়ে উঠেছে।

৩১ আগস্ট ১৯৮৬।

কুমারসাহেবের তখন দিল্লীতে পোস্টিং। রাত দুটো নাগাদ তার বাংলোতে

হঠাৎ ঝন ঝন করে টেলিফোন বেজে উঠল ক্রিং—ক্রিং—ক্রিং—

দুইজন ইন্টারন্যাশন্যাল স্মাগলার ধরা পড়েছে, দক্ষিণ দিল্লীর ডেপুটি পুলিশ কমিশনার অফিস থেকে খবর এল· এদের কাছে ৭১ কেজি বেস্ট কোয়ালিটি হোয়াইট হেরোইন, ১৭৬ কেজি· গাঁজা পাওয়া গিয়েছে—

সর্বনাশ, ৭১ কেজি সুপারফাইন কোয়ালিটি হেরোইনের আন্তর্জাতিক বাজার মূল্য যে ৯·৬ কোটি টাকা আর ১৭৬ কেজি হ্যাসিসের দাম ৬০ লাখ টাকা—হেভি কেস। অতএব তখুনি কুমারসাহেবকেই ছুটতে হল স্পটে, থেমে গেলেন তিনি। আবার পাইপের ধোঁয়া ছেড়ে বেশ গর্বের সঙ্গে বললেন—সেটাই Biggest Narcotic Haul in Delhi.

এই খবরটি কলকাতার স্টেটসম্যানে বেরিয়েছিল, দিল্লীর হিন্দুস্তান টাইমসে বেরিয়েছিল। কিন্তু প্রতিটি খবর, প্রতিটি ঘটনার পিছনে যেমন, তেমনি এই সব ড্রাগের কেসের নেপথ্যেও থাকে অনেক রোমান্টিক ইতিহাস।

দুনিয়া জোড়া ড্রাগের চোরাকারবারের নায়ক দুইজন।

কামাল।

নওরোজ।

কামাল মাঝবয়সী আফগান। ভারতে এসেছে রাষ্ট্রসংঘের বাস্তুত্যাগী বা ইউএন রিফিউজি হিসেবে। আর নওরোজও আফগান। কামালের চেয়ে কিছু ছোট। তার আছে কানাডিয়ান পাশপোর্ট। বেশ বুঝতে পারা যায়, দুজনেই দুনিয়ার দেশে দেশে ভেসে ভেসে বেড়ানো মানুষ। তাই বোধহয় তাদের স্মাগলিং অপারেশানের ভেতরেও একটা অরিজিন্যালিটি বা অভিনবত্ব ছিল।

কি রকম ?

কোন কথা বললেন না কুমারসাহেব। কি একটা ভাবতে ভাবতে পাইপের গায়ে টোকা দিতে লাগলেন। আস্তে আস্তে বললেন এই ড্রাগ পাচারের কেসটা ধরেছিল দক্ষিণ দিল্লীর পুলিশ! আমাকে ফোন করে ডেকেছিলেন ডেপুটি পুলিশ কমিশনার ম্যাক্সওয়েল পেরিইরা—বলতে বলতে আবার থেমে গেলেন তিনি।

দিল্লীর সবচাইতে বড় ড্রাগ কেসটির যে ইতিহাস বড্ড বেশি ফেনিয়ে বলেছিলেন কুমারসাহেব তা এখানে খুব সংক্ষেপে বলা হল।

বেশিদিন নয়। মাত্র মাস ছয়েক হল ওরা দিল্লীতে আছে। তারই ভেতরে চার চারবার তারা ডেরা পালটেছে। কিছুদিন হয়ত থাকল মধ্যদিল্লীর রাজেন্দ্রনগরে। তারপরেই হঠাৎ একদিন তল্পিতল্পা গুটিয়ে চলে গেল দক্ষিণদিল্লীর নিউ ফ্রেন্ডস কলোনিতে। কয়েকদিন যেতে না যেতেই ম্যাটাডোরে মালপত্র চলে গেল দয়ানন্দ কলোনিতে।

শুধু ঘন ঘন বাসা বদল নয়। নিত্যি নতুন দামী দামী গাড়িতে চড়ে। প্রায়ই ফাইভস্টার হোটেলে খানা খায়। পরণের সাজপোশাক দেখে তো মনে হয়—ওদের

অঢেল টাকা!

এত টাকা আসে কোথায় থেকে?

কি করে এই দুই আফগান যুবক?

পুলিশ তাদের ওয়াচে রাখতে লাগল। খোঁজখবর নিয়ে জানতে পারল—কিসের যেন সাপ্লাইয়ের বিজনেস করে। তার চেয়ে বেশি আর কেউ কিছু বলতে পারে না।

পুলিশের সন্দেহ আরও বাড়ল। কি গুডস সাপ্লাই করে—কোথায় করে? তাদের দয়ানন্দ কলোনি আর নিউ ফ্রেন্ডস কলোনির আস্তানার আশপাশে সাদা পোশাকের ওয়াচার ঘুরঘুর করতে লাগল।

একদিন রাত ১১টা বাজতেই দেখা গেল দয়ানন্দ কলোনির ফ্ল্যাট থেকে বেরিয়ে গেল একটা লোক—

না। কামাল নয়। নয় নওরোজও। লোকটা বেঁটে গুটকুল। পিঠে মস্ত বড় কুঁজ। কুঁজের ভারে সামনের দিকে নুয়ে পড়েছে। তবুও হাতে একটা বড় ভি আই পি স্যুটকেশ নিয়ে কোনরকমে চলতে লাগল।

কি আছে স্যুটকেশে?

কি আবার থাকবে হাতী ঘোড়া বেশ ঝাঁঝিয়ে উঠল। সামান্য—জামা কাপড় আছে—

খোল স্যুটকেশ—

কেন? আপনারা কোন্ শাহেনশা যে আপনাদের কথায় বাক্স—

প্লেন পোশাক পরা পুলিশ অফিসার তার আইডেণ্টিটি কার্ডটা লোকটার চোখের সামনে তুলে ধরলেন। সঙ্গে সঙ্গে সে কেমন চুপসে গেল। বেশ নরম হয়ে বিনয়ের হাসি হেসে বলল, স্যার গরীব মানুষ—যাচ্ছি হরিদ্বারে তীর্থ করতে। কেন শুধু শুধু হ্যারাস—

বাজে কথা না বলে—খুলুন স্যুটকেশ। তা নাহলে আমরা তালা ভেঙ্গে—পুলিশ অফিসার গর্জন করে উঠলেন।

না—না স্যার—স্যুটকেশ আমার নয়। চেয়ে নিয়ে এসেছি। গরীব মানুষ—বিপদে—

আঃ শুধু শুধু সময় নষ্ট করছ কেন, ক্ষিপ্ত হয়ে দক্ষিণদিল্লীর ডি এস পি সাহেব স্বয়ং তালা ভেঙ্গে খুলে ফেললেন বাক্স।

জামাকাপড় পাওয়া গেল ঠিকই। কিন্তু তার নিচে পলিথিনের মোটা মোটা প্যাকেটের ভেতরে এসব কিসের মোড়ক! ডি এস পি-র বুকের ভেতরে গুর গুর করে উঠল।

লোকটার চোখে ভয়ের ছায়া। কেমন জটিল এবড়ো খেবড়ো মুখখানা ফ্যাকাশে। পলিথিনের প্যাকেটগুলো খুলতেই বেরিয়ে পড়ল হেরোইন! এক কেজি দু'কেজি নয়—পুরো ১৮ কেজি—

কোথায় পেলে তুমি এত মাল, লোকটার চুলের মুঠি ধরে প্রচণ্ড জোরে ঝাঁকুনি

দিতে দিতে চিৎকার করে উঠলেন অফিসার সত্যি কথা বললে তোমার—

কোন কথাই বলতে পারল না লোকটা। ভয়ে থর থর করে কাঁপছে।

চুপ করে থেক না—বলো—ঠিক করে বলো—

স্যার—আমি—আমি—বলতে বলতে ডি এস পি সাহেবের পায়ের ওপর আছড়ে পড়ে কাঁদতে লাগল।

আঃ পা ছাড়—পা ছাড়—বলো কার মাল ?

আমার সাহেবের স্যার—আমি শুধু ক্যারিয়ার—মাল সাপ্লাই করি—পয়সা পাই। আমার সংসার—

চুপ কর, তোমার কাঁদুনি শোনার সময় নেই আমার, তীব্র আক্রোশে চিৎকার করে উঠলেন ডি এস পি—সব খোলাখুলি বলো—তোমার সাজা কম হবে—বলতে বলতে হঠাৎ দূরে একটা দোকানের কোণে অন্ধকারে তাকিয়ে চেঁচিয়ে উঠলেন কে—কে ওখানে—

সঙ্গে সঙ্গে চাঁদনীচকের বাজারের ঝাপসা মেটে মেটে আলোয় একটা ছায়ামূর্তি যেন সরীসৃপের মত মিলিয়ে গেল। সেপাইরা বাজারের চারিদিকে তন্ন তন্ন করে খুঁজল। কিন্তু কাউকে দেখল না।

লোকটাকে থানায় নিয়ে আসা হল। আবারও খোদ বড়কর্তা ডেপুটি কমিশনার ম্যাকসওয়েল পেরিইরার পাদুটো জড়িয়ে ধরে হাউ হাউ করে কাঁদতে লাগল।

আহা! কাঁদছ কেন আশ্চর্য মিষ্টিকণ্ঠে সহানুভূতিতে ভিজে ভিজে গলায় বললেন ম্যাকশওয়েল, তুমি আমাদের হেলপ করলে আমরাও তোমাকে সাহায্য—

স্যার—আমার জেল হলে আমার আউরত বাল—বাচ্চা—

লোকটা শুধু যে কামাল-নওরোজদের কীর্তিকলাপ সব ফাঁস করে দিয়েছিল, তা নয়। পেরিইয়ারসাহেবকে সঙ্গে করে কামালদের দয়ানন্দ কলোনির ডেরায় নিয়ে এসেছিল।

কিন্তু কোন লাভ হল না। পাখি উড়ে গিয়েছে। ফ্ল্যাটের দরজা হাট করে খোলা। শুধু পোড়া সিগারেটের টুকরো আর বিলেতি মদের বোতল ঘরময় ছড়ানো।

—এখুনি নিউ ফ্রেন্ডস কলোনির ফ্ল্যাটে চলুন স্যার, চাপা উত্তেজিত কণ্ঠে বলল, কামালদের কেরিয়ার সেখানে স্যার অনেক—অনেক মাল—

ঝড়ের গতিতে গাড়ি ছুটিয়ে পেরিইয়ারসাহের এলেন নিউ ফ্রেন্ডস কলোনির ফ্ল্যাটে। কিন্তু সেখানেও তালা ঝুলছে। তালা ভেঙে ঘরে ঢুকে দেখা গেল ঘরে কোন জিনিসের ছিটেফোঁটাও নেই।

আন্তর্জাতিক চোরাকারবারিদের ধরতে না পেরে ক্ষিপ্ত হয়ে উঠলেন পেরিইয়ার-সাহেব। তার রাগ রাগ মুখের দিকে তাকিয়ে ভয়ে ভয়ে লোকটা বলল, স্যার খুব কাছেই ওদের গ্যারেজ—সেখানে যদি ওদের মারুতি গাড়ি না থাকে—

তুমি তখন থেকে আমাদের হ্যারাস করছ, দাঁতে দাঁত চেপে ধরে চিৎকার করে

উঠলেন পেরিইয়ার—এটাই ওদের ডেরা ঠিক তো?

স্যার—ঠিক না হলে তালা দেওয়া থাকবে কেন?

অন্য যে কোন খালি বাড়িতেও তো তালা দেওয়া থাকতে পারে আর এক পুলিশ অফিসার টিপ্পনি কাটল।

তোমার কঠিন শাস্তি হবে—তুমি যদি—

স্যার—আবার পেরিইয়ারের পায়ের ওপর আছড়ে পড়ল লোকটা—দয়া করে আমাকে একটা সেপাই দিন—গ্যারেজে যাই।

গ্যারেজে গিয়ে দেখা গেল কামালদের গাড়ি নেই। কয়েক মুহূর্ত মাথা নিচু করে ভাবতে লাগলেন ডেপুটি কমিশনার। কম শাস্তি হওয়ার আশায় মরিয়া হয়ে বলল সেই কেরিয়ার—স্যার গাড়ি করেই পালিয়েছে। তীব্র উত্তেজনায় ভেঙ্গে পড়লে—স্যার চকোলেট রঙের—মারুতি গাড়ি—

খরচোখে লোকটার দিকে তাকিয়ে জরীপ করলেন পেরিইয়ার—মনে হচ্ছে তো ঠিকই বলছে।

সঙ্গে সঙ্গে হাইওয়ে পেট্রোল পুলিশের বড়কর্তাকে টেলিফোনে সব বিস্তারিত বললেন। দিল্লী—বোম্বে ট্রাংক রোড, দিল্লী—কলকাতা, দিল্লী—মাদ্রাজ ট্রাংক রোড ইত্যাদি দিল্লী থেকে বাইরে যাওয়ার সমস্ত ট্রাংক রোডে পেট্রোলপুলিশ শিকারী কুকুরের মত হন্যে হয়ে ঘুরতে লাগল।

সেইদিনই রাত দুটো নাগাদ দিল্লী—বোম্বে ট্রাংক রোডের লেভেল ক্রসিং-এ চকোলেট কালারের একটা মারুতি গাড়ি আটক করল পেট্রোল পুলিশ। চালক স্বয়ং-কামাল। গাড়িতে পাওয়া গেল ২০ কেজি হেরোইন—Superfine Quality পলিথিনের কাগজে মোড়া তিন-চারটি প্যাকেট—থামলেন কুমারসাহেব।

এই কেসটিকেই Biggest Narcotic Haul of Delhi বলে। আবার কিছুক্ষণ পর আস্তে আস্তে বললেন ভারতের পশ্চিমাঞ্চলের নার্কটিক কণ্ট্রোল ব্যুরোর চিফ কুমারসাহেব দক্ষিণদিল্লীর পুলিশ কমিশনার মিঃ পেরিইয়ার—খুব গর্ব বোধ করে থাকেন। আরও কি একটা বলতে যেয়ে থেমে গেলেন তিনি। আর একটা কথাও বললেন না। কিসের যেন গভীর চিন্তার ভেতর তলিয়ে গেলেন—

কামাল নওরোজের মত আরও লক্ষ লক্ষ চোরাকারবারি কি করে এই হেরোইন পায়, কে এবং কোথায় থেকে, কোন সূত্র থেকে এইসব নার্কটিক সাপ্লাই হয়ে থাকে—এসব কোন প্রশ্নই আমাকে করতে হয়নি—হয়নি কেন ঔৎসুক্য বা কৌতূহল প্রকাশ করতে। আমাকে তারই লেখা—স্মাগলিং অপারেশন ইন ইণ্ডিয়া—একটি খুব গোপনীয় সরকারি ডকুমেণ্ট পড়তে দিয়েছিলেন সেই রেকর্ডের তথ্যগুলোই এখানে খুব সংক্ষেপে বলা হল—

স্বর্ণময় ত্রিভুজ।

গোল্ডেন ট্রাঙ্গেল। ব্রহ্মদেশ, থাইল্যাণ্ড এবং লাওস। এই তিনটি ভূখণ্ডকে

একটি রেখায় সংযুক্ত করলে যে ত্রিভুজাকৃতি ভূমি পাওয়া যাবে—ড্রাগের জগতে তার নাম গোল্ডেন ট্র্যাঙ্গল বা স্বর্ণময় ত্রিভুজ। কেননা এখানকার উর্বরা ভূমিতে বিভিন্ন বিধ্বংসী মাদকদ্রব্যের মূল উপাদান আফিং-এর ফলন হয় অপর্যাপ্ত—যাকে বলে বাম্পিংক্রপ—

ছিয়াশি সালের হিসেবে দেখা যায় ৮০০ থেকে ১০০০ টন আফিং পাওয়া গিয়েছে। সাতাশি অষ্টাশিতে এই আফিং-এর চাষ যেমন, তেমনি বেড়ে গিয়েছে তার ফলন।

বার্মা, থাইল্যান্ডের পাহাড় আর জঙ্গলাকীর্ণ সীমান্ত অঞ্চলের নানা জায়গায় আছে ড্রাগের কারবারিদের গোপন ল্যাবরেটারি। সেখানে কাঁচা আফিং ভিজিয়ে পরিশুদ্ধ করে তৈরি করা হয়—মরফিন! অবশ্যই মরফিনের আদিপর্ব। সেই মরফিনের সঙ্গে অ্যাসেটাইলেশন দিয়ে গরম করে আবার পরিশুদ্ধ করা হয়। তার সঙ্গে সুরাসার এবং অ্যাজিটোন মিশিয়ে দিয়ে গরম করে আবার রিফাইন করে যে বস্তুটি তৈরি হয়, তারই নাম—

হেরোইন!

দেখতে চিনির গুঁড়োর মত। নানা রঙের হয়। সাদা, বাদামী। বাজারে হোয়াইট সুগার বা ব্রাউনসুগার ইত্যাদি নামে পরিচিত। এই হেরোইন গোল্ডেন ট্রাঙ্গেল থেকে চলে যায় দক্ষিণ চীনের প্রদেশ ইউনানে। ইউনান থেকে হংকং হয়ে ক্যান্টনে। ক্যান্টন থেকে জাহাজে অস্ট্রেলিয়া, আমেরিকা এবং পশ্চিম ইউরোপের নানা দেশে।

বলা দরকার, ইউরোপ আমেরিকার দেশে দেশে যে বেআইনী চোরাই হেরোইন কি মরফিন বিক্রি হয় তার অন্তত শতকরা ১৮ থেকে ২২ ভাগই সেই সর্বনাশা মৃত্যু-বীজবাহী অভিশপ্ত ভূখণ্ড গোল্ডেন ট্রাঙ্গেলের।

এখন কিন্তু গোল্ডেন ট্র্যাঙ্গেল থেকেই ড্রাগের ব্যবসা ছড়িয়ে পড়েছে এশিয়ার সীমানা ছাড়িয়ে সারা পৃথিবীতে।

হবে নাই বা কেন? ড্রাগের ব্যবসা যে দারুণ লাভের ব্যবসা। মইয়্যানমার (ব্রহ্মদেশে) ১৭০ ডলারের আফিং থেকে যে পরিমাণ হেরোইন তৈরি হয় আমেরিকায় তার দাম দুই মিলিয়ন ডলার। কোকো এবং মারিজুয়ানার ক্ষেত্রেও লাভের চিত্রটা ঠিক এইরকমই। ৩০০ কিলো কোকো পাতা থেকে তিন কিলো কোকো পেস্ট তৈরি হয়। আর এই ৩ কিলো পেস্ট থেকে পাওয়া যায় ১ কিলো খাঁটি কোকেন। আবার আমেরিকার একটি হিসেবে পাওয়া যায় ১ ডলারের কোকো পাতা থেকে ৩ ডলার কোকো পেস্ট তৈরি হয়। আর এই কোকো পেস্ট থেকেই তৈরি হয় সেই বিধ্বংসী মাদকদ্রব্য, যার জনপ্রিয়তা অ্যাটম বোমার মতই প্রচণ্ড বিস্ফোরক, যার ধ্বংসলীলা যেমন দূরপ্রসারী, তেমনি ভয়াবহ—সেই ড্রাগটিই হেরোইন!

তিন ডলারের কোকো পেস্ট থেকে ৩১৫ ডলারের হোয়াইট পাউডার বা হেরোইনের সাদা গুঁড়ো তৈরি হয়। সাদা, বাদামী নানা রঙের হেরোইনের পাউডার প্যাকেট করে বিক্রি হয় রাস্তার খদ্দেরদের কাছে খুব গোপনে অন্ধকারের আড়ালে।

৩ থেকে ৩১৫। পনের গুণ বেশি লাভ। আর মেহনতও তো তেমন কিছু নয়। শুধু ড্রাগের কাঁচামালের কারবারিদের কাছে কোকো এবং আফিং-এর পেস্টটুকু জোগাড় করা। তারপর ল্যাবরেটারি রিফাইনারি সবই তো নিজেদের এক্তিয়ারের ভেতরে। অতএব—

এখনকার পৃথিবীর প্রায় সবদেশের সন্ত্রাসবাদীরা আর ব্যাঙ্ক ডাকাতি কি খুন জখম করে টাকা জোগাড়ের ঝুঁকি নেয় না। ড্রাগের চোরাকারবারিদের সঙ্গে হাত মিলিয়ে যে পরিমাণ টাকা সংগ্রহ করে তার অঙ্কটা বিশাল—Drug traffickers provides them (Terrorists) access to enormous funds. তাই—

তাই সারা দুনিয়া জুড়ে সন্ত্রাসবাদীদের কার্যকলাপ যেমন বেড়ে চলেছে তেমনি ফুলে ফেঁপে উঠছে ড্রাগের চোরাকারবার—ড্রাগের এই বিস্ময়কর অভিশপ্ত বিস্তারের প্রসঙ্গে এই তথ্যটি মাথায় রাখতে হবে।

চীফ পুলিশ ইন্সপেক্টর শর্মা ওয়েস্টার্ণ জোনের নার্কটিক কন্ট্রোলের ডিরেক্টর কুমারসাহেবের সহযোগি বোম্বের জাহাজঘাটে একেবারেই বোকা হয়ে দাঁড়িয়ে রইলেন।

কৈ ষণ্ডাগুণ্ডা চেহারার পাঁচজন ইয়ংম্যান। তাদের সঙ্গে বড় বড় কাঠের বাক্স থাকবে—ইনফরমারের বর্ণনার সঙ্গে তো কিছুই মিলছে না। কোথায় তার তরতাজা জওয়ান? সব—সব ফলস ইনফরমেশান।

পাঁচবুড়ো একেবারে থুড়থুড়ে বুড়ো নয়। বেশ আটসাঁট চেহারা। তাই বয়স তাদের কাবু করতে পারেনি। পরণে দামী মসলিনের রক্তবর্ণ আলখাল্লা। সাদা ধবধবে চুলদাড়ি—সব মিলিয়ে পীর ফকির পয়গম্বরের মত কেমন আরাত্রিক পবিত্রতা।

আর হবেই না বা কেন? তারা পাঁচজনই হজযাত্রী। চলেছেন মক্কা শরীফে। সকালের আলো তাদের চোখেমুখে পুণ্যের আলোর মত ঝরে ঝরে পড়ছে।

এঁরা শুধু সম্ভ্রান্ত মুসলমান নন।

ধর্মপ্রাণ হজযাত্রী।

এদের চ্যালেঞ্জ করলেই এখুনি একটা কমুন্যাল রায়ট বেধে যেতে পারে। কিন্তু ইনফরমারের খবর তো সচরাচর ভুল হয় না। এরা তো ডিসগাইজ ছদ্মবেশ—

আপনাদের পাশপোর্ট?

কেমন থতমত খেয়ে গেল হজযাত্রীরা। বেশ ঝাঁঝিয়ে বলল কেন বিরক্ত করছেন—পাসপোর্ট না করেই কি হজ করতে যাচ্ছি—বলতে বলতে জোব্বার পকেট থেকে বের করে শর্মার মুখের সামনে তুলে ধরলে তাঁদের ছাড়পত্র।

না। কোন খুঁত নেই। ভারত সরকারের অশোকস্তম্ভ ছাপ আছে। অফিসারেরও স্বাক্ষর আছে। উত্তরপ্রদেশে বাড়ি। সম্ভ্রান্ত মুসলমান। কিন্তু যাই হোক—ডিউটি তো করতেই হবে।

খুলুন বাক্স!

আল্লা—আল্লা—ছিঃ ছিঃ—পাঁচটি কণ্ঠে আক্ষেপের ঝড় উঠল। আমরা যাচ্ছি

হজ করতে ইন্সপেক্টারসাহেব—আমাদের কাছে।

কথা না বাড়িয়ে যা বলছি করুন—

কিন্তু কোন কাজ হল না। কোরাণ থেকে পাপপুণ্যের বয়েৎ আউড়াতে লাগল। শর্মা মরিয়া হয়ে হুকুম দিলেন ভেঙে ফেল বাক্স—

স্তব্ধ হয়ে গেল কোরাণের আবৃত্তি।

ইন্সপেক্টার শর্মার চোখদুটো চকচক করে উঠল।

কোরাণ এবং পয়গম্বর মহম্মদের নাম জপার মালার নিচে থেকে বেরিয়ে পড়ল আফগানি চরস, কোন বাক্সে পাকিস্তানি আফিং আবার কোনটায় খাঁটি সোনার তাল।

বাজেয়াপ্ত মোট মালের হিসাবটা এইরকম—

আফগানি চরস—	৬৩ কে. জি.
পাকিস্তানি আফিং—	২৬ কে. জি.
সোনা—	½ কে. জি.

পুলিশের সূত্রে জানা যায় এরা বেশ কয়েক বছর ধরেই হজ তীর্থযাত্রী সেজে ড্রাগের চোরাকারবার করছিল। ভুয়ো পাশপোর্ট জোগাড় করছিল। মক্কা যাওয়ার এই জাল পাশপোর্ট নিয়ে তারা এই ড্রাগ নিয়ে চলে যেত সৌদি আরবে। সেসব সেখানে বিক্রি করে নিয়ে আসত ইলেকট্রনিক গুডস এবং সোনা!

নার্কটিক কন্ট্রোল ব্যুরোর তরফ থেকে অনুসন্ধান করে এবং খুঁটিয়ে তদন্ত করে কুমারসাহেব জেনেছেন এরা ভারত পাকিস্তানের সীমান্তে পাকিস্তানের সিকিউরিটি ফোর্সের কাছ থেকে এসব ড্রাগ কিনেছিল।

পাকিস্তান বর্ডারেই যে চোরাই ড্রাগের লেনদেন খুব বেশি হয়, তার প্রমাণ দেখুন গত ৯ মে ১৯৮৭ তারিখের স্টেটসম্যানের এই খবরটিতে—

গত ৮ মে ভারত-পাকিস্তানের সীমান্তের কাছে পাঞ্জাবের ফিরোজপুর জেলায় একদল চোরাকারবারির কাছ থেকে ভারতের সীমান্তরক্ষী বাহিনীর জওয়ানেরা ২২৪ কে. জি. হেরোইন (যার দাম ১১ কোটি টাকারও বেশি) উদ্ধার করেছে।

সিক্রেট ডকুমেন্ট পড়তে পড়তে যেন একেবারে তলিয়ে গিয়েছিলাম। হঠাৎ বাধা এল—

শুনুন—ড্রাগের ওপরে বই লিখছেন। কুমারসাহেব পাইপে তামাক ভরতে ভরতে কেমন ছাড়া ছাড়া গলায় বললেন, মনে রাখবেন ড্রাগের স্মাগলিং-এর সঙ্গে কিন্তু রাজনীতি, সমাজবিরোধী কাজ বা সন্ত্রাসবাদীদের নৃশংস কাজকর্ম মিশে গিয়েছে।

শুধু ড্রাগ অ্যাবিউস—কিন্তু কোন ফ্যাক্টরই নয়—

কি রকম, একটু এক্সপ্লেন করে বলুন কাইন্ডলি—

কোন কথা বললেন না তিনি। উঠে এসে সেই ডকুমেন্টের নিচে থেকে একটা বাংলা খবরের কাগজের কাটিং বের করে বললেন এটা পড়ুন—

'ভারতের বিরুদ্ধে পাক ড্রাগ যুদ্ধ।'

১০ মে' ৮৭ বোম্বাই পাকিস্তান কার্যত ভারতের বিরুদ্ধে ড্রাগ যুদ্ধ শুরু করেছে।

প্রচুর পরিমাণে নার্কোটিক এবং সাইকোট্রপিক ড্রাগস (এল. এস. ডি., মেথাড্রেন, ম্যান্ডারাস ইত্যাদি) ভারতে পাচার করছে—ড্রাগের ক্ষতিজনিত তথ্য পুনর্বাসন ও গবেষণা কেন্দ্রের সভাপতি ইয়ুসুফ মার্চেন্ট আজ এখানে এই অভিযোগ করেন। তিনি আরো জানিয়েছেন—নার্কোটিক উদ্ধারের সরকারি তথ্য থেকে দেখা যাচ্ছে ১৯২৮ সালে যে পরিমাণ নার্কোটিক উদ্ধার করা হয়েছে তার ৭২ শতাংশই এসেছে পাকিস্তান থেকে। ১৯০৬ সালে ওই হার বেড়ে দাঁড়ায় ১০০ শতাংশ। অতীতে বৃটেন চীনের বিরুদ্ধে যে আফিং যুদ্ধ চালিয়েছিল, ভারতের সঙ্গে পাকিস্তানের আচরণ তারই সমতুল্য। সামরিক আক্রমণের থেকে এ অনেক বেশি ভয়াবহও বটে। সমাজের ভাঙন এবং সামগ্রিক ধ্বংসেও অনেক বেশি কার্যকর……

আর পাকিস্তানে যে অত্যন্ত ব্যাপকভাবেই হেরোইন তৈরি হচ্ছে তার আরও একটা নজির—১০ আগস্ট ১৯২৮ সালের স্টেটসম্যানের খবরে বলছে, খাইবার গিরিপথ থেকে প্রায় ৩০ কিলোমিটার দূরে গঞ্জগড়ে পাকিস্তান আফগানিস্তানের সীমানায় বন্য আদিবাসী অধ্যুষিত অঞ্চলে একটি হেরোইন ল্যাবরেটারির সন্ধান পাওয়া গিয়েছে। এই আদিবাসী সর্দাররাই এক একজন ড্রাগ স্মাগলিং-এর অগ্রনায়ক। স্টাফরিপোর্টার তাই লিখেছেন, Tribesmen thriving with drug trafficking……

ঠিক তার পাশেই মার্জিনে কুমারসাহেবের একটি ছোট্ট নোট আছে বাঙ্গালোরে ৮৬ সালের শেষে সার্কের (SAARC বা দক্ষিণ এশিয়া রাষ্ট্রপুঞ্জ সম্মেলন) অবশ্য স্থির হয়েছে খুব শীগগীরই ভারত-পাকিস্তান সীমান্তে ড্রাগের চোরাকারবার রুখতে "TECHNICAL COMMITTEE ON DRUG ABUSE AND TRAFFICKING" নামে একটি সংস্থা স্থাপিত হবে লাহোরে। বলাবাহুল্য ভারত পাকিস্তানের দুই দেশেরই কর্তাদের ড্রাগের স্মাগলিং সম্বন্ধে তথ্যের দেওয়া নেওয়ার ভিত্তিতেই এই কমিটি কাজ করবে—

ছেড়ে দিন—কত আর পড়বেন। তিনদিন তিনরাত ধরে পড়লেও তো শেষ করতে পারবেন না, কুমারসাহেব বাধা দিলেন।

আপনি তো আর এই সিক্রেট ডকুমেন্টটা আমাকে নিয়ে যেতে দেবেন না। পড়ে নিই। যতটুকু মেমোরিতে রাখতে পারি—

মেমোরি! হঠাৎ যেন ক্‌কিয়ে উঠলেন কুমারসাহেব। পাইপটা সশব্দে ছুড়ে ফেলে দিয়ে উত্তেজনায় ফেটে পড়ে বললেন কত—কত মনে রাখবেন—একটা মানুষ আর কত মনে রাখতে পারে, হঠাৎ থেমে গেলেন। নিজেকে কিছুটা সংযত করে আস্তে আস্তে আবার বললেন, মনে রাখবেন ড্রাগের চোরাকারবার এবং বিক্রি কিন্তু আর সমাজবিরোধী দুর্বৃত্তদের ভেতরেই সীমাবদ্ধ নেই—আর্মি, বি. এস. এফ. সিকিউরিটি পারসনেল এবং পুলিশের লোকও ড্রাগ স্মাগলিং করছে—

বলেন কি?

আমার কথাটা হয়ত শুনতে পেলেন না নারকোটিক কন্ট্রোল ব্যুরোর ওয়েস্টার্ণ জোনের চীফ। বুক উজাড় করে একটা দীর্ঘশ্বাস ছেড়ে অস্ফুটস্বরে বললেন যে সরষে

দিয়ে ভূত তাড়াবে—তাতেই যদি—

ঘেউ—ঘেউ—ঘেউ ভেতর থেকে বোধহয় লাকিই ডেকে উঠল। সঙ্গে সঙ্গে তীরের মত উঠে দাঁড়ালেন কুমারসাহেব। কুটিল একটা সন্দেহের চাপে তার চোখদুটো কেমন কুঞ্চিত হয়ে উঠল। শক্ত—ভয়ানক শক্ত হয়ে উঠল চোয়াল দুটো—

কি হল কুমারসাহেব?

কোন কথাই বললেন না তিনি। খরচোখে তাকিয়ে রইলেন বাড়ির ভেতরের দিকে—যেখান থেকে কুকুরের চিৎকার ভেসে আসছিল। যেন অন্দরমহলের কোন কোণের ঘন অন্ধকারেই আত্মগোপন করে আছে তার লাকির অদৃশ্য আততায়ী। অতএব কুমারসাহেবের জন্মসূত্র।

ঘেউ—ঘেউ—ঘেউ—সমানে ডেকে চলেছে লাকি।

নো—দেয়ারস মাস্ট বি সামবডি—অস্ফুটস্বরে বলতে বলতে ঝড়ের মত বেরিয়ে গেলেন কুমারসাহেব।

আমি বোকার মত দাঁড়িয়ে থাকলাম।

মনে মনে একটু লজ্জিতই হলাম। এসেছিলাম ভরদুপুরে। কখন সেই দুপুর গড়িয়ে বিকেল হয়েছে। সেই বিকেল পেরিয়ে সন্ধ্যাও উতরে গিয়েছে, টেরই পাইনি। ছিঃ ছিঃ কুমারসাহেবের মত একটা ব্যস্ত মানুষ কত বড় অফিসারের এতখানি সময় নষ্ট করা—

আরে—আরে যাচ্ছেন কোথায়? হঠাৎ ফিরে এসে আমি যাওয়ার জন্য উঠে দাঁড়িয়েছি দেখেই চেঁচিয়ে উঠলেন বসুন—বসুন—স্মাগলিং-এর এখনও তো কিছুই বলা হয়নি—

আচ্ছা কুমারসাহেব লাকিকে কেমন দেখলেন?

সঙ্গে সঙ্গে ভয়ানক গম্ভীর হয়ে গেলেন কুমারসাহেব। তীক্ষ্ণ চোখে আমার দিকে তাকিয়ে বললেন, কেন আপনার দাদার ডক্টর ভট্টাচার্য (খোকন) কি লাকি সম্বন্ধে কিছু বলেছে—

হ্যাঁ—বলেছে ওর নাকি লস অফ অ্যাপেটাইট—খেতে চায় না—

খাবে কি করে—ওকে ওই শালারা যে স্লো-পয়েজন করেছে—

শালারা—মানে—?

মানে আবার কি—ওই যারা ভরদুপুরে নিশিরাতে আমার বাংলোর আনাচে-কানাচে ঘুরঘুর করে—ওই বাসটার্ড ড্রাগ স্মাগলাররা—একটু থেমে বললেন, লাকি যে ওদের পয়লা নম্বরের শত্রু—

কিন্তু কুমারসাহেব—আপনার বাড়ির চারিদিকে আর্মস গার্ড—

আমার কথাটা শেষ করতে দিলেন না কুমারসাহেব। খুক খুক করে হাসলেন। প্রচ্ছন্ন তাচ্ছিল্যের হাসি। বললেন এই ড্রাগের স্মাগলারদের সম্বন্ধে আপনার কোন আইডিয়া নেই—এদের অসাধ্য কিছু নেই—একটু থামলেন। আবার থেমে থেমে বললেন, এক একজন ড্রাগব্যারণ আছে যারা টাকার কুমীর! তারা এক একটা সাম্রাজ্য

কিনে নিতে পারে। জানেন—হঠাৎ থেমে গেলেন, মনের ভেতরে সাবেক দিনের কোন ঘটনা নাড়াচাড়া করতে করতে বললেন এই ধনকুবের ড্রাগ কিংয়ের একটা আশ্চর্য ঘটনা বলি শুনুন—

কুমারসাহেব তখন গুয়াহাটিতে ইস্টার্ণজোনের নার্কটিক কন্ট্রোল ব্যুরোর চীফ!

একদিন মধ্যরাতে আসাম-ক্যালকাটা ট্র্যাঙ্ক রোডে বঙ্গাইগাঁও রেলওয়ে গেটের কাছে একটা পাহাড়ের মত উঁচু করে মাল বোঝাই ট্র্যাক আটক করল পুলিশ। তল্লাসী করতেই চায়ের বড় বড় পেটির সঙ্গে অবিকল সেইরকম দুতিনটি পেটির ভেতরে পাওয়া গেল কোটি কোটি টাকার হেরোইন আর আফিং।

ড্রাইভারের পাশেই বসেছিল একটা গোবেচারি গোছের চেহারার মোটাসোটা আধবুড়ো চেহারার মানুষ। পরণে নীল লুঙ্গি। গায়ে ছেঁড়া ছেঁড়া ময়লা গেঞ্জি।

কার মাল? ইন্সপেক্টারের কথা শেষ হওয়ার আগেই বুড়ো লোকটা ধাঁ করে একটা পিস্তল বের করে তার দিকে উঁচিয়ে ধরল। মুহূর্তের জন্য কেমন থতমত খেয়ে গেলেন পুলিশ অফিসার। আর চোখের পলকে এক লাফ মেরে লোকটা রাস্তার ধারে ঘনজঙ্গলের ভেতরে কোথায় অদৃশ্য হয়ে গেল।

চোখের পলকে ঘটে গেল কাণ্ডটা। পুলিশ বাহিনী রব তুলল—পাকড়ো—পাকড়ো—পাকড়ো উসকো—

ড্রাইভার স্পষ্টই বলল ইন্সপেক্টারকে স্যার—বিশ্বাস করুন মাল আমার নয়। আমি সামান্য ড্রাইভার, আমার গাড়ি ভাড়া করা হয়েছিল—

তাহলে এসব মাল কার?

যিনি পিস্তল বের করে ভয় দেখিয়ে পালিয়ে গেলেন তিনিই। ডিব্রুগড়ের আয়ুব খান!

ইন্সপেক্টার চমকে উঠলেন। আয়ুব খান—গ্রেট ড্রাগব্যারণ অফ ইস্টার্ণ ইণ্ডিয়া! ব্রহ্মদেশ, থাইলাণ্ড থেকে সরাসরি হেরোইন, মরফিন এনে সারা ভারতে এবং সময় সময় আরবে ইরানেও সাপ্লাই করে। সারা এশিয়া জুড়ে তার কারবার। তার বৈশিষ্ট্য হচ্ছে তার প্রত্যেকটি স্মাগলিং অপারেশানে সে কোন না কোন ছদ্মবেশ নিয়ে সঙ্গে থাকে।

নানা জায়গায় অনেক খুঁজেও আয়ুব খানকে পাওয়া গেল না। সে অ্যাবস্কণ্ড করল। কিন্তু—

নার্কটিক কন্ট্রোল ব্যুরোর ইন্সপেক্টার চুপ করে থাকলেন না। আইনমাফিক কাজ করলেন। ড্রাগগুলো কনফিসকেট করলেন। আর Prevention of Illicit trafficking in Narcotics অ্যাক্ট অনুযায়ী তাকে গ্রেপ্তারের আদেশ দেওয়া হল ফেব্রুয়ারির ১৯৮৯ তে।

শুধু তাই নয়। তিন তিনজন হাইকোর্ট জজ নিয়ে গঠিত একটা অ্যাডভাইসরি বোর্ডও রায় দিলেন, এটা ননবেলেবল অফেন্স—অর্থাৎ আয়ুব খান কখনও জামিন

পেতে পারে না। তাকে হাজতে বাস করতেই হবে—confirmed Khan's detention।

কিন্তু আয়ুবের আছে টাকার জোর। অগাধ টাকা দিয়ে বাঘা বাঘা দুঁদে বেশ কয়েকজন লড়াকু উকিল লাগিয়ে দিল। তারা আইনের মারপ্যাচের ভেতর দিয়ে আয়ুবের বিপদ কাটিয়ে দিল। ২০ শে জুন, গৌহাটি হাইকোর্ট থেকে জামিন পেয়ে গেল—থামলেন কুমারসাহেব। তার মুখখানা বিষন্ন হয়ে উঠল। আবার খুব আস্তে আস্তে বললেন, আমরা এত মেহনত করে স্মাগলারদের গ্রেপ্তার করি—কিন্তু আইনের ফাঁকফোকর দিয়ে তারা বেরিয়ে যায়—বলতে বলতে হঠাৎ থেমে গেলেন। আবার বেশ উত্তেজিত হয়ে বললেন, সরকারি উকিলদের এবং শুভবুদ্ধি সম্পন্ন মানুষদের কর্তব্য হল—সেইসব বোম্ধা বিচারকদের বোঝানো—আয়ুবদের মত ড্রাগ স্মাগলারদের ছেড়ে দেওয়া মানে সমাজের ক্ষতি করা—He is detrimental to the soceity—বুক উজাড় করে একটা নিশ্বাস ফেললেন কুমারসাহেব। অস্ফুটস্বরে বললেন তারপরেই ঘটে গিয়েছিল সেই দুর্ঘটনা—

কি হয়েছিল ?

কি আবার হবে ? আয়ুব আমার প্রচণ্ড ক্ষতি করেছিল—

সেই দীর্ঘকাহিনী এখানে সংক্ষেপে বলা হল—

আসামে থাকতে কুমারসাহেবের আরও একটি কুকুর ছিল। তিব্বতী কুকুর। মণিপুরের এক বড়লোক স্মাগলার সাহেবকে দিয়েছিল খাতির করে।

কুমারসাহেব কিন্তু দারুণ অনেস্ট। এক পয়সা খান না এমন কি স্মাগলারদের পয়সায় একটা পান কি সিগারেট পর্যন্ত নয়। কিন্তু—

কুকুর পেলেই হয়ে গেল। নীতিধর্ম সব—সব কোথায় ভেসে গেল। যা হোক কুকুরটাকে ডাকতেন 'ভুটু' বলে। ভুটুর ছোট ছোট চোখ দুটোতে হিংস্র দৃষ্টি তরমুজের বীচির মত। হৃষ্টপুষ্ট বাঘের মত চেহারা।

যেদিন গৌহাটি হাইকোর্ট থেকে আয়ুব জামিন পেল তার তিনদিন পরেই একদিন সকালে উঠে দেখলেন—ভুটু নেই!

শুধু তার শেকলটা ছিড়ে পড়ে রয়েছে। থামলেন কুমারসাহেব।

কয়েকমুহূর্ত কি চিন্তা করে বললেন, আমার বুঝতে বাকি রইল না—ভুটুকে কে কিডন্যাপ করেছে। কিন্তু—

হতাশ হয়ে ডাইনে বাঁয়ে মাথা ঝাঁকিয়ে অস্ফুটস্বরে বললেন, এসব কোটিপতি চোরাকারবারিদের কাছে আমরা অসহায়—

লাকিকে পেলেন কি করে ?

লাকিকে পেয়েছি গোয়ায় আসার পরে—ওকে দিয়েছে গোয়ার আনজুনা বীচের এক অ্যাডিক্ট—

আনজুনা বীচ! আমার বুকের ভেতরে তোলপাড় করে উঠল।

আপনি কি আনজুনা বীচ সম্বন্ধে ইন্টারেস্টেড ? যেতে চান সেখানে—

বড্ড ভাল হয় কুমারসাহেব—আপনি যদি ব্যবস্থা—

আরে—আরে সে কী কথা—বেশ—আপনি নাভারকরের সঙ্গে যাবেন—সে আপনাকে মাথার করে—

নাভারকর ?

গোয়ার সেই অ্যাডিক্ট! আমি ওকে রিহ্যাবিলেট করেছি। আগে হেরোইন খেয়ে বুঁদ হয়ে থাকত এখন নেশাটেশা সব ছেড়ে দিয়ে মাছের বিজনেস করছে—

ঠিক দুইদিন পরেই রোগা, লম্বা সিড়িঙ্গে চেহারার একটি লোক অসীমের কোয়ার্টারে এসে হাজির হল—

কাকে চাই ?

দুর্বোধ্য গোয়ানিজ ভাষায় দ্রুত সে যা বলল তার অর্থ হল—সে নাভারকর—কুমারসাহেব জানিয়েছেন—সে আমাদের কি উপকারে লাগতে পারে—

অসীম আমাকে ইঙ্গিত করে চোস্ত গোয়ানিজে বলল আমার এই দাদাকে আনজুনা আরাম্বল আরো যতগুলো বীচ আছে তোমাকে দেখিগে দিতে হবে—পারবে না ?

নাভারকরের কুচকুচে কালো মুখখানায় হাসির আলো জ্বলে উঠল। খুশিতে গদগদ হয়ে বলল আরাম্বল বীচেই তো আমার ডেরা—আমার মাছ ধরার সাজসরঞ্জাম সবই তো সেখানে—আপনারা যা যা দেখতে চাইবেন—

তুমি আমাকে মাছ ধরা দেখাতে পারবে ?

খোকন উৎসুক হয়ে উঠল। কেন পারব না স্যার, আমার সঙ্গে নৌকো করে সমুদ্রে গেলেই দেখতে পারবেন—

অসীমের চোখে চিন্তার ছায়া পড়ল।

মনের ভেতরে তার কাজের প্রোগ্রামগুলো নিয়ে বোধহয় নাড়াচাড়া চলতে লাগল।

তোর যদি কাজের ক্ষতি না হয়, তাহলে চল না খোকন, আমি তার হাত দুটো ধরে বললাম তোর আউটিংও হবে আর মাঝেসাজে তো রেস্ট দরকার—

তপতী বাইরের ঘরে এল। ভেজা ভেজা হাতে হলুদের ছোপ। হয়ত রান্না করছিল। কথাবার্তা শুনে বাইরে এসেছে। বলল, তুমি দাদার সঙ্গে যাও—এখানে তো দিনরাত পরিশ্রম করতে করতে হাড়ে কালি পড়ে গেল—

তুমিও চল না তপতী—

কি যে বলেন দাদা, ছিটুর স্কুল আছে না।

তুমি থাকতে পারবে ?

ওমা! তিনতলায়, একতলায় তোমারই কলিগরা আছেন আমি দিব্যি থাকতে পারব—কল কল করে বলল তপতী। স্বামী বেড়াতে যাবে—কয়দিন খোলা আলো বাতাস গায়ে লাগাতে পারবে মনে করেই সে খুশি।

টুকিটাকি কয়েকটা জিনিস কেনাকাটা করতে হল। ঠিক তিনদিন পরেই আমরা আনজুনা বীচে রওনা হলাম।

দশ

আনজুনা বীচে সম্পূর্ণ উলঙ্গ জাঙ্কি যুবক যুবতীদের মাঝখানে এক জার্মান যুবক। সে হঠ-যোগ আয়ত্ব করার জন্য এল. এস. ডি খায়।

আমরা বাসস্টাণ্ডে পা দিতেই গাড়ির কণ্ডাক্টর, ক্লিনাররা একসঙ্গে চিৎকার করতে লাগল—আনজুনা বীচ—আরাম্বল বীচ—

মুহূর্তের ভেতরে বাস ভর্তি হয়ে গেল। সব ঢুলু ঢুলু চোখ। উসকো খুসকো চুল। ঢোলা প্যাণ্ট জামা নোংরা। কতকাল সাবানের মুখ দেখেনি কে জানে—

দাদা—প্রত্যেকটা জাঙ্কি—আপনার মক্কেল, চাপা গলায় বলল অসীম।

এদের যন্ত্রণায় বীচে ঘুরতে পারবেন না স্যার, নাভারকর বলল সব কটা হেরোইন কি এল এস ডি খেয়ে বেহেড হয়ে বীচে পড়ে থাকবে, একটু থেমে আবার আড়চোখে জাঙ্কিদের দিকে তাকিয়ে চাপা গলায় বলল, আরও কত নোংরা কাণ্ডকারখানা যে করে ওরা—

আনজুনা বীচ হল অ্যাডিক্টদের প্যারাডাইস—দীনেশ যাজ্ঞির কথাগুলো কানে বাজতে লাগল। শুধু ধু দিগবিস্তীর্ণ বালুচর দূরে বহু দূরে আরব সমুদ্রের নীলিম আভাস—এই অবারিত প্রকৃতির ভেতরে এসে ফ্রেকরা সভ্যতার সমস্ত বন্ধন ছুড়ে ফেলে দিয়ে বাধাবন্ধনহীন ও আদিম হয়ে উঠতে পারে। কোন অসুবিধে নেই। কোন বাধা নেই। এইজন্যেই জাঙ্কিদের কাছে আনজুনার আকর্ষণ এত বেশি।

আনজুনা বাস স্টাণ্ডে গাড়ি থামল।

জাঙ্কি যুবক-যুবতীরা হাত ধরাধরি করে হৈ হৈ করতে করতে নেমে এল। তাদের হুল্লোড়ে আর চিৎকারে বালুচরের নিস্তব্ধতাও যেন কেঁপে কেঁপে উঠতে লাগল। আমার মনে হল যেন উৎসবমুখর লোকালয়ে হঠাৎ এসে পড়েছি।

আনজুনা।

বেশ কয়েক মাইল লম্বা খুব নরম মিহি সোনালি বালি ছড়ানো বালুচর। তার মাঝে মাঝে হঠাৎ এক একটা ছোট ছোট পাহাড় মাথা ফুঁড়ে ওপরে উঠেছে। এই পাহাড়গুলোর জন্যেই যেন এই বালুচরের আদিম সৌন্দর্য আরো মনোরম আরো আকর্ষণীয় হয়ে উঠেছে। বীচের দু'দিকেই যেন সীমান্ত রচনা করেছে ছোট ছোট পাহাড়।

জানেন স্যার উত্তরদিকে যে আর একটা বীচ দেখা যাচ্ছে তার নাম ভাগ্যাটর আর দক্ষিণে বাগা বীচ, বলল নাভারকর।

কিন্তু আমাদের তো একটা ডেরা চাই নাভারকর, থেমে থেমে চিন্তিত হয়ে বলল অসীম।

আরাম্বলে আমার গরীবের আস্তানায় চলুন না স্যার—

না-না নাভারকর, তার কথা শেষ হবার আগেই প্রবলভাবে মাথা ঝাঁকিয়ে অসীম বলল দাদা এখানে অনেক জাঙ্কি দেখতে পাবেন—

নাভারকর চুপ করে গেল।

নরম বালিতে আমাদের জুতো পরা পায়ের দাগকেটে কেটে হাঁটতে শুরু করলাম।

স্যার এখানে থাকার ভাবনা করবেন না। দূরে কতগুলো ছোট ছোট কুঁড়ে ঘরের দিকে ইঙ্গিত করে বলল নাভারকর—ওই ঘরগুলো বাঁশ আর নারকেলগাছের পাতা দিয়ে তৈরি করা হয়েছে। কোনটায় চায়ের দোকান আর সব ঘরেই জাঙ্কি সাহেবরা গাদাগাদি করে থাকে—

আমরা এরকম একটা ঘর পেতে পারি না?

নিশ্চয়ই। ইচ্ছে করলে এরকম একটা কুঁড়েঘর আপনি ত্রিশ কি চল্লিশ টাকায় কিনেও ফেলতে পারেন স্যার—একটু থেমে কিছুক্ষণ কি ভেবে আবার বলল অনেক ফ্রেক আবার বীচ ছাড়িয়ে পাহাড়ের নিচে জঙ্গলের ভেতরে যেয়ে গাছগাছালির ডাল কেটে নারকেল পাতা দিয়ে ছেয়ে নিজেরাই ঘর বানিয়ে নেয়। মাত্র পনের থেকে বিশ টাকা মত খরচ পড়ে স্যার—

আরে ডাক্তারবাবু যে আপনি এখানে? আচমকা আমাদের পথরোধ করে খোকনের পরিচিত এক ভদ্রলোক।

আপনার গিনিপিগগুলো ভাল আছে?

আপনি ট্রিটমেন্ট করেছেন। খারাপ কখনো থাকতে পারে, হঠাৎ থেমে গেলেন। আমাদের হাতে স্যুটকেশ ব্যাগ দেখে বললেন আপনারা কি ঘর খুঁজছেন? বলেই দূরে একসঙ্গে জড়াজড়ি করে দাঁড়িয়ে থাকা কতগুলো নারকেলগাছের নিচে একটা ঘরের দিকে ইঙ্গিত করে বলল আমি এইমাত্র ঘরটা ছেড়ে দিয়ে এলাম—এখনও কেউ ভাড়া নেয়নি—

তাই না কি। আমরা জোর কদমে ছুটলাম সেদিকে। ক্লান্তিতে শরীর ভেঙ্গে আসছিল। অত্যন্ত অবসন্ন বোধ করছিলাম। ঘরে জিনিসপত্র রেখে একটু বসে বিশ্রাম নেব। কিন্তু—

ঘরে পা দিতেই ঘটে গেল একটা কাণ্ড। ঘরের দরজা দুটো ছিল হাট করে খোলা। জানালা-টানালার বালাই নেই। সেই খোলা দরজার সামান্য আলো আঁধারিতে মনে হল খড় বিছানো মেঝেতে যেন দুটো ছায়ামূর্তি গা এলিয়ে শুয়ে রয়েছে। দূর থেকে তাদের দুটো মোটা দাগের অন্ধকার কালো রেখা মনে হচ্ছে।

আশ্চর্য আমাদের পায়ের শব্দে টুকরো টুকরো কথাতেও তাদের ঘুম ভাঙ্গল না। টর্চ জ্বালল অসীম। টর্চের আলো তাদের ওপর বন্দুকের গুলির মত আছড়ে পড়ল। সেই আলোয় দেখা গেল—দুটো বিদেশী তরুণ তরুণী। দুই জাঙ্কি তাদের দেহের কোথাও কোন পোশাকের চিহ্ন নেই। সম্পূর্ণ নিরাবরণ হয়ে নেশায় অচেতন হয়ে পড়ে আছে।

অসীম ঘৃণায় লজ্জায় মুখ ঘুরিয়ে বাইরে চলে গেল। সে ছোটবেলা থেকেই

গোঁড়া—পিউরিট্যান! আমি নাভারকরকে নিয়ে এগিয়ে গিয়ে দেখলাম দু'তিনটি বড় বড় শিশির ভেতরে বেগুনী, নীল, কালো, ধূসর—নানারঙের এবং নানা আকৃতির ছোট ছোট বড়ি—

খুদে খুদে বড়িগুলো হল মাইক্রোডটস আর তেকোণা উ'চুগুলো—পিরামিড চাপা গলায় বলল নাভারকর। সমুদ্রে মাছ ধরলে কি হবে—জাঙ্কিদের স্বর্গের কাছা-কাছি থেকে নেশার সম্বন্ধে তার বেশ অভিজ্ঞতা হয়েছে।

আবার ঘরের আর দুটো শিশি টেনে বের করল সে। সে দুটোতেই লিকুইড—জলের মত তরল কি যেন ঝকমক করছে।

স্যার—এগুলো লিকুইড এল. এস. ডি.। যেন দারুণ একটা কিছু আবিষ্কার করেছে তেমনি তীব্র আনন্দে উত্তেজনায় ছটফট করে বলল আরাম্বলের ধীবর, স্যার আমি নিজের চোখে দেখেছি ফ্রেকরা জিভের ওপর কয়েকটা ফোঁটা ঢেলে নেয় আবার কখনো কখনো একটুকরো চৌকো ব্লটিংপেপারের ওপরে কয়েকটা ফোঁটা ঢেলে নিয়ে চুষতে থাকে—প্রায় সঙ্গে সঙ্গেই তারা টলতে থাকে। নেশার ঘোরে বেহুঁস হয়ে যেন সাগরের অতলে তলিয়ে যায়। কিন্তু—হঠাৎ থেমে গেল নাভারকর। ঘরের এদিকে সেদিকে উৎসুক হয়ে কি যেন খুঁজতে লাগল—

কি খুঁজছ নাভারকর—

ছোট ছোট বড়িগুলোও এল. এস. ডি. স্যার। কিন্তু ওরা বড়ি খায়নি—নিজের মনেই বলতে লাগল নাভারকর ওরা এই লিকুইড এল. এস. ডি. ও খায়নি—

তাহলে?

এই যে পেয়ে গেছি স্যার—পেয়ে গেছি। তারা যে ব্যাগ মাথায় দিয়ে শুয়ে রয়েছে তার নিচ থেকে টেনে বের করল—বড় একটা নোংরা সিরিঞ্জ, নিডল—ইনজেকশানের সাজসরঞ্জাম।

ওরা নিজেরাই নিজেদের হাতের শিরায় ইনজেকশান করে লিকুইড এল. এস. ডি. নিয়েছে। একটু থেমে বলল এতে তীব্র নেশা হয় স্যার—terribly potent!

তুমি এত জানলে কি করে নাভারকর?

আরাম্বলের ফ্রেকরা বেশ পয়সাওয়ালা ঘরের ছেলেমেয়ে স্যার—

ওরা প্রতেকে এই লিকুইডই যে খায়—

এই ঘরের আশা ছেড়ে দাও—নাভারকর—বাইরে থেকে অধৈর্য হয়ে চেঁচিয়ে বলল খোকন অন্য ঘরের খোঁজ কর—ওদের তুলতে পারবে না—

বলছেন কি ডাক্তারবাবু চায়ের দোকানদারকে অ্যাডভান্স করে ঘর বুক করে এলাম—দেখলেন না উ'চু গলায় বলল নাভারকর—আমাদের ঘর আমরা ছাড়ব কেন—দাঁড়ান—কি করে নেশাখোরদের নেশা ছুটিয়ে দিতে হয় আমি জানি—ছুটে যেয়ে বালতিতে করে ঠাণ্ডা জল নিয়ে এল। কিন্তু—

নাভারকরকে আর কিছুই করতে হল না। ঠাণ্ডা জল জাঙ্কিদের গায়ে ঢালতে হল না। তাদের খোঁচাতেও হল না।

খট খট জোড়া জোড়া বুট জুতো পরা পায়ের শব্দ বেজে উঠল। মার মার করে এল আনজুনা সীবীচের একদল কপ। তারা কোন কথা না বলে হাণ্টার দিয়ে বেধড়ক পেটাতে লাগল জাংক দুটোকে। নেশার আচ্ছন্নতা থেকে জেগে উঠেই তারা যন্ত্রণায় আর্তনাদ করে উঠল।

ছেলেটি মনে হল আমেরিকান। চোস্ত ইংরেজীতে বলল পুলিশদের, আমাদের মারছ কেন—কি করেছি আমরা—

ইউ—জাংক—ব্রুটস হিংস্র আক্রোশে চিৎকার করে উঠল কপদের অফিসার—তোমরা স্মাগলার—আমরা খবর পেয়েছি। কুলুভ্যালি থেকে তোমরা ৮০০ গ্রাম ফ্রেস হ্যাস (গাঁজা) নিয়ে এসেছ—মেয়েটি ভয়ে বিবর্ণ হয়ে গেল।

আর তার সঙ্গী ছেলেটি মরিয়া হয়ে চিৎকার করে বলল—ফলস—ফলস। All are false allegations—

ইন্সপেক্টারের মুখে চাপা হাসি ছুরির ধারের মত ঝিকমিক করতে লাগল। আস্তে আস্তে বলল তোমরা সেই হ্যাসের কিছুটা গোপনে চড়া দামে বোম্বেতে বিক্রি করে এল. এস. ডি. কেননি ?

ছেলেটি যেন হঠাৎ নিভে গেল।

আর বাদ বাকি চোরাই হ্যাস তোমাদের কাছে আছে। ভালয় ভালয় বের করে দাও, তা না হলে—

না। আমাদের কাছে কিছু নেই—

এই লাগাও তল্লাসি—কর সার্চ। সফল শিকারীর মত আনন্দে উত্তেজনায় কাঁপতে লাগল কপদের প্রধান।

পুলিশরা ঝাঁপিয়ে পড়ল ঘরে। তাদের কিটব্যাগ, রুকস্যাক, ঘাড়ে ঝোলানো ব্যাগ, প্যাণ্টসার্ট, স্টিরিও, ক্যামেরা, ট্র্যানজিস্টার সব আছড়ে আছড়ে ফেলে ক্ষ্যাপার মত খুঁজতে লাগল অ্যাঞ্জেলডাস্ট (গাঁজা)।

কোথাও কিছু পাওয়া গেল না—

ইমপসিবল—নার্কটিক ব্যুরোর খোদ হেড কোয়ার্টারের ইনফরমেশান। কোমরে হাত দিয়ে চিৎকার করতে লাগল বীচকপ ইন্সপেক্টার, মিথ্যে হতে পাবে না—

আমরা নীরব দর্শক হয়ে দাঁড়িয়ে আছি। মেয়েটার ভয় কেটে গেছে। বেশবাস ঠিক করে নিয়ে নেশার ঘোরে ঢুলতে লাগল। ছেলেটির মুখে যেন যত রাজ্যের বিস্বাদ বিরক্তি চেপে নেমে এসেছে।

পুলিশের ভয়ে নয় নেশার মৌতাতের মধুর আচ্ছন্নতা থেকে বাস্তব পৃথিবীর রূঢ়তার ভেতরে আসতে হয়েছে বলেই যেন ওদের তীব্র ক্ষোভ।

কপরা হতাশ হয়ে ফিরে যাচ্ছিল। কিন্তু দুঁদে ইন্সপেক্টার হটে যাওয়ার পাত্র নয়। হঠাৎ কি মনে করে চেঁচিয়ে বলল অনুচরদের সাহেব মেমদের জুতোর সুকতলি দেখেছ ব্লাডি—অপদার্থ—ওয়ার্থলেসের দল—

হ্যাঁ স্যার—চার জোড়া জুতো সাহেবের সামনে নিয়ে এল।

জুতো দেখে কি করব ক্ষিপ্ত হয়ে উঠল কপদের দলনায়ক—কর ওদের বডি সার্চ—

স্যার—ও তো আউরত আছে—

ড্যাম ইয়োর আউরত। রাগে ফেটে পড়লেন ইন্সপেক্টার—দিনের বেলায় ন্যাংটো হয়ে শুয়ে থাকে—ও আবার কিসের জেনানা—কর তল্লাসি চোরাই মেরীজুন* আমার চাই—ই—চাই। মাথা নিচু করে নিজের মনেই বিড় বিড় করে বলল—শালা ডেপুটি সুপার আমার ডায়েরিতে কষে নোট দিয়েছে—আনজুনা বীচের কেস ফিগার ফল করছে— mprove yourself—

পেয়েছি স্যার—পেয়েছি, এক সিপাই চিৎকার করে উঠল—সাহেবের জাঙ্গিয়ার ভেতরের পকেটে কয়েকতোলা গাঁজা পাওয়া গেছে—

উঁহু—উঁহু—উল্লাসে গরগর করতে করতে দলপতি বলল, আরও আছে—আরও চারশো গ্রাম মেক্সিক্যান ব্রাউন* ওদের কাছে আছে—খোঁজ—খোঁজ—আউরতটার পোশাকের ভেতরে হাত ঢুকিয়ে দেখ—

বনস্টেবলরা কথা বলে না। তারা এ ওর মুখের দিকে তাকায়। তাদের চোখে মুখে অস্বস্তি ফুটে ওঠে।

স্যার—গোয়াতে একটা ফোন করে দিন না—মেয়েপুলিশ আর ফিমেল সার্চার—

সাট আপ—ইউ ব্লাডি ফুল, গর্জন করে উঠল ইন্সপেক্টার, আমার সঙ্গে ফোর্স পাঠানোর পরেও আবার একটা কেসের জন্য ফিমেল সার্জেণ্ট পাঠাবে—তোমাদের কাউকে কিছু করতে হবে না, বলেই জুতো মসমস করে এগিয়ে যেতেই আমাদের দেখে থমকে দাঁড়াল।

আপনারা ?

আমরা এই ঘর ভাড়া নিয়েছিলাম স্যার, নাভারকর ভয়ে ভয়ে বলল এসে দেখি—জাঙ্কিদুটো জোর দখল করে এখানে নেশা করে—

বুঝতে পেরেছি—ঘর এখন পুলিশের হেফাজতে, ধমকে উঠল ইন্সপেক্টার ঝামেলা না মিটলে পজেশান পাবেন না—ঝড়ের বেগে ভেতরে যেতে যেতে চেঁচিয়ে বলল আপনারা এখন কেউ ভেতরে যাবেন না—কয়েক মুহূর্তের স্তব্ধতা।

ভেতরে কি অপারেশান চলছে দেখা যায় না। অনুমান করা যায়।

উঃ—হোয়াট আর ইউ ডুয়িং—মেমসাহেবের তীক্ষ্ন আর্তনাদে বাতাস ভারি হয়ে উঠল। আর একটু পরেই বেরিয়ে এল আনজুনা বীচের চীফ ইন্সপেক্টার মুখে সাফল্যের হাসি ঝকমক করছে। আমাদের শুনিয়ে শুনিয়ে চেঁচিয়ে বলল, মাগী মোক্ষম জায়গায় রেখেছিল এই পুরিয়া—আমিও শালা মারাঠির বাচ্চা এস· বি· ডাতার—আমার সঙ্গে চালাকি—

মেরীজুন—জাঙ্কিদের জগতে চালু গাঁজার আর এক নাম।

মেক্সিক্যাপ ব্রাউন—ফ্রেস হ্যাস বা টাটকা গাঁজাকে ফ্রেকরা বলে মেক্সিক্যাপ ব্রাউন।

ওদের অ্যারেস্ট করে থানায় নিয়ে গেল।

আমরা ঘরে ঢুকলাম।

অসীম কেমন বিষন্ন কণ্ঠে বলল, আমি যতটুকু জানি—জাংকিরা one and all are sumggler—একটু থেমে বলল আবার স্মাগলিং না করলে এত ড্রাগের খরচ জোগাবে কি করে? আবার মনে মনে যেন কিসের হিসেব করে বলল, একবার এল এস ডি ইনজেকশান পুশ করতে কত খরচ হয় দাদা জানেন?

কত?

প্রায় পঁচিশ টাকা—ভেরি কস্টলি ড্রাগ—

তুমি ড্রাগওয়ার্ল্ডের এত খবর জানলে কি করে—

আপনারা ভাবেন গরু-মোষের ডাক্তারি করি—আমি আর কি জানব, মাথা ঝাঁকিয়ে হেসে হেসে বলে খোকন দাদা একটা জিনিস মাথায় রাখবেন—আমার সমস্ত ক্লায়েন্ট বা পার্টি—অত্যন্ত বীচ—যাকে বলে ফেবুলাসলি বীচ, একটু থেমে আবার বলল আর বড়লোক হলেই হয় কুকুর, না হয় খরগোস, ছাগল গরু বাছুর পুষবেই পুষবে, থেমে যায় সে। আবার তীক্ষ্ণকণ্ঠে বলে জন্তু জানোয়ার বাড়িতে না থাকলে তো অ্যারিস্টোক্র্যাসি থাকে না—

এরা কি বিজনেসম্যান—

নিশ্চয়ই, ব্যবসা তো বটেই। তবে জেনে রাখবেন চারিদিকে সন্ত্রস্ত চোখে তাকিয়ে চাপা গলায় বলল গোয়ার বাসিন্দা এরা—বেশিরভাগই ইণ্টারন্যাশনাল স্মাগলার—এদের অপর্যাপ্ত ব্ল্যাকমানি—

কথায় কথায় বেলা পড়ে এল। বিকেলের কোমল বিষন্ন ছায়া নেমে এল ধু ধু বালুচরে।

নাভারকর—একটু চায়ের বন্দোবস্ত কর—

তীরের মত উঠে দাঁড়াল নাভারকর। খোকনকে বলল এখানে নিয়ে আসব ডাক্তার-বাবু—না রেস্টুরেন্টে গিয়ে যাবেন?

তাই চল—একটু ঘোরাও হবে—

বাইরে আসামাত্র আরব সাগরের হু হু বাতাস শীতল জলের ঝাপটার মত আছড়ে পড়ল আমাদের চোখে মুখে। আমাদের পাশে পাশে হাঁটতে হাঁটতে নাভারকর বলল জানেন স্যার—এই বীচের ঠিক বালুচরটা মানে স্যাণ্ডি পোর্শানটা সাতশো ফিট চওড়া, একটু থেমে আবার দূরে আঙুল দেখিয়ে বলল আর ওই—ওই যে পূর্বদিকের নারকেলবীথিটা, তারপরেই ধু ধু করছে ধানের মাঠ—

বাঃ আনজুনাতে তো সবই আছে দেখছি—

আর ওই দেখুন হেডলাইট জ্বালিয়ে গাড়ি যাচ্ছে—ধানের ক্ষেতের গা ঘেসে চলে গিয়েছে মোটরেবল রোড—চওড়া পীচের রাস্তা—

ফাঁকা বালুচরে সন্ধ্যা ঘোর হলেও অন্ধকার নামে না।

ফিকে আবছায়া আলোয় ধু ধু বালুচর, উঁচু উঁচু টিলা, নারকেলগাছের সারি।

সব—সব কেমন মায়াময় হয়ে ওঠে। মনে হয় যেন কোন্ সুদূর স্বপ্নের দেশে এসে পড়েছি।

আনজুনায় ইলেকট্রিক নেই।

বাঁচের এখানে সেখানে ছড়ানো চায়ের দোকানে দোকানে আলো জ্বলে উঠল। মোমবাতির আলো। আমাদের আশপাশ দিয়ে জাঙ্কিরা যাওয়া আসা করছে। আশ্চর্য তারা হাঁটছে যেন দম দেওয়া কলের পুতুল বা অটোমেটরের মত। তাদের চোখে মুখে না বিষাদ না আনন্দ না দুঃখ—কোন অভিব্যক্তিই নেই। যেন কিসের একটা ঘোরের ভেতরে চলাফেরা করছে।

প্রত্যেকটা সাহেবমেম স্যার, বলতে বলতে হঠাৎ দাঁড়িয়ে পড়ল নাভারকর।

কি হল নাভারকর ?

ওদিকে আমি স্যার আপনাদের সঙ্গে যেতে পারব না—

কেন—কি হয়েছে ওদিকে ? তীব্র কৌতূহলে খোকনের চোখ দুটো জোনাকির মত জ্বলতে থাকে।

আমিও উৎসুক হয়ে উঠি। যেদিকে যেতে চাইছে না নাভারকর সেদিকেই যাওয়ার প্রবল বাসনা বুকের ভেতরে খামচাতে থাকে।

কী হেঁয়ালি করছ নাভারকর—কি আছে ওদিকে ? পাঞ্জিমের ভেটারিনারীর বড়কর্তার কণ্ঠে বিরক্তি ফুটে ওঠে।

বেশ চলুন—অনিচ্ছা সত্ত্বেও আমাদের নিয়ে ওদিকে যেতেই আবার বাধা—

স্যার—আমাকে দশটা টাকা দিন, এক গোয়ানিজ যুবক হাত পেতে আমাদের সামনে দাঁড়াল। ব্যাকুল কণ্ঠে বলল, স্যার—ওনলি—ওনলি টেন রুপিজ—আমি একটা পয়সা বেশি নেব না—

কেন—টাকা দিয়ে তুমি কি করবে ?

কোন কথা বলল না ছেলেটি। বলতে পারল না। তীব্র যন্ত্রণায় দু'হাতে বুক চেপে ধরে এক নিদারুণ জ্বালায় জ্বলে যেতে যেতে অস্ফুটস্বরে বলল, ড্রাগ—স্যার—ড্রাগ—

চলে যাও এখান থেকে গর্জে উঠল খোকন, তুমি নেশা করবে আর পয়সা দেব—তার কথা শেষ হওয়ার আগেই যুবকটি ধপ করে তার পায়ের ওপর টান টান হয়ে শুয়ে পড়ল। ফিস ফিস করে বলল দিন স্যার—দিন স্যার—মরে যাব—একেবারে মরে যাব--সন্ধ্যের অন্ধকারে আচ্ছন্ন নির্জন বালুচরে তার চাপাগলার কথাগুলো কেমন কাতরকান্নার ফোঁস ফোঁসানির মত মনে হল।

আমাদের কাছে সুবিধে হল না বলে সে এগিয়ে গেল। সাগরের শাঁ শাঁ বাতাসের সওয়ার হয়ে ভেসে এল তার ক্ষীণ করুণ কণ্ঠস্বর—স্যার—ওনলি—ওনলি টেন রুপিজ—

ড্রাগের কী সাংঘাতিক পরিণতি! একটা বড় নিশ্বাস বাতাসে ভাসিয়ে দিয়ে খোকন বলল—

এখন বোগিং করে না পেলে চুরি করবে স্যার।

এইবার সন্ধ্যার অন্ধকার একটু একটু করে ঘন হয়ে নামল বালুচরে। চায়ের দোকানে দোকানে জাঙ্কিদের ভিড় উপছে পড়ছে।

একটু ফাঁকা কোন দোকানে গেলে হত না ?

না দাদা। ড্রাগ অ্যাডিকশানের মালমশলা সংগ্রহ করতে এতদূরে এসেছেন। খোকন হেসে বলল, গোয়ার এইসব বীচ হল ইন্টারন্যাশনাল জাঙ্কিদের লীলাক্ষেত্র—চলুন—দেখবেন কত বিচিত্র অ্যাডিক্ট যে দেখবেন—

দোকানে পা দিতেই জাঙ্কিরা যেন একটু বিরক্ত হল। তাদের বেশির ভাগ হেরোইন কি এল. এস. ডি. খেয়ে ঢুলছে। প্রেমিকা বা সঙ্গিনীর কোমর জড়িয়ে ধরে চা খাচ্ছে। খাচ্ছে কাপের পর কাপ—

গোয়ানিজ দোকানি খোকনের পরিচিত। হেসে বলল জানেন ডাক্তারবাবু এরা এক একজন চল্লিশ বিয়াল্লিশ কাপ চা খেয়ে নেয়—

নেশা করলে কি চা—

না ডাক্তারবাবু আমি ওদের মুখে শুনেছি—নেশা করার পর যখন ঝিমুনি আসে—ছোকরা দোকানদার বলতে লাগল তখন ওদের মনে হয় চা খেলে বুঝি চাঙ্গা হতে পারবে—তাই কাপের পর কাপ, একটু থামল। মাথাটা ঝাঁকিয়ে বলল, আবার চা কি কফি—কোন কিছুতেই যে নেশার অবসন্নতা আর কখনো কাটবে না সেটা ওরা জানে না—বলতে বলতে হঠাৎ দোকানের অন্ধকার কোণে এক জাঙ্কিদের দিকে আড়চোখে তাকিয়ে চাপা গলায় বলল ওর সঙ্গে কথা বলুন—অদ্ভুত মানুষ—

আমাদের আর গায়ে পড়ে আলাপ করতে হল না। সে নিজেই তাড়াতাড়ি আমাদের সামনে এসে—আপনারা নিশ্চয়ই ইণ্ডিয়ান—

হ্যাঁ—কিন্তু কেন ?

কোন কথা বলল না সে। বছর ত্রিশেকের জার্মান যুবকটি চোখে চিন্তার ছায়া নামল। কেমন ঝাপসা গলায় বলল আমি অকাল্ট সায়েন্সে খুব ইন্টারেস্টেড, থেমে গেল সে। আবার নিজের ভেতরে ডুবে থেকে বলল শুনেছি—আনজুনা কি আরাম্বল বীচে না কি তুকতাক জানা লোক হঠযোগির দেখা মেলে—

আপনি হঠযোগে ইন্টারেস্টেড ? আমি বললাম।

কোন কথা বলল না সে। ম্লান একটু হেসে বলল, আপনারা গৌতম বুদ্ধ চৈতন্যের দেশের লোক স্যার—আপনারা অত্যন্ত ফরচুনেট—কত রীচ আপনাদের রিলিজিয়াস ট্রাডিশান—কথা বলতে বলতেই আবার নিজের ভেতরে মগ্ন হয়ে গেল।

জাঙ্কি বলে তো মনে হচ্ছে না।

খাড়া নাকে ধারালো লম্বাটে মুখের রেখায় রেখায় দৃঢ়তা। ঘন নীল দুটো বড় বড় চোখে কেমন সুদূর স্বপ্নাচ্ছন্ন দৃষ্টি।

কতদিন আগে ইণ্ডিয়ায় এসেছেন ?

কোন কথা বলল না।

দূরে—বহুদূরে অন্ধকারে আচ্ছন্ন সাগরের দিকে চোখদুটো ছড়িয়ে দিয়ে দাঁড়িয়ে রইল। দাঁড়িয়ে রইল পাথুরে মূর্তি।

আপনি অকাল্ট সায়ান্স—মানে হঠযোগ সম্বন্ধে ইণ্টারেস্টেড হলেন কি করে?

কোন সাড়া নেই।

আমার কথা যেন শুনতে পাচ্ছে না—

বুকের ওপর মাথা ঝুলিয়ে অস্ফুটস্বরে যেন কোন স্বপ্নের ঘোরে বলল, সত্যিই কি ইণ্ডিয়ায় এসেছি—কে যে কোথায় আসে কি করে আসে আর কেমন করেই বা অকাল্ট সায়ান্স (তুকতাক বশীকরণ) বা থিয়োলজি (ঈশ্বরতত্ত্ব) সম্বন্ধে মানুষের ইণ্টারেস্ট জাগে—থেমে গেল। আবার হেসে বলল এসবের কি কোন এক্সপ্ল্যানেশান আছে—

বেশ শিক্ষিত লোক বলে মনে হল।

শুধু শিক্ষা নয়। চিন্তাভাবনা, ধ্যানধারণাও আছে—

কথাবার্তায় যেমন দূঢ়—ভয়ানক সার্প, বেশবাস তেমনি একেবারে উল্টো। ঢোলা প্যাণ্ট। তার আবার দুএকটা বোতাম নেই। বেশ ময়লা। মনে হয় অনেক—অনেকদিন লণ্ড্রি কি ধোপাখানার মুখ দেখেনি। সবচেয়ে আশ্চর্য সাহেবের জুতো জোড়া! মনে হয় একদা ছিল সাদা ধবধবে কেডস জুতো—এখন আসল রঙ হারিয়ে কেমন ধুসর আর ছাই ছাই রং ধরেছে। তাও আবার দুটো পায়েরই কনে আঙুলের জায়গায় বোগল ফুটো। সেই ফুটো দিয়ে আঙুল উঁকি দিচ্ছে।

ওয়েল মনে হচ্ছে আপনারা হটযোগীর কিম্বা অকাল্ট সায়েন্সের এক্সপার্টের সঙ্গে দেখা করিয়ে দিতে পারবেন না—সাহেব যেন ব্যস্ত হয়ে উঠে পড়ল। বলল এমন মস্ক বা সন্ন্যাসীর সন্ধান দিতে পারেন যারা হ্যালুসিনোজেনাস (Hallucinogenus গাঁজা, চরস জাতীয় ড্রাগ যা খেলে খোয়াব দেখে বা দৃষ্টি বিভ্রম কি শ্রুতি বিভ্রম হয় এবং অদ্ভুত এক অলীক জগতে পৌঁছে যায়) ড্রাগ খেয়ে তুরীয় লোকে পৌঁছে যায়—

আপাতত পারছি না খোকন বলল, গোয়াতে গেলে দুএকজন মস্তের সঙ্গে দেখা করাতে চেষ্টা করতে পারব—

জানেন আপনারা ড্রাগকে যতটা ইনজুরিয়াস মনে করেন, সাহেব যেন খোকনের কথা শুনতেই পেল না, বেশ প্রত্যকের সঙ্গে প্রত্যেকটি কথা কেটে কেটে স্পষ্ট উচ্চারণ করে বলল, ততটা ইনজুরিয়াস নয়। একটু থামল সে। আবার অন্ধকার ধু ধু বালুচরের দিকে চোখদুটো ছড়িয়ে দিয়ে বলল যদি জীবন সম্বন্ধে মহৎ এবং বলিষ্ঠ উপলব্ধি নিয়ে ড্রাগ খান, তা সে হেরোইনই হোক—আর এল এস ডিই হোক বা ক্যানাবিসই (গাঁজা) হোক—তাহলে—

তাহলে কি হবে—

Definitely it can help to attain higher level of conciousness… মানসিকতাকে চৈতন্যকে এক উন্নত স্তরে নিয়ে যেতে পারে। তবে—থেমে গেল সেই বিচিত্র জার্মান যুবক, আবার থেমে থেমে বলল তবে মুস্কিল কি জানেন অপরিণত

বয়সের কতগুলো অর্বাচীন ছেলেমেয়েরা এল. এস. ডি. বা হেরোইনের মত সাইকিয়াটিক ড্রাগ খেয়ে দারুণ জটিলতা বাধিয়ে ফেলে—

প্রত্যেকটি কথা বলছে সে যেন একেবারে বুকের ভেতর থেকে। কিসের যেন আশ্চর্য প্রেরণায় তার বড় বড় চোখদুটো জ্বলজ্বল করছে।

কি হে পণ্ডিত—হেরোইনের একটা ফিক্স চলবে না কি? এক জাংক টলতে টলতে এসে যেন ইচ্ছে করেই তাকে একটু খুঁচিয়ে দিল।

ধক করে জ্বলে উঠল তার চোখদুটো। ক্ষিপ্ত হয়ে বলে উঠল—

নো—আই হেট ইউ ড্রাগ টেকারস—

জাংকি ছেলেটি ভয় পেয়ে পিছু হটতে লাগল। চিৎকার করে সে বলল খবরদার আমাকে বিরক্ত করতে এস না—অনেক—অনেকবার বলেছি—

আমাদের দিকে শান্ত সরল সহজ দৃষ্টিতে তাকিয়ে আস্তে আস্তে বলল জানেন, আমি এই অর্ডিনারি ড্রাগটেকারদের একেবারেই সহ্য করতে পারি না। একটু থেমে কেমন গাঢ়কণ্ঠে বলল, এদের কোন জীবনদর্শন নেই। জীবন সম্বন্ধে কোন উপলব্ধি নেই—শুধু মাতাল হওয়ার জন্যেই, শুধু নেশা করার জন্যেই ড্রাগ খায় এরা—র‍্যাবিশ।

সেদিন নয়।

আরও দুদিন পরেই একটু ঘনিষ্ঠতা হতেই নিজেই সে বলেছিল তার জীবন বৃত্তান্ত। বলেছিল কখনো ভয়ানক উত্তেজিত হয়ে, কখনো আকাশের দিকে হাতের মুঠো ছুড়ে ছুড়ে। আর তার বলার ভেতরে ভাবাবেগ ছিল অনেক বেশি। সেসব বাদ দিয়ে খুব সংক্ষেপে বলা হল তার বিচিত্র জীবনের ইতিবৃত্ত—

ট্রিপারা।

বার্লিন ইউনিভারসিটির ফাইলোলাজির (ভাষাতত্ত্বের) এম. এ। অধ্যাপনা করেছিল। বেশ অবস্থাপন্ন ঘরের ছেলে। বাবা মা দুজনেই অঢেল রোজগার করেন। অতএব স্বচ্ছন্দ এবং নিশ্চিন্ত জীবন।

বুদ্ধিমান। সুশ্রী। উচ্চশিক্ষিত। ব্যক্তিত্বও বেশ জোরাল যাকে বলা যায় 'ম্যানলি'। অতএব—

যা হওয়ার তাই হয়েছিল। একটি দুইটি করে মেয়েবন্ধু জুটতে শুরু করেছিল। দিনে দিনে তাদের সংখ্যাও বাড়ছিল—

এই পর্যন্ত বলেই হঠাৎ থেমে গিয়েছিল ট্রিপারা। তার মনের ভেতরে হয়ত প্রেমিকারা মিছিল করে চলছিল।

কিন্তু জানেন সব মেয়ে এক ধাতুতে গড়া, প্রত্যেকটি কথা কেটে কেটে বলতে লাগল—প্রচণ্ড রিয়েলিস্টিক—কঠিন বাস্তববাদী। চোখে কোন স্বপ্ন নেই—কোন আইডিয়া নেই। কিন্তু আছে শুধু একটা জিনিস—

কী—

বিড়ালের যেমন লক্ষ্য শুধু পাতের দিকে তেমনি মেয়েদের প্রেম ভালবাসা ছলা কলার আড়ালে থাকে একটাই মোটিভ—সেক্স—কথা বলতে বলতে কণ্ঠস্বরে উত্তাপ ফুটে উঠল। চোখে ঘৃণার খিক্কার জ্বলতে লাগল। বিস্বাদ বিবর্ণ গলায় বলল, ওদের শুধু চেষ্টা হচ্ছে কি করে মধু খাইয়ে আপনাকে বশ করবে—বিপর্যস্ত করে দেবে আপনার জীবন—থেমে গেল ট্রিপারা।

সাগরের বুকে অন্ধকার ঘন হচ্ছে।

সাঁ সাঁ বাতাসের সঙ্গে বালির কণা উড়ে এসে পড়ছে আমাদের চোখেমুখে।

এই তো একজন নাছোড়বান্দা হয়ে আমার সঙ্গে ইণ্ডিয়াতে এসেছিল—

তিনি কোথায়—আনজুনায় এসেছেন—

আরে না—না, বিরক্ত হয়ে বলল, ঐসব শৌখিন তরুণী আসবে এখানে—এই বালুচরে, যেখানে ইলেকট্রিক নেই, পাকা বাড়ি নেই একটু থেমে বলল বোম্বে পর্যন্ত। হঠাৎ জিদ ধরে বসল—গোয়ায় যাবে না—আমিও দুত্তোর বলে তাকে ছেড়ে চলে এসেছি—

আপনি তাহলে ফেরার সময় তাকে সঙ্গে করে নিয়ে যাবেন নিশ্চয়ই—

ইমপসিবল! আমি ফিরব কিনা, কোথায় যাব আমি নিজেই জানি না—একটু থেমে বেশ দম্ভের সঙ্গে বলল, আমি প্ল্যান প্রোগ্রাম করে কখনো কিছুই করি না—প্ল্যান করে কিছু করা যায় আমি বিশ্বাস করি না—থেমে গেল ট্রিপারা। একেবারেই অকারণে মুঠোমুঠো বালি নিয়ে সমুদ্রের দিক চিহ্নহীন অন্ধকারে ছুড়ে ছুড়ে দিতে লাগল—

তার কথাবার্তা শুনে তাকে এক সৌখিন বোহেমিয়ান বা ভবঘুরে বলে আমার মনে হচ্ছিল। কিন্তু তার জীবনের সব ঘটনা শুনে এই ভুল ভেঙ্গে গিয়েছিল।

একদিন বার্লিনের রাস্তায় যেতে যেতে ট্রিপারাকে থমকে দাঁড়িয়ে পড়তে হয়েছিল। অনেক লোক গোল হয়ে দাঁড়িয়ে ভিড় করে কি যেন দেখছে। সেও উঁকি দিয়ে দেখল—এক ভারতীয় সন্ন্যাসী চিৎকার করে বলছে যোগের দ্বারা অসাধ্য সাধন করা যায়—এই দেখুন এই ঘটির জলে আমি হাত ডুবিয়ে দিচ্ছি—জলটা সঙ্গে সঙ্গে শরবত হয়ে যাবে—

দর্শকদের চোখের পলক পড়ছে না। সত্যিই সেই জল ট্রিপারা নিজে চেখে দেখল—একেবারে চিনির মত মিষ্টি। ব্যস সঙ্গে সঙ্গে সেই সাধুর সঙ্গ নিল—

১৯৬০ সালের মাঝামাঝি হবে—সব ছেড়েছুড়ে দিল ট্রিপারা। কলেজের চাকরি ছাড়ল, বাড়িঘর ছাড়ল—নিশ্চিন্ত জীবনের আশ্রয় ছেড়ে এক অজানা রহস্যময় জগতের দুর্নিবার আকর্ষণে ঝড়ের বাতাসে ডানা মেলে উড়ে চলল। উদভ্রান্তের মত জার্মানির বিভিন্ন শহরের পথে পথে ক্ষ্যাপার মত ঘুরতে লাগল। শুধু ভাবে—সন্ন্যাসী একঘটি জলকে শরবতে রূপান্তরিত করল কি করে?

মন্ত্রশক্তি! উইলফোর্স—দৃঢ় ইচ্ছাশক্তি বা একাগ্রতা! সেই মানসিক সংযমকেই যোগ বলে? হঠযোগী সন্ন্যাসী যে বলল যোগের দ্বারা অসম্ভবকেও সম্ভব করা যায়।

হঠযোগ কি ? যেমন করে হোক যেতে হবে যোগী সন্ন্যাসীদের সেই রহস্যময় দেশ ইণ্ডিয়ায়।

পাক্কা দু-দুটো বছর রাস্তাতেই কেটে গেল। তারপরে একদিন প্যাসেজ মানি জোগাড় করে ভারতে পাড়ি দিয়েছিল। কিন্তু এদেশেও তো তার থাকা খাওয়া এবং ড্রাগের জন্য খরচ আছে—সেই টাকা কোথা থেকে আসবে ?

ট্রিপারা ছবি আঁকতে শুরু করল। ছোটবেলা থেকে ছবি আঁকার নেশা ছিল। আর্ট—পেইণ্টিং-এর লাইনে পয়সা নেই। রোজগার করা যায়নি বলে বাবা আর ছবি আঁকতে দেননি।

ভারতে এসে ট্রিপারা কাঁধে ব্যাগ আর বোর্ড ঝুলিয়ে রং তুলি ক্যানভাস নিয়ে চলে যায় কখনো সমুদ্রের ধারে কখনো বা গাছগাছালিতে ঢাকা পাহাড়ে—অবারিত প্রকৃতির অপার্থিব দৃশ্য ট্রিপারার নিপুন হাতের রঙে রেখায় একেবারে জীবন্ত হয়ে ওঠে। ছবি বিক্রি হতে থাকে।

বেশ চড়াদামেই বিক্রি হয়। সেলফ সাপোর্টেড বা নিজের পায়ে দাঁড়িয়ে যায় সে —এই পর্যন্ত বলে থেমে যায় সে। কিছুক্ষণ মাথা নিচু করে কি ভেবে বেশ গভীর আত্মপ্রত্যয়ের সঙ্গে বলে—আমার ছবি অত সজীব হত কেন জানেন ? আমি যে আমার সমস্ত সত্বা, সমস্ত ইন্দ্রিয় ঢেলে দিতাম আমার সৃষ্টিতে—

দেখুন—Art must be expressive not oppressive. একটু থেমে আবার দৃঢ় গলায় বলল ট্রিপারা—ছবির ভেতরে শিল্পীর মনের অভিব্যক্তি ফুটে উঠবে। একটু থেমে যেন নিজের মনকেই শুনিয়ে শুনিয়ে বলল যেদিন বান্ধবীর সঙ্গে ঝগড়াঝাটি কি মন কষাকষি হত কি সাইকেলডিক (psycheldic) ড্রাগ বেশি মাত্রায় খেতাম সেদিন আর তুলিতে হাত দিতাম না জানেন—

আপনি কি হ্যালুসিনোজেনাস (Hallucinogeus) ড্রাগ ছাড়া অন্য কিছু খান না ?

আমি তো আপনাদের একবার বলেছি ড্রাগটেকিং সম্বন্ধে আমার চিন্তা—আমার ধ্যানধারণা সম্পূর্ণ অন্যরকম। একটু যেন বিরক্তি ফুটে উঠল তার কথায়। বেশ গম্ভীর কণ্ঠে বলল—Psycheldic (Hallucinogeus) drugs was the mental requirements of my own enthusiasm…আমার মনে উদ্দীপনা উৎসাহ জাগিয়ে দেওয়ার জন্যই সাইকেলডিক ড্রাগ আমার একান্ত দরকার—

থেমে গেল ট্রিপারা। আবার আস্তে আস্তে বলল, আমার গুরু সেই ভারতীয় যোগীই আমাকে বলেছিলেন, এমন নেশা করবি, এমন ড্রাগ খাবি যা তোর মনকে অনেক—অনেক উঁচুতে এক মহৎ উপলব্ধির ভেতরে নিয়ে যাবে। একটু থেমে আবার বলল, বলতে গেলে তিনিই হ্যালুসিনোজাস ড্রাগ আমাকে ধরিয়েছিলেন—তাই আমি তাঁর সঙ্গে বসে ক্যানাবিস (গাঁজা) স্মোক করতাম—বলতে বলতে হঠাৎ তার মুখখানা বিকৃত হয়ে উঠল। কিসের যেন দুঃস্মৃতিতে জ্বলে যেতে যেতে বলল, কিন্তু ক্যানাবিসের আবার বহুত বায়নাক্কা—সরকার অনেক নিয়মকানুন করেছে…লাইসেন্সড ভেণ্ডারের

কাছ থেকে নিতে হবে। একজনকে তিনচার ভরির বেশি দেবে না—এসব কি জানেন, একটু থেমে উত্তেজিত কণ্ঠে বলল, আমাদের ব্যক্তিগত জীবনচর্চার ওপরে অনধিকার প্রবেশ—Cannabis law was intraded the private beheviourism…বলতে বলতে হঠাৎ উত্তেজিত হয়ে উঠে দাঁড়াল। অন্ধকারে আচ্ছন্ন আরবসাগরের দিকে মুঠো করা হাতের ঘুসি ছুড়ে ছুড়ে বলল—কেউ কিচ্ছু জানে না—জানে না পড়াশুনা করে না হোল সোসাইটিই একেবারে Rot-barren (বন্ধ্যা) আবার থেমে গেল। বালির ওপরে কেমন অবসন্ন হয়ে বসে পড়ল। ভেতরে ভেতরে তীব্র উত্তেজনাকে সংযত করে বলল ফিলসফার জন স্টুয়ার্ট মিলের (John Stuart Mill) নাম শুনেছেন—তিনি স্পষ্ট বলেছেন—যার যার ব্যক্তিগত চালচলনে, ব্যবহারে আইন মাথা গলাতে পারে না—private behaviour was not the business of the law—থেমে গেল, বুকের ওপরে মাথাটা ঝুলিয়ে বসে রইল ট্রিপারা। আর একটা কথাও বলল না।

ক্যানাবিসে অসুবিধা আছে যখন তার বদলে আপনি এল এস ডি ব্যবহার করতে পারেন না? তাকে একটু খুঁচিয়ে দেওয়ার জন্য বললাম আমি ড্রাগবিশেষজ্ঞ—

ধক করে জ্বলে উঠল তার চোখদুটো। কেমন তাচ্ছিল্যের সঙ্গে বলল—

আরে ও আমেরিকান সাহেব কি বলবে—ওরা তো অ্যাকাডেমিশিয়ান সমস্ত নলেজটাই থিয়োরেটিক্যাল—একটু থেমে বলল, আমার একেবারে practical experience—শুনুন, বলেই ট্রিপারা বলতে শুরু করে দিল এই অদ্ভুত ড্রাগ এল· এস· ডি·-র বিচিত্র ইতিহাস—

গোড়াতেই বলে নিল নোডাউট ভেরি পাওয়ারফুল Hallucinogic…অত্যন্ত শক্তিশালী ড্রাগ। মনকে আচ্ছন্ন করে, অলীক এক জগতে নিয়ে যেতে তার জুড়ি নেই—বলেই থামল সে।

এখানে ট্রিপারার বক্তব্য খুব সংক্ষেপে বলা হল।

খুব বেশিদিন আগের কথা নয়। ১৯৩৮ সালের গোড়ার দিকে হফম্যান (Hofman) বলে এক ফার্মাকোলজিস্ট (যিনি নানা উপাদান দিয়ে ওষুধ তৈরি করে থাকেন) প্রথম এল· এস· ডি· তৈরি করেছিলেন। তবে তৈরি—করেছিলেন মানে কি—ব্যাঙের ছাতার মত একটা ছাতা বা ফাঙ্গাস (Fungus) নিয়ে নাড়াচাড়া করতে করতেই একেবারে হঠাৎ আবিষ্কার করে ফেলেছিলেন, ওষুধটার আশ্চর্য রকমের একটা নেশা ধরানোর শক্তি। নেশার মধুর মৌতাতে একেবারে আচ্ছন্ন করে দিয়ে অলীক আর অবাস্তব একটা জগতে নিয়ে যেতে এই ড্রাগটার কোন বিকল্প নেই—এই পর্যন্ত বলে থেমে গিয়েছিল ট্রিপারা।

সাইকেডেলিক ড্রাগ সম্বন্ধে তার নলেজ দেখে আমি অবাক হচ্ছিলাম। কিন্তু তখনো বিস্ময়ের অনেক বাকি ছিল।

এবার হফম্যান কি করে হঠাৎ এল· এস· ডি·-র সন্ধান পেয়েছিলেন সেটা শুনুন তাঁরই জবানীতে—

১৯৩৮ সালে এল· এস· ডি· তৈরি করেছিলাম ঠিকই কিন্তু এই ড্রাগের হ্যালুসিনিক

এফেক্টটা তখন মোটেই জানতে পারিনি—জানলাম কেমন করে জানেন—

সেও হঠাৎ—একেবারেই হঠাৎ। সব—সব—ডেস্টিনি (Destiny অদৃষ্ট) বা প্রি-ডেস্টিণ্ড (পূর্বনির্ধারিত) যাইহোক—

১৬ এপ্রিল, ১৯৪৩। দিনটা আমার স্পষ্ট মনে আছে। আমি দুপুরে ল্যাবরেটরিতে বসে কাজ করছিলাম। হঠাৎ একটা কি যে কাণ্ড ঘটে গেল—মাথাটা ঝিমঝিম করতে লাগল। অথচ কালরাত্রে সাউণ্ড স্লিপ হয়েছে। কিন্তু আমার চেতনা কেমন ধীরে ধীরে অবসন্ন হয়ে আসতে লাগল। চেষ্টা করেও আমি আর কাজে মন দিতে কিছুতেই পারলাম না। ভেতরে ভেতরে সে যে কী সাংঘাতিক অস্থিরতা তা বলে বোঝাতে পারব না। সারা শরীর ক্লান্তিতে ভেঙ্গে আসতে লাগল। ঘুম—শুধু ঘুমের জন্য ভেতরটা ছটফট করতে লাগল। আমার সঙ্গে আরও দুজন কাজ করছিল—তাদেরও সেই একই হাল।

আমি কোনরকম টলতে টলতে এবং দু'একবার রাস্তায় বসে দেহটাকে টেনে হিঁচড়ে বাড়িতে নিয়ে এসেছিলাম। এসেই ঘরের পর্দাগুলো টেনে দিয়েই ধপ করে বিছানায় শুয়ে পড়লাম।

না ঘুম এল না।

অদ্ভুত একটা আচ্ছন্নতার ঘোর যেন আমাকে একটু একটু করে গ্রাস করতে লাগল। চোখদুটো বন্ধ আছে ঠিকই। কিন্তু ঘুমের লেশ নেই। শুধু সারা শরীর ভেঙ্গে একটা আশ্চর্য অবসন্নতা কিম্বা আচ্ছন্নতাও বলা যায়। আমার মনে হল, স্পষ্ট বুঝতে পারলাম—আমি বাতাসে ভেসে ভেসে পাখির মত ডানা মেলে উড়ে চলেছি। পেরিয়ে গেলাম আমাদের শহরের সীমানা, ছাড়িয়ে গেলাম জার্মানির চৌহদ্দিও—নিচে বহু নিচে দানিউব নদী একটা অত্যন্ত সরু রুপালী রেখার মত দেখা দিয়েই মিলিয়ে গেল—আমি আরও উপরে উঠে যেতে যেতেই একেবারে স্বপ্নের মত সুন্দর একটা দেশে এসে পড়লাম—ঘন নীল আকাশ, তার নিচেই যেদিকে তাকাও নানা রঙের সমারোহ। কত রকমের যে রং—লাল, নীল, সবুজ, হলুদ, ধূসর—প্রতিটি রঙও ভয়ানক উজ্জ্বল। চোখে ধাঁধা লাগিয়ে দেয়। আর জ্বলজ্বলে রক্তিম রেখাগুলো যেন পর পর চক্রাকারে থেকে সারা পৃথিবীকে বেষ্টন করে রয়েছে। কিন্তু সেই অপরূপ সুন্দর দেশটা গোধূলির নরম আলোয় কেমন মেদুর স্বপ্নাচ্ছন্ন ও মায়াময় হয়ে উঠেছে।

জানেন প্রায় দুটো ঘণ্টা ধরে আমি এইরকম স্বপ্নের আচ্ছন্নতার ভেতরে আধো ঘুমে আধো জাগরণের ভেতরে ছিলাম। তারপর একটু একটু করে সেই ঘোর লাগা আচ্ছন্নতা কাটতে লাগল।

সেই প্রথম জানতে পারলাম এল. এস. ডির—

হ্যালুজেনিক এফেক্ট কী সাংঘাতিক—কী ইণ্টেন্স—কী তীব্র, এই পর্যন্ত বলে থেমে গিয়েছিল ত্রিপারা।

আশ্চর্য! আমি মুগ্ধ ও বিস্মিত হয়ে গিয়েছিলাম। ত্রিপারার এই সাইকেলডিক

ড্রাগ সম্বন্ধে অ্যাকিউরেট এবং এনসাইক্লোপেডিক নলেজ অর্থাৎ নির্ভুল এবং প্রায় অভিধানতুল্য বিপুল জ্ঞানভাণ্ডার দেখে। কেন না আমি সেই ড্রাগ বিশেষজ্ঞ স্টেনলি আইনস্টাইনের লেখা Beyond the Drugs—বইটিতেই এল. এস. ডি. সম্বন্ধে যা পড়েছিলাম সেই কথাগুলোর সঙ্গে ট্রিপারার বক্তব্য একেবারে নির্ভুলভাবে মিলে গিয়েছিল।

এইখানে এল. এস. ডি. সম্বন্ধে আরও কিছু তথ্য খুব সংক্ষেপে বলা হল যা ট্রিপারা হয়ত জানেন না কিংবা বলেননি—

ড্রাগের জগতের সম্রাট এই এল এস ডি-র মূল উপাদান হল—ইরগট (Ergot) এক ধরনের পরাশ্রয়ী ছাতা বা প্যারাসিটিক ফাঙ্গাস। গম এবং রাইয়ের ওপরে এবং 'মর্নিং গ্লোরি' নামে ছোট ছোট কিছু গাছে ও অন্যান্য কিছু ঘাসের ওপরেও এই ফাঙ্গাস জন্মায়।

প্রায় হাজার বছর আগে ৯৯৪ খৃস্টাব্দের গোড়ার দিকে উদ্ভিদবিদ্যার বিশেষজ্ঞরাই প্রথম ইরগটের ভেতরে নেশা ধরানোর বা টক্সিটির উপাদানের অস্তিত্ব আবিষ্কার করেন। আর আশ্চর্য সেই বছরেই ফ্রান্সে ৪০০০০ হাজার মানুষ ইরগট অধ্যুষিত বিষাক্ত আটা এবং ময়দা খেয়ে ভবলীলা সাঙ্গ করে। পৃথিবীর কোন কোন দেশে নেশা করার জন্য ইরগটযুক্ত মর্নিং গ্লোরির বীজ গুঁড়ো করে চায়ের সঙ্গে মিশিয়ে কিম্বা এই সীডস চিবিয়ে খেয়ে থাকে। ড্রাগের ইতিহাসে আছে প্রায় একশো বছর আগে দক্ষিণ আমেরিকার আদিবাসী ভারতীয়রা (রেড ইণ্ডিয়ান) ধর্মীয় ধ্যানধারণায় নিবিড় একাগ্রতা আয়ত্ব করার জন্য এবং সাধনার উচ্চস্তরে পেঁছানোর জন্য অর্থাৎ Religious hellucination এর আকর্ষণে ইরগট ব্যবহার করত। ড্রাগ বিশেষজ্ঞদের গবেষণায় প্রমাণিত হয়েছে এল এস ডির র মেটিরিয়েল ইরগটের ভেতরে ম্যানুফ্যাকচার করা এল এস. ডির হ্যালুসিনিক এফেক্টের দশভাগের একভাগ মাত্র আছে।

এল এস ডিকে কি ওষুধ হিসেবে ব্যবহার করা যায়—অর্থাৎ থেরাপিউটিক ইউজ কতটুকু সম্ভব। প্রথমেই বলা দরকার এল এস ডি কিন্তু নেশা ধরানো বা মাতাল করা অর্থাৎ ইনটক্সিকেটেড ড্রাগ নয়। এল এস ডি খেলে হঠাৎ অস্থির হয়ে ভদ্রতা এবং শালিনতার মুখোস খুলে ফেলে উদ্দাম হয়ে উঠতে পারে। একে ড্রাগের জগতের ভাষাতে বলে রিভারস টলারেন্স। আর এল এস ডিতে 'টলারেন্সও দেখা যায়। এমন ভাবে গম্ভীর হয়ে একেবারে সমাধিস্থ হয়ে যেতে পারে যে তিনদিন তিনরাত এইভাবে ধ্যানস্থ হয়ে থেকে যাবে। কারো সঙ্গে একটা কথাও বলবে না। কেউ বললেও মুখ ঘুরিয়ে নেবে। এই রিভারস টলারেন্স সম্বন্ধে ড্রাগ বিশেজ্ঞরা গ্রামেতে এলেও বলেছেন নিঃসন্দেহে বলতে হবে অস্বাভাবিক গাম্ভীর্যের দুর্গে নিজেকে বন্দী করে সমাধিস্থ হতে পারাটা। একটা ফেনোমেনন—

অর্থাৎ একটা আশ্চর্যজনক বস্তু এবং হালুসিনিক এফেক্টের জন্যই কমবেশি ড্রাগের প্রয়োজন হয়। কিন্তু সেই স্থৈর্য বা সহিষ্ণুতা কিম্বা গাম্ভীর্য যেমন হঠাৎ

দেখা দিতে পারে তেমনি আবার দ্রুত মিলিয়েও যেতে পারে।

বিয়ণ্ড দি ড্রাগের লেখক স্পষ্টই বলেছেন এল. এস. ডির নেশাটা এবং তার পরিনাম বা এফেক্ট একান্তই ব্যক্তিগত। মনে রাখতে হবে মাদকসেবী এল. এস. ডি খেয়ে কতটা নেশাচ্ছন্ন হবে সেটা নির্ভর করবে তার মানসিক গঠনের ওপরে। আরও একটা ফ্যাক্টর আছে—সেই ইরগট বা ফাঙ্গাসে কতটা পরিমানে অ্যালকয়েড ক্রিস্ট্যালিন বা হ্যালুসিনিক শক্ত দলার মত উপাদান আছে তার ওপরেও নির্ভর করবে অ্যাডিক্টের প্রতিক্রিয়া।

বড় বিচিত্র এই ড্রাগ—এল. এস. ডি।

নেশার ঘোর ঘোর আচ্ছন্নতা অতি দ্রুত এক সুন্দর স্বপ্নের দেশে চলে যাওয়ার অপার্থিব আনন্দের পুলাকানুভূতি আসবে ঢেউয়ের মত। আপনার মনকে বহু বহু দূরের এক অপরূপ সুন্দর আর মায়াময় জগতে নিয়ে যাবে ঠিকই। কিন্তু নেশার এই মধুর মৌতাত এই আচ্ছন্নতা কতক্ষণ স্হায়ী হবে আবার কখন আপনাকে আপনার বাস্তব পৃথিবীর মাটিতে আছড়ে ফেলে রেখে চলে যাবে তা কেউ বলতে পারে না। তার কোন ধরাবাঁধা নিয়ম নেই।

মর্নিং গ্লোরির নিবিড় সবুজ স্বাস্থ্যঘন ঘাসের বুকে ও পুষ্ট সোনালী গমের সেই ছাতা ইরগট খেয়ে যে প্রাচীন দিনের কত সাধক, কত যোগী যোগ সাধনার উচ্চস্তরে পেঁছাতে সক্ষম হয়েছেন যা যুগ যুগ ধরে কারনবারির (মদ) মতই ধর্মীয় অনুষ্ঠানের ক্রিয়াপ্রকরণের উপকরণ হিসাবে মর্যাদা পেয়েছে—সেই ইরগটের কেমিক্যাল কম্পাউণ্ড এল. এস. ডির আভিজাত্য এবং ঐতিহ্য, দুই-ই নির্মমভাবে ধ্বংস করে দিয়েছে আমেরিকা। নিউইয়র্কের একটি ফার্মাসিউটিক্যাল বা ওষুধ তৈরির কোম্পানি 'স্যাণ্ডোজ' (Sandoz) সমস্ত খাঁটি (pure) এবং পরিশুদ্ধ (Pharmaceutically refine) ইরগট বা এল. এস. ডির সমস্ত সত্ব মার্কিন সরকারের হাতে তুলে দিয়েছে প্রচুর অর্থের বিনিময়ে। ব্যবসায়ী কোম্পানিটি স্যাণ্ডোজ কিন্তু একবারও ভ্রূক্ষেপ করল না এমন একটা সময়ে তারা রাইট বিক্রি করল যখন পৃথিবীর দেশে দেশে অ্যাডিক্টদের জগতে এল. এস. ডির দুর্বার আকর্ষণ প্রায় হিস্টিরিয়ার মত আকার ধারণ করেছে।

পরিণাম হল ভয়াবহ।

এল. এস. ডির ওষুধ হিসেবে ব্যবহার বা থেরাপিউটিক ইউজ (Therapeuticure আর সম্ভব হল না। আভিজাত্য এবং সম্মান হারিয়ে এল. এস. ডি বাজার চালু আরও পাঁচটা ড্রাগের সঙ্গে মিশে গেল। হেরোইন, আফিং, মারিজুয়ানা ইত্যাদি ড্রাগ খেলে অ্যাডিক্টরা যে কষ্ট ও যন্ত্রণা অনুভব করে একেবারে অবিকল সেইরকম অনুভূতি হয় ইরগটের সঙ্গে নানা রাসায়নিক উপাদানের মিশ্রণে তৈরি ম্যানুফ্যাকচার করা এল. এস. ডিতে। হতভাগা ড্রাগটেকাররা জানতে পারে না—বুঝতে পারে না তারা কি কিনছে।

কল্পনাও করতে পারে না—এই ড্রাগ থেকে তারা নেশার মৌতাতের ওপরে বাড়তি কি বোনাস পাবে।

কিন্তু ইনস্টিটিউট ফর দি স্টাডি অফ ড্রাগ মিসইউজ-এর (Institute for the study of Drug Misuse) ড্রাগ বিশেষজ্ঞ লেখক স্টেইনলি আইনস্টাইন (Stainly Einstein) জানিয়েছেন—প্রাচীন যুগে নয় সুদূর অতীতেও নয়—এই সামান্য কিছু দিন আগেও নিম্নলিখিত ব্যাধির 'উপশমের জন্যে লিসার্জিক অ্যাসিড ডাইইথিলামিডে (Lysergic Acid Diethylamide) বা এল. এস. ডির প্রয়োগ ছিল অনিবার্য—

(ক) অপরাধীদের মানসিক বিকারকে সংযত করা

(খ) মনের অবসাদ এবং অবসন্নতায়

(গ) মানসিক ব্যাধিগ্রস্ত বা স্কিটসোফ্রীনিক (Schizophrenic) শিশুদের চিকিৎসায়

(ঘ) মনস্তাত্ত্বিক রোগে আক্রান্ত পরিণত বয়সের মানুষের ব্যাধির উপশমে

(ঙ) মদের নেশায় আসক্ত নেশাখোরদের পুনর্বাসনে

(চ) ব্যক্তিত্বের সংঘাত বা নিজেরই ব্যক্তিত্বের কোন জটিলতায় আর

(ছ) দুরারোগ্য কালব্যাধি ক্যানসারের অন্তিম পর্যায়ে

পরিশেষে আইনস্টাইনসাহেব মন্তব্য করেছেন গভীর এবং নিরলস গবেষণা ছাড়া এখনই বলা যাবে না এখনও এল. এস. ডির ওষুধ হিসেবে কি গুণাগুণ বা থেরানিউটিক ভ্যালু কতটুকু অবশিষ্ট আছে।

পাঠকদের নিশ্চয়ই মনে আছে বেনারসের অ্যাডিক্ট দীনেশ যাজ্ঞি এল. এস. ডির ভয়াবহ পরিণাম সম্বন্ধে তার কিছু প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতা বলেছিল। এখানে স্টেনলি আইনস্টাইন দীর্ঘদিন ধরে ড্রাগের অপপ্রয়োগ বা মিসইউজ সম্বন্ধে নাড়াচাড়া করতে করতে যা জেনেছেন সেইসব তথ্য খুব সংক্ষেপে বলা হল।

(১) এল এস ডি খেলেই নেশাখোরের ভেতরে ভেতরে তীব্র প্রতিক্রিয়া বা অ্যাকশান শুরু হয়ে যায় মাত্র ৪৫ মিনিটের ভেতরে। সেই 'মুড' বা মানসিক অবস্থা দীর্ঘ সময় ধরে থাকতে পারে আবার নাও পারে। আবার মনের গঠন বা মেন্টাল স্ট্রাকচার (Mental Structure) বদলেও যেতে পারে চিরকালের মত।

(২) যে কোন দুর্বল মনের স্পর্শকাতর ব্যক্তি ২৫ মাইক্রোগ্রাম এল. এস. ডি. খেলেই তার মন আলোড়িত হয়ে উঠবে। ঘোর ঘোর আচ্ছন্নতার অতলে তলিয়ে যাবে। আর সুস্থ স্বাভাবিক একটি লোকের ক্ষেত্রে প্রয়োজন হয় ১৫০ মাইক্রোগ্রাম।

(৩) সবচেয়ে সমস্যা হল এল. এস. ডির নেশায় আচ্ছন্ন কোন অ্যাডিক্ট যদি হঠাৎ হড় হড় করে বমি করতে থাকে কি কম্প দিয়ে জ্বর চলে আসে। অতি দক্ষ চিকিৎসকও তখন তার চিকিৎসা করতে পারেন না। সম্ভব হয় না। কেননা এল. এস. ডির মজা হল, এই ড্রাগের প্রতিক্রিয়া বা অ্যাকশনটা ঠিক দেহের কোথায় বাসা বাঁধে—বুকে না পেটের ভেতরে পাকস্থলীতে তা বুঝতে পারা যায় না। দীর্ঘদিন ধরে ড্রাগ বিশেষজ্ঞরা অনেক গবেষণা করেও আজ পর্যন্ত জানতে পারেননি এল. এস. ডি

কেমন করে মানুষকে মানসিক বিপর্যয়ের সর্বনাশা ও বিভৎস একটা পর্যায়ে নিয়ে যায়।

(৪) মাদকসেবীদের এল. এস. ডি. ঠিক কতখানি নেশাগ্রস্ত করবে তার কোন সমতা বা ইউনিফরমিটি যেমন তেমনি একই লোকের ভেতরে বিভিন্ন সময়ে কি প্রতিক্রিয়া দেখা দেবে তারও কোন নির্দিষ্ট ধরাবাঁধা নিয়মে নেই।

(৫) শুধু 'ডোজ' বা পরিমান নয়। কত গ্রাম এল. এস. ডি. খেয়েছে বা দেহে ইনজেকশান করেছে তার ওপর কিন্তু এই রহস্যময় ড্রাগের এফেক্ট নির্ভর করে না। নির্ভর করবে যে ব্যবহার করবে সেই অ্যাডিক্টের মানসিক গঠনের ওপরে। শুধু তাই নয় এল. এস. ডিতে আসক্ত অ্যাডিক্টের অস্বাভাবিক চালচলন—যেমন নিজেকে পাখি মনে করে ডানা মেলে উড়তে গিয়ে জখম হওয়া, সমুদ্রের বিশাল জলরাশিকে বিস্তীর্ণ প্রান্তর ভেবে তার ওপর দিয়ে হাঁটতে গিয়ে ডুবে যাওয়া, গভীর এক আচ্ছন্নতার ভেতরে তলিয়ে থাকা ইত্যাদির চিকিৎসা বা প্রতিকার করতে হলে জানতে হবে—অ্যাডিক্ট কি ভাবে এল. এস. ডি খেয়েছে—ইনজেকশান করেছে, না খেয়েছে। খেলে কত গ্রাম করে এক একটা ফিক্স ব্যবহার করেছে এবং মোটা কয়টা ফিক্স নিয়েছে। তারপর খোঁজ খবর নিয়ে দেখতে হবে এল. এস. ডির কোন অভিজ্ঞতা মাদকসেবীর ছিল কি না এবং কি কারণে এল. এস. ডি খেয়েছিল—বাস্তব পৃথিবীর রূঢ়তা থেকে কোন হতাশা থেকে পালিয়ে যাওয়া—এসকেপ না নেশার সেই মিষ্টি মিষ্টি রোমাঞ্চকর ও বিচিত্র আচ্ছন্নতার ভেতরে তলিয়ে থাকার আকর্ষণে এল. এস. ডিতে আসক্ত হয়েছিল।

(৬) স্টেনলি জানিয়েছেন এইসব ফ্যাক্টর তন্ন তন্ন করে বিশ্লেষণ করলেও কিন্তু জানা যায় না এল. এস. ডির এফেক্ট বা পরিণাম কি—সেটা এল. এস. ডি. সেবীদের ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতার ভাণ্ডারে সঞ্চিত থেকে যায়। এই নেশার রোমাঞ্চকর মিষ্টি স্বাদ, কষ্ট-যন্ত্রণা, আনন্দ বিষাদ সব—সব অনুভূতি তাদের মনের অন্ধকারে থরে থরে সাজানো থাকে। আর সেইসব সেনসেশান বা অনুভূতির কথা এল. এস. ডির অ্যাডিক্টরা কখনো কারো কাছে এমন কি তার শয্যাসঙ্গিনী বান্ধবীর কাছেও বলে না। তাই এল. এস ডির এফেক্ট সাধারণ লোকের কাছে চিরকালের মত অজ্ঞাত থেকে যায়—

ডাক্তারসাহেব—ডা—ক—তা—র সা—হেব—হঠাৎ আরবসাগরের উদ্দাম বাতাসে ভয় বয়ে একটা চিৎকার ভেসে উঠল। ছুটতে ছুটতে এল আমরা যে ঘরে উঠেছিলাম তার কেয়ারটেকার ছোকরা। হাঁফাতে হাঁফাতে বলল, স্যার আপনাকে এখুনি গোয়া ফিরে যেতে হবে—

কেন—খবর এসেছে না কি?

ছেলেটি খোকনের হাতে একটা টেলেক্স মেসেজ ধরিয়ে দিল—গোয়া থেকে তারই ডেপুটি ডিরেক্টার জানিয়েছে অনেক নামী-দামী পায়াভারি পার্টির কুকুর গরু—ইত্যাদি ডোমিস্টিক অ্যানিমেলদের ভেতরে মড়ক দেখা দিয়েছে—আপনি তাড়াতাড়ি চলে আসুন—

ট্রিপারাও উঠে দাঁড়াল।

আপনি—আপনি কোথায় যাচ্ছেন, আমি ব্যাকুল হয়ে বললাম।

কোন কথা বলল না সে দূরে—বহুদূরে যেখানে তমসাস্তীর্ণ আরবসাগরের জল ভোঁতা ছুরির মত ঝিকমিক করছে একবারে সেইদিকে আর একবার মাথার ওপরে কোটি কোটি তারার দীপালিতে উজ্জ্বল বিপুলব্যপ্ত আকাশের দিকে চোখ রেখে আস্তে আস্তে ঝাপসা গলায় বলল, কোথায় যাব জানি না। তবে—যাব—

দাদা—আমি গোয়ার লাস্ট বাসটায় ফিরে যাচ্ছি—দূরে ঝাপসা অন্ধকারে আচ্ছন্ন বালুচরে অপসৃয়মান আরো এক ছোপ নিকষ কালো ছায়ামূর্তির মত চলে যেতে যেতে হেঁকে বলল খোকন—নাভারকর থাকল—আপনার কোন অসুবিধা হবে—না—

আপনি আমার বাড়িতে আরাম্বল বীচে যাবেন না স্যার—

যাব নাভারকর—যাব ব্যস্ত হবে না—

ডাক্তারবাবুর সমুদ্রে মাছ দেখার খুব শখ ছিল, নিজের মনেই বলল নাভারকর।

নাভারকর, তুমি আমাদের ঘরে যাও—রাতে খাওয়ার ব্যবস্থা কর, আমি এখুনি আসছি—নাভারকরকে বিদায় করে দিয়ে ট্রিপারাকে বললাম আপনার সঙ্গে আলাপ করে আমি যে কী আনন্দ পেয়েছি—একটু থেমে বললাম, যদি কিছু মনে না করেন শুনি না আপনার প্রোগ্রাম কি, কোথায় যাবেন—না কি দেশে ফিরে যাবেন—

একটা মূর্তির মত বসে রইল ট্রিপারা। বুকের ওপরে মাথাটা ঝুঁকিয়ে দিয়ে আস্তে আস্তে বলল, আমার মনে হয় আপনাদের ইন্ডিয়াতে যত সাধক জন্মেছিল তার ভেতরে গৌতম বুদ্ধই সবচেয়ে বড় যোগী—

কেন রামকৃষ্ণপরমহংস, চৈতন্য, সাধক বামাক্ষ্যাপা, তৈলঙ্গস্বামীই বা কম কিসে? এসব কথা আমার মুখে এসে গিয়েছিল। কিন্তু বললাম না। ট্রিপারা যা বলতে চায় সেই প্রসঙ্গটা বদলে যেতে পারে। বললাম, কেন বলছেন একথা?

দেখুন আমি বুদ্ধিস্ট রেকর্ডে পড়েছি আবার নিজের ভেতরে ডুব দিয়ে বলতে লাগল ট্রিপারা। দীঘনিকায়ের ভেতরে মহাসতিপট্‌ঠান সুত্তন্তে এবং মজ্‌ঝিম নিকায়ের অন্তর্গত পট্‌ঠান সুত্তে মজ্‌ঝিম নিকায়ের সচ্চবিভঙ্গ সুত্তে যে অষ্টাঙ্গিক মার্গের ব্যাখ্যা দিয়েছেন বুদ্ধ। তার প্রতিটি ধ্যানেই যোগের কথা আছে—সমাধিস্থ হওয়ার পর নিয়মের কথা আছে—থামল সে।

আমার চোখদুটো বিস্ময়ে ছটফট করতে লাগল। দূর সাগর পারের সেই বিদেশী জাতির প্রতি গভীর শ্রদ্ধায় মনটা কেমন আবিষ্ট হয়ে এল অন্ধকার বালুচরে ট্রিপারার ছায়ামূর্তিটা যেন আরও—আরও বড় হয়ে দূরে দিগন্ত পর্যন্ত প্রসারিত হয়ে গেল।

চতুর্থধ্যানে আছে, বলল ট্রিপারা সুখের অতীত হয়ে দুঃখের অতীত হয়ে অর্থাৎ সৌমনস্য ও দৌর্মনস্য হয়ে এবং দুঃখকে অতিক্রম করে—দুঃখরহিত, সুখরহিত ও উপেক্ষা ও স্মৃতির সাহায্যে পরিশুদ্ধ হয়ে চতুর্থ ধ্যানে বিহার করতে হয়। একটু থেমে বলল আবার ট্রিপারা, ভাবতে পারেন কী অসামান্য সাধনা। আর এই অবস্থাটা

আমরা কিনা হ্যালুসিনিক ড্রাগ এল. এস. ডি. খেয়ে পেতে চাই। নিজের ওপরে তীব্র ঘৃণায় তার ধারালো মুখখানা বিকৃত হয়ে উঠল। ঝাপসা অন্ধকারে নির্জন মহাশ্মশানে করালবদনী ছিন্নমস্তা দক্ষিণাকালীর পূজায় রত তান্ত্রিকের মতই তার বড় বড় চোখদুটো ধক ধক করে জ্বলতে লাগল।

আমি ইন্ডিয়ার অনেক বুদ্ধিস্ট মনেস্টারিতে ঘুরেছি জানেন, দার্জিলিং-এর ঘুমে যে বৌদ্ধবিহার আছে সেখানে অনেক পুঁথি আছে, ট্রিপারা যেন কথাগুলো নিজেকেই শুনিয়ে শুনিয়ে বলছে কিন্তু সেসব টিবেটান ল্যাঙ্গুয়েজে বা তিব্বতী ভাষায় লেখা। এক ভিক্ষুর কাছে তিব্বতী ভাষা শিখে নিলাম। একটু থেমে আবার বলল, আমি ফাইলোলজির লোক—পৃথিবীর যে কোন ভাষা শিখে নিতে আমাদের খুব বেশি সময় লাগে না—

ঘুমের বৌদ্ধ পুঁথিতে কি পেলেন?

কি নয় বলুন? উত্তেজিত হয়ে উঠল ট্রিপারা। বলল, হটযোগটোগ কি জানি না, বুঝি না। আমি বিদেশী, আমি দেখছি গৌতমবুদ্ধের অষ্টাঙ্গিক মার্গের প্রতিটি ধ্যানেই তো আছে যোগসাধনার কথা একটু থেমে বলল যেমন দেখুন ষষ্ঠ ধ্যানে আছে সাধককে আকাশের যে অনন্ত আয়তন আছে—এ জ্ঞানও অতিক্রম করতে হবে। বলতে বলতে উত্তেজনায় আবেগে কাঁপতে লাগল সেই জার্মান যুবক। আবার যেন অনেক—অনেক দূর থেকে বলল। অষ্টম ধ্যানটাই যোগের বা সমাধির চরম অবস্থা —তখন সাধক এমন একটা অবস্থায় বিহার করেন যে অবস্থাতে বেদনা (Sensation) বা সংজ্ঞা (Perception) কিছুই থাকে না—উঠে দাঁড়াল ট্রিপারা। হাঁটতে হাঁটতে বলল, আমাকে আরও—আরও বুদ্ধিস্ট রেকর্ড দেখতে হবে জানেন। দেখতে হবে কেমন করে গৌতম বুদ্ধ আকাশের অনন্ত আয়তন, এই জ্ঞানকেও অতিক্রম করেছিলেন। জানতে হবে কি করে আকিঞ্চনের (অর্থাৎ কিছুই নাই—শূন্যতা) অনন্ত আয়তনে বিহার করতেন—

আপনি কি তিব্বতে যেতে চান?

যেতে পারলে ভাল হত। কিন্তু বড় বেশি আনুরেস্ট সেখানে—

তাহলে কি বুদ্ধগয়া—

জানি না—জানি না—লম্বা লম্বা পা ফেলে হাঁটতে লাগল ট্রিপারা।

কবে যাবেন?

জানি না। তবে—

যাব।

এগার

কেন ওরা নেশা করে জোড়ায় জোড়ায় পথে পথে ঘোরে—এদের যৌনলীলাও যেমন বিচিত্র তেমনি রোমাঞ্চকর।

আনজুনার অভিজ্ঞতার তখনও অনেক বাকি ছিল।

নাভারকর ক্রমাগত তাগিদ দিয়ে চলছিল আরাম্বল বীচে যাওয়ার জন্য। কিন্তু আনজুনা ছেড়ে চলে গেলে দেখা হত না। হয়ত কোনদিনই হত না সেই ইতালির অধ্যাপক ম্যাসিমোর সঙ্গে যে বোম্বাই থেকে গোয়ার স্টীমার ছাড়ার সময় জলে ঝাঁপ দিয়েছিল। দেখা পেতাম না ট্রিপারার মতই বিচিত্র সেই গ্রীক যুবকের যে একটা সস্তা ছাপা ধ্যানী বুদ্ধমূর্তির জন্য বিনাদ্বিধায় তার হীরের আংটি খুলে দিয়েছিল। জাঙ্কিদের রবিবারের জমজমাট হাট—ফ্লি মার্কেট সম্বন্ধে বিচিত্র অভিজ্ঞতা অজানাই থেকে যেত। আর আনজুনার সেই নিষিদ্ধপল্লী—নুডিস্ট ভিলেজ, যেখানে নাভারকর যেতে সঙ্কুচিত হয়ে উঠেছিল—যেখানে ফ্রেক যুবক যুবতীরা পুরোপুরি নিরাবরণ হয়ে ঘোরাফেরা করে থাকে—সেখানকার বিচিত্র জীবন আর সেই অদ্ভুত ঘটনাও জানা হত না।

কিন্তু আনজুনার শেষ কয়েকদিন এবং আরাম্বালার অভিজ্ঞতা বলার আগে মনে হচ্ছে—জানানো দরকার আমার মনের ভেতরের চিন্তাগুলো—গোয়ার আনজুনা বীচে, আরাম্বালে কেন এত বেশি বিদেশী যুবক যুবতী অ্যাডিক্ট, পৃথিবীতে এত জায়গা থাকতে এই জাঙ্কির দল কেন ভারতের সুদূর পশ্চিম প্রান্তে আরবসমুদ্র সন্নিহিত ধু ধু বিস্তীর্ণ বালুচরে এসে ভিড় করে। শুধু কি অবারিত প্রকৃতির এবং অপর্যাপ্ত বনের ভেতরে এসে সভ্যতার সমস্ত মুখোশ ফেলে বাধাবন্ধহীন হয়ে উদ্দাম হয়ে যাওয়া যায় বলে—না ইদানিং ভারতে এল. এস. ডি. এবং হ্যাসের আমদানি অত্যন্ত বেশি বলে—মনের ভেতরে এই সব ভাবনাই ঘুরপাক খেয়ে চলেছিল। আবার হঠাৎ মনে হল জাঙ্কিরা উলঙ্গ হয়ে থাকে কেন—সেটা কি নেশারই প্রভাব যা যৌনবিকার হয়ে দেখা দেয়।

এসব প্রশ্নেরই উত্তর পেয়েছিলাম জাঙ্কিদের কাছ থেকেই। আরাম্বাল বীচের ইতালিয়ান মেয়ে রুথ, যে আনম্যারেড মাদার বলে গর্ব অনুভব করত, সেই কঠোর ব্যক্তিত্বসম্পন্ন পুরুষালী মেয়েটি আমার কাছে বেশ সুন্দর বিশ্লেষণ করে বুঝিয়ে দিয়েছিল কেন জাঙ্কিরা ঝাঁকে ঝাঁকে আনজুনা বীচে আসে। আর কেন, কোন্ মানসিকতা থেকে তারা বেশবাসের আবরণ খুলে ফেলে আদিম মানুষের মত বাস করে, বলেছিল, সেই বুদ্ধিদীপ্ত নিগ্রো যুবক জো। এদের কথা যথা সময়ে বলা হবে। কিন্তু—

সাম্প্রতিককালে ইন্ডিয়ান ড্রাগের এত বেশি প্রাচুর্য কেন—এই তথ্যটি কোন

অ্যাডিক্টের কাছে জানতে হয়নি। এই সম্বন্ধে পেয়ে গেলাম কলকাতা থেকে প্রকাশিত বিখ্যাত ইংরেজী দৈনিক স্টেটসম্যানে প্রকাশিত গুয়াহাটির নার্কোটিক কন্ট্রোল ব্যুরোর চীফ অপূর্ব চন্দ্রের লেখা একটি নিবন্ধ। তাঁর প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতা থেকে লেখার প্রতিটি তথ্যই অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ ও জরুরী। তবুও তাঁর বক্তব্য যতদূর সম্ভব এখানে সংক্ষেপে বলা হল।

এখানে অনায়াসেই বলা যায় ভারতের উত্তর-পূর্বাঞ্চলে ড্রাগের স্মাগলিং বা ড্রাগ ট্র্যাফিকিং অত্যন্ত বেড়ে গিয়েছে। অল্প কিছুদিন আগেই মনিপুরে, নাগাল্যান্ডে এবং আরও কয়েকটি রাজ্যে বেশ কয়েকবার 'রেড' করা হয়েছে এবং পর্যাপ্ত পরিমাণে 'হেরোইন' আফিং বাজেয়াপ্ত করা হয়েছে। তাতেও স্মাগলিং এতটুকু কমেনি। বরং ধীরে ধীরে বেড়েই চলেছে। তার একমাত্র কারণ—

খুবই আশ্চর্য হয়ে যেতে হয় ও দুঃখ হয় যখন দেখি অধিকাংশ ক্ষেত্রেই চোরাই আফিং এবং হেরোইন যাদের কাছে ধরা পড়েছে তারা—

জওয়ান।

আর্মি'র লোক! দেশের প্রতিরক্ষার গুরুদায়িত্ব যাদের ওপরে, যারা আমাদের মনে প্রায় দেবতার মহিমায় বিরাজ করে থাকে। আমাদের শ্রদ্ধা প্রীতি ও বিশ্বাস দিয়ে গড়া তাদের সেই উজ্জ্বল ভাবমূর্তিতে কালি ঢেলে দিয়েছে সমাজ সভ্যতা বিধ্বংসী সর্বনাশ সেই ড্রাগ—Drug traffickers engage an army of couriers…

এবারে নার্কোটিকস কন্ট্রোল ব্যুরোর চীফ চন্দ্রসাহেব গুয়াহাটির অ্যাডিশনাল কালেক্টরেট অফ কাস্টমস অ্যান্ড সেন্ট্রাল এক্সাসাইজ মিঃ রমেশচন্দ্র ভট্টাচার্যের ডায়েরি থেকে হুবহু উদ্ধৃতি দিয়ে পরিসংখ্যানযুক্ত ড্রাগ স্মাগলিং-এর যে চিত্রটা তুলে ধরেছেন—তা এখানে বলা হল।

মানচিত্রে মনিপুর কল্পনা করুন—এই মনিপুরের একেবারে পূর্ব ভারত ব্রহ্মদেশের সীমান্তে একটা ছোট শহর মোরেহ (Moreh)। এই মোরেহ হল ড্রাগ স্মাগলারদের প্রধান কর্মকেন্দ্র। প্রতিদিন অন্ততঃ কম করে ১০ কে. জি. হেরোইন ব্রহ্মদেশের সীমান্ত শহর টামু (Tamu) থেকে চোরাপথে এখানে আসে। টামু থেকে মোরেহর দূরত্ব মাত্র কয়েক কিলোমিটার। আর তাহাং (Tahang) হল ব্রহ্মদেশের সবচেয়ে বড় ড্রাগ তৈরির কেন্দ্র। তাহাং থেকে টামুর দূরত্ব মাত্র ৯২ কিলোমিটার।

রেভিনিউ ইন্টেলিজেন্স অফিসিয়ালরা (Revenue Intelligence Officialls) জানিয়েছেন—(ক) ১ কিলো হেরোইনের দাম ছিল ৩০,০০০ (ফেব্রুয়ারি ৮৯) এখন তার দাম বিগুণ হয়ে গিয়েছে।

(খ) ১ কেজি লায়ন ব্র্যান্ড হেরোইনের দাম—১'৫ লাখ টাকা মোরেহতে

(গ) ১ " " " " " ৫ লাখ টাকা দিল্লীতে

এই যে নার্কোটিকের দাম চড় চড় করে বেড়ে গিয়েছে কারণ অনেক ড্রাগ ডিলারই দেশের অন্যান্য অঞ্চল থেকে ব্রহ্মদেশে তৈরি আফিং এবং হেরোইন কিনতে ভারতে আসছে আর—ড্রাগ-ট্র্যাফিকিং স্মাগলিং বেড়েছে কেন?

তার কারণও রেভিনিউ ইন্টেলিজেন্স ডিপার্টমেন্টের রেকর্ডে আছে—তাহাং-এ তৈরি ১ টন লায়ন ব্র্যান্ড হেরোইন মুলমে (Mulme) থাইল্যান্ডের একটা ছোট শহরের ভেতর দিয়ে আমেরিকায় স্মাগল হয়েছিল এবং সেখানে ধরা পড়েছিল। যুক্তরাষ্ট্র গভর্ণমেন্ট সেই হেরোইন বাজেয়াপ্ত করেছিল। মনে রাখতে হবে যে পরিমাণ আফিং র এক দাম ১৭০ ডলার ব্রহ্মদেশে। সেই আফিং আমেরিকায় হেরোইন হয়ে তার মূল্য হয় ২ মিলিয়ন ডলার।

গত সেপ্টেম্বর '৮৯ ব্রহ্মদেশে সেনাবাহিনীতে অভ্যুত্থান হয়েছিল। যথাসময়ে সেই সেনা বিদ্রোহকে দমন করেছিল ব্রহ্মদেশ সরকার। সঙ্গে সঙ্গে বিপুল সংখ্যক সৈনিককে চাকরি থেকে বরখাস্তও করে দিয়েছিল। তারা এসে পেটের দায়ে যোগ দিল ড্রাগ স্মাগলারদের দলে। তাদের দল আরও ভারি করে তুলল বর্মী ছাত্ররা। তাছাড়া—

সাধারণ ব্যবসায়ী যারা তেল, চিনি, ডাল ইত্যাদি দৈনন্দিন নিত্যপ্রয়োজনীয় জিনিস বিক্রি করে তারাও তাদের চালের কি চিনির বস্তার ভেতরে হেরোইন কি আফিং-এর প্যাকেট ভরে চোরাকারবার অবাধে চালাতে লাগল।

গত কয়েক মাস আগে মোরেহতে এক ব্যবসায়ীর কাছে দুই কিলো হেরোইন পাওয়া গিয়েছিল। ব্রহ্মদেশ সীমান্তে মনিপুরের চূড়াচাঁদপুর গ্রামে এক বর্মী চোরা-কারবারির কাছ থেকে ৭০০ গ্রাম খাঁটি হেরোইন বাজেয়াপ্ত করা হয়েছিল। তবে মনে রাখতে হবে ব্রহ্মদেশ, থাইল্যান্ড গোল্ডেন ট্র্যাঙ্গেলের বিভিন্ন দেশ থেকে প্রকৃতপক্ষে যে বিপুল পরিমাণ নার্কটিক স্মাগল হয়ে আসে তার অতি অল্প পরিমাণই পুলিশের কাছে ধরা পড়ে।

আর স্মাগলাররা কখনই তাদের নার্কটিকের সম্ভার একটি মাত্র জায়গায় বিশেষ করে সীমান্ত সন্নিহিত কোন শহরে স্টোর করে রাখে না। তারা আসামের কি মনিপুরে কিম্বা নাগাল্যান্ডেরই বিভিন্ন শহরে গ্রামে ছড়িয়ে ছিটিয়ে রেখে দেয়। গত ১৮ জুন '৮৯ কাস্টম ৩৬ কেজি. আফিং পেল ডিব্রুগড়ে আবার তিনশুকিয়ার কাছে এক অখ্যাত গণ্ডগ্রামে পেল ১৪ কেজি. হেরোইন—স্লিপিং পিল এবং ৩.৬৭ কেজি. হাতির দাঁত মনিপুরের এক গ্রামে।

স্মাগলিং বিশেষ করে ড্রাগ ট্র্যাফিকিং-এর চিত্র যেমন ভয়াবহ তেমনি করুণ ও সর্বনাশা। কিন্তু বার্মা-থাইল্যান্ডের আফিং-এর জন্ম আমেরিকার বাজারে তার দামের এই আকাশ-জমিন পার্থক্যই প্রমাণিত করে ড্রাগ স্মাগলিং কী দারুণ লাভের ব্যবসা তাই সেনাবাহিনীর জওয়ান, ছাত্র, সন্ত্রাসবাদী, ব্যবসায়ী দেশের জনগোষ্ঠীর এক বিশাল অংশ ড্রাগ-স্মাগলিং—লাভের ব্যবসায় নেমে পড়েছে। তাই ড্রাগ-ট্র্যাফিকিং এত বেশি কিন্তু—

গোয়ায় বিদেশী জাঙ্কিরা আসে কেন—কেন ইণ্ডিয়াতে ড্রাগের এত ছড়াছড়ি—এই প্রশ্নগুলোর সমাধান পাওয়া যায়—এই ড্রাগ ট্র্যাফিকিং-এর অপারেশনের ভেতরেই। পুলিশের চোখে ধুলো দিয়ে স্মাগলিং করতে করতে অনেক সময় ধরা পড়ে যাওয়ার সম্ভাবনা থাকে কিম্বা বামাল গ্রেপ্তার হয়ে যাওয়ার উপক্রম হয়। তখুনি সস্তা দরে

দেশের (ভারতের) বাজারে ব্রহ্মদেশের হেরোইন কি আফিংয়ের কনসাইণ্টমেণ্ট ছেড়ে দেয়। তাই ভারতের অভ্যন্তরে এবং পশ্চিমাঞ্চলে বোম্বাই, গোয়া প্রভৃতি অঞ্চলে এবং পূর্বাঞ্চলে পশ্চিমবঙ্গ, আসাম, মনিপুর, নাগাল্যাণ্ডে ড্রাগের এত বিপুল প্রাচুর্য। মূল্যেও সুলভ। আমদানী বেশি বলেই।

বিদেশী জাঙ্কিদের আর একটি আকর্ষণ হল—হ্যাস বা ক্যানাবিস বা গাঁজা। নেপালে গাঁজার কোন লাইসেন্স নেই। মাঠে মাঠে গাঁজার চাষ হয়। বিক্রি হয় অবাধে—এসব কথা দীনেশ যাজ্ঞি বলেছে—হয়ত পাঠকের স্মরণ আছে।

বলা দরকার। দীনেশ শুধু নেপালের কথাই বলেছিল। কিন্তু ড্রাগের ইতিহাসে আছে ক্যানাবিস সটিভা (Cannabis Sativa), যা থেকে ভাঙ্গ, গাঁজা, চরস তৈরি হয় এমন একটি নেশার উপকরণ—যা সম্পূর্ণ প্রকৃতির অকৃপণ সম্ভার—Natural Drug। উত্তর ভারতের সর্বত্র পাহাড়ের ঢালুতে এই ক্যানাবিস সটিভা বা গাঁজার গাছ জন্মায় অপর্যাপ্ত অন্যান্য বন্য উদ্ভিদের মতই।

হ্যাসের প্রসঙ্গেই মনে পড়ছে একজনের কথা। সে আরাম্বল বীচের বালিতে আনমনে আঙ্গুল দিয়ে পৃথিবীর মানচিত্র আঁকতে আঁকতে অস্ফুটস্বরে বলেছিল দেখুন—আমি অ্যাডিক্ট। কিন্তু এই নোংরার বাসা জাঙ্কিগুলোর মত বদ্ধ মাতাল নই—পাঁড় নেশাখোরও নই—বলতে বলতে থেমে গিয়েছিল সে। আবছায়া অন্ধকারে তার চোখদুটো জ্বলজ্বল করছিল।

আমি হ্যাস ছাড়া কখনো অন্য কোন ড্রাগ খাই না; তার কথার ভেতরে গর্বের ঝাঁঝ ফুটে উঠেছিল।

কেন বলুন তো?

হেরোইন কি এল. এস. ডি.-র মত বিপজ্জনক নয়—নট ডেঞ্জারাস—থেমে গিয়েছিল সে। মাথা নিচু করে কয়েকমুহূর্ত কি ভেবে তীব্র ঘৃণায় তার চোখমুখ বিকৃত হয়ে উঠল—ইনজেকশান করে শরীরের ভেতরে হেরোইন কি এল. এস. ডি. ঢুকিয়ে দেওয়াকে আমি সবচেয়ে বেশি ঘৃণা করি—আই হেট ইট, তীব্র উত্তেজনায় দুলতে লাগল তার লম্বা ছিলছিলে শরীরটা।

এসব কি জানেন? নেশা করা নয়—পাগলামি—বদ্ধ পাগলামি, দু'হাতে বুক চেপে ধরে চিৎকার করতে করতে বলল, এসব ফ্রাস্ট্রেশান থেকে হয়—থেমে গিয়েছিল সে। তারপর দূরে—বহুদূরে আলোর মালা পরানো আরাম্বল সী বীচের বাড়িগুলোর দিকে তাকিয়ে ছাড়া ছাড়া গলায় বলেছিল এই হ্যাসিসও ছেড়ে দেব—ছাড়তে চেষ্টা করব, তারপরে একটা দীর্ঘশ্বাস ছেড়ে বাতাসে ভাসিয়ে দিয়ে অস্ফুটস্বরে বলেছিল, জানি না পারব কিনা—

জার্মান যুবক উচ্চাভিলাষী ট্রিপারার সঙ্গে আলাপ করে মুগ্ধ ও বিস্মিত হয়েছিলাম। উগ্র সন্ত্রাসবাদী রাজনৈতিক কর্মী ইংরেজ তরুণ এডওয়ার্ডের সঙ্গে পরিচিত হয়ে আমার অভিজ্ঞতার পরিধি বেড়ে গিয়েছিল। সমৃদ্ধ হয়েছিল আমার অভিজ্ঞতার ভাণ্ডার।

এডওয়ার্ড।

আপনার সঙ্গে কখনো এডওয়ার্ডের আলাপ হলে আপনিও বুঝতেন—সত্যিই একটা রোমাঞ্চকর এক্সপেরিয়েন্স। এই নেশাগ্রস্ত মাদকাসক্ত মানুষগুলোকে 'জাঙ্কি' কি 'ফ্রেক' ইত্যাদি বিভিন্ন নামের লেবেল দিয়েই তাদের আমরা নিতান্ত অবহেলায় আর অনাদরে অপাঙক্তেয় করে রেখে দিয়ে থাকি। কিন্তু এডওয়ার্ডের সঙ্গে ঘনিষ্ঠতা হওয়ার পর আমার প্রায়ই মনে হত—অ্যাডিক্টদের জগতে কত বিচিত্র রকমের মানুষ যে আছে।

আনজুনা বীচে হাঁটতে হাঁটতে আমাকে থমকে দাঁড়িয়ে পড়তে হয়েছিল। আমার যেতে পা আর উঠছিল না। এক ইংরেজম্যান হাতপা নেড়ে নেড়ে এমন সুন্দর করে বোঝাচ্ছে পূর্ব ইউরোপের কমিউনিস্ট দেশগুলোর সাম্প্রতিক রাজনৈতিক সংকট কি হয়েছে রুমানিয়াতে—কি হয়েছে বেলজিয়ামে, হাঙ্গেরিতে আর পোলাণ্ডের সলিডারিটি (Solidarity) মুভমেন্টেরই বা গতিপ্রকৃতি কি—

এমন সুন্দর বিশ্লেষণ করে বলছিল—বলছিল বক্তৃতার স্টাইলে যে দাঁড়িয়ে শোনার মত। সে বোঝাতে চাইছে রুমানিয়ার স্বৈরাচারি শাসক সেসেস্কুকে যে পালিয়ে যেতে হল—তার একমাত্র কারণই হল বাইরে কমিউনিজমের শুধু লেবেল আঁটা ছিল রুমানিয়ার গায়ে—ভেতরে চলছিল ডিক্টেটারশিপ, চলছিল হিংস্র অটোক্রাসির রথ। শুধু রুমানিয়া নয়—পূর্ব ইউরোপের প্রত্যেকটি দেশের এই একই চিত্র।

আরও বলছিল খোদ রাশিয়াতেই বা কি হচ্ছে? সে কি মার্কসিজম থেকে এবং কমিউনিজমের আদর্শ থেকে অনেক—অনেক সরে আসেনি? যার ফলশ্রুতি হল—ইউনাইটেড সোভিয়েত সোসালিস্ট রিপাবলিকের অধীনে বিভিন্ন স্বায়ত্বশাশিত রাজ্যগুলো উজবেকিস্থান, তুর্কমেন ইত্যাদি মাথা চাড়া দিয়ে উঠছে—

জ্বলে গেল—উঃ জ্বলে গেল—হঠাৎ নিদারুণ মর্মান্তিক এক আর্তনাদে সাগরের শাঁ শাঁ একটানা বাতাসের ঐক্যতান ধু ধু বালুচরের প্রগাঢ় স্তব্ধতার মাঝখানে বিদেশী সেই যুবকের সুরেলা কণ্ঠের ভাষণ—সব—সব যেন আড়ষ্ঠ ব্যথায় স্তব্ধ হয়ে গেল।

ছুটে এলাম আমরা।

এক জাঙ্কি বালুর ভেতরে গড়াগড়ি খাচ্ছে। থেকে থেকে আবার উঠে বসে সারা গায়ে ঠাণ্ডা বালুগুলো মুঠো মুঠো তুলে নিয়ে ঘষছে। মনে হচ্ছে তার সারা শরীর জ্বলে যাচ্ছে—পুড়ে যাচ্ছে।

কি হয়েছে—হয়েছে কি—

হবে আবার কি—ভালবেসে সেই মাগী আমাকে বোনাস দিয়ে গেছে—

বলতে বলতেই আবার বীচে আছড়ে পড়ে মর্মভেদি আর্তনাদ করতে লাগল—জ্বলে গেল—উঃ জ্বলে গেল—আমাকে বাঁচাও—

আরাম্বলে কোন হসপিটাল নেই নাভারকর?

না স্যার—

হসপিটাল, ডাক্তার কি করবে, ভিড়ের ভেতরে মাথা দিয়ে ধাক্কা মেরে মেরে সামনে

সে আক্রোশে ফেটে পড়ল—ভিডি—ভিডি ভেনারেল ডিজিজে আক্রান্ত হয়েছে। এর ইমিডিয়েট কোন রিলিফ নেই। আস্তে আস্তে থেমে থেমে সে আমাকে বলেছিল দেখুন নেশা করলে বা অ্যাডিক্ট হলেই কি উচ্ছৃংখল বিকারগ্রস্থ কামুক পশু হতে হবে? এই নোংরা জাংকটার কি হয়েছে জানেন?

কি বলুন তো?

সিফিলিস। পরীক্ষা করলে দেখা যাবে ওর পুরুষাঙ্গতে বিযাক্ত ঘা হয়েছে দগদগে ঘা—তারই নিদারুণ যন্ত্রণায় পাঠা কাটার মত ছটফট করছে—

দেখে তো মনে হচ্ছে বেশ ভদ্র ও অভিজাত ঘরের ছেলে—

জাংকরা অধিকাংশই বেশ স্বচ্ছল ঘরের ছেলে। আমার মুখের কথাটা সে কেড়ে নিয়ে বলল স্বাচ্ছল্য যেখানে, যেখানে জীবনে সুখনেশ বা মসৃণতা বেশি গোলমাল সেইখানেই সবথেকে বেশি—

শুনেছিলাম কিন্তু ভিডি তো সেকসুয়াল কনটাক্ট ছাড়া হয় না—

সেক্সুয়াল কনটাক্ট! হো হো করে হেসে হেসে গড়িয়ে পড়তে লাগল সে। আমি অপ্রতিভ হয়ে গেলাম।

এই যে জোড়ায় জোড়ায় জাংকরা ঘুরছে, হাসির দমক সংযত করতে করতে বলল, এদের কি আপনি নিরামিশাষী ভাবেন? একটু থেমে বিস্তীর্ণ বালুচরে আবছায়া ফিকে অন্ধকারে ইতস্তত সঞ্চরমান কালো কালো ছায়ামুর্তির দিকে চোখদুটো ছড়িয়ে দিয়ে বলল অস্ফুটস্বরে এই হতভাগা জাংকদের যৌনজীবন এবং যৌনবোধ বড় বিচিত্র—

কি রকম?

পাশাপাশি এক বিছানায় মাসের পর মাস থাকলেও ওদের মনে কোন ভালবাসার কোন নরম নবম মিষ্টি অনুভূতি কখনো জাগে না। মেয়ে-পুরুষ—ওদের দুজনের মন এবং সমগ্র চেতনা আচ্ছন্ন করে থাকে একটাই চিন্তা—

ড্রাগ।

ঝাপসা অন্ধকারেও স্পষ্ট দেখা যায় তার চোখে ঘৃণার ধিক্কার জ্বলজ্বল করছে। ধারাল মুখের রেখাদুটো কঠিন হয়ে উঠেছে। বিস্বাদ বিবর্ণ গলায় বলল কোন জাংক মেয়ের পুরুষ সঙ্গী যদি হেরোইনের ফিক্স হাতে নিয়ে ডাকে, তাহলে সঙ্গে সঙ্গে ছুটবে। তার কাছে হেরোইনের একটা বেশ জমাট ফিক্স নিয়েই—উত্তেজনায় বাদবাকি কথাগুলো আর বলতে পারল না।

ফিক্স নিয়ে কি?

আবার কি ছেলেটির শয্যাসঙ্গিনী হয়ে যাবে এবং তারজন্য ছেলেটিকে অ্যাপ্রোচও করতে হবে না—

একটু থেমে আবার বলল এটা অ্যাসুউমড সেটেল্ড ফ্যাক্ট—ড্রাগ পেলেই দেহ দিতে হবে—থেমে গেল সে।

এখন মুস্কিল কি জানেন। ছেলেটির এই যৌনসহচরীটি আবার হাত নেড়ে নেড়ে বক্তৃতার ভঙ্গিতে বলেছিল সে, নোংরা সিরিঞ্জে এবং নিডল দিয়ে ফিক্স নিতে

নিতেই মারাত্মক ভেনারেল ডিজিজ বাধিয়ে বসে থাকে—থেমে যায় সে। হঠাৎ খুক খুক করে হেসে ওঠে ?

আমি বুঝতে পারি না হাসছে কেন ?

জাঙ্ক ছেলেটা তো আর বাইরে থেকে মেয়েটার এই ব্যাধির কথা জানতে পারে না। মনের সুখে দেহের উগ্র কামনার জ্বালা মিটিয়ে মনের সুখে রমণ করতে থাকে দিনের পর দিন—বোনাস পায়—এই—

ভিডি !

হ্যাঁ। এই যুবকের নামই—এডওয়ার্ড।

ওয়েলসেরই কোন শহরের একটা কলেজে পার্টটাইম পড়ায় এবং নিজে সোসিওলজি নিয়ে রিসার্চ করছে।

আপনার মনে নিশ্চয়ই প্রশ্ন জাগছে—এইরকম হাইলি এডুকেটেড একজন প্রফেসার। পাক্কা ইনটেলেকচুয়াল কেন এসেছে উলঙ্গ অর্ধোলঙ্গ জাঙ্ক অধ্যুষিত এই আরাম্বল বীচে। কিসের আকর্ষণে এসেছে ?

মুখে যতই বড় বড় কথা বলুক এমন তো হতে পারে এডওয়ার্ডেরও আছে কোন বিলাসের সহচরী বা বান্ধবী এবং সে পাড় জাঙ্ক। তারই টানে পাড়ি দিয়েছে ইংলাণ্ড থেকে ইণ্ডিয়ায়। কিম্বা হয়ত এসব কিছুই নয়। জীবনের বৈচিত্র্য খুঁজতে বেরিয়ে পড়েছে। তাহলে হ্যাসই বা খায় কেন ? কিন্তু—

এসব চিন্তাভাবনা স্পেকুলেশান থাক, তার জীবনের রূপরেখাটা আপনার সামনে মেলে ধরলেই স্পষ্ট বুঝতে পারা যাবে এডওয়ার্ড কেন ফ্রেকদের স্বর্গরাজ্যে এসেছে। তবে বলা দরকার—ট্রিপারার সঙ্গে এডওয়ার্ডের আকাশ-জমিন পার্থক্য ছিল। ট্রিপারা ছিল দারুণ আউটস্পোকেন। আর অত্যন্ত আবেগপ্রবণ। সে মন উজাড় করে বলেছিল নিজের কথা কিন্তু—

এই ইংরেজ যুবক একেবারে উল্টো। অস্বাভাবিক রিজার্ভ। সবসময় কিসের যেন বিষণ্ণ চিন্তার দুর্গে নিজেকে বন্দী করে রাখতে ভালবাসে। তাই যেটুকু খোঁচা মেরে মেরে জানতে পেরেছিলাম —সেসবই এখানে বলা হল—

এডওয়ার্ড তার বাবা মা-র একমাত্র সন্তান। বাবা সরকারি অফিসের খুব উঁচু র‍্যাঙ্কের অফিসার। রাশভারী। অসম্ভব স্ট্রিক্ট প্রিন্সিপালের লোক। এতটুকু বেচাল বেহিসেবী-পণা চলবে না। তাহলেই প্রচণ্ড রেগে গিয়ে ছেলেকে মারধোর করে অনর্থ বাধিয়ে দিতেন।

না। মা এসে কান্নাকাটি করে বাবার ওপরে ঝাঁপিয়ে পড়তেন না। একটা কথাও বলতেন না। টুঁ শব্দটি পর্যন্ত করতেন না। দূরে থেকে নিঃশব্দে দাঁড়িয়ে দেখতেন। তাঁর চোখে চাপা কান্না থমকে থাকত। যন্ত্রণায় তাঁর সুন্দর মুখখানা এঁকে বেঁকে দুমড়ে কেমন কুৎসিত হয়ে উঠত। আর তাঁর ভেতরে ভেতরে তিনি নিঃশব্দ দাবদাহের মত জ্বলে যেতেন।

কেন কথা বলতেন না—কেন প্রতিবাদ করতেন না স্বামীকে—তারও কারণ ছিল। ছোটবেলা থেকেই অনেক—অনেক ভেবেছে এডওয়ার্ড মা-র এই শীতল নিরুত্তাপ আচরণের হেতু কি হতে পারে ?

মা ছিলেন একটি নামকরা গালর্স স্কুলের হেডমিসট্রেস। অসম্ভব ডিগনিটি ! তাঁর এই প্রখর আত্মমর্যাদা সম্বন্ধে অসম্ভব সচেতনতার জন্যই তিনি বাবার সঙ্গে কোন কথা বলতেন না। তাঁর সম্ভ্রমে বাধত। রুচিতে বাধত। যদি কথা কাটাকাটি থেকে ঝগড়া ঝাটি শুরু হয়ে যায়।

দুই মেরু।

উত্তর গোলার্ধ। দক্ষিণ গোলার্ধ। উত্তরে কড়া ডিসিপ্লিন, কঠিন নিয়মনীতি। আর দক্ষিণে অভ্রভেদী পাহাড়ের মত আত্মসম্মান, আত্মমর্যাদা--সেলফ রেসপেক্টের স্পর্শকাতরতা বা সেনসিটিভনেস। দুজনকেই—বাবা এবং মা-কে এডওয়ার্ডের কেমন অ্যাবনরম্যাল, কেমন অস্বাভাবিক মনে হত। কখনো দুজনকে হেসে সহজ করে কোন কথা বলতে দেখেছে কি না মনে করতে পারে না বা তার পড়াশুনা তার ভবিষ্যত নিয়ে তাদের ভেতরে কোন আলোচনা করতেও কখনো শোনেনি সে।

তাঁরা দুজনেই নিজের নিজের গণ্ডীর ভেতরে তাঁদের নিয়মনীতি এবং আত্মসম্মানটাকে খুব সযত্নে যখের মত সতর্ক প্রহরায় আগলে রেখে দিন কাটাতেন। নিজেদের নিয়েই তাঁরা এত মগ্ন হয়ে থাকতেন যে আর পাঁচটা স্বামী-স্ত্রীর মত ছেলেকেও একটু মিষ্টি করে কথা বলা, ভালবাসা, নিবিড় স্নেহে তাকে বুকে টেনে নেওয়া—এসব তুচ্ছ হাবি জাবি কাজ তাঁরা করতেন না কখনো।

—দুইমেরু।—দুইপ্রান্ত।

দু'দিকের দুইটি সাঁড়াশি যেন গলা টিপে রাখত নিশিদিন। এই পর্যন্ত বলে থেমে গিয়েছিল এডওয়ার্ড। তারপরেই তিক্ত কটু গলায় বলেছিল জানেন মা বাবাকে ছেলেমেয়েরা ভালবাসে, শ্রদ্ধা করে, ভক্তি করে আর আমার ? মাথা নিচু করে বলেছিল, মা-বাবা আমার বুকের ওপরে বোঝা হয়ে থাকত সব সময়, থেমে গিয়েছিল।

এই পরিবেশে যা হওয়ার তাই হয়েছিল। ক্লাস সিক্সে উঠতেই স্কুল অথরিটি রাগবি খেলার অনুমতি দিল। এই খেলাটায় সব ধেড়ে ধেড়ে ফেল করা ছেলেপুলেই বেশি যোগ দিত। খেলার শেষে একটা পার্কের পুকুরে হাত মুখ ধুয়ে খেলোয়াড় বন্ধুর সঙ্গে একটু গল্পগুজব কি আড্ডাটাড্ডা দিত। কিন্তু যেই বাবার কড়া চোখ দুটো আর মার বিষণ্ণ গম্ভীর কঠোর মুখখানা তার মনের ভেতরে ভেসে উঠত অমনি তাড়াতাড়ি উঠে বলতে গেলে প্রায় ছুটেই বাড়ি চলে যেত।

দাঁড়া, যাস না গ্রীল বলল এত শীগগীরই বাড়িতে ফিরে কি করবি রে—আয় বস এখানে, একটা মজা করব। হেসে হেসে বলল সবচাইতে বয়স্ক রাগবি খেলুড়ে, বলেই শুকনো শুকনো কতগুলো পাতা হাতে ডলে ডলে ছোট আর খুব সরু একটা কল্কের ভেতরে গুঁজে গুঁজে বেশ করে ভরে নিয়েই খস করে আগুন ধরিয়ে দিল। গল গল করে নীলাভ ধোঁয়া বেরোতে লাগল। বন্ধুদের হাতে হাতে ঘুরতে লাগল

কঙ্কে। কেমন কটু আর ঝাঁঝাল গন্ধে বাতাস ভারি খুব ভারি হয়ে উঠল—

হাঁ করে দেখছিস কী, দে না একটা টান গ্রীল তার পিঠে মৃদু চাপড় দিতে দিতে বলল, কী আনন্দ—কী মজা যে পাবি—

আরও বারদুয়েক বলতেই সে মারল এক টান। সঙ্গে সঙ্গে মাথা ঘুরে গেল। তার চারিদিকের পৃথিবী দুলতে লাগল। আর মনে হল সে যেন অনেক—অনেক ওপরে আস্তে আস্তে উঠে যাচ্ছে—ভেসে চলেছে আশ্চর্য আর অপরূপ এক অজানা জগতে। নরম সিল্কের ওড়নার মত মিষ্টি হলদে রোদে ভরা সেই পৃথিবীতে শুধু পাখির মিষ্টি কূজন আর যেদিকে তাকাও রাশি রাশি রঙবেরঙের ফুলের রঙিন সমারোহ! কিন্তু—হঠাৎ—কি যে হল?

কালো কালো মেঘের দল এক একটা হিংস্র নেকড়ের মত ঝাঁপিয়ে এসে থাবা দিয়ে সেই অপরূপ সুন্দর ছবিটাকে ছিঁড়ে টুকরো টুকরো করে দিয়ে চলে গেল। সে একটু একটু করে গভীর খাদের ঘন অন্ধকারে তলিয়ে যেতে লাগল।

চোখ মেলেই দেখল হাসপাতালের বেডে।

মাথার কাছে বাবা। পায়ের দিকে মা। মা বোধহয় এডওয়ার্ডের মাথায় হাত বুলিয়ে টুলিয়ে দিতে দু-এক পা এগিয়েছিল হঠাৎ বাবা দাঁতে দাঁত ঘসতে ঘসতে চাপা গলায় বলে উঠলেন দাঁড়াও—আদর আহ্লাদ পরে কর—আগে আমাকে জানতে হবে—ও মারামারি করতে গিয়েছিল কেন?

কেন জ্ঞান হারিয়েছিল। কি ঘটেছিল ঠিক—খেলতে গিয়ে কি কি ঘটতে পারে—এতটুকু খোঁজ খবর না নিয়ে কারো কাছে শোনা কথার ওপর ভিত্তি করেই বকাবকি করতে শুরু করে দিলেন!

জন্মদাতা পিতা এবং অভিভাবক হিসেবে গালাগাল বকাবকি যতটা পারলেন হাসপাতালের ডেকরাম বজায় রেখে ততটা করে জুতো মসমসিয়ে চলে যাওয়ার সময় আবার শাসিয়ে গেলেন—বাড়িতে চল, কি করে তোমাকে শায়েস্তা করতে হয় দেখছি—

মা একটা কথাও বললেন না।

বেডের রেলিংটা ধরে বিষাদের একটা প্রতিমূর্তির মত দাঁড়িয়ে রইলেন। বাবা একেবারে হসপিটাল কম্পাউণ্ড ছাড়িয়ে চলে গেলে মা শুধু বলেছিলেন কি হয়েছিল বলতো—কোন বড় রকমের ধাক্কা বা শক না পেলে তো কেউ সেন্স হারায় না—

কি বলবে মাকে সে? আসল ঘটনা কি কখনো বলা যায়। চুপ করে থাকল। মা-র দিক থেকে মুখ ঘুরিয়ে পাশ ফিরে শুয়ে থাকল। মা কিছুক্ষণ খরচোখে তার দিকে তাকিয়ে স্ত্রীসুলভ সহজাত অন্তর্দৃষ্টি বা ইন্টুইশান থেকে বললেন হাঁ রে তুই ছাবিজাবি কিছু খাসনি তো?

না।

মা আর দাঁড়ালেন না। চলে গেলেন। বাবা মা কেউ ঘুণাক্ষরে জানলেন না। জানতে চেষ্টাও করলেন না কেন এডওয়ার্ড সংজ্ঞা হারিয়েছিল। তাদের চিন্তা ভাবনার পরিধির ভেতরেই এল না—ছেলে ড্রাগ খেয়েছিল—

এই হয়—এই নিয়ম।

দীনেশ যাজ্ঞিও তো বলেছিল—৪০% Percent responsible are the Parents and Guardians for drug taking of their boys and girls…

বাবা-মার হয় উদাসীনতা না হয় অত্যন্ত বেশি কড়াকড়ির জন্যই ছেলেমেয়েরা বিপথে যেয়ে থাকে। বাড়ি তাদের কাছে যন্ত্রণা মনে হয়। আর সেই যন্ত্রণা থেকে অব্যাহতি পাওয়ার জন্যেই ড্রাগ ধরে!

কিন্তু এডওয়ার্ডের ক্ষেত্রে একটু ব্যতিক্রম আছে। সে সেই একদিনই হ্যাস খেল বটে—মনে মনে ঠিক করল আর খাবে না। নেশার ঘোরে আচ্ছন্ন থাকলে সে পড়াশুনা করবে কি করে? লেখাপড়ায় তার প্রবল অনুরাগই তাকে পাঁকে নামতে দিল না।

স্কুলের পড়া শেষ করে এডওয়ার্ড চেলটেনহাম কলেজে ভর্তি হল।

কলেজের গণ্ডী আরো বড়। এইখানেই হল আর এক বিপদ! প্রায় ড্রাগের মতই সর্বনাশা তার আকর্ষণ—উগ্র সন্ত্রাসবাদী রাজনীতিতে জড়িয়ে গেল। তারই দু-তিনজন সহপাঠীই তাকে বিপজ্জনক ও অনিশ্চিত জীবনের অন্ধকারে টেনে নামিয়েছিল।

তার টেররিষ্ট বন্ধুরা রাজনীতি করলে কি হবে, আদর্শের জন্য সংগ্রাম করলে কি হবে তাদের ভেতরে দু-একজন ছিল অ্যাডিক্টেট। হ্যাস নয় মারিজুয়ানাও নয় রীতিমত মোক্ষম ড্রাগ এল এস ডির পিল খেত কিম্বা ইনজেকশান করে এল এস ডি নিয়ে দিনের পর দিন তাদের গোপন ডেরায় পড়ে থাকত। তাদের পাল্লায় পড়ে এডওয়ার্ডও এল এস. ডি এবং হেরোইন খেতে শুধু করল। বদলে গেল—

একেবারে বদলে গেল কলেজের সেরা ছাত্র এডওয়ার্ড। বেশবাস পাল্টে গেল। মাথার চুলগুলোতে জট পড়ে গেল এবং আরো লম্বা লম্বা হয়ে ঘাড়ের ওপরে কালো কেউটের বাচ্চার মত দুলতে লাগল। আর তার ঘাড়ে যেন ড্রাগের ভূত চেপে গেল। হেরোইন, আফিং, মার্ফিয়া, ম্যানডেক্স যা জোগাড় করতে পারত তাই খেতে শুরু করল। পড়ার টেবিলে যেয়ে বসতে পর্যন্ত পারে না। মাথাটা বুকের ওপরে ঝুলিয়ে চুপ করে বসে থাকে। বসে থাকে নিশি-পাওয়া মানুষের মত আচ্ছন্ন হয়ে।

কলেজ কামাই হতে শুরু করল।

এডওয়াড আসছে না কেন। তোমরা কেউ কিছু জান? পল সায়েন্সের প্রফেসার একদিন এডওয়ার্ডের ক্লাসের ছাত্রদের জিজ্ঞাসা করলেন। সঙ্গে সঙ্গে খুক খুক হাসির আওয়াজ উঠল।

কি ব্যাপার তোমরা হাসছ কেন?

এডওয়ার্ড স্যার গোল্লায় গেছে। দিনরাত ড্রাগ খেয়ে বেহুস হয়ে পড়ে থাকে—

ছি—ছি। তাই নাকি—আহারে অমন ভাল ছেলেটা—বলতে বলতে বেরিয়ে গেলেন অধ্যাপক। সঙ্গে সঙ্গে তাঁকে প্রায় ঠেলে ফেলে দিয়ে তাঁর পাশ কাটিয়ে বেরিয়ে গেল ঝড়ের গতিতে ক্লাসের সেরা সুন্দরী মেয়ে—প্যাট।

আহা রে লাভারের নিন্দা করা হয়েছে—বড্ড লেগেছে বেচারির ক্লাসে ঠাট্টা তামাসা

আর হাসির রোল পড়ে গেল।

প্যাট চলে এল সোজা টেররিস্টদের গোপন ডেরায়। সেখানে নেশায় আচ্ছন্ন এডওয়ার্ডের চুলের মুঠি ধরে ঝাঁকিয়ে বলল, এ তুমি কি আরম্ভ করেছ—তুমি ড্রাগ খেয়ে তোমার উজ্জ্বল ভবিষ্যৎ নষ্ট করছ—বলেই বন্ধ একটা উন্মাদিনীর মত তার বুকে মাথা ঘসতে লাগল আর উদভ্রান্ত হয়ে অস্ফুটস্বরে বলতেই লাগল—বল—বল—প্রমিস কর—তুমি এসব ছাইভস্ম আর খাবে না—বলতে বলতে হঠাৎ থেমে গিয়েছিল এডওয়ার্ড। আবার বুক উজাড় করে দীর্ঘশ্বাস ছেড়ে বলেছিল আস্তে আস্তে—প্যাট অসম্ভব ভালবাসতো। কাউকে গভীরভাবে ভালবাসলে তার কথা কিছুতেই অগ্রাহ্য করা যায় না—

এডওয়ার্ড ড্রাগ ছাড়ল।

কিন্তু সন্ত্রাসবাদী রাজনীতির সঙ্গে যোগাযোগ রইল। এবং রীতিমত অ্যাকশান স্কোয়াডেরই কর্মী ছিল সে। প্রায়ই আত্মগোপন করে থাকতে হত। আণ্ডার গ্রাউণ্ডে থাকতে থাকতে অনেক অভিজ্ঞতাই হয়েছিল। কিন্তু—

আশ্চর্য রাজনীতি নিয়ে এত বেশি মাতামাতি করে, অ্যাক্টিভ পলিটিক্সের সঙ্গে যুক্ত থেকেও কিন্তু সে মন দিয়ে পড়াশুনাও চালিয়ে যাচ্ছিল। আর ধাপে ধাপে পরীক্ষার বেড়াগুলো বেশ ভাল করে টপকে টপকে গিয়ে এম এ-তে সমাজবিজ্ঞানে বা পল সায়েন্সে ফার্স্ট ক্লাস ফার্স্ট হয়েছিল। তাই প্রফেসারি পেতে কোন অসুবিধেই হয়নি, এই পর্যন্ত বলে এডওয়ার্ড থেমে গেল। আর মাথা নিচু করে কিসের যেন চিন্তায় মগ্ন হয়ে গেল।

প্যাটকে কি সঙ্গে এনেছেন?

না।

তিনি এখন কোথায়?

জানি না, তিক্ত কটু গলায় বলল এডওয়ার্ড। চোখে যন্ত্রণার চিহ্ন ফুটে উঠল।

মনে হয় প্যাটের প্রসঙ্গ পাল্টে দেওয়ার জন্যেই এডওয়ার্ড গম্ভীর হয়ে বলল, আপনাকে ড্রাগ সম্বন্ধে যখন সব কথাই বললাম তখন আরো একটা জরুরী কথাও জেনে রাখুন—একটু থেমে আবার বলল হয়ত আপনি বিশ্বাসই করবেন না—

ব্যাপারটাই বলুন না—

প্যাটের কথায় ড্রাগ ছেড়ে ছিলাম ঠিকই কিন্তু, আচমকা থেমে গেল। বিষণ্ন গম্ভীর মুখখানা উজ্জ্বল হয়ে উঠল। আস্তে আস্তে আবার বলল, যখন পরীক্ষার চাপ পড়ত, রাত জেগে পড়াশুনা করতে হত, তখন এমন মাপ মত হ্যাস খেতাম যাতে পড়ার ক্ষতি না হয়—আচ্ছন্ন ভাবটা না আসে।

বলেন কি?

হ্যাঁ, বিশ্বাস করুন। তাতে নেশা তো হতই না। মেডিটেশানটা মানে মনযোগ আরও গভীর হত, থেমে গিয়ে যেন হঠাৎ মনে পড়ে গেছে এমন করে বলে উঠল। বলল, আপনাদের ইণ্ডিয়ার সন্ন্যাসী যোগীরাও না কি শুধু গাঁজাই খায়, ঈশ্বরের

চিন্তায় মগ্ন হয়ে থাকার জন্য, বলতে বলতে দূরে অন্ধকার বালুচরে উৎসুক চোখ দুটো ছড়িয়ে দিয়ে কি যেন দেখতে লাগল।

কাউকে খুঁজছেন না কি ?

না—না আমার কোন বন্ধু কি বান্ধবী এখানে নেই একটু যেন বিরক্ত হয়ে উঠল এডওয়ার্ড। আবাব আপন মনে অস্ফুটস্বরে বলল, জানেন—Hash is not all dangerous. And rather it is highly beneficial to the intellectuals and Sannyasis Yogies বুদ্ধিজীবি এবং যোগীসাধকদের পক্ষে পরম উপকারি—

আনজুনাতেই অনেক দেরি করে ফেলছেন স্যার, নাভারকর সংকুচিত হয়ে বলল আরাম্বলে এইসব হিপিদের অনেক পাবেন—

এডওয়ার্ড'ও হঠাৎ উঠে পড়ল। কাছে দূরে কোথাও মোমবাতি, কোথাও হ্যারিকেনের আলোর রহস্যময় আলো-আঁধারিতে ভরা বীচের রেস্টুরেন্টে পরিপাটি জাংকদের ভিড়ের দিকে তাকিয়ে যেন শপথ করার মত করে বলল, একজনকে খুঁজে বের করতেই হবে—

কাকে—প্যাটকে ? তিনি তাহলে ইণ্ডিয়াতে এসেছেন ?

কোন কথা বলল না এডওয়ার্ড। বিষণ্ণ ম্লান মুখখানা ভয়ানক কঠোর হয়ে উঠল। চোয়াল দুটো গালে খিলের মত এঁটে বসল। চলে যেতে যেতে দূর থেকে শুধু বলল, সেসব শুনে আর কি করবেন—

নিস্তব্ধ বালুচরে সমুদ্রের শাঁ শাঁ বাতাসের নিদারুণ হাহাকারের মতই শোনাল তার কথাগুলো।

শোন নাভারকর, তাড়া দিও না—তোমার কাজের ক্ষতি হচ্ছে না তো ?

না স্যার—আর আপনার দেখভালের জন্য কুমারসাহেব বলে দিয়েছেন মাথা নিচু করে বলল নাভারকর, আমাকে নরক থেকে উদ্ধার করেছেন তিনি—এতদিনে কোথায় যে ভেসে যেতাম—

ও হ্যাঁ তুমিও তো অ্যাডিক্ট ছিলে—কুমারসাহেব—

জিভ কেটে কান মলে দিয়ে বলল স্যার আপনি কুমারসাহেবের দোস্ত—সেসব লজ্জার কথা আমি আপনাকে বলতে পারব না—

কিন্তু পরে জানতে পেরেছিলাম নাভারকরের ড্রাগে আসক্ত হওয়ার ইতিহাস। সে বৃত্তান্ত যেমন বিচিত্র তেমনি রোমাঞ্চকর। সেদিন রাত্রে আনজুনার সেই কটেজে পাশাপাশি শুয়ে আরও অনেক কথাই হয়েছিল নাভারকরের সঙ্গে। ঠিক হল—আর দুইদিন পরই রবিবার। রবিবারে এখানে জাঙ্কিদের মার্কেট—ফ্লি মার্কেট দেখে এবং নুডিস্ট ভিলেজটা দূর থেকে একবার দেখে আমরা আরাম্বলে চলে যাব—

আরাম্বল বীচের এদিকে সেদিকে তন্নতন্ন করে অনেক খুঁজেছিলাম আর কোথাও এডওয়ার্ডের দেখা পায়নি। সে কি বোম্বাইতে ফিরে গেছে ?

এসে পড়ল রবিবার। সেই ভোর থেকেই আনজুনায় বহুলোকের আনাগোনা শুরু হয়ে গেল। বোম্বাই থেকে গোয়া থেকেই নয়, নাগপুর, রায়পুর থেকে, কেরালা থেকে, তামিলনাড়ু থেকে দলে দলে ব্যবসায়ীরা আসতে লাগল। বীচ গমগম করতে লাগল। তাদের একটি উদ্দেশ্য—একটি লক্ষ্য—হিপির বাজার অর্থাৎ নামেমাত্র দামে ফ্লি মার্কেটের ফরেনগুডস কিনতে হবে।

আরবসাগরের একটানা উদ্দাম বাতাসের শাঁ শাঁ শব্দকেও ছাপিয়ে ড্রাম বাজছে। বাজছে ক্ল্যারিওনেট, বাজছে মাউথঅরগ্যান। আর থেকে থেকেই সেই জোরাল ঐক্যতানকে ছিঁড়ে ছিঁড়ে ফালা ফালা করে দিয়ে হিংস্র শব্দে বেজে উঠছে বিউগল—ভোঁ—ও—ভোঁ—ও—ও—

স্পষ্টই আভাস পাওয়া যায় ফ্লি মার্কেটে বিকিকিনি শুরু হওয়ার সঙ্কেতধ্বনি।

আমি নাভারকরকে নিয়ে দ্রুত প্রায় একরকম দৌড়েই সেই উতরোল আর উত্তাল বাজনার দূরাগত আওয়াজকে অনুসরণ করে যেতে লাগলাম।

পশ্চিমের আকাশে সূর্য হেলে পড়েছে।

সাগরের জলে কে যে মুঠো মুঠো আবির ছড়িয়ে দিয়েছে। গোধূলির সেই কোমল বিষণ্ন আলোয় ধূধূ দিগবিস্তীর্ণ সেই বালুচর কেমন মায়াময় আর অপরূপ হয়ে উঠেছে। হঠাৎ আমার মনে হয়েছিল—মনে হয়েছিল, স্বপ্নের ভেতরে আমি যেন ফিকে হলুদ আলোয় ভরা প্রান্তরের ওপর দিয়ে ছুটছি।

অনেক—বেশ খানিকটা পথ ছুটতে হল।

যত কাছে যাচ্ছি ততই কনসার্টের আওয়াজ প্রবল হয়ে কানে আসছে।

কী ব্যাপার—লোকজন কোথায় নাভারকর, বাজার কোথায়—কিছুই তো—

নাভারকর কোন কথা বলল না। ছুটতে ছুটতেই খুক খুক করে হেসে বলল। এসব হিপি সাহেবসুবোদের ব্যাপার স্যার—চলুন না—বলেই দূরে বহুদূরে বীচের একেবারে শেষপ্রান্তে যেখানে অতিকায় ঘাতকের মত উদ্ধত ভঙ্গীতে দাঁড়িয়ে রয়েছে নীলাভ পাহাড়ের প্রাচীর, তার নিচে জড়াজড়ি করে আছে অনেকগুলো নারকেল-গাছ। সেইদিকে ইঙ্গিত করে বলল নাভারকর, ওই যে কোকোনাট গ্রোভ দেখছেন, তার নিচে সাহেবরা হাট বসিয়েছে—

পৌঁছে গেলাম সেই নারকেলবীথির কুঞ্জে। আর চোখদুটোর দৃষ্টি বিস্ময়ে থমকে গেল। এ কী! আমার মনে হল আমি যেন লণ্ডন কি নিউইয়র্ক কিংবা প্যারিসের রকমারি অপরূপ সম্ভারে ভরা বাজারে এসে পড়েছি। কি নেই সেই মার্কেটে ক্যামেরা, টেপরেকর্ডার, জিনস, সার্টস, বুটজুতো, রুকস্যাকস, স্লিপিংব্যাগ—আরও নানারকমের বিলাসের সামগ্রী থরে থরে সাজানো রয়েছে। দোকানে দোকানে ভিড় উপচে পড়ছে। গোয়ানিজ, গুজরাঠি, মারাঠি, মাদ্রাজি, বিহারি, ভারতের প্রতিটি জাতির প্রতিটি রাজ্যের লোকের এক মনোরম সমাবেশ। তারা দোকানে দোকানে হুমড়ি খেয়ে পড়ে পছন্দমত জিনিস বাছছে—কিনছে।

না। দরদাম নেই। আর পাঁচটা বাজারের মত ক্রেতা-বিক্রেতায় দড়ি টানাটানি

টাগ অফ ওয়ার নেই—দোকানদার বলাবাহুল্য জাঙ্কি। হেরোইন কি এল. এস. ডি. কিম্বা মার্ফিয়ার নেশায় বুঁদ হয়ে বসে আছে। সে শুধু একবার একটা দাম বলছে—হয়ত বলল—ত্রিশ টাকা—

বিশ টাকায় দিয়ে দিন সাহেব—

নিয়ে যাও—নেশায় বুঁদ হয়ে থেকে খরিদ্দারের দিকে একবারও না তাকিয়ে জড়ানো গলায় বলে জাঙ্কি দোকানি—এসব বোঝা আর কে ঝোলাই করে দেশে নিয়ে যাবে—

ক্রেতা উল্লসিত হয়ে কিনে নেয় তার মনের জিনিসটি। তার লোভ বেড়ে যায়। হুমড়ি খেয়ে পড়ে আরও অন্যান্য আকর্ষণীয় পণ্যসম্ভারের ওপরে।

জলের দরে বিক্রি হয় ক্যামেরা, বিক্রি হয় রুকস্যাক কি স্লিপিং ব্যাগ। তাই ফ্রি মার্কেটের দোকানে দোকানে খদ্দেররা একেবারে মাছির মত থুকথুক করে। অবিশ্বাস্য কমদামে মহার্ঘ 'ফরেনগুডস'—এটাই সবচাইতে বড় আকর্ষণ—ফ্রি মার্কেটের।

বলা দরকার অন্যান্য ব্যবসায়ীর মত জিনিস কিনে এনে প্রফিটের মার্জিনে রেখে এখানে কোন জিনিস বিক্রি করে না ফ্রেকরা। প্রতিটি জিনিসই তাদের নিজেদের ব্যবহারের। এরা এই—অ্যাডিক্টরা প্রায় প্রত্যেকেই অত্যন্ত অবস্থাপন্ন ঘরের ছেলেমেয়ে। তাই একটার জায়গায় তিনটি কি চারটি জিনসের প্যান্ট, চারটের জায়গায় দশটা সার্ট, একজোড়া বুটজুতোর বদলে চারজোড়া নিয়ে আসে। টাকার জোর থাকলে যা হয়। অপর্যাপ্ত জিনিস নিয়ে আসে। আসতে পারে। কিন্তু—

বিক্রি করতে বসে কেন? ব্যবসা করে দুটো পয়সা করার ধান্দা তো নেশাখোরদের থাকার কথা নয়। তবুও দোকান সাজিয়ে সে বসে। তাকে বসতেই হয়। কারণ—

ড্রাগ!

নেশা করার জন্য এক একবার ফিক্সের জন্য প্রচুর পয়সার দরকার হয়। যতই টাকা নিয়ে আসুক। গড়িয়ে খেলে কলসীর জল কতদিন থাকে। একসময় ফোঁত হয়ে যায়। একেবারে দেউলে হয়ে চোখে সরষের ফুল দেখে। সর্বনাশ হেরোইন কি মার্ফিয়া কিনবে কি করে। তখন নিজেদের জিনিসপত্রই তাদের একমাত্র ভরসা। আর যেসব জাঙ্কিদের তেমন জিনিস নেই তারা হয় চুরি, না হয় ভিক্ষে করে। যেমন করে হোক—ড্রাগ যে তাদের চাই—ই—চাই। এই হল ফ্রি মার্কেটের ছেলেজাঙ্কিদের হাল—কিন্তু—

মেয়েরা?

ছেলেদের একেবারে উল্টো। হয়ত নেশা তারাও করেছে। কিন্তু ডিগনিফায়েড কোন জড়তা নেই। আচ্ছন্ন ঘোর ঘোর ভাব নেই। তারা কোমরে তোয়ালে পেঁচিয়ে কেউ তৈরি করছে টোস্ট, কেউ তৈরি করছে চা কেউ বা অতি যত্নে নিপুণ হাতে দক্ষ কারিগরের মতই বানাচ্ছে চপ কাটলেট। আর খদ্দের একেবারে উপছে পড়ছে তাদের

দোকানে। হুল্লোড় করে খাচ্ছে তারা। হু হু করে বিক্রি করছে টোস্ট, চা, চপ, কাটলেট। তারা দিয়ে শেষ করতে পারছে না। থেকে থেকে জাঙ্কি মেয়ে হেসে হেসে কোমর দুলিয়ে দুলিয়ে চিৎকার করছে—প্লী—জ—ওয়েট—ওয়েট এ বীট—দেখছেন না—স্টোভের আঁচে আর এর চেয়ে তাড়াতাড়ি কি হবে—

হোক—হোক না—আস্তে আস্তেই হোক না সুন্দরী। বলেই আলত করে তার চিবুক ধরে আদর করে বলে উঠছে কোন জাঙ্কি ছেলে—

এই জন ভাল হবে না বলছি, কপট রাগে ফুঁসে ওঠে মেয়েটি। কিন্তু চোখ-দুটোতে চাপা হাসির আলো জ্বলজ্বল করে—

ওহো ম্যাডাম তোমার মিষ্টি হাতের ছোঁয়ায় যে চপ তৈরি হচ্ছে বলতে বলতে টলতে টলতে এগিয়ে আসে ছেলেটি—

তবে রে আবার অসভ্যতা হচ্ছে বলেই হঠাৎ এক লাফে মেয়েটি তার বুকের ওপর ঝাঁপিয়ে পড়ে।

ছেলেটির গলা দু'হাতে জড়িয়ে ধরে তার বুকের ওপরে মাকড়সার মত ঝুলতে থাকে আর চক্—চক্ সশব্দ চুমুতে চুমুতে কেমন আচ্ছন্ন আর বিহ্বল করে দেয় ছেলেটি—

বাহবা রে বাহবা—ও হো রে ফ্রি মার্কেট জমে উঠেছে। আশেপাশের লোকজন উল্লসিত হয়ে ওঠে। কেউ কেউ আবার বেশি স্ফূর্তির চোটে উচ্চকিত কণ্ঠে জয়ধ্বনি দিয়ে ওঠে—লং—লীভ—ফ্রি মার্কেট—

ওহো রে আমার একী হল বলে দু'হাতে বুক চেপে ধরে কোন জাঙ্কি ডুকরে ডুকরে কাঁদতে থাকে। কিসের যেন যন্ত্রণায় তার সারা শরীর কেমন দুমড়ে দুমড়ে ওঠে।

এই শালা—ন্যাস্টি—ইম্পস—এল. এস. ডি.-র বড়ি গেলার সময় মনে ছিল না।—আর এক ফ্রেক শাসায়। তাকে বেধড়ক কিলচড় ঘুষি মেরে মেরে বালিতে শুইয়ে ফেলে তার বুকে পিঠের ওপরে চেপে বসে হঠাৎ সেও ছেলেমানুষের মত অঝোর কান্নায় ভেঙে পড়ে। দুই মাতাল—দুটো নেশাচ্ছন্ন মানুষ দুজনকে জড়িয়ে ধরে কেঁদে কেঁদে ফ্রি মার্কেটের আনন্দ-সন্ধ্যার দখিনা বাতাসকে ভারাক্রান্ত করে তোলে।

ড্রাগ!

সর্বনাশা অঘটন ঘটনপটিয়সী মহাশক্তিময়ী ড্রাগই পরিচালিত করে ফ্রি মার্কেট। এখানে বাইরে থেকে আসা উটকো খদ্দেররা ছাড়া কেউই ড্রাগের প্রভাব থেকে মুক্ত নয়। দোকানি আফিং খেয়ে বসে পসরা নিয়ে ঝিমোয়। জাঙ্কি খদ্দের ঢুলতে ঢুলতে আসে। অকারণ জিনিসপত্র নাড়াচাড়া করে ডবল দাম দিয়ে কিনে ফেলে কেউ বা এলোপাথাড়ি গালাগাল দিতে শুরু করে দেয় দোকানদার।

কোন কারণ নেই, হেতু নেই এসব মারামারি গালাগাল কিম্বা হাসির হুল্লোড়ের। কারণ একটাই—

ড্রাগ!

কিন্তু হয়ত আপনার মনে প্রশ্ন জাগছে। হয়ত নয়। নিশ্চয়ই আপনার মনে হবে ক্যামেরা, টেপরেকর্ডার, সার্টপ্যান্ট অঢেল বিক্রি হচ্ছে। আর মার্কেট ভর্তি অ্যাডিক্ট যেখানে সেখানে সেই অমূল্য বস্তুটি ড্রাগ বিক্রি কি হয় না ?

কৌতুহলি হয়ে এদিক ওদিক তাকাতেই আমার চোখদুটোর দৃষ্টি একবার চমকে উঠেই স্থির হয়ে গেল। বাতাসে মারিজুয়ানার* উগ্র ঝাঁঝাল ঈষৎ কটু গন্ধকে অনুসরণ করেই আমি আর নাভারকর এগচ্ছিলাম। হঠাৎ নাভারকর আমার পাঞ্জাবী ধরে একটু টেনে আমাকে থামতে ইঙ্গিত করল। চোখের ইসারা করে এক মেমসাহেবকে লক্ষ্য করতে বলল। মেয়েটি দ্রুতহাতে কেক কিম্বা পুডিং তৈরি করছে। আর থেকে থেকেই স্কার্টের ভেতরে চোরাপকেট থেকে একটা চ্যাপটা শিশি বের করে সাদা পাউডারের মত কি যেন মেশাচ্ছে—

জয় পাউডার স্যার, চাপা গলায় হিস হিস করে বলল নাভারকর, মেমসাহেবের শিশিতে জয় পাউডার—

জয় পাউডার কি ?

ও গড ! তাও জানেন না ড্রাগ আর অ্যাডিক্ট নিয়ে এত নাড়াচাড়া করছেন—তার কথা আর শেষ হল না। তার আগেই আমি সেই আশ্চর্য দৃশ্যটা দেখে একেবারে থ হয়ে গিয়েছিলাম। এক জাঙ্কি একটা প্রমাণ সাইজের স্টোভের ওপরে বেশ বড় একটা তাওয়া চাপিয়ে দিয়ে ডিম পাউরুটি দিয়ে স্ন্যাকস তৈরি করছে। তার ঝোলা ঝাম্পা একটা কোটের পকেট থেকে শুকনো শুকনো সবজেটে রঙের পাতার গুঁড়ো বের করে হাতের তালুতে ঢেলে বেশ করে ডলে ডলে স্ন্যাকসে মিশিয়ে দিচ্ছে।

কে আমাকে দিন—আই কেম ফার্স্ট—আই কেম ফার্স্ট জাঙ্কিরা হাতে শালপাতার ঠোঙ্গা নিয়ে বসে কে আগে খাবে সেই স্ন্যাকস* তাই নিয়ে হুড়োহুড়ি করছে। কিন্তু সেই জাঙ্কি দোকানির কোনদিকে ভ্রূক্ষেপ নেই। অস্থির হয়ে পাগলের মত ছটফট করছে যে তারই খদ্দেররা তাদের দিকে ফিরেও তাকাচ্ছে না। তার ধারাল টানা টানা চোখদুটোর খরদৃষ্ট উতপ্ত তাওয়ার ওপরে গরম তেলে ভাজা স্ন্যাকসের দিকে। আত্ম-মগ্ন শিল্পীর মতই যেন রচনা করে চলেছে আহার্যসম্ভার !

ও—টু লেট—লেট—এত স্লো হলে হয় ?

মোর দ্যান ফর্টি মিনিটস অ্যাম ওয়েটিং—

আর ইউ ডিফ অ্যান্ড ডাম্ব—ইউ কান্ট লিসন হোয়াট আর উই সেয়িং—

হঠাৎ থেমে গেল স্ন্যাকসের প্রিপ্যারেশন জ্বলন্ত স্টোভ থেকে তাওয়াটাকে আছড়ে ফেলে দিয়ে উঠে দাঁড়াল সেই জাঙ্কি। আগুন ঝরা দুটো চোখে কটমট করে একবার তাকিয়েই সে দোকান ফেলে দিয়ে চলে গেল। যেতে যেতে দূর থেকে বলল—ইউ ব্লাডি ইম্পস—ন্যাস্টি আনরুলি—তোমরা যে কয়টা স্ন্যাকস পাবে নিয়ে শান্ত হও—দাম দিতে হবে না—

জাঙ্কিরা একেবারে বেকুফ !

---

* মারিজুয়ানা—গাঁজা, স্ন্যাকস—তাড়াতাড়ি করা যায় অল্প আহার বা জলখাবার।

কারো মুখে একটা কথা নেই। এই জাঙ্কিসাহেব যে এমন কাণ্ড করে বসবে তা তারা কল্পনাও করতে পারেনি। কিন্তু ডিম পাউরুটির ওপরে নেপাল থেকে নিয়ে আসা দামী মেক্সিকান ব্রাউনের কো দিয়ে তৈরি স্ন্যাকস কি কখনো ছাড়া যায়। আধ-বুড়ো হ্যাগার্ড পাগলা জাঙ্কিটা রাগ করে চলে গেল—গেল যা ব্যাটা জাহান্নমে যা। গোল্লায় যা। তারা শকুনের মত ঝাঁপিয়ে পড়ল স্টোভের আশেপাশে বালির ওপরে ছড়ানো স্ন্যাকসের ওপরে।

আমি কিন্তু ছুটলাম সেই সাহেবের পিছু পিছু। নাভারকরও অবাক হয়ে আমার সঙ্গে যেতে যেতে বলল, স্যার যাচ্ছেন কোথায়—জাঙ্কিরা নেশার ঘোরে কত কাণ্ড—

না—না নাভারকর সাহেবকে যেন কোথায় দেখেছি—আমার চেনা—আর কিছু বলতে পারলাম না। বলা সম্ভব হল না। আমাকে ফ্লি মার্কেটের জমাট ভিড় দু'হাতে ঠেলে ঠেলে পেরোতে হচ্ছে। গায়ে ঢিলেঢালা ঝোলাঝাম্পা কোট। একটা বোতামেরও বালাই নেই—সেই চার-চারটি শতাব্দী আগে গোয়ার প্রথম পর্তুগিজ গভর্ণর অ্যাফোনোসো দ্য অলবুকেরুখির প্রতিষ্ঠিত সেই গীর্জার বারান্দায়···না কি ঊর্ধ্ব-শ্বাসে রাতের ঘন অন্ধকারকে উগ্র সাদা সার্চ লাইটের আলোয় ফালা ফালা করে দিয়ে ছুটে চলা বোম্বাই মেল ট্রেন···মাঝরাতে জলগাঁও স্টেশন···না—কিছুতেই মনে করতে পারছি না। এক একবার মনের অন্ধকারে এক একটা দৃশ্য এক একবার রুপোলী মাছের মত ঝিলিক দিয়ে উঠেই আবার ডুবে যাচ্ছে।

ওই বদ্ধ পাগল জাঙ্কিটা আপনার চেনা স্যার? ওটা নেশা খোর—

চুপ কর নাভারকর, যাকে জান না তার সম্বন্ধে অমন করে বল না। সাহেব পাগল নয়।

ওদিকে ব্যাণ্ডের বাজনা বেজেই চলেছে।

তালে তাল মিলিয়ে বাজছে ফ্লুট। বাজছে ক্ল্যারিওনেট। জাঙ্কিরা জোড়ায় জোড়ায় ধেই ধেই করে নেচে চলেছে। না—না বলড্যান্স নয়। কোন ড্যান্সই নয়—শুধুই মনের বিকারে পাগলের মত নাচার জন্যই নাচা! সে নাচের কোন মাথা মুণ্ডু নেই। বাজনাও তথৈবচ। একেবারে এলোমেলো হিংস্র শব্দের ঝঙ্কার। শুধু কানে তালা ধরানো শব্দ আর গর্জনের জগঝম্পের ভেতর জাঙ্কিদের অট্টহাসি তাদের বুকফাটা কান্নার হাহাকার সব মিলিয়ে যেন অনাজুনা বীচে মহাপ্রলয় নেমে এসেছে।

জানেন স্যার, নাভারকর বলল এই নাচগান চলবে হোলনাইট কাল বেলা দশটায় শেষ হবে।

আমি তার কথা যেন শুনতে পেলাম না। আমার বুকের ভেতরটা ধক করে উঠল—সেই নাচগানের আসরের একপাশে একটা বালিয়াড়ির ঢিবির ওপরে চুপ করে বসে আছে সেই সাহেব—সেই জাঙ্কি। বসে আছে একটা ধ্যানস্থ মূর্তির মত সেই উন্মত্ত গান বাজনার কলরোলের দিকে পিঠ দিয়ে উল্টোমুখো তার চোখদুটোতে স্বপ্নাচ্ছন্ন মেদুর দৃষ্টি।

আমি আস্তে আস্তে এগিয়ে গেলাম। তার সামনে গিয়ে নিভু নিভু আলোয় পুঁথি

পড়ার মত করে চোখদ্যুটোকে প্রখর করে তার দিকে তাকাতেই সে বিরক্ত হল। ঘ্যাস ঘেসে গলায় বলল, হোয়াট ডু ইউ ওয়াণ্ট হিয়ার—হোয়াই হ্যাভ ইউ কাম হিয়ার—

তার কোন কথাই আমার কানে এল না। তার দৃঢ় সংবদ্ধ দুটো চোয়াল, প্রশান্ত কপাল, খড়্গের মত নাকে জোরাল একটা ব্যক্তিত্বের আভাস আর তার ধারাল দুটো উজ্জ্বল চোখে অস্থির উন্মাদনা আর উদ্‌ভ্রান্তের দৃষ্টি ঠাহর করা মাত্রই আমার স্মৃতির ভেতরে সেই মাঝরাতের জলগাঁও স্টেশন—সেই গোয়ার পর্তুগিজ গীর্জার শান্ত সমাহিত আর গম্ভীর পরিবেশে দেখা মানুষটা যেন স্পষ্ট মূর্তি ধরে জেগে উঠল।

আপনি প্রফেসার ম্যাসিমো—না ?

কোন কথা বলল না সে। তার জিজ্ঞাসু চোখে বিরক্ত ফুটে উঠল। বুঝতে পারলাম সে আমাকে চিনতে চেষ্টা করছে—পারছে না। অস্বস্তি হচ্ছে। বললাম—আপনার সঙ্গে গোয়ার চার্চে দেখা—

ও—হ্যাঁ—হ্যাঁ—আপনি এখানে ?

আনজুনা বীচ দেখতে এসেছি—

তার মানে ন্যাংটো সাহেবমেম দেখতে এসেছেন—একটা পাগলা গারদ দেখতে এসেছেন, খেঁকিয়ে উঠল ম্যাসিমো। মাথা নিচু করে থেমে থেমে বলল, কিন্তু আপনার তো যথেষ্ঠ বয়স হয়েছে।

আপনি অত্যন্ত উত্তেজিত হয়ে আছেন প্রফেসার ম্যাসিমো—একটু থেমে সংকুচিত হয়ে বললাম, আমি এসেছি বলে আপনি বিরক্ত হচ্ছেন না তো ?

আরে—না—না—নট অ্যাট অল—হেসে হেসে আমার দুর্ভাবনাকে উড়িয়ে দিল সে। জাঙ্কিদের নাচের আসরের দিকে জ্বলন্ত দৃষ্টি নিক্ষেপ করে বলল, কেন উত্তেজিত হব না বলতে পারেন—? আরে তোদেরই তৃপ্তির জন্য আমি নেপাল থেকে কেনা একনম্বর অ্যাঞ্জেল ডাস্টের কোটিং দিয়ে স্ন্যাকস তৈরি করছি কষ্ট করে আর—তোরা কিনা কুকুরের মত ঘেউ ঘেউ করছিস—চুপ করে গেল। রাগে ফুঁসতে লাগল। আর একটা কথাও বলল না।

জলগাঁও স্টেশনে বামাল গ্রেপ্তার হয়েছিল। এই ম্যাসিমোরই জুতোর সুকতলির নিচে ২০০ গ্রাম আর রুকস্যাকের ভেতরে ৮০০ গ্রাম হ্যাসিস পেয়েছিল পুলিশ। রীতিমত পাকা স্মাগলার—ড্রাগ স্মাগলার বলেই তো মনে হয়। এদিকে পাঁড় অ্যাডিক্ট। বোম্বাই থেকে স্টিমারে গোয়া আসার সময় পানজিমের জেটিতে বোট এসে ভিড়বার সময় ইঞ্জিনে আগুন ধরে গেছে বলে সাগরের জলে ঝাঁপিয়ে পড়েছিল। এল এস ডির ঝোঁকে এই কাণ্ড করেছিল সে। ওদিকে আবার কলেজে পড়ায়। আশ্চর্য ! আরও আশ্চর্যের ব্যাপার অতগুলো হ্যাসের কোটিং দেওয়া ডিম পাউরুটির স্ন্যাকস বীচের বালিতে ছড়িয়ে ছিটিয়ে দিয়ে চলে এল দিব্যি ! এই মানুষ লাভের জন্য দুটো পয়সার জন্য স্মাগল করে কি ব্যবসা করে বলে মনে তো হয় না—

কি ভাবছেন ?

আপনার কথাই ভাবছি—

ভাবুন, ভেবে কোন কূলকিনারা পাবেন না ; হাসতে লাগল ম্যাসিমো। কেমন বিষন্ন হাসি। তার বুকের ভেতরে যেন কোন দুঃখের যন্ত্রণা তাকে কুরে কুরে খাচ্ছে।

ভাবছেন কলেজে মাস্টারি করি! কিন্তু ড্রাগ খাই—স্মাগল করি—এসব অ্যান্টি সোস্যাল অ্যাক্টিভিটি বলতে বলতে হঠাৎ থেমে যেয়ে আমার সামনে এসে দারুণ উত্তেজিত হয়ে তর্জনী নাচিয়ে নাচিয়ে বলল—বলতে পারেন—সোসাইটিতে—হিপোক্রিসি অর্থাৎ ভণ্ডামি ছাড়া মহত্ব, সততা, উদারতা বলে কোন কিছুর অস্তিত্ব আছে ?

আপনি শিক্ষিত বুদ্ধিজীবি প্রফেসার ম্যাসিমো। কোন গুরুতর কারণে হয়ত আঘাত পেয়েছেন—আমি আস্তে আস্তে খুব সন্তপর্ণে বললাম, আপনার মন জুড়ে আছে কোন ফ্রাস্ট্রেশান—

ফ্রাস্ট্রেশান আর ডিপ্রেশানের দোষ কি বলুন, একটা কাঠি দিয়ে বালিতে খোঁচা মারতে মারতে আস্তে আস্তে বলল মানুষের মূল্যবোধই তো নষ্টে হয়ে গিয়েছে আর সমাজে সৎ, সুস্থ জীবন বোধ কি করে থাকবে ?

ম্যাসিমোর বাবা—ইতালির বিখ্যাত বনেদি শহর পিসার ক্যাথেড্রাল গীর্জার প্রধান ধর্মযাজক। মা অত্যন্ত অ্যারিস্টোক্র্যাট সোসাইটি লেডি। মুখে পাউডার পমেড মেখে সেজেগুজে সোশ্যাল ওয়েলফেয়ার না কিসের কাজ করে—ভাল বুঝতে পারত না ম্যাসিমো। শুধু দেখত মা কখনো রিলিজিয়ন কখনো ফিলসফি নিয়ে বড় বড় বুলি আওড়াচ্ছেন। ছোটবেলায় সে বুঝতে পারত না, বড় হয়ে জেনেছিল যেসব তত্বকথা বলতেন তার অধিকাংশই ভুল। তার মার আর একটা বাই ছিল বিহেভীয়ারিজম ম্যানারস। মানুষের সঙ্গে মানুষের ব্যবহার কেমন হওয়া উচিত কেমন সৌহার্দপূর্ণ বন্ধুত্ব গড়ে তোলা যায়—এসব নিয়ে মাথা কাটাকাটি করতেন। প্রায়ই আক্ষেপ করে বলতেন মানুষ ত মানুষকে সহ্যই করতে পারে না। সে হিংসুক। সে পরশ্রীকাতর—সোসাইটির মঙ্গল হবে কি করে ? মা-কে দেখে দেখে তাঁর কথাবার্তা শুনে ম্যাসিমোর মনে পড়ে যেত সেই অলডাস হাকসলির বিখ্যাত উপন্যাস "টাইম মাস্ট হ্যাভ এ স্টপের' নায়কের কথা—সে সারা পৃথিবীর দুঃখ দুর্দশার প্রতিকারের কথা চিন্তা করে করে দেওয়ালে মাথা ঠুকত। শুধু তাই নয়, হিংস্র অতিকায় দৈত্যের মত যে সমস্যা আর উদ্বেগ যন্ত্রণা কষ্ট মানুষের টুঁটি চেপে ধরে তাকে তিলে তিলে পিষে মারার চেষ্টা করছে সেই দৈত্যটাকে—সেই জায়েন্ট অ্যাগনি অফ লাইফকে মাথায় তুলে নিয়ে তাকে শান্ত করে মানুষের সমাজে শান্তি ফিরিয়ে নিয়ে আসার স্বপ্ন দেখত।

বাবার কথাও বলা দরকার। তা না হলে ম্যাসিমোর জীবনের ট্র্যাজেডিটার কোন কারণ, কোন ব্যথা আপনারা খুঁজে পাবেন না। ভাবতে পারেন ম্যাসিমো স্বপ্ন-বিলাসী সে রোমান্টিক। সে বোহেমিয়ান—আরো অনেক কিছু। কিন্তু এসব বিশেষণের কোনটাই ম্যাসিমোর খাটে না। সে ছিল অত্যন্ত প্র্যাকটিক্যাল। রিয়েলিস্টিক বাস্তববাদী। পড়াশুনায় ছিল যাকে বলে ব্রিলিয়ান্ট। প্রত্যেক ক্লাসে ফার্স্ট

হয়ে উঠত। লেখাপড়া শেষ করে কোন একটা ভদ্র এবং মার্জিত রুচির চাকরি জুটিয়ে নিয়ে সুখী উজ্জ্বল মসৃণ জীবনের স্বপ্ন দেখত। আর সেই স্বপ্নটাকে প্রায় সত্যে রূপায়িত করেও ফেলেছিল সে। নিবিড় ও অখণ্ড মনযোগে লেখাপড়া করেছিল। ধাপে ধাপে পরীক্ষায় পাশ করে কলেজের মাস্টারি জুটিয়েও ফেলেছিল। কিন্তু—

একেবারে ঘাটে এসে নৌকা ডুবে গেল। সে ভেসে গেল—কারণ—বাবা। তিনি ছিলেন কট্টর প্রোটেস্টান্ট। দিনরাত বাইবেল পকেটে নিয়ে ঘুরছেন। চোখ বুজে বিড় বিড় করে প্রার্থনা করছেন। আর প্রায়ই আক্ষেপ করে বলতেন—আরে প্রোটেস্টান্টই হও আর রোমান ক্যাথলিকই হও—অন্তর শুদ্ধি না হলে সব বৃথা।··· কোন ধর্মই আপনাকে রক্ষা করতে পারবে না।···

শহরের বাসিন্দারা তাঁকে ধার্মিক এক সাত্বিক প্রকৃতির লোক বলেই জানে। আর তিনিও প্রায় ঈশ্বরের মহিমায় বিরাজ করেন। কিন্তু যেই গভীর হয়ে রাত নামত তখন তাঁর চেহারা এবং আচার আচরণ বদলে যেত। গ্রাউণ্ড ফ্লোরে তার ছোট ড্রইং রুমটায় ভেতর থেকে খিল দিয়ে দিতেন। কি করতেন তিনি—সেসব দিকে ম্যাসিমো ভ্রূক্ষেপ করত না। সে ওপরের ঘরে তার পড়াশুনা নিয়ে ডুবে থাকত। আর বাবা মা কারো ব্যাপারেই তার ইন্টারফেয়ার করার সময় ছিল না। রুচিও ছিল না। কিন্তু নাক গলাতেই হল বাবার রহস্যজনক কার্যকলাপে। আর বেধে গেল তুমুল সংঘাত।

তার নজরে পড়ত প্রায়ই মাঝরাতে একটা কালো রঙের প্রাইভেটকার এসে দাঁড়াত তাদের বাড়ির সামনে। নিঃশব্দ পায়ে তিনচারজন লোক গাড়ি থেকে নেমে আসত। তাদের প্রত্যেকের হাতে থাকত অ্যাটাচিকেস।

তাদের গাড়ির ইঞ্জিনের আওয়াজ পাওয়া মাত্র বাবার ঘরের দরজা খুলে যেত। বেশ কিছুক্ষণ তারা বাবার কাছে থেকে তারা আবার যেমন এসেছিল তেমনি চারিদিকে ভয়ে ভয়ে তাকিয়ে পা টিপে টিপে হেঁটে গাড়িতে উঠে চলে যেত। তারা চলে গেলে বাবা আবার ঘরের দরজা বন্ধ করে দিতেন।

কি ব্যাপার—কারা আসে নিশি রাতে? কি থাকে অ্যাটাচিকেসে ম্যাসিমোর মনের ভেতরটা ছটফট করে। একদিন যেই লোকগুলো এল অমনি সে পা টিপে টিপে নেমে এল। আর জানালায় উঁকি দিল। কিন্তু—

ম্যাসিমোর বোধহয় না এলেই ভাল হত। তাহলে হয়ত তার সুখী মসৃণ জীবনটা এমন করে ছিঁড়ে খুঁড়ে তচনচ হয়ে যেত না। কিন্তু এখন থাক সে কথা।

ফাদার চায় না কি পারাশিয়ান বা ইণ্ডিয়ায় নয়—

তাহলে—

একেবারে আণ্ডিজের খাঁটি এরিথ্রোকসিলন কোকো প্ল্যান্ট—

বল কি হে।···ম্যাসিমোর বাবা খুশিতে গরগর করে উঠল।

চমকে উঠল ম্যাসিমো!

সাউথ আমেরিকার আন্দিজ পর্বতমালার ঢালুতে যে ছোট ছোট এক ধরনের গাছ হয় সেই এরিথ্রোকসিলন কোকো প্ল্যান্ট! তার তো বোটানি কম্বিনেশান ছিল।

সে পড়েছে এই গাছ থেকেই তো কোকেন হয়—

তারা অ্যাটাচি থেকে এক একটা বড় বড় প্যাকেট বের করে টেবিলে রাখতে লাগল।

সর্বনাশ! বাবা কি তাহলে কোকেনের চোরাকারবার করছেন?

তোমরা তো জান না দক্ষিণ আমেরিকার আদিবাসী লুকাস এবং আজটেকদের তাদের ধর্মীয় যে ক্রিয়া অনুষ্ঠানের প্রধান উপকরণ ছিল—কোকেন বাবা টেবিলে টোকা দিতে দিতে মুরুব্বির মত বললেন। আমি আমার ভক্তদের ভেতরে কোকেন ইণ্ট্রডিউস করব—

আচ্ছা ফাদার—হোয়াই কোকেন। হ্যাসিস কি হেভেনলি সানসাইন ও তো রিলিজিয়ান রাইটসে ব্যবহার হতে পারে স্মাগলারদের একজন বলল।

আরে শোন তাহলে ড্রাগের সঙ্গে রিলিজিয়নের ক্লোজ রিলেশান হয়েছে খ্রীস্টের জন্মের পাঁচ হাজার বছর আগে থেকে ফাদার চোখ বুজে যেন ধ্যানস্থ হয়ে কথা বলে চলেছেন মানুষ তার প্রথম ড্রাগ তৈরি করেছিল গাছগাছড়ার লতাপতা থেকে ওয়াইন, থামলেন তিনি আবার বলেন এই ওয়াইনই ইণ্ডিয়ানরা তাদের মাদার গডেসের পুজোয় ব্যবহার করে কারন হিসিবে—নেক্সট ড্রাগ হল—কোকেন—

নিঃশব্দ পায়ে যেমন এসেছিল তেমনি ম্যাসিমো নিজের ঘরে চলে গেল।

তার মাথার ভেতরে আগুন জ্বলতে লাগল। বাবা কোকেন স্মাগল করছেন।

কিন্তু কেন?

বাবার তো কোন অভাব নেই। নিজের দু-দুটো বাড়ি আছে—দুটো ফ্রিজ—এবং তিনজনের তিনটি দামী বুইক গাড়ি। উপরন্তু চার্চের বড় ফাদার বলেও ভক্তদের দান ধ্যান থেকে আরও নানাবিধ রোজগার আছে। তবুও এই নোংরা জঘন্য—আর ভাবতে পারল না। মাথার ভেতরটা টলতে লাগল। তার বাবা চোরাকারবারি। স্মাগলার! তারপরের ঘটনা খুব সংক্ষিপ্ত—

একদিন সকালে চায়ের টেবিলে কোন ভূমিকা না করে বাবাকে চার্জ করল ম্যাসিমো আপনি এসব কি করছেন?

কি কি বলছিস তুই—কিসের কী—

আপনি কোকেন স্মাগল করছেন। বিয়িং এ বিশপ—বা।

মুখ সামলে কথা বলবি—রাগে থরথর করে কাঁপতে লাগলেন। তারপরে দাঁতে দাঁত ঘসে বললেন আর যদি করেও থাকি—তোমারই ভবিষ্যতের সুখ স্বাচ্ছন্দ্যে—

তার জন্য স্মাগলিং? আপনি এসব নোংরা কারবার বন্ধ না করলে আমি বাড়িতে থাকব না—

মা একটা কথা বললেন না। হয়ত মা জানেনই না। বাবা কয়েক মুহূর্ত অবাক হয়ে তাকিয়ে কটু গলায় তোমার যা খুশি করতে পার বলে জুতো মসমসিয়ে চলে গেলেন। যেতে যেতে বকের পালকের মত সাদা ধবধবে আলখাল্লার ওপরে ঝুলানো চকচকে ক্রুশটাকে একটু টেনেটুনে ঠিক করে নিলেন।

তার সুখ স্বাচ্ছন্দ্যের জন্য বাবা এত নিচে নেমে যাচ্ছেন! মাকে বলল, মা আমি

চলে যাচ্ছি—বাবার সঙ্গে আমি থাকতে পারব না— ইম্পসিবল ! বলেই হনহন করে চলে যাচ্ছিল—

ওরে টাকা পয়সা কিছুই তো নিলি না।—হেঁকে বললেন মা।

থমকে দাঁড়িয়ে পড়ল ম্যাসিমো সত্যিই তো টাকা ছাড়া পৃথিবীর কোথাও এক পা চলতে পারবে না।

হঠাৎ একটা কাণ্ড করে বসলেন বাবা। ঝড়ের মত ছুটে এসে ঘসঘস করে একটা চেক লিখে দিয়ে বললেন—আমার মুখের ওপরে আমার বাড়িতে কেউ কথা বলে আমি কল্পনাও করতে পারি না—একটু থেমে আবার বেশ শান্ত সংযত কণ্ঠে বললেন। এই নাও। তোমার প্রাপ্য সম্পত্তির অংশটা বোধহয় কভার করে যাবে তুমি আর না ফিরে এলে আমি খুশি হব—

এ তুমি কী বলছ! মা মৃদু অস্ফুটস্বরে বললেন।

দেখ—আমি যা করছি প্রভু যীশুর নামে শপথ করে করছি—তোমাদের ভবিষ্যতের নিরাপত্তা সুখ স্বাচ্ছন্দ্যের জন্য করছি—একটু থেমে বললেন তোমার ছেলের ঈশ্বরে বিশ্বাস আছে বলে মনে হয় না। সে হিদেন-প্যাগান—কোন হিদেনের স্থান আমার বাড়িতে হবে না।

আমার মনে পড়ে গেল দীনেশ বলেছিল সেই ভারত—নেপাল সীমান্তে ভৈরোতে কোকেন খেয়ে দুই জাঙ্কি রব ও পলের মারামারি থেকে খুনোখুনির কথা—বলেছিল কোকেনের সর্বনাশা প্রভাবের কথা। পাঠকদের নিশ্চয়ই স্মরণ আছে তখন কোকেনের জন্মবৃত্তান্ত ও ইতিহাস বলা হয়েছিল।

রাত বেড়ে চলল।

সেই বালিয়াড়ির ওপর বসেই রইল ম্যাসিমো বাজপড়া ঠুটো তালগাছের মত। ত্রয়োদশীর চাঁদের তামাটে জ্যোৎস্নার আলো এসে পড়ল তার মুখের একপাশে—সেখানে ঠেলে ওঠা গালের হাড়ের ওপরে অশ্রুর বিন্দু চিকচিক করছে। আর একপাশে অন্ধকার শূন্যতা।

তারপর ?

তারপর আর কি কক্ষচ্যুত উল্কার মত যেদিকে দু'চোখ যায় ছুটে চললাম। পাগলের মত ঝাপসা গলায় বলল ম্যাসিমো ড্রাগ খেতে শুরু করলাম আর অপর্যাপ্ত ড্রাগ কিনে জাঙ্কিদের বিলিয়ে দিতে লাগলাম—

সে কী!—কেন বলুন তো ?

যাতে অ্যাডিক্টরা তাড়াতাড়ি ধ্বংসের দিকে এগিয়ে যেতে পারে। যাক মরুক—জাহান্নমে যাক—

আপনি শক পেয়েছেন বলে কি রিভেঞ্জটা—

না—না তা নয় সুস্থ স্বাভাবিক সামাজিক জীবন কোথাও আছে না কি ? ধক করে জ্বলে উঠল তার চোখদুটো। উত্তেজনায় উঠে দাঁড়াল ম্যাসিমো।

জানেন আসল ব্যাপারটা হয়েছে কি বাবার সর্বনাশ। পরিণতির ভেতরে আমি আধুনিক কালের মানুষের ট্র্যাজেডির প্রতিচ্ছবি দেখতে পেয়েছি, প্রত্যেকটি কথা কেটে কেটে যেন সুগম্ভীর আর পবিত্র মন্ত্রোচ্চারণের মত করে' বলেছিল সম্পদ আর স্বাচ্ছন্দ্যের প্রতি লোভ এমন অতিকায় দৈত্যের মত হয়ে উঠেছে। যে মানুষের টুঁটি চিপে ধরেছে একটু থেমে তার বুক উজাড় করা দীর্ঘশ্বাসের সঙ্গে মিশিয়ে আবার বলেছিল তার মহত্ব, তার উদারতা, তার সমস্ত মানবিক অনুভূতি নির্বাসিত হয়ে গিয়েছে থেমে গেল ম্যাসিমো। আবার যেন নিজের মনকেই শুনিয়ে শুনিয়ে অস্ফুটস্বরে বলল ধর্ম বা ঈশ্বর আর মানুষকে ধারণ করতে পারছে না। তার পায়ের নিচে কোন ঠাঁই নেই—এই কথাগুলো বলতে বলতেই সে হঠাৎ আবছায়া অন্ধকারে বালিয়াড়ির পিছনে অদৃশ্য হয়ে গেল।

আরব সাগরের শাঁ শাঁ বাতাস ধুধু বালুচরে করুণ হাহাকারের মত বেজে যেতে লাগল।

আমি মুখ্যুসুখ্যু মানুষ স্যার নাভারকর বলল, একটা জিনিস আমি কিছুতেই বুঝতে পারছি না এই ম্যাসিমোসাহেব এডওয়ার্ড—কলেজে মাস্টারি করে কিন্তু ড্রাগ খায়—

আনজুনা বীচের সেই নারকেলপাতার ঘরে বসে কথা হচ্ছিল। বললাম—ওরা খুব দুঃখী মানুষ নাভারকর—দুঃখকে যন্ত্রণাকে ভুলে থাকার জন্য ড্রাগ—আমার কথা আর শেষ হল না—

ধপ—ধপ—ধপ—ঝাঁপের দরজায় ধাক্কার শব্দ।

নাভারকর তোমার বাড়িতে চোরাই আফিং পাওয়া গেছে আরাম্বল থেকে তার এক প্রতিবেশী ভগ্নদূতের মত এসে খবর দিল—

আমাকে এখুনি যেতে হবে স্যার ভয়ে উত্তেজনায় কাঁপতে কাঁপতে বলল নাভারকর নিশ্চয়ই কোন শালা শত্রুতা করে আমার বাড়িতে স্মাগলড ড্রাগ রেখেছে—যেতে যেতে দূর থেকে বলল নিশ্চয়ই শালা সেই সিলোনিজ প্রেমদাসের কাজ—

যার সঙ্গে দিনের পর দিন কাটাচ্ছি সেই নাভারকর নিজেই ড্রাগ স্মাগলার নয় তো!

বারো

আনজুয়া বীচের নুডিস্ট কলোনি বা উলঙ্গ উপনিবেশে নেশাগ্রস্ত যুবক-যুবতীরা বেশবাস সব খুলে আদিম হয়ে বাস করে কেন—কেন নাভারকরা অ্যাডিক্টদের সুস্থ জীবনে ফিরিয়ে আনতে গিয়ে জেলে যায়—

কলকাতা।

অনেকদিন কলকাতা ছেড়ে এসেছি। মনে পড়ল বেহালার সেই সুবিখ্যাত সমাজ-সেবা প্রতিষ্ঠানের পরিচালকের কথা, যিনি আমাকে ড্রাগের ওপরে বই লিখতে অনুরোধ করেছিলেন। মনে পড়ে গেল তাঁর সেই সনির্বন্ধ অনুরোধের কথাগুলো—তন্ন তন্ন করে বিশ্লেষণ করবেন, কেন—কেন ড্রাগ খায়, আর অ্যাডিক্ট হয়ে গিয়ে অবক্ষয়ের অন্ধকারে তলিয়ে যায়। শুধুই কি ফ্রাস্ট্রেশান—হতাশা?

বেশ ফ্রাস্ট্রেশানই যদি হয়, তাহলে পোস্টমর্টেম করে দেখবেন কিসের হতাশা—কিসের ফ্রাস্ট্রেশান তাদের চাবুক মেরে নিয়ে আসে ধাক্কা দিয়ে ফেলে দেয় অন্ধকার খাদে। মোটের ওপর অ্যাডিক্ট হওয়ার কারণ যেমন, তেমনি ফ্রাস্ট্রেশানেরও ডিটেল অ্যানালিসিস প্রতিটি ফ্যাসেডের (পর্যায়) বিস্তারিত বিবরণ আমার চাই……

কাজটা কঠিন।

অত্যন্ত দুরূহ। কেন না আফিম মার্ফিয়া হেরোইন থেকে শুরু করে সাইকেলডিক ড্রাগ এল এস ডি ম্যান্ড্রেক্স যারা তৈরি করে সেই ম্যানুফ্যাকচারার বা প্রডিউসাররা যেমন কাজটা করে খুব সঙ্গোপনে কোন পাহাড়ের জঙ্গলাকীর্ণ গুহার ভেতরে কোন ল্যাবরেটারিতে তেমনি পেডলার বা সেলার, স্মাগলার এবং অ্যাডিক্টরাও যার যার কার্যক্রম চালিয়ে যায় অত্যন্ত সন্তর্পনে গোপন পদসঞ্চারে।

সেই নিষিদ্ধ জগতের খবর তাকে কে দেবে? আর খবর নিয়েই বা কি হবে। সেই সোশাল ওয়েলফেয়ার সোসাইটি যাই বলুক, এপর্যন্ত যা বলা হয়েছে তার চেয়ে নতুন, তার চেয়ে অভিনব আর কোন নতুন তথ্য ড্রাগ ওয়ার্ল্ডে নেই—থাকতে পারে না। আর ব্যাপারটা আরো একটু সহজ করে দেখা যাক না।

একদল ড্রাগ তৈরি করে ব্যবসা করে দুটো পয়সা করবে বলে। সেই ড্রাগ পেডলার এবং স্মাগলাররা পৃথিবীর দেশ-দেশান্তরে বহন করে নিয়ে যায় সেও পয়সার লোভে। এই দুটো গ্রুপের চালচলন এবং গতিবিধি ও কার্যকলাপের ভেতরে কোন রহস্য নেই, নেই কোন ধোঁয়াটে এবং জটিল কোন কারণ। একেবারে পরিষ্কার—

লোভ।

দুর্বার লোভ। অঢেল টাকার লোভ। বিষয়-আসয়-গাড়ি-বাড়ির লোভ। বলতে বাধা নেই মানুষের এই ভোগসুখের অর্থাৎ আত্মসর্বস্বতার সর্বগ্রাসী লোভের অক্ষরেখায় আধুনিক পৃথিবীর সমাজটা আবর্তিত হচ্ছে। কিন্তু—

অ্যাডিক্টরা কেন ড্রাগের কবলে পড়ে। তলিয়ে ভাবতে হবে। ভাবতে হবে সমস্ত সমাজ সচেতন মানুষকে। কেন ড্রাগের নেশা আজ অ্যাটম কি নিউক্লিয়ার বোমার মতই বিধ্বংসী আর সর্বনাশা বিভৎসতায় দুনিয়ার দেশে দেশে মানুষের সমাজকে গ্রাস করছে। তার আগামী প্রজন্মকেও রসাতলে নিয়ে যাচ্ছে।

ভাবনা শুরু হয়েছে।

নিখিল বিশ্বমস্তিষ্কে আজ ধূমায়িত হয়ে উঠেছে এই নিদারুণ সমস্যার এই সংকটের প্রতিকারের কথা। চিন্তাশীল মনীষীরা কেউ বলেছেন মানুষের সমাজকে অর্থনৈতিক সংকট থেকে মুক্ত করতে হবে অর্থাৎ ইকনমিক ডিপ্রেশানটাই অ্যাডিকশানের কারণ বলতে চাইছেন। আবার কেউ বা বলেছেন ফ্যামিলি ডিসকর্ড। অর্থাৎ পারিবারিক কলহ, সংঘাত, অশান্তি। আরো অনেক কারণের কথা নিয়ে চিন্তাভাবনা করে চলেছেন। কিন্তু—

বেনারসের সেই দীনেশ যাজ্ঞি ড্রাগের শিকার হয়েছিল কেন? তার কি ইকনমিক ডিপ্রেশান ছিল? সে তো জবরদস্ত হোমরাচোমড়া মিলিটারি অফিসারের একমাত্র ছেলে। আদরে এবং ঐশ্বর্যের ভেতরে লালিত। বোম্বাইয়ের মারাঠি যুবক বিশ্বনাথ দাতারেরই বা কি ডিপ্রেশান ছিল? সে তো ছিল বোম্বাই বিশ্ববিদ্যালয়ের গ্র্যাজুয়েট। স্বপ্ন ছিল—গায়ক হবে। আর ঋতুচক্রের আবর্তনে পাখির মত ডানা মেলে দূর সাগর পারের যে তরুণতরুণীরা আফিং গাঁজা ইত্যাদি অধ্যুষিত অঞ্চলে আসে। কিম্বা যেখানে ড্রাগ সস্তায় এবং প্রচুর পরিমানে পাওয়া যায় সেইসব শহরে আসে—এদের অ্যাডিক্ট হওয়ার কারণই বা কি? কিসের নেশায় কিসের দুর্বার আকর্ষণে এরা দেশ ছেড়ে বাড়ির সুখ স্বাচ্ছন্দ নিশ্চিত নিরাপত্তা ছেড়ে নেশাগ্রস্ত বাউন্ডুলে হয়ে পথে পথে ঘোরে। সেই দীনেশের বন্ধু ইতালির পিটার। তার বান্ধবী লুসি। সুইডেনের মেয়ে সু, কারোলে থেকে শুরু করে ইংলাণ্ডেব এডওয়ার্ড ম্যাসিমো প্রমুখদের ড্রাগের শিকার হওয়ার কারণ, তাদের জবানী থেকে যেটুকু জানতে পারা গিয়েছে তার ভেতরে কি ঘুরে ফিরে পুনরাবৃত্তি হয়নি একটি মাত্র হেতু—একটি মাত্র মূল কারণ—

হতাশা—ফ্রাস্ট্রেশান।

কিন্তু ফ্রাস্ট্রেশান তো Culminating Factor—অনেক বিষাদ, অনেক দুঃখ যন্ত্রণার আঘাত, অনেক সংঘাতের ব্যথা পুঞ্জীভূত হতে হতে বারুদের স্তূপের মত হয়ে ওঠে। তারপরে অতি তুচ্ছ, অতি সামান্য কোন ঘটনায় তাতে অগ্নিসংযোগ করলে প্রচণ্ড বিস্ফোরণ ঘটে যায়। সেই বিস্ফোরণেরই আর এক নাম ফ্রাস্ট্রেশান। তখন কেউ মদ খেয়ে, কেউ বা আফিং খেয়ে সব কিছু ভুলে থাকতে চায়। কিম্বা চায় এখান থেকে পালাতে। বিষাক্ত পরিবেশ থেকে অবারিত আলো বাতাসের পৃথিবীতে ছুটে এসে মুক্তি পেতে চায়। যেমন এসেছিল ম্যাসিমো এবং আরো অনেকে।

কিন্তু থাক এসব কথা—আরও আরও গভীরে যেতে হবে, দেখতে হবে দুনিয়া জুড়ে এই বিভৎস সংকটের উৎস কোথায়?

এখন দেখা যাক তো আনজুনা বীচের সেই সবচাইতে আকর্ষনীয় রহস্যময় সেই উলঙ্গ উপনিবেশ বা নুডিস্ট কলোনির কুশীলবরা কেন আদিমতার ভেতরে

ফিরে যেতে চায়। মাফিয়া কি হেরোইন মানুষকে নেশাচ্ছন্ন করে, কিন্তু সেই সৃষ্টির প্রথম পর্যায়ে খ্রীষ্টের জন্মের লক্ষ লক্ষ বছর আগে প্রথম প্রস্তর যুগের মানুষ যখন শুধু পেয়েছিল তার একমাত্র হাতিয়ার রাশি রাশি পাথর, সেই পাথর ছুড়ে পশু শিকার করে জঠরের জ্বালা মেটাত—সেই প্রাচীন পৃথিবীর আদিম অসভ্য বর্বর যুগে ফিরে যাওয়ার ইচ্ছা জাগায় কেন ওদের মনে। কিন্তু সভ্যতার এই আবরণ বেশবাস সব ছুড়ে ফেলে দিয়ে মেয়েপুরুষ একসঙ্গে থাকাটা নিছক যৌনবিকার নয়ত? এসব চিন্তাই আলোড়িত করেছিল আমাকে।

কিন্তু—

নুডিস্ট কলোনিতে ঢোকার মুখেই বেধে গেল গোলমাল। বেশ মনে আছে সেদিনটা ছিল রবিবার।

আনজুনা বীচের একেবারে শেষপ্রান্তে সারি সারি বালিয়াড়ি ছাড়িয়ে বাঁশের বেড়া দিয়ে ঘেরা উলঙ্গ উপনিবেশ। গেটের মুখে একটা কালো পাথরের প্রাচীরের মত দাঁড়িয়ে রয়েছে এক নিগ্রো যুবক। তার জ্বলন্ত দুটো চোখ হিংস্রতায় দপ দপ করছে। তার দুর্বোধ্য ভাষার সঙ্গে দু'একটা ইংরেজী মিশিয়ে চিৎকার করে কি যেন বোঝানোর চেষ্টা করছে তার সামনে গোল হয়ে দাঁড়িয়ে থাকা কতগুলো ছোকরাকে। মনে হয় বোম্বাই কি গোয়া থেকে আসা কলেজের ছেলে তারা।

একবার—একবার ভেতরে যেতে দিন না—

ফরসা টুকটুকে মেমসাহেবকে ন্যাংটো দেখতে কি মজাই লাগে—

নো-নো যাও—এখান থেকে চলে যাও, দু'হাতে ঠেলে দেয় সেই কৃষ্ণকায় যুবক।

আমরা দশজন আছি তুমি আমাদের ঠেকাতে পারবে কালোসাহেব, কোমর দুলিয়ে দুলিয়ে বলে তাদের একজন। তার কথা শেষ হওরাব আগেই তার সঙ্গীরা বেড়া ডিঙ্গিয়ে বেনো জলের ঢেউয়ের মত আছড়ে পড়ে কলোনি চৌহদ্দির ভেতরে। তাদের নজরে পড়ে কাছে দূরে কলোনির গাছগাছালির ছায়ার নিচে নিচে জ্যোৎস্নার এক একটা রুপোলী রেখার মত ঘোরাফেরা করছে নিরাবরণ সুতনুকা শ্বেতকায় রমনীরা। তাদের চোখেব পলক পড়ে না। বুকের ভেতরটা গুণগুণ করে। তন্বী সুযৌবনা বিদেশীনিদের অনাবৃত যৌবনশ্রীর অপরিহার্য সৌন্দর্যের সুধা যখন তারা আকণ্ঠ পান করছিল আর মধু খাওয়া মৌমাছির মত ঝিম ধরে দাঁড়িয়ে পড়েছিল তখুনি তাদের পিঠে পড়তে লাগল এলোপাথাড়ি ব্যাটনের ঘা। সেই কৃষ্ণবর্ণ যুবকের আদিম রক্তে যেন আগুন ধরে গিয়েছে। ছেলেদের ব্যাটন দিয়ে এলোপাথাড়ি মেরে চলেছে। যন্ত্রণায় পশুর মত আর্তনাদ করতে লাগল তারা, কারো কারো পিঠ ফেটে রক্ত ঝরতে লাগল।

হোয়াটশ দি ম্যাটার? কি হয়েছে—বলতে বলতে ছুটে এল কপের দল (পুলিশ)। তারা কি বৃত্তান্ত—কি ঘটেছে—কেন ছেলেদের মারছে সেই নিগ্রো তরুণ সেসব না শুনেই কপের ইন্সপেক্টার সেই কালো যুবককে চিৎকার করে বলল, ইউ আর আণ্ডার অ্যারেস্ট—

মুহূর্তে যেন চুপসে গেল কালোমানুষটি। ভয়ের ছায়া পড়ল তার চোখে।

আকারে ইঙ্গিতে আর জগাখিচুড়ি ভাষায় সে বলল, দেখুন এই ছেলেগুলো প্রত্যেক রবিবারে দল বেঁধে এখানে আসে শুধু নেকেড মেয়েমানুষ দেখতে—স্যার—

তাই বলে তুমি মানুষ খুন করবে, ইন্সপেক্টারও আড়চোখে একবার অদূরে উলঙ্গ মেমসাহেবদের দেখে নিয়ে আবার ক্রুদ্ধ আক্রোশে গর্জন করে, ওরা যদি কোন বদমায়েসিই করে থাকে তুমি আমাদের কাছে কমপ্লেন কর—ডায়েরি করাও, একটু থেমে আবার দাঁতে দাঁত ঘসে বলে, তুমি—তুমি কোন্ শালা লাটের বাচ্চা যে ল অ্যাণ্ড অর্ডার হাতে নেবে বলেই বেড়ার ওপারের সেই শাশ্বতকালের পুরুষের কাছে রমনীর চির আকর্ষনীয়—নিরাবরণ দেহের অপার সৌন্দর্যের দিকে তাকিয়ে রইল।

নিগ্রো যুবকের চোখে ধূর্ত হাসি ফুটে ওঠে।

চল চল প্রিজন ভ্যানে উঠে পড় দেরি করছ কেন, বেড়ার ভেতরে সেই জ্যোৎস্নার হাটের দিকে চোখ রেখেই চেঁচিয়ে বলে ইন্সপেক্টার তার অনুচরদের—এই শিউচরণ এই পায়রাস—বলতে বলতে আচমকা থেমে যায়, আনজুনা বীচ পুলিশের চীফ কপ। কাদের অর্ডার দিচ্ছে সে—কে তার হুকুম তামিল করবে—

প্রতিটি কনস্টেবল বেড়ার ওপর আবার কেউ বা কাছেই একটা ছোট বাদামগাছের ডালে চড়ে ঝুঁকে পড়ে, কেউ বা গোড়ালিতে ভর করে উঁচু হয়ে উটের মত ডানা বাড়িয়ে দেখছে ন্যাংটো মেমসাহেবদের।

—ইস শালী জাণ্ডিক মাগীদের ব্রেস্টগুলো দেখেছিস? যেন বড় বড় দুটো ডালিম ফল।

—তোর তো শালা শুধু বুকের দিকেই নজর—মেমসাহেবদের থাইগুলো দেখ না—যেন দুটো করে নিটোল আর কেমন পুরুষ্টু কলাগাছ—

হুঃ-হুঃ বাবা, তুমি শালা ঘুঘুর বাচ্চা, থাই-টাই যাই বল আর এক সিপাহী কোমর দুলিয়ে হেসে হেসে বলল, ওই দুটো থাইয়ের একটু ওপরে ঠিক মাঝখানের সেই আসল জিনিসটার দিকেই—

তারপরে আর কি—কিই বা হতে পারে এসব ক্ষেত্রে।

যেখানে রমনী, তার ওপর আবার পরীর মত সুন্দরী এবং পরিপূর্ণ উলঙ্গ এত সুলভ যেখানে এসব কোন সমস্যাই নয়।

নিগ্রো তরুণ একটি মেয়েকে ইসারা করল। সেই যুবতী দীর্ঘাঙ্গী এবং স্বাস্থ্যপুষ্ট দেহে অপর্যাপ্ত যৌবন। অনাবৃত সেই যৌবন সম্ভারের অর্ঘ থরে থরে সাজিয়ে নাচতে নাচতে চলে এল পুলিশ অফিসারের কাছে।

নিয়ে চলে যান, চোখের কোণা দিয়ে কপদের বড়কর্তার দিকে সেই কৃষ্ণকায় তরুণ চাপা গলায় বলল, যতক্ষণ খুশি—তার কথা শেষ হওয়ার আগেই মেয়েটি অফিসারের গলা জড়িয়ে ধরে তার বুকের ওপরে উত্তাল বন্যার একটা ঢেউয়ের মত আছড়ে পড়ল।

আ মলো যা এখানে—এখানে এত লোকজনের সামনে, অফিসার তোতলাতে লাগল। মেয়েটিই হাত ধরে হিড়হিড় করে টেনে নিয়ে একটা বালিয়াড়ির পিছনে

ঝোপের ভেতরে অদৃশ্য হয়ে গেল।

সেই নিগ্রো যুবকটিও হাসতে হাসতে কলোনির ভেতরে চলে গেল। কথা বলার কোন সুযোগই পেলাম না।

আর কথা বলেই বা কি হবে—কি বলবে—কি বলতে পারে এই নিগ্রো যুবক।

নাম?

কেন ওরা ভারতে এসেছে আর কেনই বা আরবসমুদ্রের ধারে আনজুনা বীচে কিসের নেশায় ওরা আদিম বর্বর জীবনযাপন করছে। কি চায় এরা?

এসব প্রশ্নের উত্তরে আমার মনে হয় টিপারা কিম্বা এডওয়ার্ড বা ম্যাসিমো প্রমুখ ইউরোপীয় জাঙ্কিদের সঙ্গে এই কৃষ্ণকায় যুবকের জীবনবৃত্তান্তের খুব বেশি ফারাক হবে না। তাই এই কৃষ্ণকায় বিদেশী যুবক সম্বন্ধে কিছুটা উদাসীন হয়েই ডেরায় ফেরার জন্য পা বাড়ালাম। কিন্তু কয়েক পা যেতেই—

আপনি চলে যাচ্ছেন?

আমি থতমত খেয়ে দাঁড়িয়ে পড়লাম।

আপনি কি খবরের কাগজের রিপোর্টার, একটু থেমে সেই উলঙ্গ উপনিবেশের দ্বারপাল তার কালো কুচকুচে মুখে সাদা ঝকঝকে দাঁত মেলে শ্বেতশুভ্র অনাবিল হাসি হেসে বলল জানতে পারি কি আপনার পরিচয়? একটু থেমে আমার আপাদমস্তক চোখ বুলিয়ে বলল দেখেশুনে তো মনে হচ্ছে নেকেড মেয়েমানুষ দেখতে আপনি আসেননি—

বলেছিলাম—কেন এসেছি—

সব শুনে সে মাথা নিচু করল। মনে হল তার মনের ভেতরে যেন কিসের একটা প্রচণ্ড আলোড়ন উথালপাতাল করছে। তারপরেই হঠাৎ যেন একটা সুপ্ত আগ্নেয়গিরি থেকে হঠাৎ অগ্ন্যুৎপাত ঘটল। দপ করে জ্বলে উঠল তার লাল কাঁচের মার্বেলের মত দুটো গোল গোল চোখ। খিলের মত শক্ত হয়ে এঁটে বসল তার চওড়া চোয়াল দুটো। আর নিদারুণ একটা যন্ত্রণায় জ্বলে যেতে যেতে তীক্ষ্ণ—অস্ফুটস্বরে বলল আপনাদের মেকি সভ্যতা, শিক্ষাদীক্ষা, ভদ্রতার জগতটাকে লাথি মেরে থুথু ছিটিয়ে চলে এসেছি, থেমে গেল সে। দু'হাতে বুক চেপে ধরে একটা দীর্ঘশ্বাস আস্তে আস্তে সাগরের শাঁ শাঁ বাতাসে মিশিয়ে দিয়ে ঝাপসা গলায় বলল, তাও আমাদের রেহাই নেই —এখানেও তাড়া করেছেন—হঠাৎ থেমে গেল সে। আর তীব্র কোন অস্বস্তির পীড়নে তার কালো মুখখানা এঁকেবেঁকে দুমড়ে কেমন কুৎসিত আর হিংস্র হয়ে উঠল।

দুরু দুরু কেঁপে উঠল আমার বুক।

তার ব্রাত্য অভিমানে কোন ঘা দিইনি তো?

আর একটা কথাও বলল না সে। কেমন গুম মেরে দাঁড়িয়ে রইল। আর ভেতরে ভেতরে সে দাবদাহের মত জ্বলে যেতে লাগল। আরবসাগরের শাঁ শাঁ বাতাস ধুধু বালুচরে প্রেতনীর কান্নার মত একটানা বেজে চলল। আমি মহা মুশকিলে পড়ে

গেলাম। চলে যেতেও পারছি না—থাকতেও অস্বস্তি হচ্ছে। এখন হয়ত সে চূড়ান্ত অপমান করবে।

আমার সঙ্গে আসুন, কাফ্রী যুবকের কণ্ঠস্বর আদেশের মত শোনাল।

যেতে যেতে হঠাৎ থমকে দাঁড়িয়ে পড়ল। অদূরে জাঙ্কি সহযোগিদের দিকে তাকিয়ে বলল, অনুগ্রহ করে কারো সঙ্গে কোন কথা বলবেন না—কাউকে কোন প্রশ্ন করবেন না—

নুডিস্ট কলোনির ভেতরে চক্রাকারে ঘোরানো সুরকি বিছানো পথ ধরে চলেছি। সে একটা কথাও বলছে না। বোবা হয়ে আমার সঙ্গে চলেছে। হঠাৎ আমাদের দাঁড়িয়ে পড়তে হল। ব্যা-আ-আ-ব্যা একটি ভেড়া বা ছাগলের করুণ আর্তনাদ শোনা যাচ্ছে। একদল জাঙ্কি মেয়েপুরুষ একটা গাছের নিচে দাঁড়িয়ে হুল্লোড় করছে।

কী ব্যাপার ?

একটা বেশ হৃষ্টপুষ্ট ভেড়াকে গাছের ডালে ঝুলিয়ে জ্যান্ত তার ছাল ছাড়ানো হচ্ছে। ভেড়াটা মৃত্যুযন্ত্রণায় মর্মভেদি আর্তনাদ করছে। গলগল করে কাঁচা রক্ত মাটিতে অঝোরে ঝরে পড়ছে। কোন কোন জাঙ্কি ছুটে এসে সেই তাজা গরম রক্ত মাটি থেকে চেটে চেটে খাচ্ছে। কেউ কেউ আবার ছাল ছাড়ানো শেষ হওয়ার আগেই জন্তুটার গা থেকে মাংস চাকু দিয়ে কেটে কেটে কাঁচা খাচ্ছে।

জন—একটু আগুনে সেঁকে নিলে হত না, একটি মেয়ে তার সঙ্গী প্রেমিকের গলা জড়িয়ে ধরে বলল। তার হাতদুটো এক ঝটকায় ছাড়িয়ে দিয়ে সে বলল, আরে ওসব তো সভ্য মানুষেরা করে—

আবার আর একদিকে দেখা গেল পাথরের হাতিয়ার নিয়ে শিকারের সন্ধানে বেড়িয়েছে। কেউ কেউ ঝোপঝাড় থেকে লতাপাতা ফল সংগ্রহ করে নিয়ে আসছে। আমার মনে হল আমি যেন লক্ষ লক্ষ বছর আগের সেই প্রস্তরযুগের প্রাচীন পৃথিবীতে ছিটকে এসে পড়েছি। দেখছেন তো কেমন রাগ রাগ কর্কশ গলায় বলল সেই কাফ্রী ছোকরা, আমরা ইচ্ছে করেই আদিমযুগের অসভ্য বর্বর জীবনযাপন করছি—একটু থেমে পিক্ করে একদলা থুথু ফেলে আবার বলল বলতে পারেন—ভদ্রতার মুখোস এঁটে নোংরা ভণ্ড জীবন কাটিয়ে কি হবে ?

ছাব্বিশ বছরের এই নিগ্রো যুবক জো-কে আমার কিছুই বলতে হয়নি। সে প্রচণ্ড আক্রোশে ফুঁসতে ফুঁসতে যা বলেছিল সেসব অল্পবিস্তর ম্যাসিমো কি এডওয়ার্ড এবং আরো অনেক বিদেশী জাঙ্কির জীবনবৃত্তান্তের পুনরাবৃত্তি। এই অ্যাডিক্টদের নিয়ে মাথা ঘামাতে ঘামাতে আমার বারবার মনে হয়েছে ভুবন-বিখ্যাত শিশুবিশেষজ্ঞ ডক্টর রস কাম্বেলের (Dr. Ross Campble) সেই উক্তি—স্বামী-স্ত্রীর ভেতরে মনোমালিন্য সন্তানের মনে প্রচণ্ড বিক্ষোভের জন্ম দেয়। তারা হতাশার শিকার হয়ে পড়ে।

জো-র বাবা-মার ডিভোর্স হওয়ার পরে তিনমাস যেতে না যেতে তার বাবা হার্টঅ্যাটাকে মারা গেল। মা আর একটা বিয়ে করে বসল, নাম কোওয়াস্তে। তার

স্বভাবচরিত্র কোনকালেই ভাল ছিল না। সেই স্বামীর সঙ্গেও তার খিটিমিটি লেগেই থাকত। অশান্তির জ্বালায় মা ড্রিংক করতে শুরু করল। কিন্তু মদ, আফিম খেতেন লুকিয়ে বাইরে কিন্তু ভয়ানক নিষ্ঠাবতী ধর্মপ্রাণ মহিলার নিখুঁত মেকআপ—হাতে পকেট বাইবেলের নিউ টেস্টামেন্ট, বুকে ক্রুশ। চোখ বুজে বিড়বিড় করে পরম করুণাময় ঈশ্বরের নাম জপ করে চলেছেন। আর প্রায় প্রতিরাত্রেই নিত্যনতুন এক একটা কামী পুরুষের লালসা মেটাচ্ছেন।

জো আর কি করবে? মা-র সঙ্গে ঝগড়াঝাঁটি করে বাড়ি ছেড়ে এসে হ্যাস, হেরোইন, মারিজুয়ানা ধরল এবং ওয়াগন ব্রেকারের দলে ভিড়ল। একদিন ধরাও পড়ে গেল। জেল থেকে বেরিয়ে এসে সভ্যসমাজের ওপর বীতশ্রদ্ধ হয়ে চলে এল নুডিস্ট কলোনিতে।

গোয়ায় যেতে চাইছেন যান, আনজুনা আরাম্বল বীচগুলোতে দেখবেন শুধু ড্রাগ টেকার বোহেমিয়ান ইউরোপীয় মেয়েপুরুষদের ভিড়—আপনি তাদের হিপিও বলতে পারেন—ওয়েলফেয়ার সোসাইটির সঙ্গে যুক্ত ডাক্তার সায়কিয়াটিস্ট দেবাশীষ ভট্টাচার্যের এই কথাগুলো কানে বাজতে লাগল।

গোয়ায় রওনা হওয়ার আগে সোসাইটির অফিসঘরে বসে আরো অনেক আলোচনাই হয়েছিল। কথায় কথায় ডক্টর ভট্টাচার্য বলেছিলেন, আরে ফ্রান্সের কি ইংলান্ডেব কি জার্মানি কোথাকার কোন্ টম ডিক হ্যারির ড্রাগ অ্যাডিকশনের অ্যানালিসিস করে কি হবে—কলকাতার—আপনার এই শহবের অ্যাডিক্টদের নিয়ে চিন্তাভাবনা করুন, থেমে গিয়েছিলেন হঠাৎ দু'তিনটি মেণ্টাল হসপিটালের সঙ্গে অ্যাটাচড এবং মানসিক রোগের বিখ্যাত ডাক্তার আবার একটা দীর্ঘশ্বাস ফেলে বলেছিলেন উঃ কী যে হরিবল পিকচার—আপনারা কল্পনাও করতে পারবেন না—বারো তের থেকে শুরু করে আঠারো উনিশ বছরের ছেলেমেয়েরা ড্রাগ খেয়ে খেয়ে কী ভাবে যে নিজেদের কবর নিজেরা খুঁড়ছে…

ডক্টর ভট্টাচার্য, উনি গোয়া থেকে এসেই তো কলকাতার ড্রাগটেকারদের দিয়ে সারভে করবেন বলেছিলেন সোসাইটির ডিরেক্টর। আর তাঁরই প্রবল আগ্রহে এবং খোকনের সনির্বন্ধ অনুরোধে গোয়ায় এসেছিলাম…

মন একেবারেই টানছিল না।

তবুও আরাম্বল বীচে যেতে হল। ওয়েস্টার্ণ জোনের নার্কটিক কণ্ট্রোল ব্যুরোর চীফ কুমারসাহেব বার বার বলে দিয়েছেন সেখানে যেতে। বেশ মনে আছে আসার ঠিক আগের দিন আমার কানের কাছে মুখ নিয়ে এসে চাপা গলায় বলে-ছিলেন, চোখ কান খোলা রাখবেন আরাম্বলে ড্রাগ ওয়ার্ল্ডের অনেক কিছু জানতে পারবেন—

অবশ্যই আভাসও দিয়ে দিয়েছিলেন সেই অনেক কিছুর। কিন্তু এখন থাক সেসব কথা।

আনজুনা থেকে সোজা সাগর ঘেসে ঘেসে উত্তরে বেশ কিছু দূরে গেলেই আরামবুল বীচ। হেঁটে যেতে দুদিন সময় লাগে। তাড়াতাড়ি হবে বলে স্টিমারে গেলাম। জেটিতে দাঁড়িয়ে আমার জন্য ব্যাকুল হয়ে অপেক্ষা করছিল নাভারকর। তার সঙ্গে যেতে যেতে দেখলাম বীচের ওপর থেকেই যেন মাথাফুঁড়ে উঠেছে সারি সারি পাহাড় আর পশ্চিমে একেবারে আবছায়া কালো দিগন্তরেখা পর্যন্ত উধাও হয়ে গিয়েছে আরব সাগরের শান্ত নিস্তরঙ্গ জলরাশি। আর সেই পাহাড় আর সমুদ্রের মাঝখানে একটা সুস্বাদু জলের হ্রদ। লেকের ধারে ধারে আরামবুলের বাসিন্দাদের সুদৃশ্য এক একটা বাড়ি।

থেমে গেল নাভারকর।

একেবারে শেষের বাড়িটার গেটের কাছে থামল নাভারকর। হাতদুটো জোড় করে বলল স্যার এটাই গরীবের আস্তানা—অনেক কষ্ট হবে। অপরাধ নেবেন না—

নাভারকর তোমার বাড়িতে যে বেআইনী হ্যাস পাওয়া গিয়েছিল, সেই ঝামেলায় —কিন্তু আমার কথা শেষ হল না। তার আগেই প্রায় ঝড়ের গতিতে এল এক যুবতী। কালো কুচকুচে গায়ের রঙ। দীঘল চেহারায় রূঢ় পরিপুষ্টি। হঠাৎ দেখলে মনে হয় একটা লম্বা কালো চিতাবাঘ। কিন্তু—

তার সুর্মাটানা চোখদুটো জলে ভরা। নাভারকর বেশ বিরক্ত হয়ে বলল আজ আবার কিসের মামলা রুথ—

দুটো টাকা দিন, কান্নায় ভাঙ্গা ভাঙ্গা ঝাপসা গলায় বলল—বাচ্চাটার এতটুকু দুধ নেই—

কী? আমার কি দান খয়রাতি আছে, ফুঁসে উঠল নাভারকর, গোবি কোথায়—সে কী বলেছে—

একটা কথাও বলল না রুথ। শুধু ঝকঝকে কালো মুখখানা শক্ত হয়ে উঠল। আর ধারাল দুটো চোখের কোণায় কোণায় ঝিকিয়ে উঠল আগুন। মনের ভেতরের তীব্র জ্বালা মিশিয়ে অস্ফুটস্বরে বলল আপনি তো সবই জানেন—

আর একটাও কথা না বলে তাকে টাকা দিয়ে বিদায় করে দিল নাভারকর। বলল, মেয়েটা কেরালার—বড় ট্রাজিক লাইফ স্যার—ত্রিবেন্দাম থেকে বছর তিনেক আগে—

মিঃ না-ভা-র-কর—বাইরে থেকে চড়া গলায় হাঁক শোনা গেল। খুব ব্যস্ত হয়ে উঠে পড়ল নাভারকর। কুণ্ঠিত হয়ে বলল, স্যার মাত্র হাফ অ্যান আওয়ারের জন্য আমাকে ছেড়ে দেবেন—বলতে বলতেই ছুটে বাইরে চলে গেল। আমিও তাকে অনুসরণ করলাম।

ট্রাম্পেট পেয়েছেন?

কেজি তিনেক।

পাইপ ফিস?

অল্প। মেরেকেটে পনের বিশ কেজি হতে পারে।

ফ্লাইং ফিস ? কড, হেরিং-সার্ডিন ?

পেয়েছি সবই মিঃ মাখিজানি কুণ্ঠিত হয়ে বলল নাভারকর, কিন্তু কোন ভ্যারাইটিই বেশি নয়—কোয়াণ্টিটি কম—কম—

হুম। অদ্ভুত একটা শব্দ করে বলল বোম্বাইয়ের মাছের ব্যাপারি যজ্ঞেশ্বর মাখিজানি—কি করে বেশি মাছ পাবেন আপনি—একটু থেমে তার মেদবহুল শরীরটাকে কাঁপিয়ে তাচ্ছিল্যের হাসি হেসে বলল, আপনি সেই মান্ধাতার আমলে টুনি জাল আর রড আর স্টীল দিয়ে মাছ মারবেন।

সিনেনেট জলে ফেললে সার্ডিন হেরিং ঝাঁকে ঝাঁকে ধরা যায়, ট্রলার আর দশাশই চেহারার আলট্রাসনিক কি সোনাল টাইপের ইলেক্ট্রো-অ্যাকাউস্টিক ইকুইপমেণ্ট ব্যবহার করতে পারলে তো কোন কথাই নেই—কিন্তু এসব দামী সাজসরঞ্জাম সে কোথায় পাবে—এসব কথা তার মুখে এসে গিয়েছিল। কিন্তু বলল না। মাখিজানি বড্ড ফালতু বকে। তার আর্থিক অবস্থা তো সে জানে।

নাভারকরের বাড়িটা একতলা।

পাকা বাড়ি। কিন্তু মাত্র পাঁচ ইঞ্চির দেওয়াল গেঁথে মাথায় এ্যাসবেস্টসের শেড চাপিয়ে কোনমতে কণ্টেসৃষ্টে করা বাড়ি। দুটো ছোট ছোট খুপরি ঘর। আসবাবপত্র বলতে তেমন কিছুই নেই। দুটো ঘরে দুটো নড়বড়ে তক্তাপোষ। আর একটা কি দুটো টিনের চেয়ার টেবিল। সবচেয়ে আশ্চর্য—বাড়ির কোথাও কোন মহিলার চিহ্ন দেখলাম না।

নাভারকর কি বিয়ে থা করেনি। মাছের কারবারি। জেলেদের দিয়ে মাছ ধরিয়ে পাইকারি বিক্রি করে। বেশ পয়সাওয়ালা লোকই তো হওয়ার কথা। কিন্তু তার বাড়িঘরের এই দৈন্যদশা কেন ?

সবই পরিষ্কার হয়ে গিয়েছিল। তার সঙ্গে থাকতে থাকতেই তার সম্বন্ধে সব কিছুই জানতে পেরেছিলাম। আর আশ্চর্য হয়ে গিয়েছিলাম। প্রথমে অবাক হয়েছিলাম ভেতরের বারান্দার পাশাপাশি দুটো ঘরের পাশে একটা লম্বা চিলতি ঘর যার দরজাটা সব সময়ে তালা দেওয়া দেখতাম।

ঘরটা বন্ধ কেন নাভারকর—

কোন কথা বলল না। মুখে হাসি ফুটে উঠল। গর্বের হাসি। কিছুক্ষণ কি যেন চিন্তা করে বলল আজ কি স্যাটারডে ?

হ্যাঁ। আজ শনিবার।

তাহলে আজ সন্ধেতেই বুঝতে পারবেন সব—

কিন্তু আমরা আর কথাবার্তা বলতে পারলাম না। হঠাৎ পাশের বাড়ি থেকে ভেসে এল সাগরের একটানা হুহু বাতাসকেও ছাপিয়ে মেয়েলি তীক্ষ্ণ আর্তনাদ—আমার বাচ্চাকে খুন করল—খু—ন—

নাভারকরের সঙ্গে ছুটে গেলাম সেই বাড়িতে। তেমনি সাংঘাতিক কিছু নয়। স্বামী-স্ত্রীর সংঘাতের সেই অতিপরিচিত দৃশ্য—সেই মেয়েটি রুগ্ন কোলে বাচ্চা নিয়ে

আক্রোশে ফুঁসছে। দাঁতে দাঁত চেপে ধরে বলছে—গাঁজা টানার পয়সা তো দেখি জুটেছে কিন্তু ছেলেটার জন্যএকটু দুধ কি একটা জামাপ্যাণ্টের বেলায় দেখি তোমার—

বাচ্চাটা কি আমার—যে আমি পালবো। হ্যাসের লম্বা সরু কলকেটা উঠোনের মাটিতে আছড়ে ফেলে দিয়ে উঠে দাঁড়াল সাপের মত হিলহিলে লম্বা মানুষটা। কেমন হায়েনার মত শুকনো খটখটে একটা হাসি হেসে টেনে টেনে বললে তুই মাগী ভালবাসাবাসি করে পেট বাধাবি, একজন মজা লুটে চলে যাবে আমি শালা—

এই—ও গোবি—হঠাৎ গর্জন করে উঠল নাভারকর। তার সামনে যেয়ে শাসিয়ে বলল ফের যদি আজেবাজে কথা বলবি তাহলে কিন্তু—

আপনাকে আর কি বলব গুরুদেব আপনি তো সবই জানেন—তুমি রুথকে বিয়ে করে ফেলছ না কেন?

সাদি, হুঃ একটা দীর্ঘশ্বাস ফেলে অস্পষ্ট স্বরে বলল গুরুদেব আমার কোন ঠিক ঠিকানা আছে। কখন কি ঘটে যায় কিছু বলা যায়। থেমে গেল নাভারকর।

আর একটা কথাও বলল না নাভারকর। কেমন গম্ভীর আর কঠোর হয়ে উঠল তার মুখখানা।

আমার মনে হল যেন জটিল রহস্যময় এবং দুর্বোধ্য কোন নাটক দেখছি।

ঘিঞ্জি বস্তির ভেতরে রুথের বাড়ি থেকে ফিরে আসতে আসতে রীতিমত নাকে রুমাল চাপা দিতে হল। গাঁজার উগ্র ঝাঁঝাল গন্ধ। এক একটা ঘরের সামনে দাওয়ায় গোল হয়ে বসে হ্যাসিস টানছে বস্তির বাসিন্দারা।

কি ব্যাপার নাভারকর এখানে কি সবাই অ্যাডিক্ট।

হ্যাঁ স্যার—জেলেপাড়া তো, সারা রাত জেগে সাগরে মাছ ধরে, কেন যেন মাথা নিচু করে আস্তে আস্তে বলল, দিনেরবেলা পড়ে পড়ে ঘুমোয়—ঘুম থেকে উঠে গাঁজায় দম দেয়—যেন নিজেকে শুনিয়ে শুনিয়ে বলল কিছুতেই কিছু করতে পারছি না। তার কথাগুলোর ভেতরে একটা প্রচণ্ড আক্ষেপ আর হতাশা ফুটে উঠল।

দিগন্তপ্রসারী বালুচরে আরাম্বল বীচে বিকেলের কোমল বিষণ্ণ আলো ছড়িয়ে পড়েছে। বিদেশী জাঙ্কিরা জোড়ায় জোড়ায় ঘুরছে। দেখলাম নাভারকর এদের সম্বন্ধে একেবারে উদাসিন। অত্যন্ত নিস্পৃহ কণ্ঠে বলল, প্রত্যেকটা পয়সাওয়ালা ঘরের ছেলেমেয়ে। টাকা বেশি হলে যা হয়—

যেতে যেতে হঠাৎ থমকে দাঁড়িয়ে পড়ল নাভারকর। পরীর মত সুন্দরী বিদেশিনী যুবতী বালুর ওপরে বসে রয়েছে। গলায় রুদ্রাক্ষের মালা। পরনে গৈরিক শাড়ি। তার চোখদুটো ধু ধু সাগরের দিকে ছড়িয়ে দিয়ে চুপটি করে বসে আছে।

জাঙ্ক কমিউনিটির সকলেই কিন্তু উচ্ছৃঙ্খল কি বোহেমিয়ান নয়, মেয়েটির দিকে ইঙ্গিত করে চাপাগলায় বলল, যেমন এই মেয়েটি—ফ্রেঞ্চ। কিন্তু ভারতে এসে ফরাসী নাম বদলে নিজেই নিজের নাম রেখেছে—শান্তি—পীস, থামল নাভারকর। আবার আস্তে আস্তে বলল শান্তি পশ্চিমের অত্যন্ত যান্ত্রিক আর প্রাণহীন জীবন থেকে পালিয়ে চলে এসেছে ইণ্ডিয়ায়—

আরো বলেছিল নাভারকর শান্তি কখনো সিনথেটিক শাড়ি ব্যবহার করবে না।

কট্টর নিরামিশাষি। মাছ মাংস ছোঁয় না পর্যন্ত। কখনো রাসায়নিক প্রক্রিয়ায় তৈরি ড্রাগ ব্যবহার করে না, নেশা বলতে শুধু একটু হ্যাস। শুধু গাঁজা—

সি বীচে নাভারকরের সঙ্গে ঘুরতে ঘুরতে বেশ বুঝতে পারলাম আরাম্বলের জাগ্রিক কমিউন এবং সাধারণ মানুষের মনে প্রায় সম্রাটের মহিমায় বিরাজ করছে সেই মাছের কারবারি। পরিচিত, অল্পপরিচিত যেই তাকে দেখছে অমনি ছুটে এসে তাকে নমস্কার করছে। তার কুশল নিচ্ছে, কেউ বা তার মাছের ব্যবসার কথা জিজ্ঞাসা করছে! কিন্তু—

একটা ব্যাপারে একটু অবাক হলাম। নাভারকরও তাদের প্রত্যেকের ঘর সংসারের খোঁজখবর নিচ্ছে, হাল হকিকত খুঁচিয়ে খুঁচিয়ে জিজ্ঞাসা করছে আর তারপরেই প্রত্যেককে বার বার পাখি পড়ার মত করে বলে দিচ্ছে—

সন্ধ্যেবেলা যাবে কিন্তু—ভুলবে না কেমন ?

এত লোককে ডাকছে, আমি কৌতূহল চাপতে না পেরে বলে ফেললাম, তোমার বাড়িতে কি কোন ফাংশান আছে।

ফাংশান ? একটু থেমে হেসে বলল, হ্যাঁ ফাংশানই বটে, তার কথাগুলোর ভেতরে কেমন একটা ব্যথা ফুটে উঠল। বিষাদের ছায়া থম থম করতে লাগল তার মুখে।

আমি আর কিছু বলতে ভরসা পেলাম না। লোকটা কেমন চাপা। নিজেকে একটু গুটিয়ে থাকতে ভালবাসে। আর নিজের চারিদিকে একটা রহস্যের আবরণ দিয়ে রেখে হয়ত আনন্দ পায়। রুথ-গোবির ব্যাপারটাও কিছু বলল না। রুথের কোলের বাচ্চাটা কি অবৈধ। গোবির সঙ্গে তার রিলেশানই বা কি—

ব্যাপারটা তো দেখছেন স্যার আস্তে আস্তে কথা বলতে বলতে বাড়ির দিকে এগোতে লাগল নাভারকর। মাছমারাদের পাড়া—আপনারা যাকে বলেন ধীবর পল্লী—মোর অর লেশ প্রত্যেকে অ্যাডিক্টেড থেমে গেল নাভারকর। অস্ফুটস্বরে আবার বলল, কিছুতেই কিছু করতে পারছি না স্যার—

হঠাৎ বিদ্যুতচমকের মত আমার মনে হল নাভারকর কি নিজে ড্রাগের কবল থেকে মুক্ত হয়ে আরাম্বলের সব নেশাগ্রস্তদের রিহ্যাবিলেট করার চেষ্টা করছে ?

আরও দেখুন স্যার—জেলেদের তো বেশি কিছু বলাও যায় না। হাড়ভাঙ্গা পরিশ্রম করে, নাভারকর বেশ চিন্তিত হয়ে আস্তে আস্তে বলল একটু আধটু নেশা না করলে চলবে কেন—থামল। নিজের চিন্তার ভেতরে মগ্ন হয়ে গেল। আবার বেশ একটা খুশি খুশি ভাব দেখিয়ে বলল তবে স্যার—ওই বিধ্বংসী ড্রাগ হেরোইন, মার্ফিয়া, এল এস ডি নিয়ে বাড়াবাড়িটা অনেক কমাতে পেরেছি, আরও কমাতে পারব—সেটা খুব বড় প্রবলেম নয়—প্রবলেম হল—

বলতে বলতে হঠাৎ থেমে গেল সে।

থামলে যে—কি প্রবলেম ?

এই কয়দিনেও বুঝতে পারলেন না স্যার—দেখলেন তো প্রায় সবাই গাঁজা টানছে—পয়সা কোথায় পায় বলুন তো ?

আমি জিজ্ঞাসু চোখে তাকালাম।

স্মাগলিং—ওভারসিজ স্মাগলিং। এরা গরীব। বড় বড় পয়সাওয়ালা স্মাগলারদের ক্যারিয়ারের কাজ করে—

নাভারকর যেটুকু জানে বলেছিল সমুদ্রপথে বেআইনি ড্রাগের আন্তর্জাতিক চোরা-কারবারের একটি মোটামুটি রূপরেখা। তার বক্তব্য এখানে সংক্ষেপে বলা হল।

আফিম যা থেকে হেরোইন, মার্ফিয়া তৈরি হয় তার মেন সোর্স হল দুটো—(ক) ব্রহ্মদেশ, লাওস এবং থাইলাণ্ড—এই তিনটি দেশের তিনবিন্দু থেকে টানা স্বর্ণ-ত্রিভূজ ভূখণ্ড বা গোল্ডেন ট্রাঙ্গল (খ) পাকিস্তান, আফগানিস্থান এবং ইরান—এই তিনটি দেশকেও ড্রাগের জগতে বলা হয় পাকিস্তানের গোল্ডেন ক্রিসেণ্ট—এই দুটো অঞ্চলেই বাম্পিং ক্রপ অর্থাৎ আফিম উৎপন্ন হয়। বেশিদিন আগের কথাও নয় এই ৬ এপ্রিল ৮৭ তারিখের খবরেও আছে ব্রহ্মদেশের দিকের স্বর্ণত্রিভূজ অঞ্চলের মাটিতে ৮০০ থেকে ১০০০ টন আফিম উৎপন্ন হয়েছে। আর এই বিশেষজ্ঞদের মতে এই পরিমাণ আফিম থেকে প্রায় ১০০ টন মত হেরোইন তৈরি হতে পারে।*

পাকিস্তানের দিকেই অর্থাৎ পশ্চিমপ্রান্তের স্বর্ণত্রিভূজ অর্থাৎ ইরান ও আফগানিস্থানে ঠিক কতটা করে আফিম হয় তার কোন পরিমান জানা যায় না। শুধু জানা যায় পাকিস্তানের সীমান্ত থেকে রাত্রির ঘন অন্ধকারের আড়ালে দীর্ঘ মরুভূমি পেরিয়ে নিঃশব্দে আসে 'ক্যারাভান'—অর্থাৎ পণ্যসম্ভার পিঠে নিয়ে আসে উটের সারি। না—উটের গলার ঘণ্টাও ডিং-ডং-ডিং ডং—আওয়াজ তোলে না। ঘণ্টা খুলে রাখা হয়। তা নাহলে যে উটের দুলে দুলে চলার তালে তালে শব্দ বাজবে—ডিং ডং। আর সেই দূরাগত আওয়াজ যে ধু ধু মরুভূমির শাঁ শাঁ বাতাসে ভেসে ভেসে চলে যায় একেবারে দূরে দিগন্তরেখার দিকে। যদি একবার সেই শব্দ কাস্টমস পুলিশের কানে আসে, তাহলে আর রক্ষা নেই। নেকড়ের মত থাবা বাড়িয়ে ঝাঁপিয়ে পড়বে ক্যারাভানের ওপরে। আর ইস্পাহানী রেশমের কাপড়ের গাঁটরির ভেতর থেকে টেনে বের করে ফেলবে—

চোরাই আফিম বা হেরোইনের প্যাকেট।

খুব সতর্ক হয়ে তাদের সীমান্ত পেরতে হয়। যেই বর্ডার পেরিয়ে যায় অমনি তাদের দায়িত্ব শেষ। ভারতীয় এলাকায় দাঁড়িয়ে থাকে স্মাগলারের এজেণ্ট। তাকে মালপত্র বুঝিয়ে দিয়ে উটের মুখ ঘুরিয়ে ফিরে যায় দেশে। তারপরেই দেখা যায় রাতের অন্ধকারে হাইওয়ে কাঁপিয়ে হেভিলোডেড এক একটা ট্রাক চলেছে রাজস্থানের জয়শালমীর পেরিয়ে লক্ষ্ণৌ কি দিল্লীর দিকে। বড় বড় শহরে স্মাগলারদের সিক্রেট ডেনে ট্রাক থামে এক এক কিলোর হেরোইনের এবং আফিম-এর শয়ে শয়ে প্যাকেট চড়া দামে বিক্রি হয়ে যায় ড্রাগের কারবারিদের কাছে। কিন্তু—

মনে রাখতে হবে পাকিস্তানের দিক থেকে যে চোরাই ড্রাগ আসে তার প্রায় দ্বিগুণ

---

* ৬ এপ্রিল '৮৭ তারিখের স্টেটসম্যানের "ASIAN DRUG TRAFFICKERS USING NEW ROUTES" শিরোনামে প্রকাশিত একটি খবরে উল্লিখিত হয়েছে এই পরিসংখ্যাটি।

আসে ব্রহ্মদেশের গোল্ডেন ক্রিসেণ্ট এলাকা থেকে। সেই হেরোইনের কোয়ালিটি পশ্চিমের আফগানিস্থান কি ইরানের হেরোইনের চেয়ে ঢের ভাল এবং ড্রাগ স্পেশালিস্টরা বলে থাকে সারা পৃথিবীতেই না কি সেরা স্বর্ণত্রিভূজ ভুখণ্ডের সেই লায়ন ব্রাণ্ড হেরোইন। আমেরিকাতে তার দারুণ চাহিদা। আর অবিশ্বাস্য বেশি দামে বিক্রি হয়। নিউইয়র্কে কি বোস্টনে মার্কিন দেশের বিভিন্ন বড় বড় শহরে— এক কেজি লায়ন ব্রাণ্ড হেরোইন এক মিলিয়ন ডলারে বিক্রি হয়।

শুধু আমেরিকা কেন, ভারতেই কি হেরোইনের দাম কম—ভারত ব্রহ্মদেশের সীমান্তে মনিপুরের মোরেহ হল ড্রাগ স্মাগলারদের প্রধান ঘাঁটি—সেখানকার গোপন ল্যাবরেটারিতে তৈরি হয় বা ম্যানুফ্যাকচার হয় ডবল লায়ন ব্রাণ্ড হেরোইন। এক কেজিতে খরচ পড়ে এক লক্ষ পঞ্চাশ হাজার, দিল্লীতে তার দাম হয় পাঁচ লক্ষ টাকা।

আর শুধু হেরোইন কেন আফিম, কোকেন, এল এস ডি প্রত্যেকটি ড্রাগেরই অবিশ্বাস্য দাম—মায়স্মাতে (ভারত ব্রহ্মদেশের সীমান্ত) এক কিলো আফিম তৈরি করতে খরচ মাত্র ১৭০ ডলার। সেই আফিম থেকে হেরোইন তৈরি হয় আমেরিকায়, বিক্রি হয় দুই মিলিয়ন ডলারে। কোকেন আর মারিজুয়ানাতেই কি লাভ কম।

ড্রাগ স্মাগলারদের লক্ষ্য হল আমেরিকা। বছর দুয়েক আগেও ব্রহ্মদেশ, লাওস, থাইল্যাণ্ডের সেই স্বর্ণত্রিভুজ এলাকা থেকে হেরোইন স্মাগলিং হয়ে স্ট্রেট চলে যেত আমেরিকায় কিম্বা চীনের দক্ষিণ অঞ্চলের রাজ্য ইউনানে, সেখান থেকে হংকং কি ক্যাণ্টনে। আর তারপরেই সমুদ্র পথে বেআইনী আফিং বা হেরোইন পাড়ি দেয় অস্ট্রেলিয়ায়, আমেরিকায় এবং পশ্চিম ইউরোপের বিভিন্ন দেশে। কিন্তু ইদানীং আমেরিকা ড্রাগ স্মাগলিং-এ দারুণ কড়াকড়ি করেছে। গোল্ডেন ট্রাঙ্গেলের ডবল লায়ন ব্রাণ্ড হেরোইন পেলেই বাজেয়াপ্ত করে ফেলে আর দিচ্ছেই না।

অতএব—

স্মাগলাররা রাস্তা পাল্টে ফেলছে। তাদের পণ্যসম্ভার (ড্রাগ প্রধানতঃ হেরোইন, মার্ফিয়া ইত্যাদি) এখন তারা কলকাতা বোম্বাই বন্দর দিয়ে পাঠাচ্ছে আমেরিকায় এবং ইউরোপের পশ্চিমের দেশগুলোতে। আর আফ্রিকা এবং শ্রীলঙ্কার বাসিন্দাদের নিয়োগ করছে স্মাগলিং-এর কাজে—এই পর্যন্ত বলে থেমে গিয়েছিল নাভারকর। আবার মাথা নিচু করে আস্তে আস্তে বলেছিল, আর শুধু সিলোন কি আফ্রিকার লোক এই ওভারসিজ স্মাগলিং-এ কেরিয়ারের কাজ করছে—একটু আবার অস্ফুটস্বরে বলেছিল, অভাবের সংসার—নুন আনতে তেল ফুরোয়। আর চোরাকারবারিরা প্রচুর টাকা পারিশ্রমিক দেয়। তাই টাকার লোভে লোভে সব স্মাগলিং-এ লেগে পড়েছে আবার একটা দীর্ঘশ্বাস ছেড়ে আস্তে আস্তে বলেছিল সেই পাপচক্র থেকে কিছুতেই ওদের ফেরাতে পারছি না—

সন্ধ্যার অন্ধকার ঘন হয়ে নেমে এল আরাম্বলে।

ফিকে অন্ধকারে আচ্ছন্ন বালুচরের ওপরে পায়ের দাগ কেটে এক একটা ছায়ামূর্তির মত লোক আসতে লাগল নাভারকরের বাড়িতে।

সেই লম্বা চিলতি ঘরটায় টিউব লাইট জ্বলে উঠল। গন্ধ ধূপের ধোঁয়ায় ভারি হয়ে উঠল বাতাস। আজ নাভারকরের বাড়িতে কোন পুজো পার্বন আছে না কি! কৌতূহলী হয়ে ভেতরে উঁকি দিতেই মনে হল পবিত্র কোন মন্দিরের ভেতরে এসে পড়েছি। চার দেওয়ালে চারটি পোস্টারে লাল কালিতে বড় বড় অক্ষরে লেখা—

মনে রেখ—হেরোইনের নেশা এমন সর্বনাশা যেখানে তুমি তোমার চরিত্র আত্ম-সংযম খুইয়ে বসে আছ।

মনে রেখ ড্রাগের ভেতরে তুমি তোমার সন্তানসন্ততির ভবিষ্যৎ এবং সুখশান্তি বিসর্জন দিয়েছ।

শোন—জীবনকে ভালবাস—নেশার শিকার হয়ো না—

মনে পড়ে গেল বেনারসের সেই মহিলা মনস্তত্ত্ববিদ ডাক্তার গীতা রায়ের রি-অ্যাডিক্ট সেন্টারেও এই ধরনের পোস্টার দেখেছিলাম। নাভারকর তাহলে মাদকসেবী অধ্যুষিত এই আরাম্বল বীচে নেশাগ্রস্তদের সুস্থ স্বাভাবিক জীবনের আলোয় ফিরিয়ে দেওয়ার চেষ্টা করছে। কিন্তু—

ঘরের একপ্রান্তে দেওয়াল ঘেসে একটা লম্বা টেবিলের ওপরে বসানো চৌকোণা বড় কাঠের ফ্রেমের ভেতরে সাদা ধবধবে কাপড়ের পর্দা টাঙ্গানো কেন?

নাভারকর দরজায় দাঁড়িয়ে আছে হাতজোড় করে।

যে আসছে তাকেই হাসিমুখে আপ্যায়ন করে বলছে—আসুন—আসুন কী খুশিই যে হয়েছি—

ব্যাপারটা কি—নাভারকরের জন্মদিন নাকি। না কারো হাতে তো কোন উপহার সামগ্রী দেখছি না। আমার মনে হল আমি যেন একটা অন্ধকার গোলক ধাঁধায় পড়ে ছটফট করছি।

হঠাৎ নজরে পড়ল, ঘরের এককোণে বসে রয়েছে সেই মেয়েটি—রুথ। শোকম্লানা বিষাদের মূর্তি। তার কোলে দুই বছরের শিশুপুত্র। দেখতে দেখতে সেই চিলতি ঘর লোকে ভর্তি হয়ে গেল।

ডিয়ার কমরেডস। প্রথমেই বলি ড্রাগ খেলে সাময়িক উত্তেজনা এবং নেশার মাদকতা আসে ঠিক। কিন্তু আমাদের দুঃখ বেদনাকে কখনো ভুলিয়ে দিতে পারে না। বরং আমাদের উল্টে সর্বনাশের অতলে নিয়ে যায়। এই যেমন ধরুন এই মেয়েটি রুথ—

রুথের চোখে সংকোচের ছায়া পড়ল। সে মাথা নিচু করল।

রুথ কেরালার মেয়ে, বলতে লাগল বক্তৃতার কায়দায়, ত্রিবেন্দ্রাম থেকে ভাসতে ভাসতে এসেছিল। কোলে শিশু। ওর প্রথম যৌবনের ভুল ভালবাসার ফসল। বলল আমাকে বলিষ্ঠকণ্ঠে—আমি আনম্যারেড মাদার—আমার বা মার পরিচয়েই আমার সন্তান বড় হবে। হতেই হবে, বলতে বলতে ওর চোখদুটো জ্বলে উঠেছিল।

রুথের মনের জোর আমার খুব ভাল লেগেছিল। প্রতিশ্রুতি দিয়েছিলাম তাকে সাহায্য করব—যখন যা প্রয়োজন হবে। কিন্তু কয়েকদিন পরেই দেখলাম একটা কালো কুচকুচে মালগাট্টা চেহারার ছোকরা রুথের বাড়ির আশপাশে ঘুরঘুর করছে—

আমার বয়ফ্রেণ্ড, হাসি হাসি মুখে আমাকে বলেছিল রুথ। আশ্চর্য একটা পরিতৃপ্তিতে তার মুখখানা উজ্জ্বল হয়ে উঠেছিল। কেমন স্বপ্নাচ্ছন্ন চোখে দূরে সাগরের দিকে তাকিয়ে অস্ফুটস্বরে বলেছিল, জানেন গোবি আমাকে নাকি বিয়েও করবে প্রমিস করেছে—

বাঃ বাঃ তাই নাকি। আমি সত্যিই খুশি হয়েছিলাম। সচরাচর ছেলেদের এই উদারতা দেখা যায় না—মোটের ওপরে রুথ সম্বন্ধে একেবারে নিশ্চিন্ত ছিলাম—

শ্রোতারা মুগ্ধ আর বিস্মিত জনতার একটা সমবেত ছবির মত বসে রয়েছে।

কয়েকদিন পর লক্ষ্য করলাম রুথের মুখখানা শুকনো। চোখের নিচে কালো দাগে অনিদ্রার চিহ্ন আঁকা।

অনেক খুঁচিয়ে জানতে পারলাম, প্রেমদাস গোবিন্দ—এর বয়ফ্রেণ্ড স্বামী-স্ত্রীর মত বাস করছে। কিন্তু কিছুতেই এর সিঁথিতে সিন্দুর চড়াতে চাইছে না। শুধু তাই নয়—পরে খোঁজখবর নিয়ে জেনেছি ছোকরার স্বভাব চরিত্র ভাল নয়—ওভারসিজ স্মাগলিং-এর ক্যারিয়ার—

দর্শকরা স্থিরচোখে রুথের যন্ত্রণায় দুঃখে কালিমাড়া মুখের দিকে তাকিয়ে রইল। তার ওপরে আবার গোদের ওপর বিষ ফোঁড়ার মত রুথ হ্যাসিস খেতে শুরু করেছে। জেলেদের বস্তির ভেতরে থাকে—সেখানে সন্ধেবেলা সাগরে মাছ ধরতে যাওয়ার আগে প্রত্যেকে গাঁজা টানে। ওর পাড়ার লোকেরাই ওর সর্বনাশ করেছে। রুথকে ড্রাগ ধরিয়েছে—এই পর্যন্ত বলে থামল নাভারকর। আবার একটা দীর্ঘশ্বাস ফেলে আস্তে আস্তে বলল আমি না পারছি প্রেমদাসকে দুষ্টচক্র থেকে ফেরাতে, না পারছি রুথকে মারিজুয়ানা ছাড়াতে—

গাঢ় নিস্তব্ধতা নেমে এল ঘরে। শ্রোতাদের গুঞ্জন থেমে গেল। নিভে গেল ঘরের সবগুলো আলো। ঘন অন্ধকারে নাভাকরের উদ্দীপ্ত কণ্ঠস্বর গমগম করে বেজে উঠল—এবার ম্যাজিকল্যাণ্টার্ণে যে কয়জন নেশাগ্রস্তকে ড্রাগের কবল থেকে মুক্ত করে সুস্থ স্বাভাবিক জীবনে ফিরিয়ে দেওয়া হয়েছে তাদের দেখানো হবে এবং তাদেব হেরোইনের বা এল এস ডির শিকার হওয়ার কারণ এবং কেমন করে সেই বিধ্বংসী নেশা ছাড়ানো হল তার স্টেপিংগুলো দেখানো হবে—

সাদা পর্দায় এক মিশমিশে কালো চিমড়ে চেহারার যুবকের ছবি ফুটে উঠল।

টনি।

তামিল ক্রিশ্চিয়ান। আরাম্বল বীচে হিপিসঙ্গীদের দলে ভিড়ে ড্রাগ খেয়ে বালুচরে বেহুঁস হয়ে পড়ে থাকত। প্রথমে হ্যাস দিয়ে শুরু করেছিল—তারপরে আফিম, হেরোইন, এল এস ডি যা পেত তাই খেত—থেমে গেল নাভারকর।

স্ক্রীনের ছবিতে ফুটে উঠল।

বিভৎস আর বড় করুণ সেই দৃশ্য। টনি বালুচরে পড়ে আছে। মুখের দু'পাশ দিয়ে সাদা গ্যাঁজলা গড়িয়ে পড়ছে। তিনচারটে কুকুর তার চারিদিকে ঘুরে ঘুরে তাকে শুঁকে শুঁকে দেখছে—মরে গেছে কি না—

ড্রাগ—মনুষ্যত্বের কী শোচনীয় পরিণতি দেখুন—নাভারকর আবার বলতে শুরু

করল অথচ টনি কিন্তু এক বর্ধিষ্ণু স্বচ্ছল পরিবারের ছেলে। এর যখন মাত্র ছয় বছর বয়স তখন টনির বাবা হার্ট অ্যাটাকে মারা গেল। টনির মা ছিলেন বরাবরই ছেলের সম্বন্ধে উদাসীন। বাবা মারা যাওয়ার পর তিনি আর ছেলের দিকে ভ্রূক্ষেপও করতেন না। ছেলে পড়ছে কিনা, স্কুলে যাচ্ছে কিনা কোন কিছুই খোঁজ খবর করতেন না।

টনি রাস্তায় রাস্তায় ঘুরে বেড়াতে লাগল। পাড়ার ছেলেবুড়োরা ছিল সব ড্রাগ অ্যাডিক্ট। তাদের পাল্লায় পড়ে ড্রাগ খেতে শিখল। ড্রাগের পয়সা পাবে কোথায়? চুরি করতে গিয়ে ধরা পড়ল। চুরি করে ড্রাগ কিনতে গিয়ে জেল খেটেছিল আটবার। জেল থেকে বেরিয়ে পাকা ক্রিমিনাল হয়ে গেল।

পর্দায় ছবি ভেসে উঠল—জেলে লোহার গারদ ধরে দাঁড়িয়ে আছে—টনি। একদিন সি-বীচ থেকে টনিকে ধরে নিয়ে এলাম আমার এই রি-অ্যাডিক্ট সেন্টারে। বন্ধ করে দিলাম ড্রাগ। কয়েকঘণ্টা পরেই প্রচণ্ড রি-অ্যাকশান শুরু হল। হড়হড় করে বমি করতে শুরু করল টনি—নাভারকরের কথাগুলোকে ফলো করে করে তার সহকারি ম্যাজিকল্যাণ্টার্ণে স্লাইড পাল্টে যেতে লাগল। এক একটা স্লাইডে পরিস্ফুট হয়ে উঠতে লাগল ড্রাগ ছাড়ানোর বিভিন্ন প্রক্রিয়ার চিত্ররূপ—

কোনটায় টনি বমি করছে। আবার কোনটায় অসহ্য যন্ত্রণায় তার সারা শরীর দুমড়ে দুমড়ে উঠছে। তাকে ঘুমের ওষুধ খাওয়ানো হচ্ছে—

স্লিপিং পিল খাওয়ানোর প্রায় সঙ্গে সঙ্গে তন্দ্রাচ্ছন্ন হয়ে গেল টনি। তখন তার কানের কাছে সুর করে করে মৃদু স্নিগ্ধকণ্ঠে বলতে শুরু করলাম—শোন টনি জেনে রেখ ড্রাগ কখনো তোমার দুঃখকষ্ট লাঘব করতে পারবে না—আ—আ—আ বলতে বলতে তার সারা শরীরে হাত বুলিয়ে দিতে থাকলাম—উল্টে তোমার দুঃখ—তোমা—র—যন্ত্রণা আরও অনেক অনেক বাড়িয়ে দেবে—এ—এ—

গভীর ঘুমে তলিয়ে গেল টনি।

শোন টনি পরমকরুণাময় ঈশ্বরে বিশ্বাস রাখ—ও—জেনে রাখবে রাতের অন্ধকারের পরেই ভোর হয়। কারো জীবনে একটানা দুঃখকষ্ট থাকে না—জেনে রাখবে পরমমঙ্গলময় সংসারে আমাদের জন্য পরম মমতায় সুখ ও শান্তি রচনা করে রেখেছেন, থেমে গেল নাভারকর।

স্ক্রীনের আলোও নিভে গেল।

ঘরের আলোগুলো জ্বালিয়ে দেওয়া হল। এবার টনিকে প্রোজেক্টারের পাশে মঞ্চে নিয়ে আসা হল। দর্শকদের উৎসুক চোখের দৃষ্টি সূঁচের মত বিঁধতে লাগল তাকে।

'ওকে আমি আমার এই রি-অ্যাডিক্ট সেন্টারে নিয়ে এসেছিলাম চারমাস আগে—নাভারকর উদ্দীপ্ত হয়ে বলতে লাগল, এখন টনি সম্পূর্ণ সুস্থ--ড্রাগ—হ্যাসিস—হেরোইন কোন কিছু স্পর্শ পর্যন্ত করে না—

হাততালির ঝড়ে কেঁপে উঠল ঘর।

নাভারকর হাত তুলে থামতে ইঙ্গিত করল। ভার ভার গলায় বলল, বোধহয়

আপনারা জানেন টনি এখন আরাম্বল বাঁচে গ্রসারিশপ করেছে, থেমে গেল সে। আবার যেন নিজের ভেতরে ডুব দিয়ে কেমন বেদনা বিদ্‌রকণ্ঠে বলল, কিন্তু এখনো পারিনি—পারিনি ফেরাতে অন্ধকার নরক থেকে আরও অনেককে—হঠাৎ থেমে গেল সে। গলা চড়িয়ে হাঁকল—রামদাস তেণ্ডুলকর—

কেউ সাড়া দিল না।

সে কী তেণ্ডুলকর আসেনি? এত করে বলে এলাম, বিক্ষুব্ধ হয়ে ওঠে নাভারকর।

এই যে গুরুদেব—এখানে বসে গাঁজা টানছে—কে যেন বলে উঠল।

কি! হ্যাস খাচ্ছে এইখানে বসে? প্রচণ্ড আক্রোশে জ্বলে উঠল নাভারকর। ঝড়ের গতিতে ছুটে যেয়ে ঘরের অন্ধকার একটা কোণ থেকে টেনে হিঁচড়ে নিয়ে এল ফরসা টকটকে গাট্টাগোট্টা চেহারার যুবককে—

রামদাস তেণ্ডুলকর।

দেখুন—গাঁজা টেনে থর থর করে কাঁপছে, আক্ষেপ করে বলল নাভারকর কিন্তু গত তিন মাস ধরে সমানে কত বোঝাচ্ছি চেষ্টা করে যাচ্ছি—এখনও ড্রাগ ছাড়তে পারেনি —একটু থামল নাভারকর। আবার থেমে থেমে প্রত্যেকটা কথা কেটে কেটে উচ্চারণ করে বলল, বলতে বাধা নেই রামদাস তার বাবা মার মনোমালিন্য থেকে শুরু করে প্রচণ্ড দাম্পত্য কলহের শিকার। ওর বাবা ডিভোর্স করে চলে গেল। মা ছয়মাসও ধৈর্য রাখতে পারলেন না—থেমে গেল সে। রাগে বিরক্তিতে মুখখানা বিকৃত হয়ে উঠল। অন্তরের জ্বালা মিশিয়ে মিশিয়ে অস্পষ্টস্বরে বলল বিয়ের আগে যার সঙ্গে ভাবভালবাসা ছিল তাকেই বিয়ে করে বসল মা—রামদাস বাড়ি থেকে পালিয়ে গেল। মা দু-একবার খোঁজ করে হাল ছেড়ে দিয়ে নিজের নতুন সংসার নিয়ে মত্ত হয়ে রইল— কিছুক্ষণ কি ভেবে গম্ভীর কণ্ঠে আবার বলল নাভারকর মনে পড়ে শিশু বিশেষজ্ঞ ইংরেজ ডক্টর রস কাম্বেলের সেই কথাটি সন্তানকে মানুষের মত করে মানুষ করতে হলে স্বামী-স্ত্রীর সম্পর্ক মধুর হতে হবে—গৃহের পরিবেশ শুচি স্নিগ্ধ শান্ত ও মনোরম হওয়া দরকার—একটু থেমে আবার হাতে কর গুণে গুণে কিসের একটা অংক কষে বলল, আমার তো মনে হয় ড্রাগ অ্যাডিক্টদের ভেতরে শতকার ৯০ জনই পারিবারিক অশান্তির ফসল—

খট্ খট্ খট্—হঠাৎ ভারি বুট জুতো পরা জোড়া জোড়া পায়ের শব্দ বেজে উঠল বাইরে। নাভারকরের কপালটা কুঁচকে উঠল। তার সহকারী ছুটে তার কানে কানে বলল কতগুলো কথা।

সে কী! কখন?

আজই বিকেলে মাদ্রাজ পোর্ট থেকে মাল চালান দেবে বলে হেরোইন নিয়ে যাচ্ছিল।

ইস কত করে নিষেধ করেছি—

নাভারকর তার কথা শেষ করতে পারল না। তার আগেই অ্যাসিস্টাণ্ট ছোকরাটি বলল, কিন্তু—কিন্তু স্যার—আমাদের কি হবে—

কেন আমরা কার পাকা ধানে মই দিয়েছি—

স্যার পুলিশরা বলছে আমাদের এখানে নাকি স্মাগলারদের কিছু লোক ঢুকে পড়েছে—

বলতে বলতেই মার মার করে আরাম্বল বীচের চীফ কপ বিরাট এক বাহিনী নিয়ে ঢুকে পড়ল। কোন কথা না বলেই দেওয়ালে টাঙ্গানো অ্যান্টিড্রাগের পোস্টারগুলো টেনে ফর ফর করে ছিঁড়ে ফেলে হুংকার দিয়ে উঠল আরাম্বলের ওসি—এখানে এসব কি হচ্ছে শুনি? একটু থেমে ম্যাজিক ল্যাণ্টানের পর্দার দিকে তাকিয়ে গোঁফে তা দিয়ে চোখদুটো নাচিয়ে বলল—ও! ব্লু—ফিল্ম! ভিডিও—

না স্যার—রি-অ্যাডিক্টদের—

তার কথা শুনল না অফিসার। নিরুদ্ধ আক্রোশে চেঁচিয়ে বলল আপনি এখানে এত লোক জড়ো করেছেন কেন—কি করছেন?

এটা রি-অ্যাডিক্ট সেণ্টার স্যার, জোরালো গলায় বলল নাভারকর আমি এদের ড্রাগের নেশা ছাড়ানোর চেষ্টা করছি। যাতে এরা সুস্থ স্বাভাবিক জীবন—

ও তাই নাকি? খুব যে বড় বড় কথা বলছেন মুখটাকে ভেংচে কোমর দুলিয়ে দুলিয়ে বলল চীফ কপ আমাদের খবর হচ্ছে এরা প্রত্যেকে শুধু ড্রাগ অ্যাডিক্ট নয়—প্রত্যেকটি লোক ড্রাগ স্মাগলার—ওভারসিজ ইণ্টারন্যাশনাল ড্রাগ স্মাগলার—

অসম্ভব স্যার, দপ করে জ্বলে উঠল নাভারকরের চোখদুটো এরা একসময় ড্রাগ খেত। ওরা এখন ওসব ছাইভস্ম খায় না—ভাল হয়ে থাকতে চায়—ভাল হতে চায়—

সমস্ত মিথ্যে কথা, হঠাৎ যেন তেলে বেগুনে জ্বলে উঠল ওসি। হেঁকে তার কনস্টেবলদের বলল লাগাও তল্লাসী—প্রত্যেকের বডি সার্চ করবে—

ভয়ে উত্তেজনায় কালো হয়ে গেল সমবেত শ্রোতাদের মুখ।

ভিড়ের ভেতর দিয়ে মাথা নিচু করে পালাতে চেষ্টা করল রামদাস তেন্ডুলকর—

এই ও পাকড়ো—চেঁচিয়ে উঠল অফিসার—বাড়ির মেনগেট বন্ধ করে দাও—ছেবে কেউ যেন পালাতে না পারে—

ওদিকে চলতে লাগল বডি সার্চ। প্রত্যেকের জামাপ্যাণ্টের পকেট তন্নতন্ন করে দেখতে লাগল পুলিশ তেন্ডুলকরের জাঙ্গিয়ার ভেতরের পকেট থেকে পাওয়া গেল প্রায় পাঁচ তোলা হ্যাস!

কি হে যুধিষ্ঠির দেখলে তো, পুলিশ অফিসার নাভারকরের মুখের সামনে আঙুল নাচিয়ে বলল, তুমি এদের সৎপথে ফেরাচ্ছ—

না—আমি কিছুতেই প্যাণ্ট খুলব না ফুলপ্যাণ্টের পায়ের যেখানে পকেট থাকে দুহাত দিয়ে শক্ত করে চেপে ধরে চিৎকার করে বলল টনি, আমি বহুদিন ড্রাগ স্পর্শ করি না।

কার কথা কে শোনে তবুও পাঁচজন মিলে তাকে শক্ত করে চেপে তার ফুলপ্যাণ্ট খোলা হল। না—সত্যিই পকেটে কিছু নেই। কিন্তু অফিসার হাল ছাড়ল না। দাঁতে দাঁত চেপে ধরে বলল খবর আছে—পাকা স্মাগলার লোকটা—খোল এর জুতো।

না—না আমার জুতোর ভেতরে কিছু নেই—পাগলের মত চিৎকার করে উঠল টনি।

ভারি বুট জুতো খুলতেই তার সুখতলির নিচ থেকে বেরিয়ে এল পলিথিনের সরু প্যাকেট। তার ভেতরে সযত্নে রাখা হয়েছে থাইলাণ্ডের ভুবন বিখ্যাত লায়ন ব্রাণ্ড হেরোইন। বেশ ভাল পরিমান—

বাইরে ফিকে অন্ধকারে আচ্ছন্ন নিঃসীম বালুচরে সাগরের শাঁ শাঁ বাতাসে সর্বনাশের করতাল বাজাতে লাগল। রাতের অন্ধকার যেন চেপে নেমে এল নাভারকরের মুখে। তার মনে হল সমস্ত পৃথিবীটা যেন দুলছে। আর মাদকসেবীদের সুস্থ জীবনে ফিরিয়ে দেওয়ার সেই দুর্বার স্বপ্ন…রাতের অন্ধকারের পরেই ভোর হয় …পরম করুণাময় ঈশ্বর আমাদের জন্য সুখ ও শান্তির সংসার রচনা করে রেখেছেন ইত্যাদি পোস্টারের সেই বাণীগুলো সব সব যেন দিকচিহ্নহীন অন্ধকারের স্রোতে বিলীন হয়ে যাচ্ছে—

ইউ আর আণ্ডার অ্যারেস্ট, নাভারকরকে বলল আরাম্বলের ও সি, আপনার এখানে এটা রি-অ্যাডিক্ট সেণ্টার নয়—স্মাগলারস ডেন—আপনি রিং লীডার—আপনি এদের পেট্রোন করেন, করছেন একটু থেমে সফল শিকারীর মত জ্বলজ্বলে চোখে তাকিয়ে বলল—প্রেমদাস গোবি—আপনারই লোক না? জানেন মাদ্রাজ পোর্টে ধরা পড়েছে প্রেমদাস—৫০০ কেজি কনট্রাব্রাণ্ড হেরোইন ছিল তার কাছে—

ডুবরে কেঁদে উঠল রুথ।

ছেলেকে বুকের ভেতরে শক্ত করে চেপে ধরল।

ডুবন্ত মানুষের মত আমার দিকে অসহায় চোখে তাকাল নাভারকর।

নাভারকর যে বোম্বাইয়ের নার্কটিক ইনভেস্টিগেশান ব্যুরোর চীফ কুমারসাহেবের অত্যন্ত বিশ্বস্ত এবং স্নেহভাজন। একসময় নাভারকরও ছিল মাদকে আসক্ত। কুমারসাহেবই তাকে রিহ্যাবিলেট করেছেন। আর তিনি এই নাভারকরেরই ভরসায় আমাকে আরাম্বলে পাঠিয়েছেন—এসব কথা মনের ভেতরে টগবগ করে ফুটছিল। কিন্তু আমার কথা কি পুলিশ অফিসার বিশ্বাস করবে? আমি তো বিদেশী। তাই বলে আমার সামনে একটা নির্দোষ সৎ মানুষকে পুলিশ অন্যায়ভাবে ধরে নিয়ে যাবে। তীব্র একটা যন্ত্রণায় আমার বুকের ভেতরটা পুড়ে যেতে লাগল।

আবছায়া অন্ধকার সেই ঘরে ভিড়ের ভেতরে হঠাৎ নজরে পড়ে গেল, রুথ জলে ভরা দুটো বড় বড় চোখের করুণ দৃষ্টি মেলে ধরে আমার দিকেই তাকিয়ে রয়েছে। শুধু রুথ নয়। সেখানকার আরও অনেকেরই চোখের দৃষ্টি যেন নিঃশব্দে বলছে, তুমি তো মানী লোক—জেলে বস্তির মানুষগুলোর দুঃখ দুর্দিনের সাথী এই মানুষটাকে বাঁচাতে পার না?

বলব না, বলব না করেও বললাম অফিসারকে। কুমারসাহেবের পরিচয় দিলাম। তাঁর চিঠি তাকে দেখালাম। সব শুনে অফিসারের চোখের দৃষ্টি শান্ত হয়ে এল। সুর নরম করে বলল, আমি কি করতে পারি বলুন তো। দেখলেন তো আপনার চোখের সামনে দু-দুজনের কাছে চোরাই ড্রাগ পাওয়া গেল; একটু থেমে আবার আস্তে আস্তে বলল, কাদের নাভারকরসাহেব সৎপথে ফেরাতে চেষ্টা করছেন—এরা এক একটা বিচ্ছু। প্রত্যেকে সি-স্মাগলিং-এর যন্ত্র—হঠাৎ থেমে গেল চীফকপ।

একবার নাভারকর আর একবার ঘরের লোকগুলোর দিকে কেমন অদ্ভুত দৃষ্টিতে তাকিয়ে বলল বহুদর্শী পুলিশ অফিসার, কিছুদিন আগে নাভারকরের ঘরে কনট্রাব্রান্ড ড্রাগ পাওয়া গিয়েছিল, জানেন ?

মনে পড়ে গেল গভীর রাত্রে আনজুনা বীচে আমাদের ডেরায় এই খবর নিয়ে গিয়েছিল নাভারকরেরই কোন শুভাকাঙ্খী।

যাদের নাভারকর ভাল করার চেষ্টা করছে, তারাই ওকে বিশ্বাসঘাতকতা করছে যেন নিজের মনকেই শুনিয়ে শুনিয়ে অস্ফুটস্বরে বলল অফিসার—কত দেখেছি বুঝলেন—সংসারে ভাল করবে বললেই ভাল করা যায় না—

আকাশে একাদশীর একফালি চাঁদ জ্বলজ্বল করছে।

মরা শকুনের ঘোলা চোখের মত ম্লান আলো বুকে নিয়ে স্বপ্নে বিভোর হয়ে আছে আরাম্বলের ধু ধু বালুচর। পুলিশ ভ্যান ছিল দূরে, বালুচর ছাড়িয়ে যেখানে অনেকগুলো নারকেলগাছ প্রেতচ্ছায়ার মত জড়াজড়ি করে দাঁড়িয়ে আছে তার নিচে পাকা রাস্তার ওপরে। পুলিশ অফিসারের পিছনে মাথা উঁচু করে চলেছে নাভারকর। তারপরেই যেন মিছিল করে চলেছে আরাম্বলের জেলেবস্তির হাজারো মানুষ। চাঁদের আলোয় নাভারকরের ছায়াটা দীর্ঘ থেকে দীর্ঘতর হয়ে তার পাশে পাশে যেন পাল্লা দিয়ে চলেছে।

আমার হঠাৎ মনে হল নাভারকরের মাথাটা যেন উঁচু হতে হতে দূরের সেই নারকেলগাছগুলোকেও ছাড়িয়ে দিগবিস্তীর্ণ সেই বালুচরের পরিধিও পেরিয়ে দূরের তমসাস্তীর্ণ সমুদ্রের শেষে অন্ধকারে দিগন্তরেখায় বিলীন হয়ে গিয়েছে।

তের

কেন উঠতি বয়সের ছেলেমেয়েরা হেরোইন খায়। শতকরা ৯০ ভাগই দায়ী মা বাবা এবং বাড়ির অবাঞ্ছিত পরিবেশ।

আনজুনা আর আরাম্বলের বিচিত্র অভিজ্ঞতা নিয়ে গোয়ায় ফিরে এলাম।

কিন্তু সমস্ত ঘটনার ভেতরে মুক্তোর মত টলমল করছে নাভারকরের স্মৃতি। বেচারি মাদকসেবীদের সুস্থ স্বাভাবিক জীবনের আলোয় নিয়ে আসতে গিয়ে নিজেই অন্ধকারে হারিয়ে গেল।

ওয়েস্টার্ণ জোনের চীফ অফ নার্কটিক কণ্ট্রোল ব্যুরো কুমারসাহেব এবং অসীম ওরফে খোকনকে ধন্যবাদ জানিয়ে কলকাতার উদ্দেশে পাড়ি দিলাম।

সেই সমাজসেবী প্রতিষ্ঠান বা ওয়েল ফেয়ার সোসাইটির সেক্রেটারির কাছে যথারীতি দাখিল করলাম আরব সমুদ্র তীরের সেই বিচিত্র অ্যাডিক্ট বা নেশাগ্রস্তদের সম্বন্ধে আমার প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতার বিবরণ।

কয়েকদিন পরেই সোসাইটি থেকে আমার তলব এল। যেয়ে দেখি সোসাইটির অফিসঘরে বেশ ছোটখাটো একটা মিটিং বসে গেছে। প্রথমেই সেই ঘরোয়া সভায় সম্পাদক মশায় ঘোষণা করলেন একটা আনন্দ সংবাদ—আমরা আমাদের এই সমাজ-সেবা প্রতিষ্ঠানের তরফ থেকে খুব শীগগীরই একটি রি-অ্যাডিক্ট সেণ্টার বা মাদক-সেবীদের পুনর্বসতির জন্য একটি নার্সিংহোম প্রতিষ্ঠা করতে উদ্যোগী হয়েছি। আর সেই উপলক্ষ্যেই এই সভা—বলেই তিনি আমাব সঙ্গে উপস্থিত বিশিষ্ট ব্যক্তিদের পরিচয় করিয়ে দিলেন—

ক্যালকাটা রোটারি ক্লাবের সেক্রেটারি থেকে শুরু করে ড্রাগের সর্বনাশা প্রতি-ক্রিয়ার বিরুদ্ধে দু'হাতে লড়াই করতে প্রস্তুত শুভ মানবিক বোধ সম্পন্ন অনেক হোমরা চোমরা লোকও ছিলেন।

পরিচয়ের পালা শেষ হওয়ার পরই কিন্তু হঠাৎ বুকের ভেতরটা ধক করে উঠল। দেখলাম—আমারই 'রাইট আপ'—গোয়ার অ্যাডিক্টদের সম্বন্ধে আমার লেখার স্ক্রিপ্ট দেখছেন খুব মনযোগ দিয়ে খুব সুদর্শন সুপুরুষ চেহারার এক ভদ্রলোক—

আমাদের নার্সিংহোমে ইনিই অ্যাটাচড থাকবেন, চাপা গলায় ফিসফিস করে বললেন সোসাইটির সেক্রেটারি খুব নামজাদা মনোবিজ্ঞানী সাইক্রিয়াটিস্ট ডক্টর দেবাশীষ ভট্টাচার্য।

ডক্টর ভট্টাচার্য মগ্ন হয়ে গিয়েছেন আমার স্ক্রিপ্টের ভেতরে, পড়তে পড়তে কোন কোন সময় তার ভ্রুদুটো কুঁচকে উঠছে। অস্বস্তিতে চিন চিন করে জ্বলে যাচ্ছে আমার বুকের ভেতরটা।

কী মনে করছেন—কী ভাবছেন ; কী-ই বা জিজ্ঞাসা করবেন।

পড়া শেষ হল।

কেমন গম্ভীর জিজ্ঞাসু দৃষ্টিতে আমার দিকে তাকালেন। ঠিক আমি যে আশঙ্কা করছিলাম ঠিক তাই বললেন দেখুন ইতালির অধ্যাপক ম্যাসিমো, ইংলাণ্ডের এডওয়ার্ড থেকে শুরু করে মারাঠি যুবক যোসেফ দাতার, পাঞ্জাবী তরুণ দীনেশ যাজ্ঞি—সবাই দেখছি বেশ স্বচ্ছল ঘরের ছেলে, থেমে গেলেন ডক্টর ভট্টাচার্য। আবার ছাড়া ছাড়া গলায় বললেন, রীতিমত উচ্চশিক্ষিত কিন্তু—

ড্রাগ অ্যাডিক্ট আমি বিনীত ভাবে বললাম, আপনার কি ধারণা জানি না ডক্টর ভট্টাচার্য, আমি কলকাতায়, বেনারসে, বোম্বাইতে, গোয়ায় মাসের পর মাস ঘুরে ঘুরে যেখানে যত নেশাগ্রস্তদের দেখলাম তারা প্রত্যেকে অবস্থাপন্ন ঘরের ছেলেমেয়ে—

আপনি তাই বলছেন ? মাথাটা ঝাঁকিয়ে ঝাঁকিয়ে বললেন ডাক্তার, কিন্তু কেন—প্রাচুর্য, ঐশ্বর্য আর বৈভবের ভেতরে থাকলেই নেশা করতে হবে ?

আপনি আমার সঙ্গে একমত হবেন কিনা জানি না ডাক্তারবাবু অসঙ্কোচে বললাম। আপনি যদি অভয় দেন তাহলে আমার চিন্তাটা—

বলুন, বলুন, ফ্র্যাঙ্কলি বলুন। আপনারা লেখক মানুষ—কত তলিয়ে ভাবেন—ভাবতে পারেন ভাবতে হয়।

আমি যতগুলো অ্যাডিক্টের লাইফ হিস্ট্রি নিয়েছি তারা প্রত্যেকে অগাধ প্রাচুর্যের ভেতরে থাকতে থাকতেই বিকারগ্রস্ত হয়েছে—

কেমন করে ?

শতকরা ৯০ ভাগই দোষ মা বাবার। তারা দিনরাত নিজেদের স্ট্যাটাস, আরও বেশি রোজগার, আরও মানমর্যাদার চেষ্টায় অসম্ভব স্বার্থপর ও আত্মকেন্দ্রিক জীবন কাটায়। ছেলেমেয়েরা কি করছে, কোথায় যাচ্ছে—কি তাদের মতিগতি—

কারেক্ট—কারেক্ট। খুব খুশি হয়ে মাথা দোলাতে লাগলেন ডাক্তার ভট্টাচার্য—

এই আত্মসর্বস্বতা, এই লোভের পিছনে—আমি আরও গুছিয়ে বলতে চেষ্টা করলাম মানুষ উদ্দাম বেগে ছুটেছে। দু'হাতে টাকা রোজগার করছে। একটার জায়গায় দুটো গাড়ি কিনছে, রেডিও, টি ভি, ভি সি আর, স্টিরিও ঘরে ঘরে শোভা পাচ্ছে—কিন্তু দেখবেন মনে শান্তি নেই—

অ্যাবসলিউটলি রাইট। উত্তেজনায় খুশিতে ডাক্তার টেবিলে সশব্দে চাপড় দিলেন।

আমার পেশেন্টদেরও লাইফ স্টোরি—

আমার কথা শেষ হয়নি ডাক্তারবাবু এই যে একটা অস্থির উদ্দাম অস্বাভাবিক পরিবেশেই তো এযুগের ছেলেমেয়েরা বড় হচ্ছে। তারা দেখছে মা আর বাবা—দুজন যেন বহু—বহুদূরের দুটো দ্বীপ। দুজনেই নিজের নিজের জগতে কূপমণ্ডুক হয়ে বাস করছে—

আর বলতে হবে না, আমারও প্র্যাকটিক্যাল এক্সপিরিয়েন্স থেকে বলছি, ডাক্তার ভট্টাচার্য নিজের ভেতরে মগ্ন থেকেই বললেন, আমার প্রায় প্রত্যেক পেশেন্টের ক্ষেত্রেই

দেখেছি, পেরেণ্টস তাদের স্নেহ মমতা এমন কি সান্নিধ্যটুকু থেকে পর্যন্ত শুধু বঞ্চিতই করেনি তারা নির্মমভাবে উদাসীন—থেমে গেলেন তিনি। সামনেই গুছিয়ে রাখা একটা কভার ফাইল খুলে খবরের কাগজের একটা নিউজ কাটিং বের করলেন—

স্টেটসম্যানের স্টাফ রিপোর্টারের এই খবরটা পড়ুন। তাহলে কলকাতার উঠতি বয়সের অ্যাডিক্টদের অবস্থা বুঝতে পারবেন—

খবরটির হেডিং ছিল Young drug addicts Crowd Psychiatrists Clinic অর্থাৎ তরুণ বয়সের মাদকসেবীরা মানসিক রোগের চিকিৎসকদের চেম্বারে দলে দলে আসছে।

হুবহু বঙ্গানুবাদ নিচে দেওয়া হল।

দেখা যাচ্ছে, দিনের পর দিন উঠতি বয়সের নেশাগ্রস্ত ছেলেমেয়েরা অত্যন্ত বেশি সংখ্যায় কলকাতার সায়কিয়াটিস্টদের ক্লিনিকে ভিড় করছে তাদের মানসিক বিপর্যয় এবং স্নায়ুবিকলনের চিকিৎসার জন্য। সাধারণত এই হতভাগ্য মাদকসেবীদের মা-বাবা কিম্বা তাদের কোন প্রধান অভিভাবক তাদের পরিচয় গোপন করতে এবং লোকলজ্জার ভয়েই হাসপাতালের আউটডোরে না গিয়েমানসিক রোগের ডাক্তারদের চেম্বারে আসে। বলা বাহুল্য এরা প্রত্যেকেই উচ্চবিত্ত এবং স্বচ্ছল ঘরের। প্রাইভেট ট্রিটমেণ্টের বিপুল খরচ বহন করতে সক্ষম।

কলকাতার বিভিন্ন খ্যাতিমান সায়কিয়াটিস্ট এবং সমাজকর্মীদের মতে এই অ্যাডিক্ট-দের বয়স সীমা ১৮ থেকে ২২ এর ভেতরে। অতি অল্প সংখ্যক রোগীই আসে নিম্নমধ্যবিত্ত পরিবার থেকে। কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের অ্যাপ্লায়েড সাইকোলজি ডিপার্টমেণ্ট নেশায় আক্রান্ত রোগীদের শ্রেণী বিন্যাস করেছেন ধনী, উচ্চবিত্ত অপেক্ষাকৃত স্বচ্ছল মধ্যবিত্ত এবং মধ্যবিত্ত।

মনে হয় এই কলকাতা শহরে একটি—একটি মাত্র প্রতিষ্ঠানই আছে এই মানসিক রোগের বিনামূল্যে চিকিৎসার জন্য। মৌলালির কাছে সুরেন্দ্রনাথ ব্যানার্জী রোডের ওপরে এই প্রতিষ্ঠানটি পরিচালনা করেন পশ্চিমবঙ্গের সাংস্কৃতিক এবং সমাজসেবা সংস্থা (West Bengal Caltural and Social Welfare Organisation) প্রত্যেক সপ্তাহের শনিবার সন্ধ্যায় এত বেশি ভিড় হয় যে তা সামলাতে সংস্থার কর্তৃপক্ষকে রীতিমত বেগ পেতে হয়।

এই সংস্থার সাধারণ সম্পাদক শ্রীঅলক দাসগুপ্ত জানিয়েছেন প্রতি মাসে একশোর বেশি রোগী এখানে আসে। তার ভেতরে শতকরা ৮৫ ভাগই হল টিন এজার অর্থাৎ ১৩ থেকে ১৯ এর ভেতরে এবং তরুণ তরুণীরা। কিন্তু কয়েক বছর আগে এর অর্ধেকেরও কম রোগী আসত। যত দিন যাচ্ছে তত বেশি বাড়ছে ড্রাগের শিকার—মানসিক বিপর্যয়ে এই অসুস্থদের সংখ্যা।

মানকুণ্ডুর মেণ্টাল হসপিটালের সঙ্গে অ্যাটাচড শহরের এক বিশিষ্ট ও অগ্রগণ্য সায়কিয়াটিস্ট ডক্টর বিমল দে বলেন সত্তরের দশকের মাঝামাঝি থেকেই ড্রাগের নেশায় সেই যে ভয়াবহ পরিস্থিতি শুরু হয়েছিল তা এখন আরো বেড়ে গিয়ে রীতিমত ভীতিজনক (অ্যালার্মিং) হয়ে উঠেছে।

তিনি মনে করেন এখুনি যদি বাবা-মা এবং অভিভাবক ও গভর্ণমেণ্ট এই বিধ্বংসী নেশার প্রতিকারের চেষ্টা না করেন তাহলে দেশ এবং সমাজকে এই সর্বনাশা অবক্ষয় থেকে রক্ষা করার কোন উপায় নেই।

বলা দরকার উঠতি বয়সের ছেলেমেয়েরা নেশাগ্রস্ত হয় প্রধানত ঘুমের ওষুধ (Sleeping tablets) এল এস ডি ইত্যাদি সাইকেলিডিক ড্রাগ এবং হেরোইন মার্ফিন এবং হ্যাস বা গাঁজা অর্থাৎ নার্কটিকস খেয়ে। ইদানিংকালে খোলা বাজারে এইসব ড্রাগ অনায়াসে প্রচুর পরিমানে পাওয়া যায় বলেই নেশার প্রকোপ অত্যন্ত বেড়ে গিয়েছে। আর তাছাড়া এক শ্রেণীর অসাধু ব্যবসায়ী এবং পেডলার বা ড্রাগ বিক্রেতা প্রেসক্রিপশান ছাড়াই বেশ লাভ রেখে এসব ড্রাগ বিক্রি করে। খদ্দের তো মাছির মত ভনভন করে। তারা ব্রাউন সুগারের একটা ফিক্সের জন্য নেশার ঝোঁকে যে কোন মূল্য দিতে প্রস্তুত থাকে·····

আরো অনেক কথাই আছে। সেসব এখন এখানে অবান্তর। বললাম, কলকাতার ড্রাগ অ্যাডিক্টদের চিত্রটা খুব সুন্দর দিয়েছে।

ডক্টর বিমল দে আমার সহকর্মী, বললেন ভট্টাচার্য মিঃ অলোক দাসগুপ্তের সঙ্গেও আমার যথেষ্ট হৃদ্যতা আছে। ওঁরা ফিল্ডে আছে বুঝলেন—হঠাৎ থেমে গেলেন ডাক্তার। কেন যেন মুখখানা ভয়ানক কঠোর ও গম্ভীর হয়ে উঠল।

ওঁদের কাছে যেটুকু শুনেছি আর আমিও তো অ্যাডিক্টদের ট্রিটমেণ্ট করছি কেমন অস্পষ্ট আর ঝাপসা গলায় বললেন তিনি অ্যাকচুয়্যাল পিকচার কিন্তু আরও ভয়ানক —আরও গ্রীম—

কি রকম?

হিরোসিমা নাগাসিকায় অ্যাটম বোমা পড়েছিল, তার প্রচণ্ড বিধ্বংসী শক্তি দেখে শিউরে উঠেছিল সারা পৃথিবীর মানুষ, তিনি যেন গভীরভাবে কী চিন্তা করতে করতে আস্তে আস্তে বললেন, এখন হয়ত অনেকেই বুঝতে পারছেন না অ্যাটম বোমা হাইড্রোজেন বোমার চেয়েও অনেক—অনেক গুণ বেশি শক্তিশালী মারণাস্ত্র হল এই ড্রাগ—ড্রাগের নেশা—জানেন হঠাৎ দপ করে জ্বলে উঠল ডাক্তারবাবুর বড় বড় চোখ দুটো আমরা—আমরা অত্যন্ত দ্রুত নাগরিক বিন্যাশের (Urban Collapse) দিকে এগিয়ে যাচ্ছি। তীব্র উত্তেজনা আর ভাবাবেগের উজান ঠেলে আর কিছু বলতে পারলেন না। সায়ক্রিয়াটিস্ট ডক্টর দেবাশীষ ভট্টাচার্য।

এবার ডক্টর ভট্টাচার্য আপনার যদি আপত্তি না থাকে খুব বিনীত ভাবে বললাম, আপনার দু'একটা কেসহিস্ট্রি বলুন না?

না-না আপত্তি কেন থাকবে হেসে বললেন, আপনি ড্রাগের ওপরে কাজ করছেন— একটু থেমে বললেন, আমার নিজের স্বার্থেই তো আপনাকে বলব—

বলতে বলতে কখনো উত্তেজিত, কখনো তীব্র আবেগে কেমন অস্থির হয়ে উঠছিলেন ডাক্তার। বেশ বুঝতে পারলাম চিকিৎসা শুধু তাঁর জীবিকাই নয়, ব্রতও বটে। এক কথায় ডিভোটেড। এযুগের এই বস্তুবাদী এবং আত্মসর্বস্বতার অমানবিক পরিবেশে এই ধরনের চিকিৎসক বিরল।

কলকাতার একটি বিখ্যাত হাসপাতালের সায়কিয়াট্রিক ডিপার্টমেণ্টের সঙ্গে তিনি অ্যাটাচড। তাঁর প্রতিটি অ্যাডিক্ট কলকাতার বাসিন্দা, প্রত্যেকটি কেসই যেমন বিচিত্র তেমনি রোমাঞ্চকর। এখানে তাঁর বক্তব্য সংক্ষেপে বলা হল।

সুন্দর ফুটফুটে চেহারা। আঠারো কি বড় জোর উনিশ বছর হবে। কিন্তু আশ্চর্য তারুণ্যের কোন চিহ্নই নেই তার চেহারায়। চোখদুটো ঢুলু ঢুলু। ঘুমের ভারে জড়িয়ে আসছে। গর্তে ঢোকা চোখদুটো জলে ভরা।

হেরোইন না হ্যাসিস কী খেয়ে শরীরের এই হাল করেছ?

হেরোইন।

কবে থেকে ধরেছ?

বছর চারেক।

হেরোইনের কথা তুমি জানলে কি করে?

বন্ধুদের কাছ থেকে—

ছেলেটির বাবা জানালেন তার হিস্ট্রি—কলকাতার একটি নামী ইংলিশ মিডিয়াম স্কুলে পড়ত। বাড়িতেও তিনটি সাবজেক্টের জন্য তিনজন প্রাইভেট টিউটর ছিল।

তিনি নিজে একটি বিদেশী সংস্থার পারচেজিং সেকশানের ম্যানেজার। হাজার পাঁচেক টাকা মাইনে। অতএব একমাত্র পুত্রের লেখাপড়ার ব্যাপারে এতটুকু কার্পণ্য করেননি। মাসে মাসে নামকরা ইংলিশ মিডিয়াম স্কুলের মোটা মাইনে গুনেছেন। প্রাইভেট মাস্টারের পিছনে অঢেল খরচ করেছেন। ছেলের এডুকেশনের জন্য যথেষ্ট করছেন—এই রকম একটা আত্মতৃপ্তির জগতে মনের সুখে দিন কাটাতেন।

কিন্তু ছেলে স্কুলে যেয়ে কি করছে কাদের সঙ্গে মেলামেশা ওঠাবসা করছে সেসব খবর নিতেন না। সম্ভবও তো নয়। আর তাঁর কোন বিন্দুমাত্র কৌতূহল কি সন্দেহ তো মনের কোণে উঁকিই দেয়নি।

তিনি অফিস থেকে দেরি করে ফিরতেন। ফিরে এসেই আবার অফিসের ফাইল পত্রে মুখ গুঁজে বসতেন। এক্সিকিউটিভ র‍্যাঙ্কের যেমন ঝামেলা তেমনি কঠিন দায়িত্ব। আর তার স্ত্রী তাদের ফ্ল্যাটবাড়ির নিচে তার তিনজন বান্ধবীর সঙ্গে শেয়ার করে শাড়ির সেলস্ এম্পোরিয়াম খুলেছেন। সেই শোরুম আর শাড়ির নিত্যনতুন হরেক রকমের ডিজাইন নিয়ে অসম্ভব ব্যস্ত।

সন্তু তো পাশের ঘরে পড়ছে। তাকে নিয়ে চিন্তা কিসের? এই পর্যন্ত বলে বুক উজাড় করে দীর্ঘশ্বাস ফেললেন ফরেন মেডিসিন ফার্মের চীফ এক্সিকিউটিভ সুনীল বোস। ডুবন্ত মানুষের মত কেমন ক্ষীণ অস্পষ্ট গলায় বললেন আমরা স্বামী-স্ত্রী কেউই ছেলের দিকে তাকাইনি ডাক্তারবাবু—সেই হয়েছিল কাল, ডক্টর ভট্টাচার্যের নিস্তব্ধ চেম্বারে তার কথাগুলো কেমন কাতর কান্নার মত শোনাল।

আপনি বুঝতে পারলেন কি করে ছেলে ড্রাগ খাচ্ছে?

মাঝে মাঝে মিসেস বোস তাকে বলতেন, জান সন্তু বাথরুমে বসে এতক্ষণ কি যে করে? জিজ্ঞাসা করলে কিছু বলে না। বেশি খোঁচাখুঁচি করলে রেগে আগুন হয়ে যায়।

তিনি স্ত্রীর কথায় তেমন আমলই দিলেন না। এসব ঝুটঝামেলা করার সময় কোথায় তাঁর। পরামর্শ দিলেন, ছেলেরা মায়ের সঙ্গেই বেশি ঘনিষ্ঠ হয়। সন্তুর সঙ্গে খোলাখুলি বসে কথাবার্তা বলে নিলেই ল্যাঠা চুকে গেল। মোটের ওপর ছেলের দায়দায়িত্ব সব স্ত্রীর কাঁধে চাপিয়ে দিয়ে তিনি অফিসের ফাইলে ডুবে গেলেন।

মাস দেড়েক পরে আবার একদিন মিসেস বোস তাকে বললেন জান মনে হচ্ছে সন্তু পয়সা চুরি করছে। প্রায়ই দেখি ব্যাগে আমার হিসেব করা টাকা কম—

কি যে ঘোড়ার ডিম তোমার ওই শোরুম মাথায় ঢুকেছে। কখন কোথায় টাকা পয়সা ছড়িয়ে ছিটিয়ে রাখ—মিছিমিছি সন্তুর নামে দোষ—এসব বলে স্ত্রীর সন্দেহটাকে একেবারে বাতাসে উড়িয়ে দিলেন। এই পর্যন্ত বলে থেমে গিয়েছিলেন সুনীলবাবু, কিছুক্ষণ নিজের চিন্তা হয়ত নিজের দুর্ভাগ্যের দুঃসহ কষ্ট, লজ্জা এবং অপমানের কথা নাড়াচাড়া করতে করতেই যেন তার নিজের ওপরে ঘৃণার থুতু ছিটিয়ে বললেন, স্ত্রীর কথাকে পাত্তা দেইনি ছেলের দিকেও তাকাইনি তাই ভগবান আমাকে কঠিন—

আপনি এত আপসেট হচ্ছেন কেন মিঃ বোস, শান্ত কঠিন গলায় তাকে বলতে হয়েছিল, বললেন সায়ক্রিয়াটিস্ট ডক্টর ভট্টাচার্য, প্রায়ই অ্যাডিক্টদের গার্জিয়ানদের সঙ্গে আমাদের একটু হার্স ব্যবহার করতে হয়।

কেন বলুন তো ?

বুঝতে পারছেন না, শুধু সন্তু নয় শতকরা ৯৮ ভাগ ইয়ং আর বেশ সলভেন্ট ঘরের ছেলেমেয়েদের অ্যাডিক্ট হয়ে যাওয়ার কারণ পেরেন্টসদের ক্যালাসনেস— উত্তেজনায় ডাক্তারের কানের কাছের শিরাদুটো ফুলে ফুলে উঠতে লাগল। বললেন ছেলের সর্বনাশ করে এসে কান্নাকাটি প্যানপ্যানানি করলে তো চলবে না—এসব শোনার সময় কোথায় আমার—

যাক সন্তুর কথা বলুন—

ও হ্যাঁ, বলছি—বলছি মিঃ বোসকে কড়া করে বললাম কোন ইররেলিভেন্ট ইমোশানাল কথা বলবেন না আপনি, যা জিজ্ঞাসা করছি—টু দি পয়েন্ট তার উত্তর দেবেন—

বলুন—বলুন ডাক্তারবাবু—

বাথরুমে সন্তু আনইউজ্যালি বেশি সময় নিচ্ছে। মিসেস বোসের মনে হচ্ছে আপনার ছেলে পয়সা সরাচ্ছে—এসব তো বলেছেন। কিন্তু আমি যে প্রশ্নটা একটু আগে করেছি—সেটাই তো বললেন না—

কি বলুন তো ?

আপনারা কর্তাগিন্নী প্রথমে ধরলেন কি করে ছেলে ড্রাগ অ্যাডিক্টেড হয়েছে ?

এবার ফরেন মেডিসিন ফার্মের চীফ এক্সিকিউটিভ বেশ ধাক্কা খেয়ে ধীরে ধীরে গুছিয়ে বলতে শুরু করলেন—

একদিন একটা সাংঘাতিক ঘটনা ঘটে গেল—

সন্তুর সেই বিখ্যাত ইংলিশ মিডিয়াম স্কুল থেকে প্রিন্সিপালের চিঠি এসে গেল—

আপনার ছেলে বেশ প্রায় দুই সপ্তাহ ধরে স্কুলে আসছে না। অনুগ্রহ করে কারণটি জানাবেন কি? কাউন্ডাং লেট মি নো···তারপরে আরও কড়া কড়া কথাও ছিল—আপনি একজন রেসপনসিবল লোক হয়ে···ইত্যাদি তীব্র উত্তেজনায় ভদ্রলোক আর কিছু বলতে পারলেন না। তাকে কেমন অবসন্ন আব ক্লান্ত মনে হল—

আস্তে আস্তে বলুন মিঃ বোস—বলুন, ডোণ্ট বি এক্সাইটেড—আপনার ছেলে ভাল হয়ে যাবে—

বলছেন—সত্যি বলছেন? মনে হল মিঃ বোসের বুকের ভেতরে বসে কে যেন খুট করে সুইচ টিপে দিল। সারা মুখে আলো ঝকঝক করতে লাগল।

আমি—আমি আপনাকে প্রমিস করছি—আপনার ছেলে সুস্থ হয়ে উঠবে আর স্বাভাবিক জীবন—একটু থেমে আবার ডক্টর ভট্টাচার্য বেশ গম্ভীর ও কঠোর স্বরে বলেছিলেন কিন্তু আপনাকে যা বলব—তাই করতে হবে---

বিগলিত একটা হাসি ঝুলতে লাগল মিঃ বোসের ঠোঁটে। তিনি বলেছিলেন কেমন করে প্রথমে বুঝতে পেরেছিলেন ছেলে ড্রাগের নেশা করছে।

প্রথমে স্বামী-স্ত্রীর ভেতরে একটা প্রচণ্ড সংঘাতের ঝড় বয়ে গেল। বেশ মেজাজ দেখিয়ে মিসেসকে যেই প্রিন্সিপালের চিঠি দেখিয়ে বললেন কী ব্যাপার বলতো—ছেলে যে দিনের পর দিন স্কুলে যাচ্ছে না সেই খবরটুকুও—

মানে? মিসেস বোসও লরেটোয় পড়া মেয়ে। দস্তুর মত কেতাদুরস্ত। যেমন স্মার্টনেস, তেমনি মেজাজ। তিনি বিষাক্ত সাপিনীর মত দুলে উঠলেন, তুমি কী চাও—আর কী চাও বলতো আমার কাছে—আমি তোমার ঘর সামলাব সেইসঙ্গে তোমার ছেলের পিছনে গোয়েন্দাগিরিও করব? আর উনি বেশ মেজাজে অফিসের ফাইলে—

খবরদার বলছি অফিসের খোঁটা দিও না—আমার ওই অফিসের রোজগারের টাকাতেই তো তোমরা ফুটানি দেখিয়ে—

কথায় কথা বাড়ল। দুজনেরই মেজাজ সপ্তমে উঠল। দুজন যার যার ঘরে খিল লাগিয়ে বসে থাকল। বন্ধ হয়ে গেল রাতের খাওয়াদাওয়া।

কিন্তু আশ্চর্য, কেউ একবারও ছেলের কাছে গিয়ে বসে সহানুভূতির সুরে একটা কথাও বললেন না—তোর কি হয়েছে, তুই স্কুলের নাম করে কোথায় যাস, কি করছিস—ছেলের সঙ্গে অন্তরঙ্গ বন্ধুর মত সহজ সরল অবারিত সম্বন্ধ তারা কখনো কল্পনাই করতে পারে না। আর এখানেই ট্র্যাজেডি—মা-বাবার অস্বাভাবিক আত্মকেন্দ্রিক জীবন, সন্তানের প্রতি উদাসীনতার এই অন্ধকার সুড়ঙ্গ পথেই সর্বনাশা অভিশাপ আসে নিঃশব্দ পায়ে। তারা জানতেও পারে না। যখন পারে, তখন আর সময় থাকে না—এই পর্যন্ত বলে থেমে গিয়েছিলেন ডক্টর ভট্টাচার্য। বেশ কিছুক্ষণ মাথা নিচু করে বসে থাকলেন। বেশ বুঝতে পারা যায় তাঁর মনের ভেতরে মিছিল করে চলেছে হেরোইন কি হ্যাসিসের নেশায় জর্জরিত তাঁর পেশেণ্ট রুগ্ন, দুর্বল ও পঙ্গু হতভাগ্য উঠতি বয়সের ছেলেমেয়েরা।

শুনুন, প্রায় সমস্ত অ্যাডিক্টদের এই একই হিস্ট্রি, তীব্র একটা জ্বালায় জ্বলতে

লাগল ডাক্তারবাবুর বড় বড় চোখ দুটো।

সেদিন শুধু সন্তু কেন আরও অনেক—অনেক পেশেণ্টের কেসহিস্ট্রি বলেছিলেন এবং আরও অনেক কথাই বলেছিলেন তিনি। কিন্তু সেইসব বৃত্তান্ত বলার আগে জানা দরকার আন্তর্জাতিক খ্যাতিসম্পন্ন এক ড্রাগ বিশেষজ্ঞের একটি মূল্যবান তথ্য—

বেশিদিন আগের কথা নয়।

ইণ্ডিয়ান চেম্বার অফ কমার্স আয়োজিত ডাক্তার, সমাজ-সেবী এবং নেশাগ্রস্তদের পুনর্বসতি কর্মীদের এক প্রকাশ্য অধিবেশনে কলকাতায় ডক্টর জন স্টানলি স্ট্রাঙ (Dr. John Stanely Strang) ডিরেক্টর অফ ড্রাগ ডিপেণ্ডেনস ইউনিট অফ ম্যাণ্ডস্লে অ্যাণ্ড বেথলেহাম রয়্যাল হসপিটাল ইউ কে (Director of Drug Dependence unit of Mandslay and Bethleham Royal Hospital U. K.) বললেন, আমি আশ্চর্য হয়ে যাচ্ছি ভারতে মাদকসেবীদের অত্যন্ত ঘৃণা এবং অবহেলা করা হয়ে থাকে। স্মরণ রাখতে হবে, এই অদ্ভুত জঘন্য মানসিকতার জন্যই যে সব অ্যাডিক্ট সুস্থ স্বাভাবিক জীবনে ফিরে আসতে চায় তারা নিজেদের অত্যন্ত অসহায় ও নিঃসঙ্গ মনে করে। আর ধীরে ধীরে গভীর হতাশায় আচ্ছন্ন হয়ে একেবারে সর্বনাশের অতল খাদে তলিয়ে যায়।

বহুদর্শি ও প্রবীন এই ড্রাগ অ্যাবিউস এক্সপার্ট আরও একটি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ তথ্যও জানিয়েছেন—এই উপমহাদেশে ইংলাণ্ডে ঠিক একেবারে উল্টো নিয়ম। এখানে অ্যাডিক্টদের সঙ্গে কোনরকম আলাপ আলোচনা না করে এমন কি তাকে কিছু-মাত্র আভাস পর্যন্ত না দিয়েই তার চিকিৎসা করা হয়। তার ফলে তাকে ড্রাগের নেশা থেকে বিরত করার চেষ্টা একেবারে ব্যর্থ হয়ে যায়।*

ডক্টর ভট্টাচার্যের প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতার বৃত্তান্ত শুনতে শুনতে আমার মনের ভেতরে জনসন স্ট্রাঙের কথাগুলো টগবগ করে ফুটছিল। মনে হয়েছিল—ইংলাণ্ড সত্যিই বহুদূর।

সুনীল বোস চীফ এক্সিকিউটিভ। অত্যন্ত বুদ্ধিমান। স্ত্রী অলকাদেবীও অতবড় শোরুমের মালিক। শয়ে শয়ে খদ্দের তাকে ডিল করতে হয়। তারা জানেন—বেশ ভাল করেই জানেন—অড সিচুয়েশান কী করে ট্যাকল করতে হয়, বলতে শুরু করলেন সায়কিয়াটিস্ট—

চুপচাপ তারা ছেলেকে ওয়াচ করতে লাগলেন। চোখে কেমন ঘুম ঘুম ভাব। চোখের পাতাদুটো ঢুলুঢুল। চোখের পাতাদুটো যেন খুলতেও রীতিমত কষ্ট হচ্ছে—

তোর কি হয়েছে রে সন্তু। বেশ মিষ্টি করেই বললেন অলকাদেবী।

সন্তু একটু অবাক হয়ে মার দিকে তাকাল। একটা কথাও বলল না। তাড়াতাড়ি

---

* ডক্টর স্ট্রাঙের বক্তৃতা এবং এই ড্রাগ বিরোধী সভার বিশদ বিবরণটি কোন অভিজাত ইংরেজী দৈনিকে প্রকাশিত হয়েছিল।

মার খর চোখদুটোর তীক্ষ্ন দৃষ্টির সামনে থেকে চলে গিয়ে নিজের ঘরে দড়াম করে খিল লাগিয়ে দিল।

দাঁড়িয়ে রইলেন অলকাদেবী।

যাকে বলে স্পেল বাউণ্ড। তিনি ভেতরে ভেতরে রাগে জ্বলে যেতে লাগলেন। কিন্তু দাঁতে দাঁত চেপে ধরে নিজেকে সংযত করলেন।

খট-খট-খট—-

কে—কি চাই? ভেতর থেকে শ্রীমানের অস্পষ্ট জড়ানো গলার ক্ষীণ আওয়াজ শোনা গেল—

আমি রে সন্তু, দরজাটা একটু খোল না বাবা—মিসেস বোস এবার গলায় যত বেশি সম্ভব মধু ঢেলে দিলেন।

কোন সাড়া শব্দ পাওয়া গেল না।

সুনীলবাবু তার বেডরুমে বসে অফিসের ফাইল কনসাল্ট করছেন—অনেক লাইফ সেভিং ড্রাগ কেন যেন ইণ্ডিয়াতে চালান আসছে না—

শুনছ—সন্তু দরজা খুলছে না—বেশ গলা চড়িয়ে বললেন মিসেস বোস।

কি—কি হয়েছে? বাড়িতে কি ডাকাত পড়েছে, রুখে বেরিয়ে এলেন কর্তা। দরজায় দুমদুম করে ধাক্কা মেরে হাঁফাতে লাগলেন। কঁকিয়ে চিৎকার করে বললেন এই স্কাউণ্ড্রেল—দরজা খুলবি কি না বল—

দরজা খুলল মন্টু।

কেমন মরা মাছের মত ঘোলা চোখ। ভয়ে উত্তেজনায় নেশার ঝোঁকে কাঁপছে পাদুটো।

সুনীলবাবুকে আর কিছুই জোর করতে হল না। ধাক্কাধাক্কি ধ্বস্তাধ্বস্তি কিছুই করতে হল না। সন্তুর টেবিলের ওপরেই শোভা পাচ্ছে ব্রাউন সুগারের পুরিয়া। পাশেই কাৎ হয়ে পড়ে আছে ইনজেকশানের একটা নোংরা সিরিঞ্জ।

হঠাৎ বিদ্যুতচমকের মত মনে পড়ে গেল একটি বিদেশী জার্নালের ড্রাগ সম্বন্ধে একটি আর্টিকেলে যেন পড়েছিলেন অ্যাডিক্টরা নিজের শরীরে হেরোইন বা মার্ফিয়ার ইনজেকশান—

তুই—তুই—সন্তু হেরোইন খাস—তুই—তীব্র উত্তেজনায় মর্মান্তিক আঘাতের আকস্মিকতায় আর কোন কথাই বলতে পারলেন না মিঃ বোস। তার চেতনা বিকল হয়ে গেল—এই পর্যন্ত বলেই মাথা নিচু করে বসেছিলেন মিঃ বোস।

তারপর কি করলেন?

ভয়ানক ড্রাস্টিক স্টেপ নিয়েছিলাম। দিনরাত বাড়িতে আটকে রাখতাম। স্কুলে পাঠানোও বন্ধ করে দিলাম, একটু থেমে আবার বলেছিলেন, কি আর করব—অফিসে তো যেতেই হবে—মিসেসকে বলে এলাম—পয়সাকড়ি যেন তোমার গুনধর ছেলের হাতে না পড়ে—থেমে গিয়েছিলেন সুনীলবাবু।

চুপ করে গেলেন ডক্টর দেবাশীষ ভট্টাচার্য।

মনে হল সন্তুর করুণ পরিণতির কথাই ভাবছেন। সোসাইটির সেই হলঘরে অস্বস্তিকর একটা স্তব্ধতা থমথম করতে লাগল। আমার মনে পড়ল ডক্টর স্ট্রাঙের সেই কথাগুলো—In india addicts often being neglected and Scorned by the Society ··

· সুনীলবাবু একবারও জানতে চাইলেন না। ছেলে কেমন করে ড্রাগ ধরল কি করে ড্রাগ পায় অর্থাৎ কেমন করে নিজের এতবড় সর্বনাশ করল—কোন কিছু না বলেই বাড়িতে কয়েদ করে রাখলেন। বিচিত্র—

কি ভাবছেন? ডাক্তার একটু হেসে বললেন।

কিছু না। আপনি বলুন কোন স্টেজে মিঃ বোস তাঁর ছেলেকে নিয়ে আপনার চেম্বারে—

শুনে আর কি করবেন, বুক উজাড় করে একটা দীর্ঘশ্বাস ফেললেন সায়কিয়াটিস্ট। তাঁকে কেমন ডিপ্রেসড মনে হল। আস্তে আস্তে বললেন ছেলেকে মিঃ বোস জামিনে হাজত থেকে ছাড়িয়ে নিয়ে এসেছিলেন আমার কাছে—

হাজত! অস্ফুট একটা আর্তনাদ বেরিয়ে এল আমার মুখ থেকে।

শুধু ঘরে বন্দী করা নয়। ব্যাটন দিয়ে দস্তুরমত বেদম পেটানো। কান্নাকাটি মারামারি অনেক অনেক অশান্তি অনেক সংঘাত করেও ছেলের নেশা ছাড়াতে পারেননি সুনীলবাবু। পারবেন কি করে?

অলকাদেবী যতই ঝকমকে স্মার্ট ইনটেলিজেন্ট মহিলা হন না—মা তো! সন্তু হেরোইনের জন্য পাগল হয়ে গিয়েছিল। দেওয়ালে মাথা ঠুকত নিজের মাথার বড় বড় চুল টেনে টেনে ছিঁড়ত। মিসেস বোস স্বামীকে লুকিয়ে একদিন, দুদিন পয়সা দিতেন। বুঝতেন ছেলেকে মা হয়ে নিজের হাতে বিষ দিচ্ছেন। তবুও নিজেকে চেক করতে পারতেন না। কিন্তু—

যেদিন দিতেন না। শক্ত হতেন। সেদিন মা-কে যা মুখে আসে বলে রাগ করে বেরিয়ে যেত। ফিরে আসত সন্ধ্যার পর। নিজের ঘরে খিল বন্ধ করে বসে থাকত। কিন্তু ঘরের ভেতরে বসে ছেলে কি করছে—পড়ছে না নেশা করছে—সেসব দেখার 'সময়' মা-বাবার কারোরই ছিল না।

কিন্তু এখানেই একটা কথা আছে সন্তু যে পয়সার জন্য দৌরাত্ম্য করছে, অশান্তি করছে—এসব স্বামীর কানে তুলতেন না মিসেস বোস। ভেবেছিলেন সুতো ছেড়ে কখনো টেনে জলের ভেতর থেকে মাছ খেলিয়ে তোলার মত করে ছেলের সমস্ত ব্যাপারটা ম্যানেজ করে বাজিমাৎ করবেন। হাসব্যান্ডের ওপরে টেক্কা দেবেন—একটু থামলেন ডক্টর ভট্টাচার্য। আবার আস্তে আস্তে বললেন জানবেন খুব হাইলি এডুকেটেড আর ইকোয়্যাল স্টাটাসের হাসব্যান্ড ওয়াইফের ভেতরে এরকম প্রচ্ছন্ন একটা কমপ্লেক্সের দ্বন্দ্ব থাকে—

মিসেস বোস আর একেবারেই সন্তুকে প্রশ্রয় দিতেন না। সন্তুও চাইত না। সে যেন ভোজবাজির মত বদলে গেল। অলকাদেবী মনে মনে খুশি হলেন।

কিন্তু স্বামী-স্ত্রীর ভেতরে সংঘাত বেধে গিয়েছিল যেদিন ছেলের স্কুল থেকে

খবর এসেছিল সে স্কুলে যাচ্ছে না। তার চেয়েও অনেক বড় অশান্তি আরো তীব্র সংঘাত হল সেদিন যেদিন তাদের মিশনারী ইংলিশ মিডিয়ামে পড়া ছেলেকে কোমরে দড়ি বেঁধে পুলিশ থানায় নিয়ে গেল।

সন্তু আর তার এক নেশাড়ু বন্ধু দুজনে মিলে হেরোইনের এক স্মাগলারের কাছ থেকে ব্রাউন সুগার কিনতে যেতেই পুলিশ এসে তাদের বামাল ধরে ফেলল। তাদের থানায় নিয়ে গেল পুলিশ—থেমে গেলেন ডাক্তারবাবু।

এখন সন্তু কোথায়, কেমন আছে?

জানি না। আমার মনে হল বাইরে ঘনায়মান সন্ধ্যার সমস্ত অন্ধকারটাই যেন চেপে নেমে এল ডাক্তারের মুখে।

মিঃ বোস ছেলেকে জামিনে ছাড়িয়ে নিয়ে এসেছিলেন। বেশ যত্ন নিয়ে যথাসাধ্য ট্রিটমেন্টও করছিলেন সায়কিয়াটিস্ট ডক্টর দেবাশীষ ভট্টাচার্য। ডিটাকসীফিকেশান বা উইথড্রয়াল অর্থাৎ নেশাখোরকে নেশা ছাড়ানোর যতরকম প্রক্রিয়া আছে তাঁর বিদ্যা-বুদ্ধি দিয়ে সবই করছিলেন।

কিন্তু—থামলেন ডক্টর ভট্টাচার্য। মনে হল ভেতরে ভেতরে যেন কোন তীব্র যন্ত্রণা নিঃশব্দে সহ্য করে নিজেকে শান্ত সংযত রেখেছেন।

জানেন নিশ্চয় সাইকেলটিক ড্রাগের অ্যাডিক্টদের সাইকোলজিকাল ট্রিটমেন্ট পেরেন্টস কোঅপারেশন একটা মেজর ফ্যাক্টর—

ডাক্তারের কথাগুলোর ভেতরে চাপা বিক্ষোভ ফুটে উঠল।

একমাত্র সন্তান। ওনলি সান। তাও কোন কোঅপারেশানই করলেন না তাঁরা—

মাথাটা ঝাঁকালেন ডাক্তার। তাঁর চোখে গভীর ব্যথার ছায়া ফুটে উঠল।

চিকিৎসা শুরু করার আগে স্বামী-স্ত্রীকে তাঁর মুখোমুখি পাশাপাশি দুটো চেয়ারে বসিয়েছিলেন ডাক্তার।

ছেলেকে কি নার্সিংহোমে আই মীন আমি যেখানে সেখানে অ্যাটাচড দেবেন?

নার্সিংহোম। মিসেস বোস অস্ফুট আর্তনাদ করে উঠলেন।

কেন ডাক্তারবাবু আমি বাড়িতে রাখলে আপনি মাঝে মাঝে যেযে দেখে আসতে পারবেন না? মিঃ বোস নিভু নিভু গলায় বললেন আমি আপনাকে আপনার যা ফিজ তার ডবল—

আহা! আপনাদের টাকা আছে জানি প্রচণ্ড আহত অপমানিত হয়ে ডাক্তার বললেন ফিজটা বড় কথা না আপনার ছেলের কিওর—

ডাক্তারবাবু। প্লী-জ ডোণ্টমাইণ্ড—হেঁ হেঁ করে একটা বিনয়ের বোকা বোকা হাসি হেসে ডাক্তারের হাতদুটো জড়িয়ে ধরলেন মিঃ বোস।

শুনুন আপনি যখন এত করে বলছেন—যাব। কিন্তু বাড়িতে এই ট্রিটমেণ্ট খুব-খুউব ডিফিকাল্ট। কনস্টাণ্ট টুয়েণ্টিফোর আওয়ার্স পেশেণ্টকে ওয়াচে রাখতে হবে। একটু থেমে বললেন, যেই নেশা খাওয়া বন্ধ করব অমনি হয় বমি করতে শুরু করবে না হয় তেড়ে জ্বর আসবে—হাত পা খিঁচোবে ইত্যাদি। উইথড্রয়ালের সমস্ত রিঅ্যাকশানই ধীরে ধীরে বুঝিয়ে বললেন—

আপনি ডাক্তারবাবু কোন ট্রেইণ্ড নার্সের ব্যবস্থা করে দিন কাইণ্ডলি, যে ফি চাইবে দেব—

আপনার নার্সিংহোমেই ওকে রাখুন ডাক্তারবাবু—কান্নায় ভার ভার অস্পষ্ট ঝাপসা গলায় বললেন মিসেস বোস।

মিঃ বোসের চোখের দৃষ্টি কঠোর হয়ে উঠল। অত্যন্ত রাশভারী মেজাজি মানুষ। হয়ত ডাক্তারের সামনে বলেই স্ত্রীকে বকাবকি করলেন না।

ডক্টর দেবাশীষ ভট্টাচার্য থেমে গেলেন। আর একটা কথাও বললেন না। তাঁকে অত্যন্ত ক্লান্ত আর অবসন্ন বলে মনে হল।

তাঁকে বিরক্ত করতে আমার সংকোচ হয়েছিল। তবুও বলেছিলাম, আচ্ছা ডাক্তারবাবু ছেলেকে নিয়ে আসার আগে কি পেশেণ্টকে জানিয়েছিলেন—তার চিকিৎসা করতে নিয়ে যাওয়া হচ্ছে?

বলছেন কি! কপট আর্তনাদের মত শব্দ করে বললেন ডাক্তার বোসদের মত সোকল্ড অ্যারিস্টোক্রাট বাবারা কখনো এসব নোংরা ব্যাপার নিয়ে কি ছেলের সঙ্গে ডিসকাশান করেন—চাপা উত্তেজনায় চোখদুটো জ্বলজ্বল করতে লাগল।

স্যার আপনাদের কি চা দেব?

যাও—তাড়াতাড়ি নিয়ে এস, ডাক্তারবাবু বললেন, আমি কয়েকমিনিটের ভেতরে বেরিয়ে যাব—

টিক্-টিক্-টিক্—নিস্তব্ধ ঘরে দেওয়াল ঘড়ির পেণ্ডুলামের আওয়াজ শুধু একটানা বেজে যেতে লাগল।

He complained that addicts in India were often treated without their consent unlike in U. K.

ডক্টর স্ট্রাঙের সেদিনের সভায় বক্তৃতার কথাগুলো আমার মনে পড়ে গেল। তিনি আরো বলেছিলেন অ্যাডিক্টের সঙ্গে কোন আলোচনা না করে তাকে ধরে নিয়ে সায়ক্রিয়াটিস্টের কাছে গেলেই তাকে নেশা থেকে বিরত বা Detoxification করা যায় না। বরং উল্টে সে আরও বিক্ষুব্ধ হয়, ক্ষিপ্ত হয়ে ওঠে। আরও বেশি করে নেশার দিকে ঝুঁকে পড়ে—Detoxification difficult and futile বা নেশা ছাড়ানোর সমস্ত প্রচেষ্টা শোচনীয় ভাবে ব্যর্থ হয়ে যায়।

পরে ডক্টর দেবাশীষ ভট্টাচার্যের কাছে জানতে পেরেছিলাম সন্তুর জীবনের করুণ পরিণতি—

বুঝতেই পারছেন মিঃ সুনীল বোস এবং তাঁর স্ত্রীর যে অ্যাটিচুড ছেলের চিকিৎসায় হাজার হাজার টাকা ঢালব, কিন্তু সান্নিধ্য, স্নেহ মায়া মমতা এসব হবে না—তাতে কখনো অ্যাডিক্ট সুস্থ হতে পারে না বলেই থেমে গেলেন তিনি।

সন্তু কখনো ভরদুপুরে, কি সন্ধ্যায়, যে সময় তার অত্যন্ত বিজি মা-বাবা বাড়িতে থাকতেন না। তখন পালিয়ে গিয়ে হেরোইন কিনত। এই করতে করতেই হেরোইনের স্মাগলারদের সঙ্গে পরিচয় হল, বন্ধুত্ব হল। সেও টাকার প্রয়োজনেই

স্মাগলারদের কেরিয়ার হয়ে গেল। একদিন তার কাছে চোরাই হেরোইন পেয়ে পুলিশ তাকে গ্রেপ্তার করল।

বড়লোক বাবা তাকে বেলে ছাড়িয়ে নিয়ে আসে। আবার সন্তু চোরাই আফিম ক্যারি করতে গিয়ে ধরা পড়ে। পর পর তিনবার জেল খেটে এসেছে।

সন্তু এখন দাগী আসামী।

আরো অনেক সায়ক্রিয়াটিস্টের সঙ্গে দেখা করলাম। তাঁদের পেশেন্টদের কেসহিস্ট্রি সংক্ষেপে এখানে বলা হল।

(ক)

স্বপন পাল। বয়স—২৮। পড়াশুনা—স্কুল ফাইনাল পর্যন্ত।

কর্মক্ষেত্র—আগে একটা চাকরি করত। ছোটখাটো চাকরি, তার এই কোয়ালিফিকেশানে যেমন হয় আর কি। কোন অফিসের ক্লাসফোর স্টাফ। সেই চাকরি থেকে ছাঁটাই হয়ে যায়।

ছোটখাটো ব্যবসা করত। কখনো ফুটপাতে সামান্য পুঁজি থেকে কিছু কিনে দোকান দিয়ে বসত আবার কিছু মাল কিনে মার্জিনে রেখে দোকানে দোকানে বিক্রি করত। যা রোজগার করত সব এনে মা-র হাতে দিত।

পারিবারিক অবস্থা বা ফ্যামিলি স্ট্রাকচার—একান্নবর্তী পরিবারের ছেলে স্বপন। দুই কাকা, দুই কাকীমা, বাবা-মা, তার নিজের দুই ভাই, দুই বোন এবং গুটিকয়েক খুড়তুতো ভাইবোন নিয়ে তাদের মস্ত সংসার।

বাবা এবং দুই কাকার একটা জয়েন্ট বিজনেস ছিল। গণেশ কাটরায় কাপড়ের দোকান। ছোট দোকান হলেও বিক্রিবাট্টা বেশ ভালই হত। যা আয় হত, তাতে তাদের সংসার কষ্টেসৃষ্টে চলে যেত। কিন্তু—

প্রবলেম বাধল। সমস্যা বা সঙ্কট কিম্বা মন কষাকষি একেবারেই নেই—এমন মসৃন জীবন তো মানুষের কখনো হয় না। তবে সেসব বলার আগে স্বপনের স্বভাব চালচলনও নিশ্চয়ই বলা দরকার।

মুখচোরা। নিজের ভেতরে গুটিয়ে থাকতে ভালবাসে। কথা বলে কম—খুব কম। বেশ রিজার্ভ। কিন্তু বেশ ইমোশানাল। আবেগ প্রবন। তাই যাকে ভাল লাগে—যাকে ভালবাসে তার সঙ্গে যথেষ্টই কথা বলে।

আঠাশ বছর বয়স হল। মা কাকা-কাকীমারা স্বপনের বিয়ে নিয়ে ফিসফাস্ গুজগুজ শুরু করল। আরো উসকে দিলেন বিধবা পিসীমা। বেলেঘাটার ফুলবাগানে তাঁর বিশাল বাড়ি গাড়ি। অতএব দেমাকি। বেশ জাঁদরেল।

তিনি ভাইপোর জন্য মেয়ে পছন্দ করে বসলেন। গড়পাড়ে পাশাপাশি দু-দুটো দোতালা বাড়ির মালিক। মিশন রোতে মেসিনারি পার্টসের তিনপুরুষের ব্যবসা। টাকার কুমীর।

স্বপনের বাবা দিদিকে সমীহ নয় রীতিমত ভয়ই করে। তবুও মৃদু আপত্তি জানিয়ে বলেছিল দারুণ বড়লোক দিদি—আমাদের সঙ্গে তো—

দেখ মিলমিশ খাবে রে খাবে—মেয়েটা বড় লক্ষ্মী। ওরা বড়লোক ঠিকই—

পিসীমা প্রশংসার ঝুড়ি খুলে বসে, কিন্তু এতটুকু অহমিকা নেই—

তবুও স্বপনের বাবা চুপ করে থাকেন।

তার মন কিছুতেই সায় দেয় না। পিসীমা বলে, তুই মিছিমিছি ভেবে মরছিস—মেয়েরা যদি লক্ষ্মী হয় তাহলে—বলেই শ্লোক আওড়ায়—

বন্দে বিষ্ণুপ্রিয়া দারিদ্র্য দোষানাশিনী

লক্ষ্মীমন্ত মেয়ে সংসারে এলে এই দিন আনা দিন খাওয়া, টানাটানি সব সব তাদের কর্পূরের মত কোথায় উড়ে যাবে—জানতেও পারবি না রে—

বিয়ে হয়ে গেল।

মাস দুয়েক যেতে না যেতেই তত্ত্ব দেওয়া নেওয়া নিয়ে লেগে গেল সংঘাত। জামাই ষষ্ঠীতে স্বপনকে যেমন প্যান্টের দামী কাপড় দিয়েছেন, তেমনি পুজোতে স্বপনের বাবা, তার ছেলের বৌকে ঠিক তেমনি শাড়ি দেবেন—দামও যেমন তেমনি হবে কোয়ালিটিও। কিন্তু পুজোয় দেওয়া শ্বশুরবাড়ি থেকে মেয়ের শাড়ি দেখেই স্বপনের শ্বশুর ক্ষেপে গেলেন। বললেন ছি-ছি এ-তো আমার বাড়ির কাজের মেয়েরা পরে ছি-ছি মান সম্মান আর থাকল না।

স্বপনের স্বভাব বাপের মতই। আত্মম্ভরিতায় ডগোমগো কথায় কথায় শাশুড়ি খুড়ী শাশুড়ীদের শুনিয়ে দেয় ভাবসাবে বুঝিয়ে দেয় তাদের পয়সা আছে। এটা কি—আমরা খাই না—এসব কি ভদ্রলোক খায়। অতএব—

চাপা অশান্তির আগুন ধিকি ধিকি জ্বলতে লাগল। স্বপন সব দেখত। সব বুঝত। কিন্তু টুঁ শব্দটি করত না। খেয়ে দেয়ে চুপচাপ নিজের কাজে বেরিয়ে যেত। বাড়ি ফিরত রাত করে। সে যেন অনেক—অনেক দূরের কোন অন্য গ্রহের বাসিন্দা। তবে—

একটা কথা—স্বপনকে তার বৌ ভালবাসত কিনা কিম্বা তার মনে বৌয়ের জন্য কোন টান ছিল কিনা—এই ব্যাপারটা বড্ড ধোঁয়াটে। স্বপন তো চাপা স্বভাবের ছেলে। সে কখনো বাড়ির কাউকে কিছু বলত না।

কিন্তু স্বপনের ফ্যামিলির প্রত্যেকে ধরেই নিয়েছিল বড়লোকের মেয়ে। নিশ্চয়ই স্বপনকে পাত্তা দেয় না। বাইরে যেটুকু শো বা ডেকরাম রাখতে হয়—রাখে।

কিন্তু মনে হয় তা বোধহয় ঠিক নয়। স্বামী-স্ত্রীর একেবারে ভেতরের ব্যাপারটা নিয়ে এখন খোঁচাখুঁচি না করে বলা দরকার কেমন করে তরতাজা এই যুবক যাকে বলে ব্রাইট ইয়ংম্যান ড্রাগের খপ্পরে পড়ল।

তত্ত্ব নিয়ে তো খুটখাট কোল্ডওয়ার মত চলছিলই। স্বপনের বাবা অত্যন্ত সরল সাদাসিধে মানুষ। কোন ঘোরপ্যাঁচ বোঝে না। যায়ও না কোন গোলমালের ভেতরে। ঝগড়াঝাঁটি তার একেবারে ভাল লাগে না। একদিন সোজা চলে গেল বেয়াইবাড়ি।

পয়সাওয়ালা লোক। দারুণ দেমাক। স্বপনের মা এবং কাকারা পই পই করে নিষেধ করেছিল। কিন্তু সোজা সরল মানুষ যে সুপারিগাছের মত। একবার পা

হড়কে গেলে আর রক্ষে নেই। যা একবার মাথায় চেপে বসবে—করবে! অতএব—

যা হওয়ার তাই হল। টুকটাক ঝগড়াঝাঁটি—চলতে চলতেই দুই পরিবারের ঠাণ্ডা লড়াই একেবারে তুঙ্গে উঠে গিয়েছিল। এমন কি মুখ দেখাদেখি পর্যন্ত বন্ধ হয়ে গিয়েছিল বিয়ের দেনাপাওনার জের নিয়ে।

বিয়ের আগে দেওয়াথোয়া নিয়ে যখন কচলাকচলি অর্থাৎ টাগ অফ ওয়ার চলছিল তখন স্বপনের হবু শ্বশুর গড়পাড়ে যার দু-দুটো নিজের বাড়ি যার মেশিনারি পার্টসের মস্ত দোকান বলে বসলেন আমি আমার মেয়েকে পুরো চল্লিশ ভরি সোনার গয়না দিয়ে সাজিয়ে গুছিয়ে দেব। কিন্তু পাল্টা আপনাদেরও একটা কাজ করতে হবে—

কি?

দশ-বারো ভরি সোনা দিয়ে একটি 'সাতসর' বা দেবছন্দ হার বানিয়ে দিতে হবে আমার মেয়েকে!

দেবছন্দ হার! স্বপনের কাকারা মাথা চুলকোতে লাগল।

হো-হো করে তাচ্ছিল্যের হাসি হেসে গড়পাড়ের ভদ্রলোক বলেছিলেন আপনারা কাপড়ের দোকান করেন—আপনারা কি করে এসব আলট্রা মডার্ন ডিজাইনের অরণামেন্টের নাম শুনবেন। বলেই ভেতরের ঘরের পর্দার দিকে তাকাতেই স্বপনের শাশুড়ি বেরিয়ে এসে বলেছিলেন আগেকার কালের বাঙ্গালী মেয়েরা পরত—আচ্ছা আমাদের স্যাকরাই বানিয়ে দেবে—

আপনারা শুধু বারো ভরি সোনার দামটা মানে টাকাটা আমাদের দেবেন গড়পাড় তার পাইপে তামাক ঠাসতে ঠাসতে বললেন ওটা আমি আর পারলাম না—মিসেসের বড্ড শখ তাঁর মেয়ের গলায় দুলবে দেবছন্দ—

সাত পাঁচ কিছু না ভেবে গণেশ কাটরার সেই যৎসামান্য পুঁজির ছোট কাপড়ের ব্যবসার হাল হকিকৎ নিয়ে একবারও মাথা না ঘামিয়ে ভাইদের সঙ্গে আলোচনা না করে স্বপনের বাবা দুম করে বললেন—বেশ তাই হবে—তবে বিয়ের তিনমাসের ভেতরে—

সেই হল কাল। অশান্তির সূত্র হল সেটাই—সেই দেবছন্দ হারই যে গোখরো সাপের মত তার সুখের সংসারে বিষ ঢালবে ঝলকে ঝলকে তা স্বপনের বাবা কল্পনাও করতে পারেনি।

এ জগতে হায় সেই বেশি চায় আছে যার ভুরি ভুরি।
রাজার হস্ত করে সমস্ত কাঙ্গালের ধন চুরি।

বড়লোকদের এই প্রকৃতি—এই—মানসিকতা কি করে জানবে ভাব ভোলা মানুষ স্বপনের বাবা। মনে হয় পয়সাওয়ালা বেয়াইয়ের কাছে নিজের প্রেস্টিজ দেখাতে গিয়েই প্রমিস করে বসেছিল। ভুলে গিয়েছিল তারা পূর্ব বাঙলা থেকে ভিটেমাটি ছেড়ে আসা রিফিউজি। বেমালুম ভুলে গিয়েছিল সেই কাটা কাপড়ের সামান্য দোকানটুকুর ওপরে তাদের বাড়ির অতগুলো প্রাণীর পেটে দানাপানি পড়ে।

মেয়ে যখনি বাপের বাড়ি আসে তখনি বাবা-মা দুজন দুদিক থেকে খোঁচায়। যা মুখে আসে তাই বলতে থাকে। মেয়ে আর কি করবে—বলে মা-কে—দেবছন্দ হার কি তোমরা বানিয়ে দিতে পারতে না।

সেই ফুলবাগানের পয়সাওয়ালা জাঁদরেল দিদির উদ্দেশে আক্ষেপ করতে থাকে তারা—দিদি যে বাহাদুরি দেখাতে গিয়ে কী করে বসল স্বপনের শাশুড়ি মেয়েকে বুকে টেনে নিয়ে কাঁদো কাঁদো হয়ে বলল হ্যাঁ রে দু'বেলা পেট ভরে খেতে দেয় তো?

বারুদের স্তূপের ভেতরে গিয়ে দাঁড়াল হতভাগা নেশাখোরের বাবা হাত দুটো কচলে যেই বলতে গেল, আরও একটা মাস সময় দিন বেয়াইমশাই—

যান যান ফালতু নষ্ট করার মত সময় আমার নেই, গর্জন করে উঠল গড়পাড়ের মেশিনারির মার্চেণ্ট—একেবারে ঘেয়ো কুকুরের মত দূর দূর করে তাড়িয়ে দিল স্বপনের বাবাকে।

মনে হয় তাতেই শান্ত হল না গড়পাড়। পরদিন ভোরে কাক ডাকতে না ডাকতে নিজের অ্যাম্বাসাডার হাঁকিয়ে মেয়েকে নিয়ে চলে গেল।

স্বপনের বাবা এবং কাকারা কেউ একটা কথা বলতে সাহস করল না। স্বপনের মা—ছেলের মা হয়েও ভীতু একটা বিড়ালছানার মত দাঁড়িয়ে রইল। ঠিক তারপর দিন—

পরদিন দোকান থেকে ফেরার পথে চেতলা পার্কের কাছে আসতেই হঠাৎ স্বপনের বাবার মাথাটা ঘুরে গেল। সেইখানেই পড়ে গেল মুখ থুবড়ে। সব শেষ!

সেলিব্রাল থ্রম্বসিস।

বাজ পড়ল স্বপনের মাথায়।

বাপের শ্রাদ্ধশান্তি নমো নমো করে সারতে না সারতেই কাকাদের ঘরে ঘরে আলাদা হাঁড়ি চড়ল। দোকানে তিনভাইয়েরই পুঁজি ছিল। তাই স্বপনকে কিছু টাকা ধরে দিয়ে কাকারা তাদের পৃথক করে দিল। বাড়িটাও তিনভাই মিলে টাকা ঢেলে করেছিল। তাই স্বপনরা যে দুটো ঘরে ছিল, সেই দুটোই বহাল থাকল। দাদা নেই বলে ভাইপো-বৌদিকে ভাসিয়ে দেয়নি কাকারা।

কিন্তু স্বপনের ঘাড়ে বিয়ের যুগ্যি বোন। তাছাড়া ছয় ছয়টি প্রাণীর পেটের ভাত কি করে জোগাবে সে। তার তো কাজ কারবার সেই নমো নমো। তাও কোন কোন দিন হয়ত একেবারে পকেট ঠন ঠন করে ফিরে আসতে হয়। অভাবে শোকে স্বপনের মা দিনে দিনে কেমন হিংস্র হয়ে ওঠে। আঠারো উনিশ বছরের মেয়ের গায়েও হাত তুলতে কসুর করে না। ছোট ছোট ভাইবোনগুলো মায়ের ত্রিসীমানা মাড়ায় না।

কোনদিন আধপেটা, কোনদিন পুরো হরিমটর, সামান্য আটা গোলা জল খায় তারা। খিদের জ্বালায় বাচ্চাগুলো কাঁদে। যত কাঁদে মা তত পেটায়। বাড়িতে সকাল সন্ধ্যা কুকুর কীর্তন!

স্বপন।।

ধীরে ধীরে নিজেকে সরিয়ে নেয়। সরিয়ে নেয়, দূরে অজানা একটা অন্ধকার

জগতে। বাড়ি ফেরে গভীর রাতে। তখন তাকে চেনা যায় না। চোখদুটো কেমন ঘোলা ঘোলা ও ঝুলে পড়া। টলতে টলতে গিয়ে কোনরকমে নিজের বিছানায় গিয়ে ধপাস করে আছড়ে পড়ে—

মা চেঁচামেচি করে। কান্নাকাটি করে। কে শুনছে? স্বপন তখন নেশার ঘোরে পাথরের মত ঘুমের ভারে কোন অন্ধকার অতলে হারিয়ে গিয়েছে।

এই হল—স্বপন পালের কেসহিস্ট্রি!

কিন্তু—এসব পেশেন্টের অভিভাবক বা বাবা-মা-রা সব কথা খোলাখুলি কখনো ডাক্তারের কাছে বলে না। আর রোগী বা নেশাখোরের পেটে বোমা মারলেও তো একটা কথা বেরবে না। গাঁজা টেনে কি ব্রাউন সুগারের ধোঁয়া টেনে শিবনেত্র হয়ে বসে থাকে। আবার কেউ কেউ অত্যন্ত বেশি কথা বলে অতিরিক্ত স্মার্টনেসে নিজের দোষটাকে চাপা দিতে চেষ্টা করে থাকে। সায়ক্রিয়াটিস্টদের ভাষায়—

এক্সট্রোভার্ট!

স্বপন রাত করে বাড়ি ফিরত।

ফিরত হেরোইন খেয়ে। স্ম্যাক (হেরোইন) খেতে শুরু করেছিল তার বিয়ের পর থেকে। গড়পাড়ের বড়লোকের মেয়েটি বাপের বাড়ি থেকে সোনাদানা আর অনেক দামী দামী শাড়ির সঙ্গে অশান্তির অভিশাপও নিয়ে এসেছিল—এসব তার বড়কাকা ডাক্তারের কাছে বলেছিল। আরও জানিয়েছিল কখনো পেশেন্ট হড় হড় করে বমি করে ঘর ভাসিয়ে দিচ্ছে। কখনো দেওয়ালে মাথা ঠুকছে। কেমন পাগলের মত হয়ে গিয়েছে।

তাকে ডাক্তারের নার্সিং হোমে ভর্তি করে চলে গিয়েছিল। সায়ক্রিয়াটিস্ট এবার জেরা করে করে বের করেছিলেন ভেতরের আরও অনেক—অনেক গোলমাল—

(ক) স্বপন তার বিয়ের দুই বছর আগে থেকেই একটু আধটু নেশা করত তার বন্ধু এবং সহকর্মী ফুটের হকাররা মিলে—একটু বেশি বিক্রিটিক্রি হলে স্ফূর্তি করতে খেত গাঁজা বা হ্যাসিস—সেটা রেগুলার নয়—ক্যাজুয়াল।

(খ) তারও দুই বছর আগে যখন অফিসে চাকরি করত তখন মাঝে সাজে খেত বন্ধু-বান্ধবদের সঙ্গে—ম্যানড্রেক্স। সেটাও তেমন নিয়ম করে নয়। আবার কখনো বা খেত প্রোড্রাগ—হয়ত কোন পুজো আর্চায় কি আনন্দ উৎসবে খেত সিদ্ধি।

(গ) বিয়ের পরে যখন সংসারে দারুণ অশান্তি শুরু করেছিল তখন ধরেছিল—সব ড্রাগের শিরোমণি—

হেরোইন।

অ্যাডিক্ট নিয়ে যারা নাড়াচাড়া করে থাকেন—সেই সায়ক্রিয়াটিস্টরা সবাই একবাক্যে বলেছেন হেরোইন সম্বন্ধে—

Once you have your first shot you think you won't get addicted again. But you are the slave from the very first shot.

হেরোইন অক্টোপাস বা ভ্যাম্পায়ারের মত একবার—মাত্র একবার খেলেই হল তাকে পাকে পাকে জড়িয়ে ধরে পিষে রক্ত শুষে খেয়ে নেবে। কিন্তু নেশাখোররা মনে করে খাই না একবার—আর কখনো ছোঁব না। তা—

হয় না। জয় পাউডারের কেনা গোলাম হয়ে যায়।

কেসহিস্ট্রি শুনে ডাক্তারবাবু নোট করলেন—

(১) বেকার, (২) অত্যন্ত গরীব, ভাল করে খেতে পায় না, (৩) নোংরা একটা বস্তি ঘেসা অ্যাস্টবেস্টস শেডের নড়বড়ে বাড়ি, (৩) ব্রোকেন ফ্যামিলি অর্থাৎ ঝগড়া ঝাঁটি মনোমালিন্যে ছিন্নবিছিন্ন একটি পরিবার থেকে এসেছে পেশেন্ট, (৪) আনলাভড —তাকে কখনোই কেউই ভালবাসেনি। স্নেহ-প্রীতি-মায়ামমতা তার কাছে একেবারে অজানা, (৫) উইদাউট হোপ অ্যা ভিজ্ঞান—অন্ধকার ভবিষ্যৎ। আগামী দিনগুলোর জন্য কোন পরিকল্পনা নাই। আশা আকাঙ্খা কিছুই নেই। তাই —তার কাছে Drugs were the only way of escaping the reality of his existence···অর্থাৎ তার জীবনের রূঢ় বাস্তব থেকে পালিয়ে বাঁচার জন্যই সে নেশা করতে শুরু করেছিল।

পেশেন্টকে শুধু পর পর তিনদিন ক্রস বা জেরাই করলেন না—একজামিনও করলেন। দেখলেন হেরোইন অ্যাডিক্ট হলেও চোখের দৃষ্টি, কথাবার্তা বেশ নরমাল।

মেডিসিনাল ট্রিটমেন্ট অর্থাৎ আউটডোরে দেখিয়ে বেশ কয়েকদিনের ওষুধ দিয়ে ছেড়ে দিলেন। বললেন—সপ্তাহে অন্তত একবার এসে আউটডোরে দেখিয়ে নিতে হবে।

প্রায় মাস চারেক এইভাবে ট্রিটমেন্ট চলল। তারপরে হঠাৎ একদিন আসা বন্ধ করল স্বপন। আর এলই না চেম্বারে। তারপর স্বপনের কি হল, কেমন আছে সে—কোন কিছুই জানা যায় না। ডাক্তারবাবু তার বাড়ির ঠিকানায় লোক পাঠিয়ে খোঁজ নিয়েছিলেন।

লোক ফিরে এসে জানাল স্বপনরা বাড়ি ছেড়ে কোথায় চলে গিয়েছে কেউই বলতে পারে না। কাকারাও তাদের কোন খোঁজখবর জানে না। কিম্বা জানে—বলতে চায় না—সেসব অবান্তর।

সায়ক্রিয়াটিস্ট জানালেন এইসব কেসে দুরকমের পরিণতি হয়। পেশেন্ট একেবারে ড্রাগ খাওয়া ছেড়ে দিয়ে বেশ সুস্থ স্বাভাবিক জীবনে ফিরে এসে আবার কাজকর্ম করে নিজের পায়ে দাঁড়াতে চেষ্টা করে।

আর একটা হল—আরও বেশি ডিপ্রেসড বা হতাশ হয়ে গিয়ে নিজের ব্যর্থ জীবনের অবাঞ্ছিত অস্তিত্বকে মুছে ফেলতে চায় দিনের পর দিন ওভারডোজ ড্রাগ খেয়ে।

স্বপন পালের কেসহিস্ট্রি শুনে আমার—আমার মনে হয়েছিল দুঃখবাদী জার্মান

দার্শনিক নীৎসের (Nietzsche) সেই বিখ্যাত উক্তি—

That lies should be necessary to life, is part and Parcel of the terrible and questionable character of existence

জীবনের ভয়ঙ্কর জটিল এবং বিতর্কিত অস্তিত্বের জন্যই কতগুলো মিথ্যার বেসাতির একান্ত প্রয়োজন—

বলা দরকার ড্রাগ বিশেষজ্ঞ বেন হুইটেকার (Ben Whitaker) পৃথিবীর প্রায় সমস্ত দেশের ড্রাগের নেশার গতিপ্রকৃতি বা ড্রাগ অ্যাবিউসের সমীক্ষা প্রসঙ্গেই নীৎসের এই উদ্ধৃতিটি দিয়েছিলেন। 'দ্যাট লাইজ' বা মিথ্যার বেসাতি হল ড্রাগ—হেরোইন হ্যাসিস কি এল. এস. ডি রূঢ় বাস্তব থেকে স্বার্থকোলাহল আর হতাশা বিষাদে দীর্ণ-বিদীর্ণ জীবন থেকে মানুষকে এক অপার্থিব আনন্দলোকে নিয়ে যায়—যেতে পারে।

সেই সমাজসেবা প্রতিষ্ঠানের উদ্যোগে বহু বাধাবিঘ্ন অতিক্রম করে দক্ষিণ কলকাতায় শুধু অ্যাডিক্টদের জন্য নার্সিংহোম প্রতিষ্ঠিত হল। তাঁদের বহুদিনের পরিকল্পনা বাস্তবে রূপায়িত হল। অভিজ্ঞ ও বহুদর্শী সায়ক্রিয়াটিস্ট এবং সাইকোলজিস্ট নিযুক্ত করা হল। এই নার্সিংহোমের রেকর্ড থেকে এখানে কয়েকটি কেসহিস্ট্রি সংক্ষেপে বলা হল।

২৩ বছরের এক যুবক। সমীরণ দাস। ক্লাস এইট পর্যন্ত পড়েছে। নিম্নমধ্যবিত্ত এক পরিবার থেকে এসেছে। বেকার। চায়ের অর্ডার সাপ্লায়ার। চা কিনে নিয়ে দোকানে দোকানে সাইকেলে ঘুরে ঘুরে বিক্রি করে।

কঠোর পরিশ্রমী। উচ্চাভিলাষী। তার স্বপ্ন ছিল—তাদের লোকালিটিতে একটা বড় করে চায়ের দোকান করবে। দোকানের একটা মস্তবড় সাইনবোর্ড টাঙ্গাবে। তার ভেতরে আঁকা থাকবে—যতদূর চোখ যায় চাগাছের নিস্তরঙ্গ সবুজ সমুদ্রের দিগন্তবিসারী ছবি। আর ঘন সবুজের পটভূমিতে জ্বলজ্বল করবে দোকানের নাম—

ওয়েসিস।

ক্লাস এইট পর্যন্ত পড়লে কি হয়, সমীরণের কবিতার হাত বেশ ভাল। পড়াশুনা হল না। হল না তার বাবার জন্য। প্রচণ্ড ড্রিঙ্ক করতেন। মদ খেয়ে টলতে টলতে পুরো মাতাল হয়ে নিশিরাতে বাড়ি ফিরে আসতেন। মা কিছু বলতে গেলেই শুরু হয়ে যেত মারপিট চিৎকার অশান্তি।

বাবা চাকরি করতেন একটা মার্চেন্ট ফার্মে। মাইনেও খারাপ ছিল না। কিন্তু একটা ফার্দিং মা-র হাতে দিতেন না। সংসার চালাতেন তিনি। ডেলি বাজার, গোটা মাসের মুদিখানার মশলাপাতি থেকে শুরু করে স্টেশনারির পেস্ট, নারকেল তেল—সব নিজে কিনে এনে মাকে ফেলে দিতেন কিন্তু—

ওই এক দোষ। যত দিন যেতে লাগল ততই তার মদের মাত্রা বাড়তে লাগল। সংসারে টান পড়ল। সারা মাসে হয়ত মুশুরির ডাল লাগবে তিন কিলো। সেখানে এল দেড় কিলো। মা গাইগুঁই করতে গেল কি লেগে গেল। শেষপর্যন্ত অবস্থা

করুণ হয়ে উঠল।

সে একমাত্র সন্তান। বাবা, মা আর সে। তিনটি—মাত্র তিনটি প্রাণীর সংসার। খানেওয়ালা কম। তাই ব্যাঙ্কেও বাবা কিছু রাখতেন। সেই ব্যাংক থেকেও টাকা তুলে তুলে বোতলে উড়িয়ে দিতে লাগলেন।

আর স্কুলের মাইনে দেওয়া হত না।

নাম কেটে দিল। পড়াশোনা ডকে উঠল। সাইকোলজিস্ট বলেছিলেন স্বপনের বেশ মনে আছে—যেদিন হেডমাস্টার মশায় ডেকে মিষ্টি করে বলেছিলেন সমীরণবাবুকে বলবে—পুরো তিন—তিনটি মাসের মাইনে বাকি পড়েছে—আমি তো তোমার নামটা রেজিস্টারে রাখতে পারব না বাবা—

মাথা নিচু করে চলে এসেছিল সমীরণ। চোখদুটো ফেটে জল এসে পড়েছিল। বাবাকে বলবে স্কুলের মাইনের কথা। তার বাবা তো থেকেও নেই।

লেখাপড়ায় ভাল ছিল বলেই তো হেডস্যার ডেকে নিয়ে বলেছিলেন। সেই লেখাপড়াই শুধু বন্ধই হয়ে গেল না, দুবেলা পেট ভরে খেতেও পেত না। মোটের ওপর মদ তাদের সুখের সংসারটাকে একেবারে সর্বনাশা একটা স্রোতে ভাসিয়ে দিয়েছিল—

হাল ধরেছিল সমীরণ।

ধরতেই হয়েছিল। না, বাবার সঙ্গে ঝগড়া করেনি। তাঁকে ঘাটায়নি। মা-র পাশে এসে দাঁড়িয়েছিল। তার শক্ত দুটো হাতের ভেতরে মার হাত নিয়ে বলেছিল মা—তুমি চিন্তা কর না। আমি—

তার কথা শেষ করতে দিলেন না মা। তাকে বুকে জড়িয়ে অঝোর কান্নায় ভেঙ্গে পড়লেন।

সমীরণ চায়ের ব্যবসা শুরু করল। দুটো পয়সা আসতে লাগল। সারাদিন—সাইকেল ঠেলে ঠেলে সারা কলকাতায় টো টো করে ঘুরেও তার এতটুকু ক্লান্তি লাগত না। সন্ধ্যায় ফিরে এসে বইখাতা নিয়ে বসত। কবিতা লিখত চেতলার এক সাংস্কৃতিক সংস্থার মুখপত্র—'শঙ্খে' তার কবিতা ছাপা হত। আর যত কালচারাল প্রোগ্রাম—নববর্ষ, কি বর্ষবিদায়, বা বিজয়া সম্মেলনীতে সমীরণ একেবারে মত্ত হয়ে উঠত। নাওয়া খাওয়া ভুলে যেত।

চেহারাটা সুন্দর নয়। কিন্তু—

সুশ্রী। চোখেমুখে বুদ্ধির ছাপ আছে। তাই পাড়ায় প্রত্যেকেই তাকে ভালবাসত। এই পপুলারিটি তার বিজনেসকেও নিশ্চয়ই হেল্প করত দিনে দিনে তার খদ্দের বাড়তে লাগল। তার রোজগারের অংকও বেড়ে গেল।

মা খুশি—খুব খুশি।

কিন্তু তার কপালে সুখ ছিল না।

সমীরণের কেসহিস্ট্রি বলেছিলেন নার্সিংহোম বা ডি-অ্যাডিক্টস রিহাবিলেটেশান

সেণ্টারের (Deaddicts Rehabilation Center) সাইকোলজিস্ট ভারতী বসু। সায়কিয়াটিস্ট বা মানসিক ব্যাধির ডাক্তাররা পেশেণ্টকে একজামিন করার আগে তিনিই হতভাগ্য মাদকসেবীদের হিস্ট্রি নোট করেন। বলা নিষ্প্রয়োজন, জেরা করে করে খুঁচিয়ে খুঁচিয়ে তার সর্বনাশের কালো খাদে পা হড়কে যাওয়ার সূত্রগুলো তাঁকেই বের করতে হয়।

কাজটা কঠিন—খুব কঠিন। কারণ—

নেশা সম্বন্ধে আজম্মলালিত সংস্কার বা ট্যাবুজ (Taboos) ইউরোপে আমেরিকায় তথা পাশ্চাত্যের প্রায় সব দেশেই নেশা চলে অবাধে। মদ বিড়ি সিগারেট চুরুট তো বাপ ছেলে একসঙ্গে বসে খাচ্ছে। কোন রেস্ট্রিকশান নেই। কোন সুপারস্টিশান নেই।

এখানে স্কুল কলেজে পড়ুয়ারা লুকিয়ে বিড়ি সিগারেট খেতে গিয়ে যদি ধরা পড়ে যায়, জানাজানি হয়ে যায় তাহলেই মা বাবা মাথায় হাত দিয়ে বসে পড়েন। পাড়াপ্রতিবেশিরা ছিঃ ছিক্কার করতে থাকেন। যারা আবার অন্যলোকের পিছনে কাঠি দেয়, দিতে ভালবাসে তারা উপর টপকা হয়ে হতভাগা নেশাড়ুর বাবা কি মাকে দুটো কথা শুনিয়ে দেয় ছেলের জন্য মুখে চুনকালি পড়ে।

ড্রাগ খেলে কি তাকে একেবারে বরবাদ করে দেওয়া হয়। তাকে সবাই ঘেয়ো কুকুরের মত তাড়িয়ে দেয়। তাই ড্রাগ যারা খায়—তারা খায় চুপেচাপে, লুকিয়ে—যেন মারাত্মক কোন অন্যায় কাজ করছে। মনের অবচেতনায় একটা পাপবোধ তাল তাল কাদার মত জমতে থাকে। মনের ওপরে এই প্রচণ্ড চাপে তারা কেমন আনব্যালান্সড হয়ে যায়। মনের স্থৈর্য বা ইকুলিব্রিয়াম (Equilibrium) হারিয়ে ফেলে —একটু থামলেন ভারতী। কিছুক্ষণ কি ভেবে শান্ত এবং দৃঢ় গলায় বললেন, আমার তো মনে হয় ড্রাগের চেয়েও বেশি হার্মফুল—বেশি ক্ষতি করে আমাদের ড্রাগ সম্বন্ধে এই কনজারভেটিব আউটলুক্, একটা দীর্ঘশ্বাস ফেলে তিনি আবার বললেন সমীরণের কেসহিস্ট্রি শুনলেই বুঝতে পারবেন—ড্রাগের নেশা নিয়ে এই ঘেন্না নিন্দামন্দ ঢাক ঢাক গুড় গুড় অর্থাৎ আমাদের সুপারস্টিসাচ এই মেণ্টাল অ্যাটিচুড (Mental attitude) তার কী দারুণ সর্বনাশ করেছিল—

চায়ের বিজনেস করে কষ্টেসৃষ্টে চালাচ্ছিল সমীরণ। হঠাৎ একটা চাকরির অফার এসে গেল এমপ্লয়মেণ্ট এক্সচেঞ্জ থেকে। বছর ছয়েক আগে নাম রেজিস্ট্রি করেছিল। কল এল এখন—

চাকরিটা পোর্টে।

লেবারের চাকরি। ক্লাস এইট বিদ্যায় আর এর চেয়ে বেশি কি হবে। কিন্তু—সমীরণ উৎফুল্ল হয়নি। আনন্দে বিকচ্ছ হয়নি। কবি মানুষ। জাহাজ থেকে মাল খালাস করা, আবার ওয়াগানে লোড করা। কুলিকামিনের চাকরি। তার মন বেঁকে বসেছিল। কিন্তু মাইনেটা বেশ মোটা। মা জিদ ধরলেন—সাইকেল ঠেলে ঠেলে দোকানে দোকানে ফেরি করার চেয়ে কি একটা জায়গায় বসে চাকরি ভাল

নয়? হাতের লক্ষ্মী পায়ে ঠেলতে নেই।

পোর্টের সেই চাকরিই—কাল হল।

তার সঙ্গে যারা কাজ করত তারা কেউ খায় মারিজুয়ানা, কেউ খায় কোব্যাল (Coball—Spanish Heroine) আবার কেউ বা খায় হেভেনলি সানসাইন (Heavenly Sunnshine—দামী এল. এস. ডি.)।

এই সহকর্মী বন্ধুরাই সমীরণকে ড্রাগ ধরাল। সমীরণের মনে হয়েছিল কবি সাহিত্যিকরা অনেকেই তো নেশা করে থাকেন। সে শুনেছে নেশা করলে মনটা অন্তর্মুখী হয়। তর তর করে হাত দিয়ে ধারাল লেখা বেরোয়। আর—

জীবনটাও তো একঘেয়ে হয়ে গেছে—মনোটোনাস। দেখিই না ড্রাগ খেয়ে, কেমন লাগে—থেমে গেলেন ভারতীদেবী। কেন যেন তাঁর ধারাল মুখখানা স্নিগ্ধ হাসির আলোয় উজ্জ্বল হয়ে উঠল।

বৈচিত্র্যের স্বাদ পাওয়ার জন্য এবং একটা 'কিউরিওসিটি'—দেখি কি না হয় ভেবেই সমীরণ ড্রাগ ধরেছিল। এখানে যখন এসেছিল তখন একেবারে কাহিল অবস্থা, তার মা নিয়ে এসেছিল। তিনি কেঁদে বললেন আমার আর কেউ নেই—

ডাক্তারবাবুও লক্ষ্য করলেন যদিও হেরোইন অ্যাডিক্ট—কিন্তু খুব ভেরুলেন্ট নয় —এখনও ফিয়ারস হয়ে ওঠেনি। আর সবচেয়ে গুড সিম্পটম—পেশেণ্ট বারে বারে ব্যাকুল হয়ে বলছে—আমাকে ভাল করে দিন—আমি আর ওসব ছাই পাঁশ ছোব না—

সমীরণকে নার্সিংহোমে ভর্তি করা হল। ইনডোর পেশেণ্ট করে নেওয়ার কারণ হল—একটু কেয়ার নিলেই পুরোপুরি তাকে ড্রাগ ফ্রি করা যেতে পারে—তাহলে নতুন রিঅ্যাডিক্টস সেণ্টারের খ্যাতি বাড়বে।

ঠিক পনের দিন তাকে রাখা হয়েছিল। আশ্চর্য ড্রাগ বন্ধ করলে বা উইথড্রয়ালে যেমন পেশেণ্ট অস্থির হয়ে ওঠে, সেই রেস্টলেস ভাবটা সমীরণের ছিল মাত্র সাত দিন। তারপরেই বেশ শান্ত আর স্বাভাবিক হয়ে উঠেছিল। এবার সায়কিয়াটিস্ট সাইকোলজিস্ট ভারতীদেবীকে পেশেণ্টকে কাউনসেলিং অর্থাৎ সদুপদেশ এবং জীবন সম্বন্ধে উদার ও মহৎ উপলব্ধির কথা শোনানোর নির্দেশ দিলেন।

—তুমি ঈশ্বরে বিশ্বাস কর?

—ঈশ্বর বুঝি না।—তবে আমার মনে হয় একটা অদৃশ্য শক্তি আমাদের চালাচ্ছে।

—বাঃ বেশ! সেই যে মহাশক্তির কাছে তোমার মাথা নত করতে ইচ্ছে করে না?

—করে।

—তোমার বলতে ইচ্ছে করে না সমীরণ

আমার মাথা নত করে দাও হে তোমার চরণধুলার তলে।
সকল অহংকার হে আমার ডুবাও চোখের জলে॥

জান সমীরণ আমরা আমাদের স্বার্থ কামনা বাসনা আর অহং অর্থাৎ আত্মম্ভরিতা নিয়ে ঘুরপাক খাচ্ছি। কখনো একমুহূর্তের জন্যও ঈশ্বরের কথা চিন্তা করি না।

কখনো একবার মাথার ওপরের ওই বিপদব্যাপ্ত আকাশটার দিকেও তাকাই না—

—বলুন-বলুন দিদি এমন করে কেউ কখনো কোনদিন আমাকে—

—আমাদের অবস্থাটা কি জান—

আপনারে শুধু ঘেরিয়া ঘেরিয়া ঘুরে মরি পলে পলে—

তুমি বৈচিত্র্যের আকর্ষণে হেরোইন খেতে শুরু করলে—তুমি চাইলে ড্রাগের নেশার মৌতাতে আনন্দ পেতে—তুমি—তুমি তোমার নিজের কথাই ভেবেছ—একবারও তুমি ভাবলে না তোমার মার কথা। তিনি তোমার বাবার উচ্ছৃংখলতায় সারাজীবন কষ্ট পেয়েছেন—তোমাকে নিয়ে তাঁর কত আশা—কত স্বপ্ন—[ভারতীদেবীর কণ্ঠস্বর ধীরে ধীরে খাদে নেমে আসে।]

সমীরণের চোখ ফেটে জল এসে পড়ে। কান্না জড়ানো কেমন অস্পষ্ট আর ঝাপসা গলায় বার বার যেন নিজেকেই শুনিয়ে শুনিয়ে বলতে থাকে—

ভুল—ভুল করেছি—আর কখনো খাব না—কোনদিন না। আমি আবার—আবার মাথা তুলে দাঁড়াব। আমার দুঃখিনী মা-র মুখে হাসি ফোটাব—নিস্তব্ধ ঘরে সমীরণের কথাগুলো যেন দূরাগত মন্ত্রোচ্চারণের মত মনে হল—

ভারতীর মুখে সাফল্যের হাসি ঝকমক করতে লাগল।

শোন সমীরণ যখুনি নেশা করতে ইচ্ছে করবে, যখুনি গোখরো সাপটা তোমাকে ছোবল দিতে আসবে—তখন তুমি এই মন্ত্র বলবে ভাই—

যস্ত্বাত্মরতিরেব স্যাদাত্মতৃপ্তশ্চ মানবঃ
আত্মন্যেব চ সন্তুষ্টস্তস্য।
কার্য্যং ন বিদ্যতে ॥

—মানে একটু বলে দেবেন দিদি—

—হ্যাঁ বলব—নিশ্চয় বলব—যে মানুষ কেবল নিজের আত্মাতেই প্রীত, যিনি নিজের আত্মাতেই তৃপ্ত। সন্তুষ্ট। তার কোন কর্মবন্ধন (স্বার্থবাসনাকেন্দ্রিক কাজ) থাকে না। কয়েকমুহূর্ত কি ভাবলেন ভারতীদেবী। খুব আস্তে আস্তে যেন অনেক—অনেক দূর থেকে মৃদু নম্র কণ্ঠে বললেন নিজের মনের ভেতরেই সৌন্দর্যের ভুবন তৈরি কর ভাই—সমস্ত কুচিন্তা মন থেকে ঝেড়ে ফেলে—মনটাকে সৎ ও মহৎ চিন্তায় ভরিয়ে তোল—

হঠাৎ থেমে গেলেন তিনি—

সমীরণ কাঁদছে।

কাঁদছে নিঃশব্দে।

এলিমেণ্টটা ভাল ছিল, ভারতীদেবী বললেন তাই সাকসেসফুল হয়েছি। সমীরণ এখন অন্যমানুষ—আর ড্রাগ স্পর্শ করে না—বেশ মন দিয়ে বিজনেস করছে—কথাগুলো বলছেন। বেশ আনন্দের কথা—সুখের কথা। কিন্তু তাঁর গলাটা কেমন ভার ভার। মুখে বিষাদের ছায়া থম থম করছে।

কি হল—মিস্‌ বসু—

পরেশের জন্য কিছুই করতে পারলাম না—জানেন ?

পরেশ ?

হ্যাঁ। পরেশ গুহ। সে পাঁড় নেশাখোর হয়ে আমাদের কাছে এসেছিল—যেমন অন্ধকার বহন করে এসেছিল তেমনি ঘন অন্ধকার নিয়েই চলে গেল—যেতে হল—ভারতীদেবী মাথা নিচু করলেন।

পরেশ গুহ।

বয়স—২৩। পড়াশুনা—বি কম পর্যন্ত। অবিবাহিত। পৈতৃক ব্যবসায় নিয়োজিত।

স্বাস্থ্য—সুগঠিত। মুখশ্রী—সুন্দর ধারাল। ব্যক্তিত্বব্যঞ্জক।

স্বভাব—অস্বাভাবিক গম্ভীর। কিসের যেন ভাবনায় তলিয়ে থাকে। থেকে থেকেই মা কালীর ধ্যানের স্তোত্র বলে। ধর্মের দিকে ঝোঁক আছে—রিলিজিয়াস টেম্পারামেণ্ট।

পরেশ হেরোইন অ্যাডিক্ট। গত দুই বছর থেকে ব্রাউন সুগার খাচ্ছে। দিনে দিনে তার ডোজ বেড়েছে। কখনো কখনো সে নিজে ইনজেকশান করেও লিকুইড হেরোইন পুস করে। দেহ শীর্ণ। চোখদুটো গর্তে ঢোকা, দেখলেই মনে হয় ঘুমের ভারে চোখের পাতা দুটো খুলতে পারছে না। নেশার আচ্ছন্নতার ভেতরে তলিয়ে গিয়েছে। লুপ্ত হয়ে গিয়েছে তার বাইরের পৃথিবী!

পরেশকে তার বাবা কি মা কিম্বা তার কোন নিকট আত্মীয় নার্সিংহোমে নিয়ে আসেনি। নিয়ে এসেছিল তার এক প্রধান প্রতিবেশি। ভদ্রলোক কোন কলেজের অধ্যাপক। তিনি বলেছিলেন ছেলেটা খুব ভাল—দেখুন যদি ওকে নেশার কবল থেকে মুক্ত করতে পারেন—

পরেশ তার বাবা-মা-র একমাত্র পুত্র। তাদের আর্থিক অবস্থা বেশ ভাল। খিদিরপুর বাজারে হার্ডওয়ারের দোকান তো আছেই। তাছাড়া নাজির লেনে একটা দোতলা বাড়ি। সেই বাড়িতে পাঁচ-ছয়টি পরিবার ভাড়া থাকে। ভাড়ার ইনকামটা পরেশের বাবা সত্যেন গুহ থোক ব্যাঙ্কে জমা দিয়ে দেয়। আর দোকানের আয় থেকে সংসার চলে।

বলাবাহুল্য ছোটবেলা থেকেই পরেশ স্বাচ্ছল্যের ভেতরে বড় হয়েছে। কিন্তু বাবা প্রচণ্ড বদরাগী। ভয়ানক প্রভুত্বপরায়ণ। তিনি যা বলবেন, করতে হবে—এক্সট্রা অর্ডিনারি ডোমিনেটিং—

মা অত্যন্ত স্বার্থপর স্বভাবের। পরেশের কখনো মনে হয় না, তার মা কোন দিন কাছে ডেকে নিয়ে দুটো মিষ্টি কথা বলেছে। কখনো মনে করতে পারে না—মা তার সামনে বসে তাকে কখনো আদর করে খাইয়েছে।

আর বাবার ব্যাপারটা আরও—আরও আশ্চর্যের এবং দুঃখেরও। তখন পরেশের

বয়স প্রচার। ফুটবলের চ্যারিটি ম্যাচ দেখতে গিয়েছিল বিবেকানন্দ পার্কে। সত্যেন-বাবু বাড়িতে ফিরে দেখলেন পরেশ তখনো ফেরেনি। তার বোধহয় ছাতির কোন দরকার ছিল। দেখলেন ছাতি যেখানে থাকে সেখানে নেই।

পরেশের মা ভয়ে ভয়ে জানালেন পরেশ নিয়ে গিয়েছে। বৃষ্টি হচ্ছিল তাই—

সঙ্গে সঙ্গে গৃহমশাই রেগে আগুন হয়ে গেলেন। চোখ মুখ হিংস্র হয়ে উঠল। পরেশ ছাতি নিয়ে যাওয়া মানেই ছাতিটা খোয়া যাওয়া। স্রেফ ভুলে যাবে। যেই পরেশ বাড়িতে ফিরে এল অমনি তার বাবা তার ওপরে ঝাঁপিয়ে পড়লেন। বেধড়ক মারতে লাগলেন, যন্ত্রণায় চিৎকার করে উঠল পরেশ।

তার মা তখন বাইরের বারান্দায় পাড়ার মেয়েদের সঙ্গে মেয়ে গজালিতে ব্যস্ত। ছেলের চিৎকার চেঁচামেচি শুনেও ভ্রূক্ষেপ করলেন না। পরেশ ঠিক একটা ঘা-খাওয়া কুকুরের মত যন্ত্রণায় আর্তনাদ করে ছুটে পালাল।

সবচেয়ে দুঃখের—পরেশ কিন্তু ছাতা হারায়নি। ছাতি সে ঠিক ঠিক নিয়ে এসেছিল। যখন তার বাবা তাকে এলোপাথাড়ি মারতে শুরু করল তখনো সেই ছাতি তার হাতেই ছিল। সত্যেনবাবুর এত বেশি রেগে যাওয়ার কারণ হল—তাকে না বলে কেন পরেশ ছাতি নেবে—

শুধু ছাতি কেন। এ বাড়ির লোককে প্রতিটি পা ফেলতে হবে তার মতামত নিয়ে।

আরো একদিন।

পরেশদের বাড়ির একেবারে লাগোয়া পার্কে ফুটবল খেলছিল পরেশ। হঠাৎ বলটা তীরবেগে এসে পড়ল তাদের বসার ঘরের জানালায়। জানালার একটা পাল্লা একটু ফেটে গেল।

সত্যেনবাবু সেই ঘরেই তখন ছিলেন। দড়াম করে শব্দ হতেই চিৎকার করতে করতে বেরিয়ে এলেন—

কে—কে—কে বল ফেলল?

খেলা থামিয়ে চুপ করে দাঁড়িয়ে থাকল ছেলেরা। হঠাৎ পরেশ মাথা নিচু করে এক পা এক পা করে পিছু হাঁটতে হাঁটতে দৌড়ে যেই পালাতে গেল অমনি ছেলেরা বলে উঠল—পরেশ—পালাল—পালাল ওই তো বলটা জোর এক শট দিয়ে আপনার জানালায় মারল।

সেদিন ছেলেকে গৃহমশাই ঘরের দরজা বন্ধ করে মেরেছিলেন। মেরেছিলেন চাবুক দিয়ে। যন্ত্রণায় কাতরাতে কাতরাতে পরেশ বলেছিল—বাবা আর মের না—আর কোনদিন করব না। আমি ইচ্ছে করে মারিনি—হঠাৎ—বলটা—

তোমাকে তো কষ্ট করে বাড়ি করতে হয়নি। দিব্যি বাপের হোটেলে আছ—বলতে বলতে পায়ে পিঠে সমানে চাবুক মেরেই চলেছেন গৃহমশাই—আর বল খেলছে—জানালা ভাঙছে—

মের না বাবা—মরে যাব—চি চি করে বলেছিল পরেশ। পিঠ ফেটে রক্ত ঝরেছিল।

পাড়ারই তিন-চারজন ছুটে গিয়ে সত্যেনবাবুকে বলেছিলেন আপনি কী পাগল হয়ে গেছেন—ছেলেটা যে মরে যাবে—

তার মা একবারও আসেনি। স্বামীকে নিরস্ত করতে চেষ্টা করেনি। টিভিতে বাংলা ছবি দেখতে ব্যস্ত ছিল।

পরেশের মনে হত—মনে হওয়া স্বাভাবিক তার বাবা তাকে সহ্যই করতে পারে না।—এ পর্যন্ত বলে সাইকোলজিস্ট মিস ভারতী বসু কেমন গম্ভীর হয়ে গেলেন। আবার নিজের ভেতরে ডুবে থেকে যেন দূর থেকে বললেন মনে রাখবেন এসব ঘটনা ঘটছে পরেশের অ্যাডোলেসেন্ট পিরিয়ডে। ন্যাচারেলি—পরেশের মনে তার বাবার প্রতি শ্রদ্ধা ভালবাসা নয় ঘৃণা—চরম একটা ঘৃণার ধিক্কার তাল তাল কাদার মত জমা হতে লাগল। এই ঘৃণার কমপ্লেক্স থেকে এল প্রতিহিংসা—রিভেঞ্জ। বাবার প্রতি চরম আক্রোশে তাকে জব্দ করতেই সে হেরোইন খেতে শুরু করেছিল।

এখন কেমন?

জানি না। তবে অনায়াসেই বলা যায় জীবনের যন্ত্রণা দুঃখ ভুলে থাকার জন্য আরো—আরো বেশি করেই নেশা করছে—

পরেশের ডিঅ্যাডিকশানের জন্য নিশ্চয়ই অনেক চেষ্টাই করেছেন আমি বললাম, কিন্তু ধর্মের বাতিক ছিল—ওর কাউনসেলিং-এ রিলিজিয়াস সেন্টিমেন্টটাকে যদি কাজে লাগান যেত—

সে চেষ্টা কি আমরা করিনি ভাবছেন। পকেট গীতা দিয়েছিলাম। চমৎকার সংস্কৃত উচ্চারণ! গম্ভীর ভরাট কণ্ঠস্বর ছিল পরেশের। সময় সময় আমাকে শোনাত।

হঠাৎ একদিন বলল আচ্ছা দিদি—এই যে গীতার কর্মযোগে বলছে—

যোগস্থ কুরু কর্ম্মানি সঙ্গংতক্তা ধনঞ্জয়
সিদ্ধ্যাসিদ্ধো সমোভূত্বা সমত্বং যোগ উচ্যতে।

শ্রীকৃষ্ণ অর্জুনকে বলছেন—হে ধনঞ্জয় যোগস্থ হয়ে ফলাশক্তি বর্জন করে। সিদ্ধি—অসিদ্ধিকে সমান জ্ঞান করে তুমি কর্ম করে যাও—একটু থেমে কেমন কান্নায় ভার ভার গলায় বলেছিল দিদি কত চেষ্টা করেছি মনসংযোগ করে আমি যে কিছুই করতে পারি না—একটু থেমে আবার বলেছিল, এমন কি গীতা পড়তে গেলেও আমার মনের ভেতরে বাবার কঠোর মুখখানা ভেসে ওঠে। সমস্ত মন বিষিয়ে যায়।

নার্সিংহোম থেকে পরেশের চলে যাওয়ার ঠিক আগের দিনের ঘটনা—

পরেশ তার বাবাকে নিয়ে দুঃখ করছিল। ভারতীদেবী বলেছিলেন আচ্ছা পরেশ এই কথাগুলো কার বলো তো?

"কখনও হীন সাহস হবিনি। কেবল শুতে পরতে গাইতে বাজাতে কলরোলে কেবলই সৎসাহসের পরিচয় দিবি। ভাববি কার সন্তান? তবে কেন আমার এই দুর্বলতা? হীন বুদ্ধিহীন সাহসের মাথায় লাথি মেরে আমি বীর্যবান, আমি

মেধাবান, আমি ব্রহ্মবিৎ—বলতে বলতে দাঁড়িয়ে উঠবি—"

কেন স্বামিজীর—স্বামী বিবেকানন্দের—বলেই একটা অদ্ভুত কথা বলেছিল পরেশ শুধু বলেছিল নয়—সাংঘাতিক একটা কাণ্ডও করে বসেছিল—

কি ?

হঠাৎ বিবেকবাণী বইটি ফস করে টেনে নিয়ে ছিঁড়ে কুটি কুটি করে ফেলল। চোয়ালদুটো শক্ত হয়ে গেল। হিংস্র হয়ে উঠল চোখের দৃষ্টি। মর্মান্তিক চিৎকার করে বলল—

আমাকে হেরোইন দিন—আমি পারছি না—

চৌদ্দ

> পলাশী জয় করে ক্লাইভ যে শুধু ইংরেজ সাম্রাজ্যের বনিয়াদ স্থাপন করেছিলেন তা নয়, তিনি ছিলেন পয়লা নম্বরের আফিমখোর। এ দেশের মানুষকে ড্রাগও ধরিয়েছিলেন।

আফিম

প্রাচীন পৃথিবীর মানুষের কাছেও অজানা ছিল না আফিমের নেশার মৌতাতের বিপুল আনন্দ। ড্রাগের ইতিহাসে আছে—The pleasurable effects were known even by ancient man. খ্রীস্টের জন্মের চার হাজার বছর আগে সুমেরীয়রা (প্রাচীন ব্যবিলনের দক্ষিণ অঞ্চলের বাসিন্দা) চীনাদের মত এক সাঙ্কেতিক চিহ্ন এঁকে আফিমের মূল উৎস পপিগাছের আভাস দিয়েছিল। সেই চিহ্ন বা ইডিওগ্রাফটির নিচে ক্যাপশান ছিল 'হাল্‌গিল' (Hullgill) বা আনন্দভরু অর্থাৎ জয়প্ল্যাণ্ট (Joyplant)।

হোমারের ভুবনবিখ্যাত কাব্যগ্রন্থ ইলিয়াডেও (Illiad) আছে আফিমের উল্লেখ —এমন একটি নেশার উপকরণ যা মানুষের মনে কুপ্রবৃত্তি এবং কুবুদ্ধি জাগিয়ে দেয়। খৃস্টপূর্ব তৃতীয় শতকে গ্রীক দার্শনিক থিয়োফ্রেস্টাসও (Theophrastus) পপিপ্ল্যাণ্টের কথা বলেছিলেন। গ্রীকপুরাণের এক বিশিষ্ট চরিত্র নেপিনথি (Neppnthe) যে মনের খুশিতে আবিষ্ট হয়ে দিবানিশি বাস করত এবং ভুলে যেত বেমালুম সব কাজের কথা তার কারণ কিন্তু আফিম।

আফিম বা ওপিয়াম—এই নামটির জন্ম হয়েছে আফিমগাছের বা পপিপ্ল্যাণ্টের জুস বা রস থেকে। প্রাচীন পৃথিবীর ইতিহাস বিশেষজ্ঞদের অনুমান সুমের থেকে ব্যবিলনে চলে যায় পপিপ্ল্যাণ্ট। জ্ঞানে বিদ্যায় উন্নত ব্যবিলনের বাসিন্দাদের কাছ থেকেই পপিগাছের রস বা জুস থেকে আফিম তৈরির কৌশলটি পারস্যে নিয়ে যায় সওদাগররা। এই আরবীয় ব্যবসায়ী এবং আরব সৈনিকরাই কিন্তু ইউরোপে এবং পূর্ব এশিয়ায় ঔষধ হিসেবে আফিমের কার্যকারিতার কথা প্রথম প্রচার করেছিল। সে যুগে আমাশয়ে চিকিৎসকরা রোগিকে আফিম খেতে নির্দেশ দিতেন।

ড্রাগের গবেষকরা জানিয়েছেন পঞ্চদশ শতাব্দীতে বিজ্ঞানী প্যারাসিলসাস আফিম সম্বন্ধে যে সব তথ্য দিয়েছিলেন তা আজও বেশি করে সত্য বলে প্রমাণিত হয়ে চলছে।

১৮০৩ সালে জার্মান ফার্মাসিস্ট সারটার্ণার আফিম থেকেই মর্ফিন বা মর্ফিয়া তৈরি করে গ্রীকপুরাণের নিদ্রাদেবী মর্ফিয়াসের নামে তার নামকরণ করেছিলেন। তার উনত্রিশ বছর পরে কোকেন আবিষ্কার করেছিলেন বিখ্যাত এক রাসায়নিক রবিকোয়েটে (Robiquete)। আবার ১৮৪৮ সালে আফিম থেকেই আর এক নেশার উপকরণ

প্যাপাভেরিন (Papaverine) তৈরি করেছিলেন—আর এক রসায়নবিদ ডক্টর মার্ক।

আর এ যুগের সর্বাধুনিক এবং অসামান্য জনপ্রিয় ড্রাগ হেরোইন তৈরি করেছিল জার্মানির একটি ওষুধের কোম্পানি। বেয়ার ফার্মাসিউটিক্যাল কোম্পানি। আর তার কিছুদিন পরেই এই হেরোইনই মর্ফিয়াতে আসক্ত মাদকসেবীদের চিকিৎসার জন্য ধার্য করা হয়েছিল। আবার ১৯৩৯ সালে ড্রাগ বিশেষজ্ঞ ইসলিব (Eisleb) এবং শকাউম্যান তৈরি করেছিলেন সিনথেটিক ড্রাগ মেপারিডিন (Demerol)।

এই আফিম এবং মর্ফিয়া থেকেই নানা ড্রাগের মিশ্রণে দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের সময় জার্মানরা তৈরি করেছিল মেথাডোন (Methadone)। বাধ্য হয়েই তাদের মাথা খাটিয়ে এই সিনথেটিক ড্রাগ তৈরি করতে হয়েছিল কেন না যুদ্ধের জন্য ন্যাচারাল ড্রাগ তারা পেত না।

এই ড্রাগগুলোর জন্মবৃত্তান্ত থেকেই স্পষ্ট বুঝতে পারা যায়। এই আফিম এবং অন্যান্য নার্কটিকের ইতিহাস যেমন সুদীর্ঘ তেমন তার পটভূমিও আন্তর্জাতিক। সমস্ত পৃথিবী জুড়ে তার অবাধ গতিবিধি।

আফিম পাওয়া যায় কেমন করে? আফিম থেকে তৈরি এবং আফিম জাতীয় অন্যান্য ড্রাগ আফিমগাছের নির্যাস বা দুধের মত সাদা রস থেকে তৈরি হয়। আফিম-গাছকে বলে ওপিয়াম পপিপ্ল্যান্ট যার ল্যাটিন নাম হল প্যাপাভার সোমনিফেরাম (Papaver somniferum)। এশিয়া মাইনরের মৃত্তিকাজাত এই উদ্ভিদ প্রচুর রোদ এবং অল্প বৃষ্টিতে অপর্যাপ্ত জন্মায়। যদিও এই পপিপ্ল্যান্ট যুগোশ্লোভিয়া, মিশর, ইরান, ভারত, চীন, লন্ডন, থাইল্যান্ড এবং দক্ষিণ ও মধ্য আমেরিকার কোন কোন ভূখণ্ডেও দেখা যায়।

তবে পৃথিবীর ভেতরে সবচেয়ে বেশি এবং সবচেয়ে উৎকৃষ্ট মানের আফিম পাওয়া যায় তুরস্ক থেকে—Most of the World's Opium has been growth Turskey.

যখন এই পপিগাছের ক্যাপসুলের মত দেখতে বীজগুলো কাটা হয় তখন দুধের মত সাদা রস অঝোরে ঝরতে থাকে। ঠিক পুরোপুরি সাদা রং নয়। বাদামী রঙ বেসা আঠার মত চটচটে সেই বস্তুটিই আফিমের প্রাথমিক পর্যায়। সেই আঠার মত রসকে রোদে শুকোতে হয়। তারপরে গুঁড়ো করে যে পাউডার পাওয়া যায়—সেটাই হল স্মরণাতীতকালের ভুবনবিখ্যাত নেশার উপকরণ—

আফিম।

বলা দরকার আফিম ধূমধাম করেও নেশা করা যায়। নাকে নস্যির মত করেও নেওয়া যায় এবং নেশাখোরেরা সরাসরি খেয়েও থাকে। আফিম হঠাৎ বন্ধ করলে নেশাখোররা সাংঘাতিক অসুস্থ হয়ে পড়ে।

উত্তর ভারতে বিশেষ করে পাঞ্জাবে বিত্তবান জোতদাররা চাষের কাজে আফিম-সেবীদের নিযুক্ত করে। তার কারণ নিয়মিত আফিম এবং সামান্য খাদ্য দিলেই তারা অসাধারণ পরিশ্রম করে যা সাধারণ শ্রমিকরা কল্পনাও করতে পারে না। এবং

তারা কখনো ক্লান্ত হয় না এবং দীর্ঘসময় ধরে কাজও করতে থাকে। নিম্নমধ্যবিত্ত এবং সামান্য আয়ের মানুষরা যাদের কঠোর পরিশ্রম করে পেটের ভাত জোগাড় করতে হয়, তারা দৈনন্দিন ক্লান্তি অবসান দূর করার জন্য নিয়মিত আফিম খেয়ে থাকে। দরিদ্র শ্রমজীবি স্ত্রীলোক তাদের স্তনে এবং বুড়ো আঙুলে আফিম লাগিয়ে রাখে। কিছুক্ষণ টানলেই ঘুমিয়ে পড়ে।

তারপরেই হয় এই আফিম থেকেই আইনসিদ্ধভাবে বিভিন্ন ড্রাগ যেমন মরফিন, কোকেন, মেথাডোন ইত্যাদি তৈরি করা হয়—নানা ব্যাধির প্রকোপকে প্রশমিত করতে সেসব ড্রাগের ব্যবহার চলেছে বহু যুগ ধরে—না হয় খুব গোপনে রাতের ঘন অন্ধকারে বেইরুট, নেপলস, জেনোয়া এবং মার্সেলেসের চলমান ল্যাবরেটারিতে বেআইনী চোরাকারবারের জন্য হেরোইনে রূপান্তরিত করা হয়ে থাকে।

স্মাগলারদের গোপন পথে হেরোইন আমেরিকায় যাওয়ার পর সেখানে তার সঙ্গে কুইনাইন এবং মিল্ক সুগার মেশানো হয়। সেই মিশ্রিত হেরোইনে তীব্র ঝাঁঝাল নেশা হয়ে থাকে। বলা দরকার এক কে. জি. (১ কেজি) বেআইনী স্মাগল করা হেরোইন তৈরি করতে খরচ হয় প্রায় ৭০০০ ডলার। কিন্তু যখন মিল্ক সুগার এবং কুইনাইন মিশিয়ে তাকে তরল করা হয়, সেই ডাইলুটেড হেরোইন ১ কেজির মূল্য হয়ে যায় ২½ লক্ষ ডলার। এই চড়া দামের একমাত্র কারণ হল—এই হেরোইন শতকরা ৯০ ভাগেরও বেশি খাঁটি—over 90% percent pure. কিন্তু সেই মহার্ঘ বিশুদ্ধ হেরোইন অনেক—অনেকটা সময়ের ব্যবধানে যখন পৃথিবীর দেশদেশান্তরের শহরে, জনপদে, নগরের রাস্তায় রাস্তায় বিক্রি হয় তখন তার ভেতরে শতকরা ৩ ভাগের বেশি নার্কটিকও থাকে না।

সুম্প্রতিকালে ড্রাগের জগতে চারটি নেশার উপকরণ সম্রাটের মত বিরাজ করছে।

হেরোইন।

মরফিন।

মেথাডোন।

এল. এস. ডি।

এই চারটি ড্রাগই যেমন উগ্র, অত্যন্ত শক্তিশালী তেমনি এদের বিধ্বংসী চরিত্র। তাই ড্রাগগুলোই পৃথিবী জুড়ে দেশে দেশে সর্বনাশা এবং ভয়াবহ সমস্যার সৃষ্টি করেছে। সেইজন্যেই এইসব মাদকদ্রব্যের প্রস্তুত প্রণালীর থেকে শুরু করে তাদের গতিপ্রকৃতি বৈশিষ্ট্য এবং মাদকসেবীদের ওপরে তাদের প্রভাবের সংক্ষিপ্ত বিবরণ আন্তর্জাতিক খ্যাতি সম্পন্ন ড্রাগবিশেষজ্ঞদের* লেখা থেকে এখানে খুব সংক্ষেপে বলা হল—

(১) Jonco Hardine Blair—Sensual Drugs (২) Kiev Ari—The Drug Epidemic (৩) Stanely Einstein—Beyond the Drugs (৪) Plant Martine—Drug-takers in English Town.

হেরোইন, ম্যাণ্ডারাস, মেথাডোন, এল. এস. ডি, আফিম এবং পুরানো আরও অন্যান্য মাদকদ্রব্য থেকেই বাগান হয়ে থাকে।

এসব ড্রাগ রাসায়নিক মিশ্রণ এবং তার ফলাফল বিচার করেই নানাশ্রেণীতে বিভক্ত করা হয় যেমন—

(১) অ্যানালজেসিক বা যন্ত্রণা কমানোর মাদকীয় ওষুধ—এর মধ্যে বেশ কিছু উৎকৃষ্ট আফিম থেকে তৈরি হয়। আর কিছু হয় নানা রাসায়নিক উপাদান মিশিয়ে। কয়েকটি যন্ত্রণা লাঘবের ওষুধ যেমন প্রচণ্ড শক্তিশালী তেমনি সেবন করা মাত্র দারুণ নেশা ধরে যায়। এই ড্রাগ কয়টির নাম (১) মর্ফিন (২) হেরোইন (৩) মেথাডোন।

বলাবাহুল্য অ্যানালজেসিক এবং প্রচণ্ড ইনটকিনকেটিং ড্রাগ আরও অনেক আছে। কিন্তু এই তিনটি ড্রাগই অন্যতম এবং নেশার জগতে এক অতি ভয়াবহ সমস্যার। সর্বনাশা আরও কতরকমের উত্তেজক ড্রাগ যে তৈরি হয়ে থাকে এই তিনটি মূল উপাদান (মর্ফিন, হেরোইন, মেথাডোন) থেকে—যেমন বারবিটুরেট—ভয়ানক রকমের ডিপ্রেশাণ্ট। হতাশার অন্ধকারে মনটাকে আচ্ছন্ন করে দেয়। আত্মহত্যার দুর্বার বাসনা জেগে ওঠে মনে। এই বারবিটুরেট একটু বেশি ডোজ খেলে মৃত্যু পর্যন্ত হতে পারে। অনেকক্ষেত্রে আত্মহত্যার জন্য এই ওষুধ ব্যবহার করা হয়ে থাকে।

এই তিনটি ড্রাগের আরো কয়েকটি বৈশিষ্ট্য আছে—সাইকেডোলিক প্রকৃতির ড্রাগ এই আফিম এবং মর্ফিন। এই নেশা একেবারে নাগপাশে ফেলে ধ্বংসের দিকে নিয়ে যায় না। নেশা যে কোন সময় কেটে যেতে পারে। মনস্তাত্ত্বিক বিপর্যয় আসতে পারে। দিবাস্বপ্নের সৃষ্টি হতে পারে। অলডাস হাকসলির একটি বিখ্যাত চরিত্র যে মেক্সিকোতে চালু মেস্কালিন খেয়ে কিছুক্ষণ রঙিন স্বপ্নে বিচরণ করতেন এই মেস্কালিনের শিকড়ের রস খেয়েই। বঙ্কিমচন্দ্রের কমলাকান্ত যে প্রফুল্ল গোয়ালিনীর ঘন দুধের সঙ্গে নিয়মিত আফিম সেবন করে যে পৃথিবী এবং সমাজ সম্বন্ধে মস্ত বড় দফতর (কমলাকান্তের দফতর) তৈরি করে ফেলেছিলেন—সে তথ্যটি আজ আর কারো অজানা নেই। যখন অত্যন্ত জটিল এবং রোমাঞ্চকর কোন খুনের কেস নিয়ে উত্তেজনায় টগবগ করতেন তখন উত্তেজনা কমানোর জন্য মরফিনের ইনজেকশান নিতেন স্যার আর্থার কনানডয়াল নিজে। বলা দরকার শার্লক হোমসের সৃষ্টিকার কনানডয়াল নিজে নিয়মিত কোকেন খেতেন ।

শোনা যায় পলাশী বিজয়ের পর ক্লাইভসাহেব যখন বঙ্গদেশ তথা কলকাতার কর্তা হয়েছিলেন তখন না কি আফিম খেয়ে মাঝে মাঝে বুঁদ হয়ে থাকতেন। ইতিহাসে আছে Robert Clive became addicted to it (Opium) আফিমের সামাজিক এবং রাজনৈতিক ইতিহাসও বিচিত্র—

স্মরণাতীতকাল থেকেই আফিম তৈরি বা ম্যানুফ্যাকচারিং হয়ে থাকে ভারতে। আফিমের গাছ বা পপিপ্ল্যাণ্ট অল্প বৃষ্টিতে এবং প্রচুর রোদ্রালোকিত মধ্যপ্রাচ্য এবং ভারতের মাটিতে অপর্যাপ্ত জন্মায়। ভ্রমণকারীরা ভারত থেকে দেশে ফিরে গিয়ে তাঁদের বিবরণীতে বারে বারে বলেছেন, ইউরোপে যেমন আফিম sedative—ভারতে

তেমনি অত্যন্ত উত্তেজক (Sttmulant) হিসেবে ব্যবহৃত হয়ে থাকে।

আফিম।

অত্যন্ত মহার্ঘ নেশার উপকরণ। এমন কোন ব্যবসায়ী নেই যিনি তার শেষ কপর্দক দিয়ে আফিম কেনেন না। ষোড়শ শতাব্দীতে ফরাসী প্রকৃতিবিশেষজ্ঞ বা ন্যাচারালিস্ট জানিয়েছেন আফিম এমন একটা ড্রাগ যা খেলে মনে সিংহের মত যেমন সাহস বেড়ে যায় তেমনি কোন ভয়ের লেশমাত্র থাকে না। ১৬৭০ খ্রীষ্টাব্দে বিদেশী পরিব্রাজক জন ফ্রায়ার দেখেছিলেন ভারতে কুস্তিগীররা মল্লভূমিতে যাওয়ার আগে অহিফেন সেবন করছে। আফিমের প্রভাবে তারা না কি তাদের নিজস্ব শক্তির চেয়ে অনেক গুণ বেশি মত্ত হস্তির মত শক্তি পেয়ে থাকে ফলে সুষ্ঠুভাবে কুস্তিটা করতে পারে।

রণনিপুণ সৈনিকরাও রণাঙ্গনে যাওয়ার আগে আফিম খায়। তাদের রক্তে রক্তে আগুন ধরে যায়। তারা যুদ্ধে হয় জয় না হয় মৃত্যু এমন একটি কঠিন সঙ্কল্প নিয়ে এগিয়ে যায়।

যদি ইংরেজরা ব্যবসায়ী হয়ে না এসে শুধু ঔপনিবেশিক বা কলোনীস্ট হয়ে আসত, তাহলে মনে হয় নিশ্চয়ই আইনজারী করে জনস্বাস্থ্যের দিকে তাকিয়ে আফিমের ব্যবহার নিষিদ্ধ করে দিত। ইংরেজরা প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতা থেকে জানতে পেরেছিল আফিম মানুষের দেহের ভেতরটাকে কুরে কুরে খেয়ে ফেলে। শরীরটাকে ঝাঁঝরা করে দেয়। তাদের নেতৃস্থানীয় পলাশী যুদ্ধের সফল নায়ক রবার্ট ক্লাইভ আফিমে আসক্ত হয়ে প্রায় অচল হতে বসেছিলেন। কিন্তু তাদের কিছু করণীয় ছিল না বলে আফিম যেমন ছিল তেমনি রয়ে গেল—কোন রেস্ট্রিকশান করা হল না।

এবার আবার পিছন ফিরে তাকাতে হয়। বাংলায় আফিম উৎপাদনের একচেটিয়া অধিকার ছিল মোগলদের। তারা যতদূর সম্ভব নিজেদের এবং তাদের পরিচিত গণ্ডীর ভেতরে আফিমের ব্যবহার সীমাবদ্ধ রেখেছিল। কিন্তু মোগলরা চড়া দামে কিছু আফিম ইস্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানিকে বিক্রি করত। কোম্পানির জাহাজ সেই আফিম নিয়ে সমুদ্র পাড়ি দিয়ে চলে যেত ইস্টইণ্ডিজ এবং চীনে।

১৭৭২ খৃষ্টাব্দে ওয়ারেন হেস্টিংস হলেন গভর্নর জেনারেল। বহুদর্শী। দীর্ঘকাল কাশিমবাজার কুঠির সর্বাধিনায়ক হয়ে কাজ করেছেন। দেশী মানুষের স্বভাব চালচলন তাঁর নখদর্পণে। তিনি বুঝতে পারেন—আফিম নিয়ে প্রচণ্ড লাভের ব্যবসা হতে পারে। Tremendous of possibility of trade—কোম্পানির কোষাগার স্ফীত হয়ে উঠবে।

ক্লাইভের মত হেস্টিংসসাহেবের আফিম সম্বন্ধে কোন দুর্বলতা ছিল না। কোন মোহ ছিল না। তিনি আফিম সম্বন্ধে বলেছেন Pernicious Commodity—অত্যন্ত অনিষ্টকারী একটি পণ্য এবং যে কোন সুশাসনের ভারতের সীমানার আফিমের ব্যবহার নিয়ন্ত্রিত করা উচিত।

কিন্তু আফিম নিয়ে বিদেশে ব্যবসা অর্থাৎ 'ফরেন কমার্স' সম্পূর্ণ অন্য জিনিস। তাই যখুনি ওলন্দাজরা তাদের উপনিবেশ ইস্টইণ্ডিজে সাময়িকভাবে আফিম বিক্রি বন্ধ

করে দিল, তখুনি হেস্টিংস কোম্পানির খরচে একটি জাহাজে আফিম পাঠিয়ে দিলেন ক্যান্টনে। কিন্তু সফল হল না সেই প্রচেষ্টা। কেননা ক্যান্টনের ব্যবসায়ীরা শাসিয়ে বলল—আফিম তারা ইস্টইন্ডিজে নিয়ে যেতে পারবে না। আর তাদের দেশে (চীনে) আফিম বিক্রি বন্ধ করে দেবে। কিন্তু—

ইংরেজরা জাত বেনিয়া। তাদের বংশপরম্পরায় রক্তে রক্তে ব্যবসায়ী বুদ্ধি। তাই কোম্পানির দেশী নৌকো (Country Boats) আফিমের পণ্য নিয়ে তবুও চলল ক্যান্টনে। আর একেবারে জলের দরে বিক্রি করে দিল আফিম। দিনে দিনে রপ্তানির পরিমাণ যেমন বাড়িয়ে দিলেন তেমনি দামও একটু একটু করে চাড়িয়ে দিলেন হেস্টিংস। তবুও চীনের নগরে বন্দরে আফিম বেশ বিক্রি হতে লাগল। চীনের মানুষ আফিমের স্বাদ জেনে গেল। এইভাবেই আদিযুগের ইংরেজদের ভেতরে সবচেয়ে কৃতী এবং সফল নায়ক ওয়ারেন হেস্টিংসের বুদ্ধি, দূরদর্শিতায় চীনে আফিম বিক্রি করে কোম্পানি মোটা টাকা লাভ করতে লাগল। আর—চীনের মানুষ চণ্ডু খেয়ে ঝিমোতে শুরু করল।

কিন্তু ইংরেজ শাসনের আগে মোগলরা এক রাজকীয় আদেশ জারি করেছিল—পর পর আরও অনেক অনেকবারই দেশজুড়ে ঘোষণা করেছিল—আফিম এক সর্বনাশা মাদকদ্রব্য। খবরদার কেউ বিনা অনুমতিতে ব্যবহার করিবেন না……কেউ যদি এই আদেশ অগ্রাহ্য করে আফিম কেনাবেচা করে তাহলে আইনমোতাবেক তার শাস্তি হবে……এই ঘোষণাকে—এই আদেশকে তুড়ি মেরে কোম্পানির নৌকা সাগরের ঢেউ পাড়ি দিয়ে চলল চীনে—

কিছু আফিম আবার কেউ কেউ (স্মাগলার) পাহাড় জঙ্গল পেরিয়ে পেঁৗছে দিত পিকিং-এ। ১৮০৭ খ্রীষ্টাব্দে চীনের সম্রাটকে জানানো হল—দেশময় আফিমের নেশা ছড়িয়ে পড়েছে। কথাটা যে ভয়ানক নিষ্ঠুর সত্যি তা তিনি বুঝতে পারলেন কয়দিন পরেই। তিনি হঠাৎ দেখলেন তাঁর দেহরক্ষিবাহিনীর কোন কোন সৈনিক আফিমের নেশার ভারে ঢুলছে। আর তাঁর রাজসভার কোন কোন রাজা এমনভাবে এই ড্রাগের শিকার হয়ে পড়েছে যে আফিম না খেলে তারা কোন কাজই করতে পারে না—had become enslaved by the habit that the opium cannot do any work without taking they.

আবার কড়া আদেশ জারি করলেন। সরকারের বিনা অনুমতিতে যে আফিম খাবে তার কঠিন শাস্তি হবে। শুধু আদেশ দিয়েই থেমে থাকলেন না। সত্যি সত্যি দেশে দেশে নগরে গ্রামে গুপ্তচর পাঠিয়ে ধরলেন কয়েকটি আফিমখোরকে। তাদের কাউকে শাস্তি দিলেন—বেত্রাঘাত বা ফ্লগিং। কাউকে আবার পায়ে ডাণ্ডাবেড়ি পরিয়ে দিলেন। কিন্তু—

কোন লাভ হল না। অব্যাহত গতিতে আফিমের নেশা চলতে লাগল। দেখা গেল নিম্নশ্রেণীর শ্রমজীবিরা নিয়মিত কেনে এবং আফিম খায়। আবার ১৮১৫ সালের আর এক সরকারি ইস্তাহারে বলা হল—আফিমের নেশা মানুষের বুদ্ধিবৃত্তিকে

একেবারে বিলুপ্ত করে দিয়ে একেবারে 'স্টুপিড' করে দিচ্ছে আর এমন বিপর্যস্ত করে দিচ্ছে যে তাদের স্বাভাবিক দৈহিক ও মানসিক শক্তি বিনষ্ট করে তাদের মৃত্যুকে ত্বরান্বিত করছে—

গাঁজা

যার আর এক নাম 'হ্যাস'—ইণ্ডিয়ান হেম্প।

অতি জনপ্রিয় এবং স্মরণাতীতকালের এই নেশার উপকরণটির সঙ্গে পরম মমতায় মত জড়িয়ে রয়েছে এক মধুর কিংবদন্তী—

খুব উঁচু পাহাড়ের গুহায় বাস করত এক প্রাজ্ঞ বহুদর্শী গ্রামবৃদ্ধ। তাঁর মনে হল পাহাড়ের ঢালুতে ঘন সবুজের ছবির মত গাছগাছালিতে ছেয়ে থাকা যে উপত্যকা সেখানে একটা সুন্দর বাগান করলে কেমন হয়। যেখানে থাকবে নানারঙের ফুলের সমারোহ। গাছে গাছে পাখি ডাকবে। উদ্যানের ঠিক মাঝখানে থাকবে কৃত্রিম এক পাহাড়। পাহাড়ের গা বেয়ে ঝরবে ঝরনা। ঝরনা আবার একটা নয়। দুটো, তিনটে, চারটে—যতগুলো তৈরি করা সম্ভব। সেইসব বেগবতী নির্ঝরের একটানা কল্লোল্লাসে মুখর হয়ে উঠবে সেই মনোরম উদ্যান।

শুধু কি তাই?

ঝরনার জলেরও থাকবে বৈচিত্র। কোন ঝরনায় অঝোরে পড়বে সাদা দুধের ধারা। আবার কোন নির্ঝরে ঝরবে সুগন্ধী মধুর অফুরান স্রোত। আর একটা ঝরনায় দিবা নিশি উৎকৃষ্ট আর সুগন্ধী সেরাজীর বহমান স্রোত চারিদিকের বাতাসকে আমন্থর করে তুলবে একটানা। আর এই চারটি নির্ঝরের সুমধুর ঝরঝর শব্দের ঐকতান দিকদিগন্তে যেন একটা মিষ্টি স্বপ্নের মূর্ছনা ছড়িয়ে দেবে। কিন্তু—

সেই রঙ বেরঙের ফুলে ফুলে ছেয়ে থাকা ঝরনার কলতানে মুখর সেই স্বপ্নের মত সুন্দর উদ্যানে কারা আসবে কারা বিহার করবে?

হ্যাঁ। আসবে। আসবে শুধু তারা যাদের তিনি পছন্দ করেন। স্নেহ করেন। তার স্নেহধন্য প্রতিটি তরুণের কন্দর্পকান্তির মত অসামান্য সৌন্দর্য, যৌবনোদ্ধত দীর্ঘ সুগঠিত স্বাস্থ্য। সেই রূপের হাটের দিকে হঠাৎ তাকালে মনে হবে যেন এক ঝাঁক দেবদূতই স্বর্গ থেকে নেমে এসেছে সেই কাননে। কিন্তু—

মজবুত বাঁধুনির শরীর। সুন্দর চেহারা হলে কি হয়। তারা কেন যেন প্রত্যেকে মিষ্টি একটা নেশার মৌতাতে আচ্ছন্ন। তাদের সেই অনিন্দ্যসুন্দর দেহে অপরিসীম ক্লান্তি আর অবসন্নতা নিয়ে গা এলিয়ে দিয়েছে ঘন সবুজ ঘাসের নরম গালিচায়। হঠাৎ দেখলে মনে হতে পারে জ্যোৎস্নার সারি সারি এক একটি রেখাই যেন মূর্ছিত হয়ে পড়ে রয়েছে মখমলের মত নরম ঘাসের বিছানায়।

নেশার ঘোর প্রায় অচেতন যুবকদের কাছে যেন বাতাসে পা ফেলে এগিয়ে এল পরীর মত সুন্দরী আর সুযৌবনা এক একটি তরুণী। তাদের আলতো করে স্পর্শ করে কেউ বা তাদের মাথার চুলে বিলি কেটে কেটে জাগিয়ে তুলল। তরুণরা চোখ

মেলেই দেখল তাদের বুকের কাছে বসে রয়েছে অপ্সরীর মত সুন্দরী আর উদগ্র যৌবন পুষ্ট এক একটি রমণী।

কি ব্যাপার ?—কোথায় তারা !

নানারঙের ফুলের সমারোহে ভরা ঘন সন্নিবদ্ধ সবুজ তরু শ্রেণীর নীলাভ ছায়ায় আচ্ছন্ন এই আশ্চর্য সুন্দর উদ্যানেই বা তারা কি করে এল ? তারা বিস্ময়ের চোখে তাকিয়ে রইল তাদের সান্নিধ্যে বসে থাকা সেই রহস্যময়ী রমনীর দিকে। যৌবন মদমত্তা তরুণীরা তাকিয়ে থাকল দীপশিখার মত উজ্জ্বল আর সুঠামতনু সেই এক একটি যুবকের দিকে। কেমন পুরুষ এরা !

ওরা কি জানে না। ওরা মরাল আমরা সরোবর। কেন—কেন ওরা কামনাস্মোত্ত হয়ে সরোবরের বুকে ঝাঁপিয়ে পড়ছে না—কেন—কেন এত বিলম্ব করছে ? এখুনি —আর কয়েকমুহূর্ত পরেই বিচিত্র শোভামণ্ডিত এই পার্বত্য ভূখণ্ডের উদ্যানের দণ্ডমুণ্ডের কর্তা—সেই ভয়ঙ্কর কূটবুদ্ধি সম্পন্ন বৃদ্ধ এসে পড়বে। আর কি যুবক যুবতীদের অবাধ প্রণয়লীলাকে অব্যাহত থাকতে দেবে ? রমনসুখের বিচিত্র পুলকানুভূতিতে আবিষ্ট থাকতে কি দেবে ?

ভয়ঙ্কর হিংস্র সেই বৃদ্ধ।

তারা তার বিলাসের সুখসহচরী। তারা মর্মে মর্মে জানে তার স্বভাব। সেই গ্রামবৃদ্ধ শুধু হিংস্র নয় শুধু প্রতিহিংসাপরায়ন নয়, ধূর্ত কুটিল দুরভিসন্ধির প্রতিমূর্তি। এই যে নেশার ঘোরে আচ্ছন্ন করে এতগুলি সুঠামদেহী যুবকদের সে এখানে এই নির্জন শান্ত রসাস্পদ উপত্যকায় নিয়ে এসেছে। আর প্রত্যেকটি তরুণের পরমতৃপ্তিতে উপভোগের জন্য মাথা গুণে গুণে তাদের এক-একজনকে নিয়ে এসেছে—এই নির্জন আরণ্যক উপত্যকায় সমস্ত শালীনতা আর সংযমের বাধা নিষেধ ছিন্নভিন্ন করে একেবারে আদিম হয়ে যেতে সে বাধা দেবে না। যতক্ষণ খুশি মৈথুন করতেও সে আপত্তি করবে না। কিন্তু—

একটি সর্ত।

বড় ভয়ঙ্কর বিভীষিকার মত তার সেই চুক্তি। কিন্তু এখন থাক সে কথা।

রূপরম্যা রমণীদের ভেতরে একজন উদ্ভিন্ন যৌবনা। আর নিজেকে সংযত রাখতে পারল না। সে তার যৌবনপুষ্ট দীর্ঘ তনুতে হিল্লোল তুলে নেচে নেচে চলে এল তার জন্য মনোনিত পুরুষটির কাছে। ক্ষণকালের জন্য যুবকের বিস্মিত মুখাবয়বের দিকে তাকিয়ে মোহাচ্ছন্ন একটা হাসি ছড়িয়েই কোন কথা বলল না। কোন ভূমিকা করল না। শিকারি বাঘিনীর মত দ্রুত নিঃশব্দে তার নরম ঠোঁট দুটো কাছে এসেই তার তৃষিত হঠাৎ মাছরাঙ্গা পাখির মত অব্যর্থ লক্ষ্যে যুবকের ঠোঁটে ঝাঁপিয়ে পড়ল। আর চুমুতে চুমুতে কেমন আচ্ছন্ন ও বিহ্বল করে তুলল তাকে।

সেই মুহূর্তে যুবক-যুবতীদের সমাবেশে প্রচণ্ড আলোড়ন জেগে উঠল। তাদের সেই উগ্র মিলনের এবং অবিরাম তপ্ত চুম্বনের জ্বালাধরা উত্তেজক দৃশ্য প্রতিটি তরুণ তরুণীদের রক্তে রক্তে কামনার ঝড় তুলল। দাবদাহের মত জ্বলতে লাগল তাদের

প্রতিটি অঙ্গ। তারা—যুবকরা এক একজন এক একটি উত্তাল বন্যার ঢেউয়ের মত ঝাঁপিয়ে পড়ল যুবতীদের বুকে। কিন্তু—

সেই ভয়ঙ্কর উত্তেজনার পরমলগ্নে যখন তারা চরম পরিতৃপ্তিতে মৈথুন করে আশ্লেষসুখে নিবিষ্ট হবে এবং এক অপার্থিব পুলকানুভূতিতে মগ্ন হয়ে থাকবে দীর্ঘ রজনী ঠিক তখুনি—ঠিক সেই মুহূর্তে—

নরাধম—অর্বাচীন কি হচ্ছে এসব? এক তীক্ষ্ণ কর্কশ কণ্ঠস্বর যেন ঝনঝন করে বেজে উঠল সেই উদ্যানের মনোরম শান্ত পরিবেশে। নির্ঝরের সেই একটানা কলোল্লাস পাখির কূজন গাছের পাতায় পাতায় বাতাসের মর্মরধ্বনি সব—সব যেন একটা আড়ষ্ঠ ব্যথায় স্তব্ধ হয়ে গেল।

দীর্ঘকায় সেই বৃদ্ধের শীর্ণ দেহের কোথাও নেই এতটুকু বার্ধক্যের চিহ্ন। শক্ত রজ্জুর মত পাকানো চেহারা সাদা ধবধবে চুল দাড়ির জঙ্গলে আচ্ছন্ন লম্বাটে মুখখানা কেমন কঠোর হয়ে উঠেছে। খুদে খুদে চোখদুটো থেকে যেন ঝলকে ঝলকে আগুন ঝরছে।

তোমরা কি আমার পরিকল্পনা সম্পূর্ণ বিস্মৃত হয়েছ?

বিক্ষুব্ধ যুবকযুবতীরা এ ওর মুখের দিকে তাকায়।

যত খুশি—যার সঙ্গে তোমার অভিলাষ রমন কর, ক্ষণকাল স্তব্ধ থেকে বৃদ্ধ আদেশের সুরে বলতে শুরু করল, যাও তুমি যাকে খুশি বিবাহও করতে পার—সংসার ধর্ম পালন কর। কিন্তু—

থেমে যায় পার্বত্য উপত্যকার সর্বাধিনায়ক।

ভয়ের ছায়া পড়ে তরুণতরুণীদের মুখে। কে জানে বুড়ো এবার কি বলে বসবে। তাদের বুকের ভেতরটা দুরুদুরু কাঁপে।

কিন্তু আমি যখন যাকে বলব, তাকে চলে যেতে হবে—চলে যেতে হবে তখুনি সেই মৃত্যু উপত্যকায়—তারপর তোমাদের নামতে হবে মরণযজ্ঞে—স্তব্ধ হয়ে গেল বৃদ্ধ। আবার নিচের ঠোঁটটা শক্ত করে কামড়ে ধরে বিষাক্তকণ্ঠে বলল, মাত্র ৭০টি হয়েছে—আমার দরকার আরও—আরও—৩৮টি—একটু থেমে আবার হঠাৎ ক্ষিপ্ত হয়ে বলল, তোমরা যে আশানুরূপ কাজ করছ না—আসলে অত্যন্ত বেশি স্ত্রী সংসর্গ করে তোমরা বীর্য হানি করছ—

আমরা মানুষ ধরে আনতে পারব না—আপনার এই স্বর্গে থাকতেও চাই না—চেঁচিয়ে বলল কয়েকজন যুবক।

বেশ তোমরা সামনে এস—বজ্রকণ্ঠে বলল বৃদ্ধ। আবার দূরে তার প্রমোদভবনের দিকে তাকিয়ে হাঁকল—কা-লা-ন্ত-ক

সঙ্গে সঙ্গে ঘোর কৃষ্ণবর্ণ যমদূতের মত চেহারার এক অনুচর তার সামনে এল। তাকে চোখের ইসারায় যেন কি আদেশ দিল বৃদ্ধ। কালান্তক বিদ্যুৎগতিতে ছুটছে প্রমোদ কুটিরের দিকে। ফিরল আরও তিনজন সহকারীকে নিয়ে। তাদের ঘাড়ে স্বর্ণসূত্রে মণ্ডিত বাঁকের দুইদিকে দুলছে দুইটি স্বর্ণনির্মিত ভাণ্ড।

যে কয়জন থাকবে না বলেছ—তারা আমার সামনে এস—

তারা এল।

বৃদ্ধ তাদের প্রত্যেককে সেই স্বর্ণভাণ্ড থেকে ঢেলে সুগন্ধী উৎকৃষ্ট সেরাজির মত কি যেন খাইয়ে দেওয়া মাত্র তারা নেশার ঘোরে টলতে লাগল। তারা দেখতে দেখতে অচেতন হয়ে গেল। রহস্যময় সেই বৃদ্ধের অনুচররা দ্রুত তাদের বহন করে নিয়ে চলে গেল তাদের স্বগৃহে।

যুবকরা ফিরে গিয়ে আবার সেই রূপরম্যা রমণীপরিবৃত সেই স্বর্গোদ্যানে আসার প্রবল বাসনা হয়েছিল বোধহয়। কিন্তু তার আর কোন উপায় ছিল না। আর যারা সেই উপত্যকায় রয়ে গেল তারা যে কোন দুঃসাহসিক কাজ করতে প্রস্তুত ছিল—So great was the desire to getback that initiates would face any peril to do so—

এইভাবে এই কৌশলেই দেশ দেশান্তর থেকে যুবকদের সংগ্রহ করত বৃদ্ধ নিজের উদ্দেশ্য চরিতার্থ করার জন্য—কিন্তু কি খাওয়াতো—কোন্ ড্রাগ? যার প্রভাবে তারা জ্ঞান হারিয়ে ফেলত?

ত্রয়োদশ শতাব্দীতে মার্কোপোলো সমুদ্রযাত্রী এক প্রবীন নাবিকের কাছে এই গল্পটি শুনেছিলেন—The drug used to put youths to sleep was HASHIS.

আর এই গাঁজার বা হ্যাসিসের এইক্ষেত্রে প্রধান কাজই হল—যুবকদের অজ্ঞান করে এই নির্জন উপত্যকায় নিয়ে আসা এবং ফিরিয়ে নিয়ে যাওয়ার কাজেও গাঁজা ব্যবহার করত সেই রহস্যময় গ্রামবৃদ্ধ।

কিন্তু সেই বৃদ্ধ তো নরঘাতক বা খুনী ছাড়া আর কিছুই নয়। তাই বলা যায় —Murderears used it. তাই উনবিংশ শতাব্দীর ফরাসী ভাষাবিদ সিলভেস্ট্রে ডিসাকে (Sylvestre Desacy) জানিয়েছে গাঁজা বা হ্যাসিসের—এই শব্দটির জন্মবৃত্তান্ত—

HASHIS—কথাটি এসেছে HASCHISIN থেকে। আর HASCHISIN শব্দটি থেকেই ডক্টর ডিস্যাকের দৃঢ় বিশ্বাস—জন্ম হয়েছে সেই ভয়ঙ্কর সেই স্মরণাতীকালের বিভীষিকা জড়ানো শব্দ ASSASSIMI থেকেই। গাঁজার ইতিবৃত্তে আরও—আরও বলছে খুনী এবং সমাজবিরোধী দুর্বৃত্তরা তাদের জঘন্য অপরাধের কাজগুলো করার আগে খুব করে গাঁজায় দম নিয়ে নেয়—They took before continuing their astrocious crimes....

লিভিংস্টোনও আফ্রিকা থেকে ফিরে এসে সভ্য পৃথিবীর কাছে অজানা সেই গভীর অরণ্যসমাচ্ছন্ন মহাদেশের সম্বন্ধে অনেক বিচিত্র তথ্য জানিয়েছিলেন তার ভেতরে একটি তথ্য ছিল এই ড্রাগ প্রসঙ্গে—লিভিংস্টোন বলেছেন, Africans used some penrcious weed to help them to work themselves upto the species of frozy অর্থাৎ খুব উন্মাদনার উত্তেজক এক ধরনের উদ্ভিদ তারা ব্যবহার করে, যা

তাদের পাগলের মত উদ্দাম হয়ে কঠিন কাজ করতে সাহায্য করে থাকে।

কিন্তু লিভিংস্টোনের এই বক্তব্য থেকে প্রমাণিত হয় না যে সেই—penrcious weed গাঁজা বা হেম্প। কিন্তু অষ্টাদশ শতাব্দীর শেষের দিকে ফরাসী পরিব্রাজক সি. এস. সোমমিমি (C. S. Sommimi) জানিয়েছেন আরবরা গাঁজা থেকে তরল পানীয় বা 'লিকার' তৈরি করে থাকে—Arabs made liquior from the hemp plant··· আরও বলেছে এক সুমধুর এবং সুগন্ধী পানীয়—A Port of pleasing inebriely—অত্যন্ত আরামদায়ক যা পান করলে নেশার মিষ্টি মৌতাতে মন আবিষ্ট হয়ে যায় কিন্তু নেশা হয় না। তবে সময় সময় সে ভুল বকতে পারে, চলে যেতে পারে সে কোন সুদূর স্বপ্নের রাজ্যে। আর এই বিচিত্র পানীয় (মনে হয় সিদ্ধির শরবত) রক্তের ভেতরে ধরিয়ে দেয় অফুরন্ত কাজের নেশা।

আর চেতনার ভেতরে এমন মধুর এবং অনাস্বাদিতপূর্ব অনুভূতি ছড়িয়ে দেয় যা কখনো উৎকৃষ্ট মদ্যতেও কিম্বা অন্য কোন জোরালো নেশার পানীয়তেও হয় না। ফরাসী বিশেষজ্ঞরা বলেছেন এত মধুর সেই পানীয় যার কোন বিশেষণ নেই—Affords no terms by which it can be expressed······

আরবীরা চলতি ভাষায় এই পানীয়কে বলে ফিফ (Fif)···মনের এই বিচিত্র শূন্যতা মনের এই হতচেতন ভাব, এই জড়ত্ব। মনে পড়ে যায় ফরাসী পরিব্রাজক সোমমিনির কথা—"A state of reverie বাস্তব পৃথিবীর সব কিছু ভুলে এক রঙীন কল্পনার জগতে বাস করা।

গাঁজা বা হেম্পপ্ল্যান্ট।

যার ল্যাটিন নাম ক্যানাবিসের (Cannabis) প্রাচীন ইতিহাসে জানা যায় প্রায় তিনহাজার বছর ধরে আইনসিদ্ধ ভাবে বা বেআইনী ভাবে এই ক্যানাবিস এবং তার উদ্ভূত ড্রাগ, ভাঙ্গ, চরস, মারিজুয়ানা ইত্যাদি ব্যবহার করে আসছে মানুষ।

দৃষ্টি বিভ্রম, শ্রুতিবিভ্রমে অদ্বিতীয় এই হ্যালুসিনেজেনিক ড্রাগ হ্যাসিস বা গাঁজার মূল উৎস হল গ্রীষ্মপ্রধান দেশের মাটিতে আগাছার মত অপর্যাপ্ত জন্মানো এক ধরনের ছোট ছোট গাছ—ক্যানাবিস সটিভা। মদ এবং আফিমের মত এই গাঁজাও মানুষের প্রাচীন যুগের নেশা।

খ্রীষ্টের জন্মের ২৭৩৭ বছর আগে চীনের সম্রাট শেন নাঙ-ই প্রথম এই হেম্পকে ওষুধ হিসেবে ব্যবহার করেছিলেন। তিনি তাঁর ফার্মেসি বইতেও এই গাঁজাকে ওষুধের তালিকাভুক্ত করেছিলেন। তিনি এই ড্রাগের বিধান দিয়েছিলেন নিম্নলিখিত ব্যাধিতে—

(ক) স্ত্রীরোগজনিত দুর্বলতা (খ) গেঁটে বাত (গ) বাত (ঘ) ম্যালেরিয়া (ঙ) বেরিবেরি (চ) কোষ্টবদ্ধতা (ছ) অন্যমনস্কতা।

মদের সঙ্গে গাঁজা মিশ্রিত করলে তার নাম হয় মোয়ো (Moyo)। বিখ্যাত চীনা চিকিৎসক এবং অস্ত্রোপচার বিশেষজ্ঞ হোয়া ঘো (Hoa Gho) অস্ত্রোপচারের আগে

অজ্ঞান করার জন্য অ্যানেসথেটিক হিসেবে ব্যবহার করেছিলেন। মিশরের ফারাও রামসেস প্যাপিরাসে (খাগড়ার গাছ থেকে প্রস্তুত হস্তনির্মিত কাগজ) লিখে গিয়েছেন—চোখের কোন ক্ষত বা ইনফ্ল্যামেশানে অব্যর্থ ওষুধ হল সিদ্ধির শুকনো পাতা গুঁড়ো করে লাগান। মধ্যযুগের ইউরোপে একশ্রেণীর দেহাতী মানুষ ক্যানাবিস সটিভার শুকনো পাতা চূর্ণ করে তার সঙ্গে মাখন মিশিয়ে আগুনে পোড়া ঘায়ে মলমের মত লাগাত কানে। ব্যথা এবং আলসারের ঘাতেও মহৌষধ—এই গাঁজা! জরায়ুর যে কোন অসুখে বিশেষ করে জরায়ুর স্ফীতিতেও ক্যানাবিস অব্যর্থ ওষুধ। গাঁজার ধোঁয়া কিছুক্ষণ খাওয়ার পর দেখা গিয়েছে রোগিনী আরো বাঁকা হয়ে বা নুয়ে পড়ে দাঁড়িয়ে নেই। সোজা হয়ে দাঁড়িয়েছে।

প্রাচীন দিনে হ্যাসিসের নানা ব্যাধির ওষুধ হিসেব প্রয়োগ ছাড়াও ধর্মীয় ক্রিয়া প্রকরণে এবং ধর্মীয় অনুশীলনেও এই ড্রাগের অবদান অসামান্য। চীনের সাবেক দিনের এক চিন্তাশীল মনীষী গাঁজাকে বলেছেন Delight giver—আনন্দদায়ক এবং Liberation of sin বা পাপের থেকে মুক্তির উপকরণ। স্মরণাতীতকাল থেকে সন্ন্যাসী, সাধক, তান্ত্রিকরা তাঁদের সাধনাকে তাদের তপস্যা বা ধ্যানকে আরও তীব্র আরও গভীর করে তুলে তার ভেতরে মগ্ন হয়ে যাওয়ার জন্য এই ক্যানাবিস সটিভার পাতা বা গাঁজা খেয়ে থাকে। তাই হিন্দুর ধ্যানধারণার সঙ্গে, হিন্দুর সংস্কৃতির সঙ্গে অচ্ছেদ্যবন্ধনে জড়িয়ে আছে হ্যাসিস। বলতে বাধা নেই ভারতের লোকসাহিত্যে প্রতিটি অঙ্গরাজ্যের লোককথায় উল্লেখ আছে এই নেশার উপকরণটির! ড্রাগ বিশেষজ্ঞ স্টেনলি আইনস্টাইনও তাই বলেছেন—To the Hindu the hemp is holy. A guardian lives in Bhang. No God or Man is as good as the religious drinker of Bhang অর্থাৎ হিন্দুর কাছে গাঁজা অতি পবিত্র। সিদ্ধি বা ভাঙের ভেতরেও আছে পরম পিতার আশীর্বাদ। সিদ্ধির শরবত ধর্মীয় আচার অনুষ্ঠানের এমন একটি পবিত্র উপকরণ যার মত শুদ্ধ ও সৎ এবং পবিত্র স্বয়ং ঈশ্বরও নন—মানুষ তা নয়ই···

শুধু তাই ভাঙের সম্বন্ধে আইনস্টাইনসাহেব আরও একটি অতি গুরুত্বপূর্ণ এবং প্রয়োজনীয় কথা বলেছেন—সিদ্ধির সুস্বাদু পানীয় বহু হিন্দু পরিবারকে দুঃখদুর্দিনের অন্ধকার থেকে আলোতে নিয়ে এসেছে অর্থাৎ সুস্থ স্বাভাবিক জীবনের নিশ্চয়তা এবং নিরাপত্তার ভেতরে আনতে সক্ষম হয়েছে—The supporting power of Bhang has brought many a Hiudu family in safe position.

এবার ক্যানাবিস শটিভা থেকে হ্যাসিস বা গাঁজা ছাড়া আরও কতরকমের ড্রাগ পাওয়া যায় তার সংক্ষিপ্ত বিবরণ নিচে দেওয়া হল।

গাঁজা ভাঙ চরস—এই তিনটি অতি জনপ্রিয় নেশার উপকরণের মূল উপাদান হল এই উদ্ভিদ—ক্যানাবিস শটিভা। উত্তর ভারতের পার্বত্য ভূখণ্ডের ঢালুতে এই গাছ বন্যউদ্ভিদের মতই অপর্যাপ্ত জন্মায়। কুলু, মানালি, কাশ্মীর, নেপালে এবং আরও

যেখানে যেখানে আবহাওয়া অনুকূল সেখানে যতদূর চোখ যায় দেখা যায় শুধু বাতাসে মাথা দোলাচ্ছে অজস্র ভারতীয় হেম্প বা গাঁজা গণ্য বা ক্যানাবিস শটিভা। স্থানীয় মানুষ এখন এই বুনোগাছের অপরিসীম গুরুত্ব বুঝতে পেরেছে। কাশ্মীর নেপালের গাঁজা-ক্ষেত্রের মালিকরা এই ক্যানাবিস শটিভার চাষ থেকে এখন বেশ দুটো পয়সার মুখ দেখছে। তবুও ব্যাপকভাবে লক্ষ্মীর সম্পদের মত এই গাছের চাষ তারা করে না। করতে হয় না। প্রকৃতির খেয়ালে পাহাড়ের কঠিন পাথুরে মাটিতে প্রখর রোদে বাতাসে আরও পাঁচটা বুনোগাছের মতই প্রচুর জন্মায়।

যখন এই গাছগুলো পাকে তখন তার রং হয়ে যায় ঘন—খুব ঘন সবুজ আর খুব ভারি—খুব ভারি হয়ে নুয়ে পড়ে। সেই সময় এই গাছের ওপরের পাতাগুলো কেটে গুঁড়ো গুঁড়ো করে হাতের তালুতে ঘষলেই—তালুতে ঘন আঠার মত নির্যাস লেগে থাকে। এটাই হল গঞ্জিকার প্রাথমিক পর্যায় বা ক্রুড ফরম (Crudeform)। এই ক্রুড গাঁজা স্থানীয় বাসিন্দারা কিছু ব্যবহার করে—আর সামান্য পরিমাণে বিক্রির জন্য রেখে দেয়। কিন্তু—

এখন ক্যানাবিস শাঠিভার দিন ফিরেছে। তার মর্যাদা বেড়েছে। এই গাছ বিক্রি করে পয়সা আসছে। বিদেশী মুদ্রাও বেশ আমদানী হচ্ছে। চোরাকারবারিরা তো গোপনে বিদেশে চালান দিয়ে লক্ষ লক্ষ টাকা কামাচ্ছে। তাই এখন পুরোপুরি ব্যবসায়িক ভিত্তিতেই ক্যানাবিসের চাষ হয়ে থাকে। গ্রীষ্মকালীন ফসলের মতই ঠিক বর্ষার আগে এই গাছের বীজ বোনা হয়! পাথরের দেশে ঘন হয়ে বর্ষা নামে। জল পেয়ে এই গাছ দেখতে দেখতে বড় হয়ে ওঠে শরৎকালে। এই গাছ পুষ্ট হয়ে ওঠে। তখন শুরু হয়ে যায় ফসল কাটার মরসুম। গাছের পাতা, কাণ্ড, ফুল এবং বীজ ইত্যাদি ছায়ায় রেখে শুকনো হয়। গাছের ওপরের দিকের পাতাগুলোকে কেটে আলাদা করা হয় শুধু উৎকৃষ্ট মানের—হ্যাসিসের ম্যানুফ্যাকচারের জন্য।

কিন্তু ফাইনেস্ট কোয়ালিটি অফ হ্যাসিস তৈরি হয় কি করে? ওপরের দিকের শুকনো পাতা এবং ফুলগুলো ভেঙে গুঁড়ো গুঁড়ো করে চূর্ণ করা হয়। সেগুলো চালুনি দিয়ে ঝেড়ে ঝেড়ে কাঠিগুলো বের করে ফেলা হয়। তারপরে জালের মত পাতলা কাপড় দিয়ে (গামছা হলেও চলে) ছেঁকে ফেলে পাওয়া যায় মিহি পাউডারের মত গুঁড়ো। এই পাউডারে সিরিশের গুঁড়ো এবং তিসির তেল দিয়ে তৈরি পেস্ট মেশানো হয়। তারপর অন্তত পুরো আধঘণ্টা হাতুড়ি দিয়ে বাড়ি মেরে মেরে এই পেস্টটাকে পাউডারের চারিদিকে সমান করে (uniformly) ছড়িয়ে দেওয়া হয়।

এবার কেকের মত কেটে কেটে কোনটা পাঁচশো গ্রামের খণ্ড আবার কোনটা আরও ছোট খণ্ড করা হয়—এগুলোই হল—সবচেয়ে উৎকৃষ্ট শ্রেণীর হ্যাসিস বা গঞ্জিকা—Finest grade Hashis……

সবচেয়ে ভাল শ্রেণীর পাউডার তৈরির পরে যা অবশিষ্ট তা আবার চালুনি দিয়ে ঝেড়ে গামছায় ছেঁকে পাওয়া যাবে দ্বিতীয়শ্রেণীর—বা সেকেণ্ড গ্রেড পাউডার। আবার সেই একইভাবে তিসির তেলের পেস্ট মিশিয়ে পাওয়া যাবে দ্বিতীয়শ্রেণীর

গঞ্জিকা আবার তার পরে তার অবশিষ্ট থেকে একই প্রসেসে তৃতীয়শ্রেণীর গঞ্জিকা।

এখন চালুনি দিয়ে ঝেড়ে এবং পাতলা জালের মত কাপড়ে ছেঁকে ফেলার পরে যে বড় বড় কাঠিগুলো পাওয়া যায়, সেই কাঠিগুলোকে কখনও ফেলে দেওয়া হয় না। সেই কাঠিগুলোকে ভেঙ্গে গুঁড়ো গুঁড়ো করে তার সঙ্গে আরও কিছু শুকনো পাতা, ফুলের শুকনো পাপড়ি মিশিয়ে মিহি পাউডারের মত করা হয়। এই পাউডারের সঙ্গে কিছু তামাক মিশিয়ে তৈরি হয়—

গাঁজা।

এই গাঁজাই সাধারণত ভারতের নিম্নবিত্ত অর্থাৎ অল্প আয়ের মাদকসেবী এবং সাধুসন্তদের কাছে বিক্রি হয়ে থাকে।

গঞ্জিকার মাদকশক্তি (potency) আরও বাড়িয়ে দেওয়ার জন্য এবং উগ্রনেশা ধরানোর জন্য (More addictative) গাঁজার সঙ্গে আফিম মেশানো হয়। কিন্তু এই মিশ্রণ সহজ নয়। তাই আফিম মিশ্রিত বিভিন্ন শ্রেণীর ঈষৎ বাদামী রঙের গাঁজা এবং চরণের উপরে আফিমের কালো রেখা স্পষ্ট দেখা যায়।

শুধু মাদকশক্তিই নয় গাঁজাও যে অপবিত্র প্রবণতা বাড়িয়ে দেয় সে সম্বন্ধে সুদীর্ঘ অর্ধশতাব্দীব্যাপী বাংলায় ডাক্তারি করার এবং প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতা থেকে বলেছেন এক ইংরেজ সার্জেন ক্রমবি (Crombee) এক বাঙালিবাবু রাত্রে খুব বেশি ডোজে গাঁজা খেয়ে তার নিজের স্ত্রীকে খুন করেছিলেন।

চরস কি ? চরস হল ক্যানাবিস শটিভা গাছের ওপরের পাতাগুলো ঘসে যে ঘন আঠার মত নির্যাস পাওয়া যায়—সেই নির্যাসের সঙ্গে কোন কিছুর মিশ্রণ চলবে না। সেই বিশুদ্ধ রেসিন বা নির্যাসকে বলে চরস। ভারতের বহু জায়গায় গাঁজাকেও চরস বলা হয়ে থাকে।

মারিজুয়ানা।

উৎকৃষ্ট শ্রেণীর বা ফাইনেস্ট কোয়ালিটির গঞ্জিকার জন্য যেমন ক্যানাবিস শটিভার চাষ করতে হয়, মারিজুয়ানার ক্ষেত্রে কিন্তু চাষবাসের কোন বালাই নেই। পাহাড়ের ঢালুতে যে অপর্যাপ্ত বুনো ক্যানাবিস শটিভাগাছ জন্মায় তার পাতা, তার কাণ্ড, তার বীজ শুকিয়ে গুঁড়ো করে—সেই চূর্ণের সঙ্গে অশোধিত বা ক্রুড তামাক মিশিয়ে দিলেই, যে মিশ্রণটি হয় তারই নাম—

মারিজুয়ানা!

মারিজুয়ানা নামটি— (মেকিসক্যান স্প্যানিশ শব্দ)। মারিজুয়ানাকে (Marijuana অথবা Marihuana) পৃথিবীর দেশদেশান্তরে কোথাও বলা হয়ে থাকে মারিগুয়ানা (Mariguana) কিম্বা মারিহুয়ানা (Marihuana)। অভিধানে বলা হয়েছে এক ধরনের বুনো তামাক—A wild tobacco (Nicotina glauca)। অত্যন্ত জনপ্রিয় এই ড্রাগ—মারিজুয়ানা যার মূল উপাদান হল বুনো গাঁজাগাছ বা wild hempplant বা ক্যানাবিস শটিভা। প্রায়ই সিগারেটের তামাকের সঙ্গে

মারিজুয়ানা মিশিয়ে মাদকসেবীরা ধোঁয়া টানে।

মারিজুয়ানার আন্তর্জাতিক প্রভাব সম্বন্ধেও বলা দরকার। এই শতাব্দীর একেবারে গোড়ার দিকে আমেরিকার এবং মেক্সিকোর নাবিকরাই প্রথম মারিজুয়ানা নিয়ে যায় আমেরিকা যুক্তরাষ্ট্রে। তারা এক কিলো মারিজুয়ানা ১০ থেকে ১২ ডলারে বিক্রি করত, সেই মারিজুয়ানাই আবার এক কিলো ৩৫ থেকে ৪০ ডলারে বিক্রি করত আমেরিকার ড্রাগ ব্যবসায়ীরা নিউ অরলিয়েন্সে। সেই সময় সাধারণত দরিদ্র অথবা কৃষ্ণকায় নিগ্রো বাসিন্দারাই শুধু মারিজুয়ানা ব্যবহার করত।

ভাঙ্গ অথবা ভাঙ!

ক্যানাবিসেরই আর এক রূপান্তর। ক্যানাবিস শটিভার ওপরের দিকের পাতা এবং ফুল কেটে গুঁড়ো গুঁড়ো করে তার সঙ্গে সুগন্ধী মশলা এবং আফিমের বীজ মিশিয়ে এক সুন্দর মিশ্রণ বা পেস্ট করা হয়—সেই মিশ্রণকেই বলে ভাঙ্গ বা সিদ্ধি। উত্তর ভারতে বিশেষ করে উত্তরপ্রদেশের পূর্বাঞ্চলে এই পেস্টের সঙ্গে জল মিশিয়ে তৈরি করে শরবত। তার ভেতরে প্রচুর পরিমাণে চিনি মিশিয়ে তীব্র মিষ্টি করা হয় সেই পানীয়কে। এই সিদ্ধির শরবত হোলির উৎসবে এবং বিজয়া দশমীতে দশেহারায়—হিন্দুদের যে কোন ধর্মীয় উৎসবে পার্বনের প্রধান উপকরণ এবং অন্যতম আকর্ষণ।

বর্তমান লেখক প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতা থেকে দেখেছে যে গৃহের সিদ্ধির শরবত যত বেশি সুস্বাদু এবং সুগন্ধী সেই উৎসবের বাড়িতে ততো অতিথি সমাগম হয় বেশি। চাক্ষুষ দেখার সৌভাগ্যও হয়েছে ভাঙ্গের বা সিদ্ধির নেশার প্রতিক্রিয়ার রকমারি বৈচিত্র্য!

একটু বেশি পরিমাণে খেলেই নেশার ঝিমুনি শুরু হয়। মাথার ভেতরটা রিল করে বা ঘুরতে থাকে। অত্যন্ত ঘনিষ্ট বন্ধু কিন্তু অ্যাডিক্টের কাছেও শুনেছি—অনেক সময় মনে হয় যেন যেখানে সে বসে সেই ঘরের মেঝেটা বা বাড়ির উঠোনটি যেন বাতাসে পাক খেতে খেতে দ্রুতবেগে ওপরে উঠে যাচ্ছে। সে মিথ্যা ভয়ে আর্তনাদ করে ওঠে। অসম্ভব খিদে পায়। সে যে পরিমাণ ভাত তরকারি খেয়ে থাকে তার তিন গুণ বেশি সে খেয়ে ফেলতে পারে। সবচেয়ে আশ্চর্য তারপরেও তার খিদে মরে না।

হেরোইন এবং মর্ফিন।

হেরোইন ও মর্ফিনের আদি উৎস হল—আফিম। কাঁচা আফিমকে জলে ভিজিয়ে পরিশুদ্ধ করলেই পাওয়া যায় মর্ফিন। অবশ্যই এটা ক্রুড মর্ফিন বা মর্ফিনের আদিপর্ব। তার সঙ্গে অ্যাসেটাইলেশান মিশিয়ে গরম করে আবার পরিশুদ্ধ করলে পাওয়া যাবে খাঁটি মর্ফিন।*

এক বিদেশী ড্রাগ বিশেষজ্ঞ আবার বলছেন—১৮০৩ সালে জার্মান ফার্মাসিস্ট সার্টানার নাকি, প্রথম মর্ফিন আবিষ্কার করেছিলেন। গ্রীসের নিদ্রাদেবী মফিয়াসের নামে তার নামকরণ করেছিলেন—মর্ফিন।

এই মর্ফিনের সঙ্গে সুরাসার, কাঠকয়লা এবং অ্যাসিটোন দিয়ে গরম করে আবার পরিশুদ্ধ করলে পাওয়া যায়, হেরোইনের প্রাথমিক পর্যায়। সেটাকে শুকিয়ে গুঁড়ো করলেই তৈরি হয় ব্রাউনস্যুগার বাদামী রঙের চিনির গুঁড়োর মত খাঁটি হেরোইন।

কোকেন।

কোকেনের জন্ম হয় কোকোপাতা থেকে। কোকোপাতা জলে ভেজাতে হয়। তার সঙ্গে চুন, কেরোসিন এবং হাইড্রোক্লোরিক অ্যাসিড মিশিয়ে দিলে পাওয়া যায় শক্ত উদ্ধৃত্ত ইতালিয়ান প্লাস্টারের মত জিনিস—এটাই কোকেনের আদি পর্ব। তার সঙ্গে আবার মেশাতে হবে হাইড্রোক্লোরিক অ্যাসিড—তারপরে পাওয়া যাবে হাইড্রো-ক্লোরোইড কোকেন।

এল. এস. ডি (De-Lysergic Acid Dythelamide Tartrate)

জার্মানির বেসলের ফার্মাকোলজিস্ট ডক্টর হফম্যানের আবিষ্কৃত এই ড্রাগের জন্ম-বৃত্তান্ত এবং তার সাইকোলজিক্যাল এফেক্ট বা তার প্রতিক্রিয়া ইত্যাদি সম্বন্ধে আগে বার্লিনের অধ্যাপক বুদ্ধিজীবি প্রফেসার ট্রিপারার জবানীতে বলা হয়েছে এবং আরো জানানো হয়েছে বেনারসের অ্যাডিক্ট দীনেশ যাজ্ঞির মাধ্যমে।

বলা দরকার, ট্রিপারা, পাঞ্জাবী যুবক দীনেশ যাজ্ঞি, ইতালির ম্যাসিমো প্রমুখ মাদকসেবীরা কেউই কল্পিত চরিত্র নয়। নার্কটিক ম্যানুয়েলে এবং ড্রাগ বিশেষজ্ঞদের লেখা বিভিন্ন গ্রন্থে এদের উল্লেখ আছে। লেখকরা তাঁদের প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতা থেকে তাদের অ্যাডিকশানের বিবরণ দিয়েছেন। আর এই নেশাখোরদের ড্রাগের প্রতি অস্বাভাবিক আসক্তির বৃত্তান্ত বলতে গিয়ে অনিবার্যভাবে ভুবনবিখ্যাত সাইকেলজিগ বা হ্যালুসিনোজেনিক ড্রাগ এল. এস. ডির কথা বলেছেন। অতএব নিঃসন্দেহে বলা যায় এল. এস. ডির সেই বিবরণ তথ্যভিত্তিক।

তাই এল. এস. ডির বৈশিষ্ট্য সম্বন্ধে আর কিছু না বলে এবার এই সর্বনাশা ড্রাগটির জন্মের নেপথ্য ইতিহাস এবং তার সামাজিক প্রভাবের আলোচনায় অগ্রসর হওয়া যেতে পারে—

'ফর বিডনগেমসের' লেখক ব্রেয়ান ইংলিস (Brain Inglis) জানিয়েছেন এল. এস. ডি ডক্টর হফম্যানের আকস্মিক আবিষ্কার নয়।

বর্তমান শতাব্দীর বিশের দশকেও এল. এস. ডির কোন অস্তিত্ব ছিল না। প্রাচীনতম ড্রাগ গাঁজা বা হ্যাসিসে বেশ সন্তুষ্ট ছিল নেশাখোরেরা। কিন্তু মানুষী প্রকৃতি তো কোন কিছুতেই পরিতৃপ্ত, সন্তুষ্ট থাকার নয়। আর তাছাড়াও ড্রাগের জগতে আরও একটা কঠিন সঙ্কট ঘনিয়ে এসেছিল—গাঁজা এবং আফিমখোরদের স্বাস্থ্যের দ্রুত অবনতি ঘটছিল। সারা দুনিয়ার সমাজসেবী এবং চিন্তাশীল মানুষদের মস্তিষ্কে ধুমায়িত হয়ে উঠেছিল একটি সৎ আর মহৎ ও বলিষ্ঠ সঙ্কল্প কেমন করে এই

আফিমসেবী এবং হ্যাসে আসক্ত মানুষদের অত্যন্ত দ্রুত কবরের দিকে এগিয়ে যাওয়া থেকে প্রতিহত করা যায়—যেমন করে তাদের জীবনীশক্তি এবং পরমায়ুকে দীর্ঘায়িত করা যায় অথচ সর্বনাশ—দুটো ড্রাগ—আফিম আর গাঁজাকে তো আর নির্মূল করা যাবে না। এমন কোন ড্রাগ চেষ্টা চরিত্র করে আবিষ্কার করা যায় না যা আফিম—গাঁজার সাবস্টিটিউট হতে পারে কিন্তু স্বাস্থ্যের ক্ষতি হবে না।

শুরু হয়েছিল গবেষণা।

বিজ্ঞানী, ডাক্তার এবং ফার্মাকোলজিস্টরা দীর্ঘদিন ধরে মাথা খাটিয়ে নিরলস পরিশ্রম করে বের করলেন—পেপপিলস (peppills)। বাজারে ছাড়া হল—সেই নতুন ড্রাগ ১৯৩০ সালে। যে সব রোগী সব সময় যেমন একটা আলস্যে বা লেথারজিতে ভোগে, যেমন একটা ক্লান্তি আর অবসন্নতায় প্রায় অচল হয়ে বসে থাকে ডাক্তাররা তাদের প্রেসক্রাইব করতে শুরু করেন—

পেপপিলস।

যেন একটা ম্যাজিক ঘটে গেল। যাদুমন্ত্রের মত কাজ করল এই ওষুধ বা ড্রাগ। সীমাহীন আলস্য আর অপরিসীম ক্লান্তির জ্বরে যারা ধুঁকছিল তারা তেজি ঘোড়ার মত টগবগিয়ে ছুটতে লাগল।

ডাক্তারবাবুদের উৎসাহ গেল বেড়ে। তাঁরা রণাঙ্গনে যুদ্ধরত কিন্তু সুস্থ সবল সৈনিকদেরও পেপপিলস খাওয়ার প্রেসক্রিপশান করলেন। যাতে তারা দুর্বল এবং অবসন্ন হয়ে না পড়ে, মত্ত হস্তির মত উত্তেজনায় জ্বলে উঠে যুদ্ধ করতে যেতে পারে—দুর্গম জঙ্গলাকীর্ণ পাহাড় ঘেরা সীমান্তে সদাসতর্ক থেকে অতন্দ্র প্রহরায় নিযুক্ত থাকতে পারে—To reman alert on duty.।

১৯৪৭ সালে বিশ্ববিখ্যাত লেখক সমারসেট মম (Somerset Maugham) এক ডিনার পার্টিতে যেয়ে পেপপিলস খেয়েছিলেন। এই ড্রাগের বিচিত্র অভিজ্ঞতা এবং অদ্ভুত প্রতিক্রিয়ার কথা তাঁর ডায়েরিতে আছে। কিন্তু—।

পেপপিলস নিয়েও বিপদ বেধে গেল। নেশাখোরদের মজা হল কি করে নেশাটাকে আরও উগ্র—আরও খর করা যায় এবং সেই তীব্র ঝাঁঝাল নেশার মৌতাতের ভেতরে বেশ অনেক—অনেকক্ষণ ডুবে থাকা যায়—সেই চেষ্টা সবসময় তারা করে থাকে। তাই ড্রাগ খাওয়া বা ড্রাগ টেকিং—এর নিত্যি নতুন নতুন কায়দা বের করে। পেপপিলসগুলো ভেঙ্গে গুঁড়ো গুঁড়ো করে তারা দেহে ইনজেকশান করতে শুরু করল। পরিণাম হল ভয়ানক—Disastrous Effect…আলসার থেকে শুরু করে বুকের দোষ বা চেস্ট ইনফেকশান হজমের গোলমাল অর্থাৎ লিভার ডিসঅর্ডার একেবারে সেরিব্রাল হেমারেজ। (Celebral Haemrrhages) পর্যন্ত হয়ে অত্যন্ত অল্প সময়ের ভেতরে বিপুল সংখ্যায় কফিন বন্দী হতে শুরু করল অ্যাডিক্টরা। ড্রাগসেবীরা অত্যন্ত দ্রুত মৃত্যুর দিকে এগিয়ে চলেছে—এই মৃত্যু এই অবক্ষয়কে যেমন করে রক্ষা করা যায়।

গভর্নমেন্ট—পেপপিলসের ওপরে নিষেধ জারী করল। বাজার থেকে উধাও হয়ে

গেল এই ড্রাগ।

আবার শুরু হল গবেষণা। শুরু হল নিরলস অনুসন্ধান—

আর সেই রিসার্চের কাজ শেষ হওয়ার আগে একেবারেই হঠাৎ আবিষ্কৃত হয়ে গেল এক বিচিত্র নতুন ড্রাগ—এল. এস. ডি।

দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের আগুন জ্বলছে ইউরোপের দেশে দেশে। সেই সময় জার্মানির (বেসল) এক কেমিস্ট ডক্টর আলবার্ট হফম্যান (Albert Hofman) ঘাসের ওপরের ঘন কালো বেগুনী রঙের ছাতা অর্থাৎ ছত্র বা ফ্যাঙ্গাস অর্থাৎ ইরগট (Ergot) নিয়ে ল্যাবরেটারিতে কাজ করছিলেন। এক গ্রাম ইরগটের সুক্ষ্মাতিসুক্ষ্ম চল্লিশ লক্ষ ভাগের এক ভাগ (অর্থাৎ প্রায় বিন্দুর মত) নিয়ে হয়ত কোন নতুন ওষুধ তৈরি করতে চেষ্টা করেছিলেন। কিন্তু—

তাঁর হঠাৎ মনে হল—গোটা ল্যাবরেটারি ঘরটাই যেন চাকার মত বোঁ বোঁ করে ঘুরতে লাগল। আর তাঁর সহকর্মীদের মুখগুলো কেমন ঘোড়ার মত লম্বাটে মনে হল। তাড়াতাড়ি করে বেরিয়ে এসে সাইকেলে চেপে কোনরকমে বাড়ি ফিরলেন। বাড়িতে আসার পরে এই বিচিত্র ড্রাগ এল. এস. ডির জনকের আরও কি সব অদ্ভুত অনুভূতি হয়েছিল—সেসব আগে বলা হয়েছে।

১৯৪৩ সালে আবার আর এক কাণ্ড ঘটে গেল ড্রাগের জগতে এল. এস. ডি আবিষ্কৃত হয়েছিল ঠিকই কিন্তু তখন পর্যন্ত জাঙ্কি বা ফ্রেকরা অর্থাৎ নেশাখোররা এই ড্রাগটির সুলুক সন্ধান পায়নি। কিম্বা সায়ক্রিয়াটিস্টরা কি ডাক্তারবাবু এবং মনস্তত্ত্ববিদরাও এল. এস. ডি নিয়ে নাড়াচাড়া করতে শুরু করেননি। এল এস ডি হফম্যানসাহেবের ল্যাবরেটারি ঘরে বাক্সবন্দী হয়ে পড়েছিল। হয়ত আরো অনেক—অনেক দিন—অনেক কাল পড়েই থাকত।

কোন এক সামরিক কর্তৃপক্ষ 'পেণ্টাগণ' বেয়াড়া এবং বেচাল স্বভাবের সৈনিকদের মগজ ধোলাইয়ের জন্য যুৎসই একটা ওষুধ হন্যে হয়ে খুঁজছিল। মনে হয় কোন কোন মনোবিজ্ঞানী বা সায়ক্রিয়াটিস্টের কানে পড়েছিল এল এস ডি—ড্রাগ—ওয়ার্ল্ডের নতুন আগন্তুকের কথা।

মানসিক রোগের ডাক্তাররা পরীক্ষামূলকভাবে সামরিক কর্তাদের জানালেন এল এস ডির বৃত্তান্ত—প্রেসক্রাইবও করে দিলেন হফম্যানের সেই ড্রাগ। একেবারে যাদু-মন্ত্রের মত কাজ করল এই ড্রাগ। বেয়াড়া টাইপের সোলজারগুলোর বেয়াড়ামো একেবারে কর্পূরের মত কোথায় উবে গেল। কিন্তু কিছুদিন পরেই মিলিটারি ডিপার্টমেণ্ট কেন যেন আগ্রহ হারিয়ে ফেলল। সাইকোলজিস্টরা হতাশ হয়ে গেলেন। এল এস ডির কথা ভুলেই গেলেন তাঁরা সাময়িকভাবে। পেরিয়ে গেল—

এক এক করে এগারটা বছর। ১৯৫৪ সালে এল এস ডি-কে আবার কবর থেকে তুলে নিয়ে এলেন যিনি, তিনি ডাক্তার, সায়ক্রিয়াটিস্ট এবং ফার্মাকোলজিস্টদের আবার স্মরণ করিয়ে দিলেন তিনি কিন্তু মেডিকেললাইনের লোকও নয় এমনকি একটা ওষুধ নিয়ে জীবনে কখনো নাড়াচাড়াও পর্যন্ত করেননি। সেই মানুষ কি না কি

কারণে কে জানে এল. এস. ডির কয়েকটি বড়ি খেয়েছিলেন। সঙ্গে সঙ্গে শুরু হয়েছিল অ্যাকশান। সেই অদ্ভুত প্রতিক্রিয়ার বিবরণ শুনুন এবার তাঁর জবানীতে—

লাইব্রেরির ঘরে বসে লেখাপড়া করছিলাম। হঠাৎ মাথার ভেতরে কেমন ঝিমঝিম করতে শুরু করল। চোখের সামনে মনে হল রাশি রাশি রং বেরঙের ফুল যেন ভেসে বেড়াচ্ছে। আর র‍্যাকের লাল মলাটের বইটি রক্তবর্ণ রুবির মত জ্বলজ্বল করছে তার ঝকঝকে বোর্ড বাঁধাই বইটি কোন মূল্যবান শ্বেতপ্রস্তরের মত ঝকমক করছে— আমার মনে হল—মনে হয়েছিল তাকের বইগুলো যেন বই নয়—কোনটিই বই নয়— সব সব এক একটি মহার্ঘ ধাতুনির্মিত খণ্ড—কোনটা সোনার, কোনটা রুপোর, কোনটা আবার বৈদূর্যমণির, কোনটা পীতবর্ণ পোখরাজের, কোনটা উগ্র ঘন সবুজ বর্ণ প্রস্তর ল্যাপিস ল্যাজুলি নির্মিত—আর সবচেয়ে আশ্চর্য প্রতিটি রং এত উজ্জ্বল— এত তীব্র—আর এত ভয়ানক রকমের অ্যাগ্রেসিভ আর ইনটেনস যে তারা যেন সেলফ থেকে ছিটকে নেমে এসে আমার সমস্ত চেতনার ভেতরে আগুন জ্বালিয়ে দেবে। আমার ওপর ঝাঁপিয়ে পড়ে আমাকে ছিঁড়ে টুকরো টুকরো করে ফেলবে……

এই অদ্ভুত প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতার বিবরণটি যাঁর তিনি বিশ্বসাহিত্যের অন্যতম শ্রেষ্ঠ লেখক—

অলডাস হাকসলি (Aldous Huxley)।

আর এল এস ডির সাংঘাতিক প্রতিক্রিয়ার এই বর্ণনাটি আছে তাঁর বিখ্যাত গ্রন্থ 'ডোরস অফ পারশেপশানে' (Doors of perception)। ১৯৫৪ সালে এই বইটি প্রকাশিত হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে এল এস ডি নিয়ে ডাক্তার সায়ক্রিয়াটিস্টদের মহলে প্রচণ্ড আলোড়ন পড়ে গেল। তাতে আরো ইন্ধন জোগালেন আর এক ইংরেজ মনস্তত্ত্ববিদ এবং লেখক হ্যাভলক ইলিস (Havlock Ellis 1859-1939)। তাঁর একটি কেসে মানসিক বিকলনের রোগিণী লুইস লিউয়িনকে এল এস ডি দিয়ে সুস্থ করে তুলতে সক্ষম হলেন! মেডিকেল জার্নাল ল্যানসেটে খবরটি বেরিয়েও গেল। সঙ্গে সঙ্গে এল এস ডির ডিমাণ্ড বেড়ে গেল হু হু করে!

এইখানেই শেষ নয়। হ্যাভলকসাহেব কাগজে একটি স্টেটমেণ্টও দিয়ে বললেন এল এস ডি শুধু মানসিক বিকারের কিম্বা নেশার মৌতাতের আচ্ছন্নতাকে উপভোগ করার ড্রাগ নয়। এল এস ডির আরও একটি আশ্চর্য মহৎ গুণও আছে— Hightened the perception—অন্তর্লোকে উদার ও মহৎ একটি ব্যাপ্তির উপলব্ধি জাগিয়ে দেয়। এই অনুভূতি—এই প্রতীতি মেসকালিন (Mescaline)* খেলেও হতে পারে।

বলা দরকার এই 'মেসকালিন' এল এস ডিরও একটি উপাদান। এল এস ডিকে বেশ তেজি এবং জোরাল করে তুলতে মেসকালিন প্রয়োজন। সেই প্রসঙ্গে আবার একটি বড়

---

* মেসকালিনের মূল উপাদান হল মনসা জাতীয় ছোট ছোট গাছ যার কাণ্ড বেটে মেকসিকোর আরতীয়রা উত্তেজক পানীয় তৈরি করত পানীয় ছাড়া ঈষৎ ক্ষারযুক্ত দানার মত করেও তৈরি করা যায়।

সুন্দর কথা বললেন—মেসকালিন দিয়ে ম্যানুফ্যাকচার করা এল এস ডিই তো খেয়েছিলাম। আর আমি বোকা নই। মিথ্যা কথাও বলি না—বইয়ের র‍্যাকে শুধু রঙের খেলা নয়, শুধু নানা রঙের মিছিল নয়—আরও একটি আশ্চর্য—বড় আশ্চর্য অনুভূতিও হয়েছিল। সেই ভয়ানক উগ্র আর অত্যুজ্জ্বল এক একটা রঙের তীব্ররশ্মি যেন দূরে বহুদূরে কোন সুদূর দূরবিস্তীর্ণ অনন্তলোক পর্যন্ত প্রসারিত। আর সেই আলোকোজ্জ্বল এক একটি—পথরেখা অনেক—অনেক গভীর অন্ধকার দীর্ণবিদীর্ণ করে আমাকে—আমাকে যেন নিয়ে এল এক অপরিসীম সৌন্দর্যের ভুবনে।

আপনারা হয়ত মনে করছেন—এসব তো হ্যালুসিনেশান—সব নেশার প্রভাবে। হোক নেশার জন্য—হোক অত্যন্ত ক্ষণস্থায়ী, তবুও ক্ষণকালের জন্য হলেও তো স্বার্থ কোলাহল আর হতাশা ও বিষণ্ন বেদনায় দীর্ণবিদীর্ণ সংসার থেকে মনটাকে নিয়ে যেতে পারে উদার ও মহৎ একটা ব্যাপ্তির ভেতরে অর্থাৎ Elevation—রোমান ক্যাথলিকদের ধর্মসাধনায় এবং ধ্যানধারণার ভেতরেও যা পরিস্ফুট হয়ে উঠেছে। মানুষের জীবনের উদ্দেশ্য যদি হয় salvation বা মুক্তি এবং বোধ (Intellect)—বড় দুর্লভ আর অত্যন্ত আয়াসসাধ্য—এই দুটো অনুভূতিই মেসকালিন বা এল এস ডি থেকে পাওয়া যেতে পারে।

রকমারি ড্রাগের বৈশিষ্ট্য এবং সমাজজীবনে তাদের বিচিত্র প্রভাবের আলোচনার এইখানেই ছেদ টেনে দেওয়া যেতে পারত। কিন্তু—হাক্সলি যে বলেছেন Enlightment বা Elevation মনের ব্যাপ্তি, সেটা যে কত বেশি নির্জলা সত্যি তার একটা সত্য ঘটনা বলতে হয়।

২৪ ফেব্রুয়ারি ১৯৭৮। গোয়ারই কোন এক নাম না জানা জনমানবহীন নির্জন এক বালুচরে নারকেল পাতায় ছাওয়া কুঁড়েঘরে বসেছিল চার-পাঁচজন নেশাখোর! তারা নেশা করলে যা হয়, আবোল তাবোল বকছিল। কেউ বা হাসছিল তো হেসেই যাচ্ছিল—হাসতে হাসতে একেবারে গড়িয়েই পড়ছিল।

ঘরের মাঝখানে জ্বলছিল একটা মোমবাতি। সাগরের বাতাসের ঝাপটাকে আড়াল করার জন্য তারা তাদের কারো রুকস্যাক দাঁড় করিয়ে দিয়েছিল। তবুও থেকে থেকে রোগা পাঁ্যাকাটির মত সরু মোমবাতির শিখা কেঁপে কেঁপে উঠছিল। সেই ছায়াকাঁপা নিভু নিভু আলোয় নেশার ভারে ঢুলুঢুলু জাংকিদের যেন মনে হয়েছিল কতকগুলো প্রেতাত্মা!

খট-খট-খট হঠাৎ বাইরে বুটজুতো পরা পায়ের শব্দ বেজে উঠল। ঘরে এসে ঝড়ের মত ঢুকল খুব সুন্দর আর লম্বা চওড়া মজবুত চেহারার এক সাহেব অ্যাডিক্ট। কালচে রঙের একমাথা ঝাঁকড়া চুল। ধারাল মুখশ্রী। খাড়া নাকের ঘননীল দুটো চোখ দেখে মনে হল গ্রীক। ঘরের মানুষগুলোর সঙ্গে একটা কথাও না বলে তাদের মাঝখানে বসে পড়ল। চোখ ঘুরিয়ে ঘুরিয়ে দেখল ঘরের আনাচে কানাচে কি আছে—হঠাৎ উঠে দাঁড়াল। কুড়িয়ে নিল একটা ছবি—গৌতম বুদ্ধের ছবি—। বোধহয়

কোন বুদ্ধভক্ত জাস্কিই ফেলে গিয়েছে।

ছবিটার দিকে কিছুক্ষণ এক দৃষ্টিতে তাকিয়ে রইল সাহেব। মৃদু হাসি ফুটে উঠল তার মুখে। আঙ্গুল থেকে তার আংটি—হীরের আংটিটা খুলে হাতের তালুতে রাখল। গম্ভীর গলায় বলল—ছবিটা কার জানতে পারি—

কেন, আমার। বোম্বাইয়ের এক ছোকরা মারাঠি অ্যাডিক্ট হাসতে হাসতে বলল।

তারপরেই একটা অদ্ভুত কাণ্ড করে বসল সাহেব। হাসতে হাসতে বলতে লাগল—বল তো ছবিটা কার? একটু থেমে আবার বেশ সিরিয়াস হয়ে বলল, বলতে পারলে তোমাকে এই আংটিটা দিয়ে দেব—

ছেলেটি কেমন যেন থতমত খেয়ে গেল। বলে কি সাহেব—আংটিতে হীরে জ্বলজ্বল করছে। বেশ কয়েক হাজার টাকা দামের আংটিটা দিয়ে দেবে!—

বল--তাড়াতাড়ি বল। আমার সময় নেই—চলে যাব—সাহেব তাড়া দিল।

কেন ছবিটা ভগবান তথাগতের—

ঠিক—ঠিক বলেছ—আংটিটা তার আঙ্গুলে পরিয়ে দিয়ে ছবিটা নিয়ে বেরিয়ে চলে গেল সাহেব।

বড় বিচিত্র ড্রাগ এল এস ডি।

প্রায় বারো বছর ধরে একটানা যিনি এল এস ডি খেয়েছেন এমন এক অ্যাডিক্টের প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতা থেকে জানা যায়—এল এস ডি-তে আসক্ত জাঙ্কিদের কাছে সেক্স অর্থহীন।

লিঙ্গের কোন ভেদাভেদ থাকে না। প্রায়ই দেখা যায় দেশী বিদেশী ফ্রেকরা মেয়েপুরুষ দল বেঁধে ঘোরে কিম্বা—এল এস ডি, হেরোইন এবং হ্যাসিস অধ্যুষিত জায়গাগুলোতে যেমন—দিল্লী, মিরাট, কাঠমাণ্ডু এবং পশ্চিম উপকূলের সমুদ্র সন্নিহিত বড় শহরে গোয়া, বোম্বাই, ত্রিবেন্দ্রাম ইত্যাদি নগরে জনপদে অত্যন্ত পরিচিত দৃশ্য—কমন সাইট (common sight)-এল এস ডি বেশ কড়া ডোজে শরীরে বিঁধিয়ে নিয়ে ইয়ং ছেলেমেয়েরা রাস্তায় রাস্তায় জোড়ায় জোড়ায় ঘুরছে।

কখনো নেশায় নেতিয়ে পড়ে হয়ত বা কোন বাড়ির গাড়িবারান্দায় কি গাছের নিচে বসে পড়ে। ড্রাগের প্রভাবে খিদেটিদে থাকলেও খাওয়ার জন্য হন্যে হয়ে হোটেলবারে ঘোরে না। হেভী ডোজের মর্ফিন কি হেরোইন কিম্বা এল এস ডি খেয়ে খিদে তৃষ্ণা সব ভুলে যায়। এমনকি শীত বা গরমের অনুভূতিও থাকে না। যাই হোক দিনের বেলাটা কোনরকমে কেটে যায়।

কিন্তু সমস্যা হয় যখন চারদিক অন্ধকার ছড়িয়ে দিয়ে রাত নামে। কোন হোটেলের ঘরে, কোথাও কোন কারো পরিত্যক্ত বাড়ির কোন একটা ঘরে ঢুকে পড়ে। সে ঘর যত নোংরাই হোক—আর যত ভাঙ্গাচোরাই হোক না কেন—ওসব দিকে তারা ভ্রুক্ষেপও করে না। মোটামুটি একটা আচ্ছাদন, কি আড়াল না হলে মেয়েদের নিয়ে তো খোলা জায়গায় রাত কাটানো যায় না।

ঘরে ঢুকেই ড্রাগের অ্যাকশনে আর ঘোরাঘুরির পরিশ্রমে মেঝেতে কি তক্তপোষে ওরা গা এলিয়ে দেয়। কিন্তু যতই নেশার ঘোরে আচ্ছন্ন হয়ে থাকুক, যতই ক্লান্ত থাক, পয়লা রিপুটি কিন্তু কখনো কোন বাধা মানে না। সে ঠিক মাথাচাড়া দিয়ে ওঠে। নাই বা জোড়া মিলল—কখনো হয়ত দুটো পুরুষ একটি মেয়ে কিম্বা দুটো মেয়ে একটা পুরুষ যাই হোক দুটো মেয়েই একটা ছেলেকে ঝাপটে ধরে শুয়ে পড়ে—আবার এমনও হয় দুটো ছেলেই হয়ত পরস্পরকে জড়িয়ে ধরে চুমুতে চুমুতে আচ্ছন্ন করে দেয়। আর মেয়েদের সঙ্গে যা স্বাভাবিক এবং অনিবার্য সেই মৈথুনকর্মে লিপ্ত হয়ে যায়।

বাইরে গভীর রাত্রি মধুর এক সুখস্বপ্নের আবেশে কেমন আবিষ্ট হয়। কিন্তু সবচেয়ে আশ্চর্য—যদি রমনক্রিয়ার সেই মেয়েটি যদি মেয়ে না হয়ে একটি ছেলে হত, তাতেও বিন্দুমাত্র এসে যেত না। তাকেই বুকে জড়িয়ে ধরে তাকে অনাবৃত করে দেহের সঙ্গোপন অঙ্গগুলোতে তপ্ত চুম্বন এঁকে এঁকে তাকে কেমন বিহ্বল আর অস্থির করে তোলে। তার এক মুহূর্তের জন্যেও মনে হয় না যে সে—

রমণী নয়।

পনের

কলম্বিয়ার কোকেনলর্ডরা কোটি কোটি টাকার চোরাকারবার করছে। মার্কিন প্রেসিডেন্ট বুশ তাদের শায়েস্তা করতে চান। কিন্তু ওয়াশিংটনের মেয়র নিজেই স্মাগলার। কিন্তু সরষের ভেতরেই ভূত।

ড্রাগের নেশা।

শুধু এই শহর কলকাতায় নয়, দিল্লীতে নয়—এই উপমহাদেশের নগরে গ্রামে জনপদেই তার হিংস্র থাবা দেয়নি। সারা পৃথিবী জুড়ে সে তার বিষ ছড়িয়েছে। যত দিন যাচ্ছে তত সে আরও—আরও বেশি করে তার তাণ্ডব শুরু করেছে। তাই—

২৯ মে, '৮৭। বৃহস্পতিবারের দুপুরে কলকাতার ইউ. এস. ইনফরমেশান আয়োজিত "International Control of Drug Traffic" নিয়ে একটি সেমিনারে ইউ. এস ড্রাগ এনফোর্সমেণ্ট এজেন্সির (U. S Drug Enforcement Agency) প্রতিনিধি ব্রুস আপচার্চ (Bruce Upchurch) স্পষ্টই বললেন—It is increasingly evident that trafficking in narcotics has emerged as a crucial element in global lawlessness including terrorism and insurgency…

ড্রাগের স্মাগলিং দিনের পর দিন বেড়ে যেতে যেতে এমন একটা ভয়ানক বিপজ্জনক পর্যায়ে পেঁাছে গিয়েছে, যাকে বলা যায় দুনিয়া জোড়া অরাজকতা, আইনশৃঙ্খলার কোন বালাই নেই—তার সঙ্গে শুরু হয়েছে সন্ত্রাস এবং দেশে দেশে গণঅভ্যুত্থান।

তিনি আরও বলেছেন আগে ড্রাগ অ্যাবিউস বললেই বুঝতে পারা যেত ড্রাগের সর্বনাশের গতিপ্রকৃতি এবং তাদের ব্যবহার ইত্যাদি। এখন এই ছোট্ট কথাটির গুরুত্ব যেমন বেড়েছে তেমনি অসাধারণ ভয়ঙ্কর বিধ্বংসী এক অমঙ্গলের সংকেত বহন করেছে।

কি সেই বিপদ বা অমঙ্গল?

সেটা একটা নতুন ধরনের প্রাকৃতিক ঘটনা বা ফেনোমেনন (Phenomenon) নার্কো-টেররিজম (narco-terrorism)। এখন দেখা যাচ্ছে নার্কটিকের কারবারিদের সঙ্গে সন্ত্রাসবাদীদের নিবিড় যোগাযোগ আছে আবার কোথাও বা ড্রাগ স্মাগলার নিজেই উগ্র সন্ত্রাসবাদী। মোটের ওপর তাদের পিস্তল-বন্দুক কেনা, বোমা অর্থাৎ তাদের অপারেশনের যাবতীয় খরচ উঠে আসে ড্রাগের স্মাগলিং থেকে। তাই—

তাই নিঃসন্দেহে বলা যায় শত্রু খুব শক্তিশালী। যত বড়, যত শক্তিমান শত্রু তাকে মোকাবিলার জন্য তত বড় প্রস্তুতির একান্ত প্রয়োজন। পৃথিবীর দেশে দেশে একসঙ্গে বাঘের মত হিংস্র আক্রোশে ঝাঁপিয়ে পড়তে হবে সেই শত্রুর ওপরে। ড্রাগবিরোধী সেই অভিযানকে বলা যেতে পারে—Global attack on drug abuse…

শুধু এলোপাথাড়ি আক্রমণ করলেই হবে না, আপচার্চসাহেব এই লড়াইয়ের পুরো ছকও কেটে দিয়েছেন—প্রথমেই সারা দুনিয়াজুড়ে একটি ব্যাপক এবং বহুদূর বিস্তীর্ণ জাল ফেলতে হবে। গুপ্তচরদের জাল worldwise intelligence network…

একসময় মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের স্পাইংয়ের বেশ বড় আর মজবুত জালই ছিল কিন্তু কয়েক বছর ধরে আর তেমন গা করা হয়নি। ফলে পরিনাম হয়েছে ভয়াবহ। সেখানে ড্রাগের সর্বনাশা পরিস্থিতি এমন সাংঘাতিক হয়েছে যে কর্তৃপক্ষের একেবারে আয়ত্তের বাইরে চলে গিয়েছে। তাঁর (আপচার্চ) দেশই এখন বেআইনী ড্রাগের সবচেয়ে বড় খদ্দের। এই সময় ভারতেরও উচিত সাহসের সঙ্গে এগিয়ে এসে উত্তাল বন্যার মত উন্মত্ত বেগে এগিয়ে আসা ড্রাগের সর্বনাশা প্রভাবের প্রতিরোধ করা—তা নাহলে আমেরিকার মতই ড্রাগের নেশা মহামারীর রূপ নেবে।

স্মরণ রাখতে হবে ড্রাগ শুধু যে নেশাখোরদেরই তিলে তিলে মৃত্যুর দিকে নিয়ে যায়, তা নয়, সমগ্র সমাজকেই ধ্বংস করে দেয়। মানুষের অনেক যত্নে গড়া বহু যুগের সংস্কৃতি ও ধ্যানধারণাকে ধূলিসাৎ করে দিয়ে তার অর্থনৈতিক ভিতটাকে নাড়িয়ে দেয়……

পৃথিবীর বিভিন্ন অগ্রসর দেশগুলো যেমন ইংলণ্ড, ফ্রান্স, জার্মানিতে ড্রাগের নেশার চিত্রটা কেমন, সেখানকার নেশাড়ুরা কি খায়—হেরোইন না মারিজুয়ানা ইত্যাদি বিশদ করে বলার আগে মনে রাখা দরকার—

পৃথিবী এখন ছোট।

খুব—খুব ছোট। স্বর্ণভূমির বা সেই গোল্ডেন ক্রিসেণ্টের হেরোইন কয়েক ঘণ্টার ভেতরে উড়ে চলে যাচ্ছে পাঞ্জাবের চৌহদ্দির ভেতরে ভারত পাকিস্তানের সীমান্তে। পাকিস্তান থেকে আবার স্মাগলাররা নানা কৌশলে পাচার করছে ভারতের বিভিন্ন বড় বড় শহরে। অতএব—

ড্রাগের নেশা বা ড্রাগ অ্যাবিউসের সমস্যা শুধু ভারতের কি ইংলণ্ডের কি আমেরিকার নয়—কোন একটি দেশের নয়, এই সমস্যা এই সঙ্কট সারা পৃথিবীর সমগ্র মানব সমাজের। তাই সবচেয়ে প্রযোজ্য আপচার্চের সেই কথাটি—

গ্লোবাল থ্রেট।

The chain of evil goes round the world সারা পৃথিবীর ড্রাগের সমস্যায় মনে রাখতে হবে ইংরেজ কবি এ. ই. হাউসম্যানের (A. E. Houseman) এই বিখ্যাত উদ্ধৃতিটি। সর্বনাশা সেই ভয়ঙ্কর বিপদ তার জাল ছড়িয়ে দিয়েছে সারা পৃথিবীতে।

তুমি হেরোইন কবে থেকে ধরেছ?

বছর চারেক।

তোমার এত কম বয়স—তুমি—

ওসব বলবেন না—বলবেন না ডাক্তারবাবু হেরোইন না খেলে আমি বাঁচব না—

কেন? কি অসুবিধা তোমার—বল ফ্রাঙ্কলি বল—

কোন কথা বলে না সে। মাথা নিচু করে নেশার ঘোরে বুঁদ হয়ে থাকে। তাকে আর খোঁচাখুচি করতে ইচ্ছে করে না সায়কিয়াটিস্টের।

কি হবে শুনে—কী লাভ। শতকরা ৯০ ভাগ অ্যাডিক্ট ঠিক যে কারণে নেশা করে সেও তাই বলবে। তবুও জেরা করেছিলেন আইরিশ ডিপার্টমেণ্ট অফ হেলথের (Irish Department of Health) প্রবীন মনস্তত্ত্ববিদ এবং মানসিক রোগের সুবিখ্যাত চিকিৎসক ডক্টর জিওফ্রে ডীন (Dr. Geoffrey Daen)। করতে হয়। তাই করেছিলেন। আর যা ভেবেছিলেন ঠিক তাই।

নতুন বা অভিনব কোন যুক্তি দেখাতে পারেনি সেই মাদকসেবী। ডক্টর ডীন স্থির চোখে তাকিয়ে থাকেন তাঁর পেশেণ্টের দিকে। মাত্র আঠারো বছর বয়স। নেশায় জীর্ণ বিধ্বস্ত হলেও এখনও—এখনও তার দীর্ঘ সুগঠিত চেহারায় কিছুটা গ্রীক বীর হারকিউলিসের আদল খুঁটিয়ে দেখলে পাওয়া যায়।

সুডৌল ধারাল মুখশ্রীতে তীক্ষ্মবুদ্ধির ছাপও আছে। হয়ত কেন—নিশ্চয়ই সে তার মজবুত স্বাস্থ্য এবং প্রখর বুদ্ধি ও ব্যক্তিত্ব দিয়ে দেশ ও দশের অনেক অনেক উপকারই করতে পারত। কিন্তু—

কেন তার কঠিন দারিদ্র্য, কেন তাকে প্রতিটি দিন নুনে-তেলে হিংস্র লড়াই করতে হয়। কেন সে নোংরা বস্তির বাসিন্দা—কেন সে যথেষ্ট লেখাপড়া শিখেও বড় বড় অফিসের দুয়ারে দুয়ারে ঘুরেও একটা সামান্য চাকরিও পায় না—এসব, এতগুলো কেনর কোন একটারও উত্তর জানা নেই তাঁর।

তাঁর মনে পড়ে অলডাস হাক্সলির (Aldous Huxley) উপন্যাসের 'টাইম মাস্ট হ্যাভ এ স্টপের' নায়ক যে মানুষের সেই 'জায়েণ্ট অ্যাগনি' দূর করতে গিয়ে পাগল হয়ে গিয়েছিল। যে দুঃখ দারিদ্র্য মানুষের কাঁধে দৈত্যের মত চেপে বসে থাকে তাকে দিবানিশি কুরে কুরে খেয়ে ফেলেছে, সেই হিংস্র দৈত্যটাকে বধ করবে কে?

অতএব সেই পেশেণ্ট ডাবলিনের সেই টিন এজারের (১৩-১৯ বছরের) কেস-হিস্ট্রিতে লিখলেন সেই বাঁধা গৎ—আনএমপ্লয়েড, লিভিং ইন এ শ্লাম (বস্তির বাসিন্দা)। আর—

ড্রাগের নেশায় সব ভুলে থাকার সবগুলো কারণের ভেতরে যেটি সবচেয়ে সেরা সেই বাবা মা-র ভেতরে ডিভোর্স, বাবার আবার বিয়ে করা, মা-র চলে যাওয়া এবং মা কি বাবা এবং নতুন মা—কারো কাছ থেকে এতটুকু স্নেহ ভালবাসার ছিটেফোঁটাও না পাওয়া অর্থাৎ চাইল্ড অফ এ ব্রোকেন হোম, আনলাভড আর—

ভবিষ্যতের ঘন অন্ধকারে এতটুকু আশার আলো দেখতে না পেয়ে গভীর হতাশার চোরাবালিতে একটু একটু করে ডুবে যাওয়া—For whom DRUGS were the only way of escaping the reality of his existence. তার অবাঞ্ছিত অস্তিত্বের রূঢ় বাস্তব থেকে পালিয়ে যাওয়ার একমাত্র উপায়—

ড্রাগ।

১৯৮২-৮৩ সালের আইরিশ মেডিকেল জার্নালে প্রকাশিত এই কেসহিস্ট্রির শেষে ডক্টর ডীন এবং তাঁর সহকর্মী ডক্টর ফলে মন্তব্য করেছেন—সারা আয়ারল্যাণ্ডে ড্রাগের

নেশা প্রবল মহামারীর মত হয়ে দেখা দিয়েছে—Drug addiction in Ireland was an acute epidemic.

১৯৮২ সালের জুলাই মাসে আর একটি সমীক্ষায় ড্রাগের দূরপ্রসারী ধ্বংসলীলার বিবরণে পরিস্ফুট হয়ে উঠবে আধুনিককালের পৃথিবীর জ্ঞানবিজ্ঞানে উন্নত সভ্যতার গর্বে অন্ধ মানবসমাজ কত দ্রুত ভয়ংকর একটা অবক্ষয়ের দিকে উন্মত্ত বেগে ছুটে চলেছে।

(ক) ১২ থেকে ১৮ বছরের ৫,১৭৮ জন ছেলেমেয়েকে নিয়ে এই সার্ভে করা হয়েছিল। দেখা গিয়েছে ১৯৭০ সালে যে সমীক্ষা করা হয়েছিল তার চেয়ে চারগুণ বেশি বেড়েছে ড্রাগ অ্যাবিউস।

(খ) ১৬ বছরের বেশি ছেলেমেয়েরা এবং ১৬ বছরের কম মেয়েরা স্বীকার করেছে—ডাক্তারের প্রেসক্রিপশনে নেই এমন ড্রাগ তারা খোলাবাজার থেকে কিনে খায়।

(গ) আর সবচেয়ে চাঞ্চল্যকর এবং সর্বাপেক্ষা বিপজ্জনক যে তথ্যটি উদ্ঘাটিত হয়েছে তা হল ১৬ বছরের অনেক কম বয়সের ছেলেমেয়েরা নেশায় আসক্ত হয়ে নিজেরাই নিজেদের কবর খুঁড়ছে। তাই আমাদের মতে স্কুলে কলেজের সিলেবাসে অবশ্যই সংযোজন করতে হবে আর একটি অবশ্যই প্রয়োজনীয় বিষয়—

ড্রাগ এডুকেশান।

ছাত্রজীবনের একেবারে শুরু থেকে সেই সুদূর শৈশবে স্কুলে পড়তে পড়তেই সে জানবে ব্রাউন সুগার কি—খেলে কি হয়। জানবে হ্যাসিস কি—কি-ই বা মারিজুয়ানা আর ওপিয়াম। প্রত্যেকটি ড্রাগের কমপোনেন্ট (কি কি দিয়ে তৈরি হয়) যেমন জানবে তেমনি অবশ্যই তাকে জানতে হবে— ড্রাগের অপকারিতা শক্তি কত বেশি ভয়ংকর।

বলা দরকার ১৯৮৩ সালের এই সমীক্ষাটিও করেছিলেন ডক্টর ডীন এবং তাঁর সতীর্থরা। সার্ভে রিপোর্ট শেষ করেছেন সেই হাউসম্যানেরই কবিতা উদ্ধৃত করে—

And how I am to face the odds.
Of man's bedevilment and Gods ?
I a Stranger and afraid
In a world I never made

অর্থাৎ—

ওহে, কেমন করে রুখব সেই অশুভ শক্তি
তবে, কি দিয়ে শুধু বিধাতার অশেষ করুণা আর মানুষের ভক্তি ?
জান কি আমি—আমি আগন্তুক আমি ভীত,
এসে পড়েছি এমন এক পৃথিবীতে, যা আমি করিনি সৃষ্ট ॥

ইংলাণ্ড।

ইংলাণ্ডের ড্রাগ অ্যাবিউসের সমীক্ষা করেছেন ডক্টর গাব্রিয়েল নাহাজ (Dr. Gabriel Nahas)। তিনি রাষ্ট্রসংঘের (United Nations) ড্রাগবিশেষজ্ঞ এবং ড্রাগ-সমস্যার পরামর্শদাতা অর্থাৎ কনসাল্টাণ্ট। একটানা পনের বছর ধরে তিনি গবেষণা করেছেন, এখনও করে চলেছেন বিভিন্ন ড্রাগের ওপরে।

রিপোর্টে অন্য কোন ড্রাগের খবর জানা যায় না। শুধু জানা যায় একটি-একটি মাত্র নেশার উপকরণের অসামান্য বিধ্বংসী প্রভাব। ড্রাগটি হচ্ছে—

মারিজুয়ানা।

ব্রিটেনে শুধু এই একটি মাত্র ড্রাগই ব্যবহার করে ৫০ লক্ষ মানুষ। সালে মারিজুয়ানার স্ট্রীট প্রাইস ছিল—১ গ্রেন = ১১ পেন্স। আর গাঁজাগাছের ডালপাতায় যে ঘন আঠার মত একটা পদার্থ বেরোয় সেই ক্যানাবিস রেসিনের ১ গ্রেনের দাম ১৬ পেন্স।

বেআইনী যে সব ড্রাগ বাজেয়াপ্ত করা হয়—সেই আটক পণ্যদ্রব্য বা সিজারের (seizure) হিসেব থেকে দেখা যাচ্ছে ইংলাণ্ডের মানুষ সবচেয়ে বেশি এবং অত্যন্ত দ্রুত আসক্ত হচ্ছে যে ড্রাগ, তার নাম—

ক্যাণ্ডি! অর্থাৎ

কোকেন!

১৫,৬৩৭ পাউণ্ড চোরাই কোকেন ধরা পড়েছিল ১৯৩৮ সালে। তার আগের বছরের তুলনায় তিনগুণ বেশি।

অবশ্যই বলতে হবে ইংলাণ্ডে নেশার উপকরণের যে তালিকা, তার একেবারে মাথায় আছে—

হেরোইন!

১৯৩৮ সালে রাস্তাতেই বিক্রি হয়েছিল ২,৫৩,৪৩,০৮৩ পাউণ্ডের স্ম্যাক (হেরোইন)। এই বেআইনী ড্রাগ হেরোইনের শতকরা ৮০ ভাগই এসেছে ভারতের পশ্চিম প্রান্তের স্বর্ণভূমি অর্থাৎ পাকিস্তান এবং অর্ধচন্দ্রাকৃতি স্বর্ণভূমি বা গোল্ডেন ক্রিসেণ্ট (ব্রহ্মদেশ, থাইলাণ্ড এবং লাওস) থেকে।

ইংলাণ্ডের নার্কটিক কণ্ট্রোল ব্যুরো এবং কাস্টম এই হেরোইনের স্রোত রুখতে বাধ্য হয়েই সাঁইত্রিশ বছরের এক বহুদর্শী ড্রাগ বিশেষজ্ঞ এবং কাস্টম ইনভেস্টিগেটার মি. মাইকেল স্টিফেনশানকে দুই বছরের জন্য করাচিতে পাঠিয়েছে। তিনি পাকিস্তান কাস্টম এবং নার্কটিক কণ্ট্রোলের কর্তৃপক্ষের সঙ্গে একসঙ্গে কাজ করবেন। কিন্তু তার মূল লক্ষ্য হবে—ইংলাণ্ডে যাতে গোপন পথে হেরোইন ঢুকতে না পারে—To reduce the flow of heroin.

স্টিফেনশানসাহেব এই বিধ্বংসী নেশার উপকরণ হেরোইনের স্মাগলিং কতটুকু কমাতে পেরেছিলেন, কি তার রেজাল্ট জানা যায় না। তবে কেন ব্রিটিশ কাস্টম কর্তৃপক্ষ তাকে করাচিতে পাঠানোর সিদ্ধান্ত করেছিলেন, কতটা বিপজ্জনক এবং

সংকটজনক পরিস্থিতি হয়েছিল তা নিচের শুধু ইংলাণ্ডের অ্যাডিক্টদের পরিসংখ্যান থেকে বুঝতে পারা যাবে—

ড্রাগ	নেশাখোরদের সংখ্যা
হেরোইন এবং কোকেন	৪৩৭
হেরোইন, মর্ফিন এবং পেথিডিন	২৬৫৭
হেরোইন, কোকেন ও মেথাডোন	৩৪২৫
হেরোইন	৫১০৭
হেরোইন	১০,২৩৫

বলা দরকার শুধু ইংলাণ্ড নয়, আমেরিকা নয়—বিশেষ কোন একটি দেশ নয়, এই যে মাদকসেবীদের ক্রমবর্ধমান সংখ্যার জন্য অবশ্যই দায়ী ড্রাগের চোরা-কারবারিরা, দায়ী খুচরো বিক্রেতা বা পেডলাররা। মানুষের বহু-বহু যত্নে গড়া এই সভ্যতা বিধ্বংসী বস্তুটি নিয়ে যদি চিন্তাটাকে অনেক-অনেক দূরে ছড়িয়ে দেওয়া যায় তাহলে দেখা যাবে সবচেয়ে বড় অপরাধী তারা যারা পাকিস্তানের কি ব্রহ্মদেশের, থাইলাণ্ডের কিম্বা লাওসের ক্ষেতে এই বিষ বা পপিপ্ল্যাণ্ট অর্থাৎ আফিমের চাষ করছে।

নিশ্চয়ই উল্লেখযোগ্য পাকিস্তানের ঠিক কোথায় কোন অঞ্চলের ক্ষেতে খামারে এই সর্বনাশা বিষের উৎপাদন হয়। জানা দরকার—কেন না এই পাকিস্তানই সারা দুনিয়ার দেশে দেশে হেরোইন চোরাপথে পাঠাচ্ছে। তাই ইংলাণ্ড থেকে সেই মারাত্মক গরল স্রোতকে প্রতিহত করতে বিশেষজ্ঞ পাঠাতে হয়।

আফগানিস্তানের সীমান্ত ঘেষা পাকিস্তানের উত্তর পশ্চিম সীমান্ত রাজ্যে চারিদিকে কঠোর বন্ধুর ছোট বড় পাহাড় দিয়ে ঘেরা বিস্তীর্ণ প্রান্তরে হয় পপিপ্ল্যাণ্ট বা আফিমগাছের চাষ। পর্বতাকীর্ণ ভয়ংকর দুর্গম অঞ্চলটিতে নেই কোন বিশেষ কেন্দ্রীয় সরকারের শাসন। তাই নেই কোন পুলিশ, নেই কোন আইন ও শৃংখলার বিধিনিষেধ। যথেচ্ছ পরিমাণে তৈরি করছে আফিম। খাইবার গিরিপথ সংলগ্ন বিভিন্ন পাহাড়ের ভেতরে ভেতরে আছে ল্যাবরেটরি, সেখানে র আফিম থেকে অ্যাসেটিক অ্যানিড্রাইড (Acetic annydride) নামে একটি কেমিক্যাল মিশিয়ে তৈরি হচ্ছে হেরোইন। শতকরা ৭০ ভাগ হেরোইন চলে যায় আমেরিকায় আর মাইনমা (ব্রহ্মদেশ) থেকে বাদবাকি শতকরা ৩০ ভাগ হেরোইন রপ্তানি হয় কিছু আমেরিকায় কিছু ইউরোপে এবং এশিয়ার বিভিন্ন অঞ্চলে।

বলা দরকার ওয়েস্টার্ণ জোনের নার্কটিক কণ্ট্রোল ব্যুরোর চীফ কুমারসাহেবও পাকিস্তানের ড্রাগের বিষময় কার্যক্রম সম্বন্ধে কিছু তথ্য দিয়েছিলেন আমাকে। সেই ইউ. এন রিফিউজি বামাল নওরোজ, সেই হজযাত্রীর ছদ্মবেশে ড্রাগ স্মাগলার, দুর্গম পার্বত্য অঞ্চল খাইবার গিরিপথ সন্নিহিত ড্রাগ ম্যানুফ্যাকচারিং-এর কারখানা এবং অনেক-অনেক বেশি টাকার আকর্ষণে পাকিস্তানের হেরোইন মার্কিনমুলুকে পাচার—এসবই আলোচনা করেছিলেন তিনি। কিন্তু বড় সংক্ষিপ্ত ছিল তার বিবৃতি এবং ছিল

তাঁর স্বভাবসিদ্ধ তাড়াহুড়ো।

দেশ দেশান্তরের ড্রাগের চোরাপথে গতিবিধি সম্বন্ধে আরো কিছু রোমাঞ্চকর তথ্য দেওয়ার বাসনা রইল। সেই তথ্যগুলোর ভেতর থেকে পরিস্ফুট হয়ে উঠবে একটি শোকাবহ নির্মম সত্য—

সারা পৃথিবীজুড়ে চলছে অদৃশ্য ড্রাগচক্র। আর তাতে লিপ্ত আছে সেনাবাহিনীর জওয়ান, সীমান্তরক্ষী থেকে শুরু করে কোন কোন দেশের প্রেসিডেণ্ট পর্যন্ত। অতএব—

শত্রু শক্তিশালী।

তাকে নির্মূল করা কঠিন খুব কঠিন। কিন্তু এখন থাক সেসব তত্ত্বকথা।

মনে রাখা দরকার পপিপ্ল্যাণ্ট কি হ্যাস লিভস যারা চাষ করে, যারা গোপনে ড্রাগ পাচার করে দেশে দেশে যারা সন্ধ্যার কি রাতের অন্ধকারে কোন পার্কের কোণে ঝুপসি গাছের আড়ালে দাঁড়িয়ে জয় পাউডার (হেরোইন) কি হেভেনলি সানসাইন (এল. এস. ডি) কিম্বা ক্যাণ্ডি (কোকেন) আর ড্রিমার (মরফিন) খুচরো বিক্রি করে—তারাই অর্থাৎ তিনটি শ্রেণীর মানুষ প্ল্যাণ্টার (চাষী), স্মাগলার, পেডলাররাই ড্রাগ অ্যাবিউসের জন্য দায়ী কিন্তু—

লণ্ডনের দুই হাসপাতালের দুই ডাক্তার বা সায়কিয়াটিস্ট ডক্টর থমাস ডিউলি (Dr. Thomas Dewley) এবং ডক্টর হামিড ঘোডসে (Dr. Hamid Ghodse) ড্রাগের নেশার বা ড্রাগ অ্যাডিক্টদের দুই বিশেষজ্ঞ ৬৯ থেকে ১০০ জন মাদকসেবীদের নিয়ে একটি সমীক্ষা করে উদ্ঘাটিত করেছেন ড্রাগ অ্যাবিউসের জন্য দায়ী আরো একটি শ্রেণী। কিন্তু তার আগে বলতে হয় সার্ভে কি করে করা হয়েছিল—

প্রথমে একটি নোটে লেখা হয়েছে ৬৯ থেকে ১০০ জন কিন্তু প্রতিটি প্রশ্নের উত্তর দেয়নি। তাদের ওপর কোন জোরজুলুমও করা হয়নি। প্রথম ব্যাচে ৪৮ জনকে জেরা করা হয়েছিল। প্রত্যেকটি অ্যাডিক্টকে একই প্রশ্ন করা হয়েছিল—

তুমি কি ড্রাগ খাও ?

হেরোইন।

নেশা করে শরীর খারাপ করেছ—চিকিৎসার জন্য হাসপাতালে না এসে প্রাইভেট ডাক্তারের কাছে গিয়েছ কেন ?

—প্রাইভেট ডাক্তার ইনজেকশানেবল ড্রাগ দেন—নেশাটা বেশ জমে—

৪৪ জনই এই কথা বলেছিল।

আবার ৪০ জন অ্যাডিক্টকে ডাকা হল। একই প্রশ্ন—কেন প্রাইভেট ডাক্তার ?

ডাক্তারবাবু একটার বেশি ড্রাগ খেতে দেন। আমাদের নেশা করতে এবং ড্রাগ কিনতে সুবিধে হয়—এই জবানবন্দী ৩৮ জনের।

তৃতীয় গ্রুপের ৩৯ জনের ভিতরে ৩৬ জনই বলেছিল আমরা প্রাইভেট ডাক্তারদের প্রেফারেন্স দিয়ে থাকি এবং দেব। কারণ তারা প্রেসক্রিপশানে এত বেশি ড্রাগ দিয়ে দেন যা সপ্তাহ ভোর খেলেও শেষ হয় না। বাড়তি ড্রাগ ব্ল্যাকমার্কেটে চড়াদামে বিক্রি করে সেই টাকায় সে ব্ল্যাকমার্কেট থেকেই এল. এস. ডি কি কোকেন ইত্যাদি আরো

উগ্র আরো উত্তেজক নিষিদ্ধ ড্রাগ কিনে থাকি—

প্রাইভেট ডাক্তারদের সুবিধে কি জানেন, যে ড্রাগ আমরা চাই—টাকা দিলেই সেই ড্রাগ প্রেসক্রিপশনে দিয়ে দেন—৫৬ জন অ্যাডিক্টদের ভিতরে ৫১ জনই খোলাখুলি এই কথা বলেছিল। আরো চল্লিশজন অ্যাডিক্টের ভেতরে সাইত্রিশজন অকপটে স্বীকার করেছিল প্রাইভেট ডাক্তাররা অনেক বেশি বেশি ডোজে ড্রাগ দিয়ে থাকেন। তাঁরা কখনো বলেন না—এটা খেও না—ওটা খেও না। কখনো কোন রেস্ট্রিকশান করেন না। ডাক্তাররা এসব তো কিছুই করবেন না। হুট করে ড্রাগ স্টপ করে দেবেন—

আশা করি ১৯৮৩ সালের এই সমীক্ষা থেকে স্পষ্ট হয়ে উঠেছে আর কারা ড্রাগের নেশাকে সমাজে ছড়িয়ে দিচ্ছেন। কিন্তু তাঁরা আমাদের মনে সম্রাটের মহিমায় বিরাজ করে থাকেন। জীবন-মৃত্যুর দুয়ারে দাঁড়িয়ে আমরা আকুল হয়ে তাদের দিকে হাত বাড়িয়ে থাকি—

ডক্টর ডিউলি এবং ডক্টর ঘোডসে সার্ভে রিপোর্টের শেষে মন্তব্য করেছেন—Survey established the contemptible attitude of private doctors.

আমেরিকায় ড্রাগের নেশা সুরু হয়েছিল এক আশ্চর্য ঘটনার মাধ্যমে।

১৯০০ সাল। সারা উত্তর আমেরিকা জুড়ে চলছে গৃহযুদ্ধ। সেই যুদ্ধে দুই পক্ষের জখম হল ৪,৭০,০০০ সৈনিক। তাদের প্রত্যেককে চিকিৎসা করা হল মর্ফিয়া দিয়ে। মর্ফিয়া ইনজেকশান দিতে ব্যথা বেদনা কোথায় কর্পূরের মত উড়ে গেল।

মর্ফিয়া বা মরফিয়ার—

হল আর এক নামকরণ ওয়াণ্ডার এলিকজারস (Wonder Elixers) অর্থাৎ আশ্চর্য এক মহৌষধ।

মরফিয়া দিয়ে পেশেণ্টকে রিলিফ দেওয়াটা আস্তে আস্তে কেমন করে যেন উঠে গেল। শুরু হয়ে গেল দেদার মরফিন খেয়ে নেশা করে বুঁদ হয়ে থাকা অর্থাৎ মরফিন অ্যাডিকশান।

কোকেন।

গোড়াতে কোকেন দিয়েও রোগীদের চিকিৎসা করা হত। ওষুধ থেকে নেশার উপকরণ হয়ে গিয়েছিল কোকেনও।

ইতিমধ্যে চীন থেকে দক্ষিণ পূর্ব এশিয়ার নানা দেশ থেকে দলে দলে লোক রুজি রোজগারের উদ্দেশে পাড়ি দিতে শুরু করল মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে। তারা সেখানে গড়ল বসতি। আর তাদের ধ্যানধারণা তাদের সংস্কৃতি এবং তাদের জীবনচর্যার বৈশিষ্ট্যকে ছড়িয়ে দিল বিদেশের মাটিতে। কে না জানে, চীনাদের জীবনধারার একটা বড় অংশ জুড়ে রয়েছে আফিমের নেশা এবং তারাই প্রথম আমেরিকায় নিয়ে গিয়েছিল আফিম। ইতিহাসে স্পষ্ট করে লেখা আছে—Opium smoking and consequently Opium addiction became known throughout U.S A. at the begining of 20th century through the Chinese and Asian immigrants...

কিন্তু দেশের মাটিতে যে ভয়াবহ বিষের আমদানী হয়েছে, ঘরে ঘরে যে তামাকের

সঙ্গে আফিম দিয়ে ধূমপান করা চলছে সেই বিষয়ে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র কর্তৃপক্ষ ছিলেন উদাসীন। কিন্তু—

১৮৯৮ সালে স্পেনের সঙ্গে আমেরিকার যুদ্ধ বাধল। তুমুল যুদ্ধ করে স্পেনের কাছ থেকে কেড়ে নিল ফিলিপাইন দ্বীপপুঞ্জ। ফিলিপাইনে শুরু হল মার্কিন প্রশাসন। ঠিক তখন ফিলিপাইনের এক পাদ্রীসাহেব লক্ষ্য করলেন আমেরিকার সৈনিক থেকে শুরু করে মার্কিন দেশের মানুষগুলো আফিমের নেশায় একেবারে জর্জরিত হয়ে ধীরে ধীরে কবরের দিকে এগিয়ে চলেছে।

পাদ্রীসাহেব সেই বিশপ আবার যে সে ধর্মযাজক নন ফিলিপাইনের এপিসকোপালিয়ান অর্থাৎ ধীশক্তিতে, প্রজ্ঞায় এবং কঠোর ব্যক্তিত্বে শক্তিধর এক ধর্মপ্রচারক রেভারেণ্ড চার্লস ব্রেন্টই (Reverend Charles Brent) প্রথম মার্কিন সরকারের কাছে তাঁর ব্যক্তিগত আবেদন জানালেন—আফিমের আমদানী বন্ধ করে দিন শীগগীরই। আমেরিকানদের তিলে তিলে ধ্বংসের দিকে ঠেলে নিয়ে যাচ্ছে আফিমের নেশা। Immediately Curb the Opium trade…আফিমের ব্যবসাকে বা আমদানীকে রুখতে না পারলে নিশ্চিহ্ন হয়ে যাবে ফিলিপাইনের বাসিন্দা আমেরিকানরা—বলা দরকার বিশ শতকের বহু আগে থেকেই চীনারা আসতে শুরু করেছিল। তাই আফিমও এসেছিল বহু বহু আগে।

কর্তৃপক্ষের টনক নড়ল।

কিন্তু অনেক—অনেক দেরি হয়ে গিয়েছিল। বছরের পর বছর ধরে চীনারা এসেছে। বসতি গড়েছে। তাদের সন্তানসন্ততি নিয়ে প্রজন্মের ডালপালা ছড়িয়ে দিয়েছিল মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের রাজ্যে রাজ্যে। দিনে দিনে বেড়েছে, বেড়ে গিয়েছিল লোকসংখ্যা। তারাও বলাবাহুল্য নেশা করতে শুরু করেছিল।

নেশা।

পাপ।

দুষ্টবুদ্ধি।

এক কথায় Evil. এসব নিম্নগামী। জলের স্রোতের মত অত্যন্ত তীব্রবেগে চলে যায় নিচের দিকে। তাই—

যতই পাদ্রীসাহেব বলুন। আফিমের ব্যবসা বন্ধ করা গেল না। বছরের পর বছর ধরে তার চাহিদা বেড়ে গেল। বেড়ে গেল জনপ্রিয়তা। পেরিয়ে গেল পুরো পঞ্চাশটা বছর। আধখানা শতাব্দী পেরিয়েও যখন আরো একটা দশকও যায় যায় তখন দেখা গেল জয়েণ্ট কমিটি অফ আমেরিকান বার অ্যাণ্ড মেডিকেল অ্যাসোসিয়েশন একটা রিপোর্টে ঘোষণা করল যেমন করেই হোক নার্কটিক ড্রাগের স্রোতকে রুখতে হবে। আর নেশাখোরদের বা অ্যাডিক্টদের সুস্থ জীবনে ফিরিয়ে নিয়ে আসার চেষ্টা করতে হবে—attentions also be given to developing technique for curing addiction.

শুরু হল যুদ্ধ।

ড্রাগের বিরুদ্ধে সংগ্রাম।

এসব ১৯৫৮ সালের কথা। ড্রাগের বিরুদ্ধে যুদ্ধের প্রথম ফলশ্রুতি কি?

পাঁচজন ড্রাগ ব্যারন বা মাফিয়া সর্দারকে* গ্রেপ্তার করা হল। এক নম্বর জিনোভিজ, (২) জোসেফ ডিপালরামো, (৩) স্যালভ্যাটরে স্যান্তোরা আর দুজনের নাম জানা যায়নি। যাই হোক মাফিয়াদের বিচার হল। সাজাও দেওয়া হল বেশ কড়া—জিনোভিজের পনের বছরের সশ্রমকারাদণ্ড এবং ২০,০০০ ডলার জরিমানা আর ডিপালরামো ও স্যালভ্যাটরের জেল হল ২০ বছরের এবং আরো বারোজন মাফিয়ার কিছু কমসম সাজা হল। কিন্তু যেসব মাফিয়া পুলিশের চোখে ধুলো দিয়ে আইনকে বুড়ো আঙুল দেখিয়ে কারবার চালাতে লাগল; তারা অবাধে করে চলল ড্রাগ পাচার। কিছুই কমল না ড্রাগ অ্যাবিউস।

এসে পড়ল ১৯৬১ সাল। মার্চ মাসে আমেরিকাকে নিয়ে ৭৪টি দেশের প্রতিনিধিদের একটি সভা বসল নিউইয়র্কে। নার্কটিক ড্রাগের বিরুদ্ধে নিরলস সংগ্রামের শপথ নিয়ে তারা একটি চুক্তিনামায় স্বাক্ষরও করলেন। পরের বছর আমেরিকার সুপ্রীম কোর্ট একটি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ রায় বা জাজমেন্ট দিয়ে ঘোষণা করল—নেশা করলে ফৌজদারি আইনে দণ্ডনীয় অপরাধ বলে গণ্য করা হবে—Judgement that made addiction a criminal offence ··

১৯৬১ সালে পঁয়ত্রিশ নম্বরেরমার্কিন প্রেসিডেন্ট হয়ে হোয়াইট হাউসে এলেন জন ফিটজে জেরাল্ড কেনেডি (John Fitzgerald Kennedy)। চেয়ারে বসেই কড়া হাতে ড্রাগ সমস্যার মোকাবিলা করতে সিদ্ধান্ত নিলেন। মার্কিন অ্যাটর্ণী জেনারেলকে সভাপতি করে ড্রাগ অ্যাবিউসের প্রবলেম নিয়ে একটা কনফারেন্সও করলেন হোয়াইট হাউসে। সেই সভায় বড় গলায় ঘোষণাও করলেন কেনেডি—আমেরিকার মাটিতে ড্রাগের যে বিষবৃক্ষ রোপিত হয়েছে এবং যা আজ পর্যায়ক্রমে ছড়িয়ে মহীরুহ হয়ে উঠেছে অতীতে হাজার হাজার শুভবুদ্ধি সম্পন্ন মানুষ শুধু তার ডালপালাগুলোকেই গোড়া থেকে কেটে দিয়েছে। আর কিছুই করেনি—করতে পারেনি। আমরা কিন্তু সেই বিষবৃক্ষের শেকড়টাকেই উপড়ে ফেলব না কেটে টুকরো টুকরো করে মিসিসিপির জলে ভাসিয়ে দেব······

রোমাণ্টিক মনের মানুষ। সুরেলা ভাবাবেগে ভরপুর বক্তৃতা। অবশ্যই হাততালি পেলেন। ১৯৬৩ সালে প্রেসিডেন্টের নার্কটিক এবং ড্রাগ অ্যাবিউস সম্বন্ধীয় এক কমিটি গঠিত হল। তাঁরা গুপ্তচরদের দেশের বড় বড় শহরে, গ্রামে জনপদে পাঠিয়ে দিয়ে নার্কটিকের কারবারিদের গোপন সংস্থাগুলো বের করতে চেষ্টা করলেন কিন্তু—

বন্যার জলের তোড় কে কবে বাঁধ দিয়ে আটকাতে পেরেছে? কেনেডি কি তার উপদেষ্টা কমিটি মনে হয় জানতেনই না ড্রাগের বিষ গাছটাকে আরো পরিপুষ্ট করেছে

---

* মাফিয়া কথাটির অর্থ হল ভূমধ্যসাগরে ইতালির দক্ষিণের দ্বীপ সিসিলিতে গঠিত একটি ক্রিমিনাল সোসাইটি। (২) রাজনৈতিক সন্ত্রাসবাদীদের গুপ্তসমিতি (৩) দুষ্কৃতকারি এবং খুনীদের নিয়ে তৈরি কোন গোপন সংস্থা (৪) নিষিদ্ধ ড্রাগের চোরাকারবারি বা স্মাগলার এবং যারা ড্রাগ বিক্রি করে, জুয়া খেলে ও সারা পৃথিবী জুড়ে নানা অসামাজিক বেআইনী কাজে লিপ্ত। পাকিস্তানে, কলম্বিয়াতে ড্রাগের মাফিয়ারাই বার বার প্রশাসনের চাকা উল্টে দেয়। এদের লোকবল, অর্থবল বিপুল।

আরো শক্তিশালী করে তুলেছে। দ্বিতীয় মহাযুদ্ধকালীন বহু সিনথেটিক ড্রাগ বা নানা রাসায়নিক বস্তুর মিশ্রণে উৎপন্ন নকল ড্রাগ। ১৯৪৬ বিশ্বযুদ্ধের শেষে নানারকমের সিনথেটিক ড্রাগে দেশ ছেয়ে ফেলেছিল—In the year 1946 Handful of synthetic drugs introduced developed in wartime…

শুধু কি তাই? ১৯৬০ সাল থেকে ওষুধ তৈরির কারখানাগুলো বা ফার্মাসিউটিকাল ইন্ডাস্ট্রি সমৃদ্ধ হয়ে উঠল। তারা নানারকমের উত্তেজক বা স্টিমুলান্টস আবার বেশ অবসাদে ভার ভার হয়ে নেতিয়ে পড়ে থাকার ড্রাগ ডিপ্রেশান্টস (Depressants) তৈরি করে দেবার বাজারে ছাড়তে লাগল।

শুধু কি তাই? নেশা করে দুটো পাখা মেলে আকাশে ওড়ার ড্রাগ 'আপার' আবার ড্রাগের প্রভাবে পাতালের অন্ধকারে নেমে যাওয়ার ড্রাগ 'ডাউনারের' সঙ্গে ফার্মাসিস্টরা তৈরি করতে লাগল খুব সামান্য ডোজে ড্রাগ মিশিয়ে রঙবেরঙের চকোলেট, লজেন্স—ডঙ্কানিনাদ করে দিল বিজ্ঞাপন—Here are the technicolour sweets for school going flower children·· ফুলের মত সুন্দর ছোট ছোট স্কুলের বাচ্চাদের জন্য এখানে আছে নানারঙের মিষ্টির সম্ভার…

বাচ্চাদের লোভনীয় এই চকোলেট বা টফিতে ড্রাগ মেশাতে গিয়ে কোন ফার্মাসিস্ট ধরা পড়েছে, জেল হয়েছে এমন কোন নজির আমেরিকাতে তো নেই আর এক গোলার্ধের দেশগুলোতেও খুঁজে পাওয়া যায় না।

ওষুধ প্রস্তুতকারক—ফার্মাসিস্ট।

কত লাইফ সেভিং (Life saving) ড্রাগ তাঁরা তৈরি করছেন। মৃত্যুর দুয়ার থেকে কত লোককে ফিরিয়ে আনছেন। নিঃসন্দেহে তাঁরা সমাজে অত্যন্ত সম্মানীয় ব্যক্তি। কিন্তু তাঁরা যে এক হাতে জীবনদায়ী ওষুধ বানাচ্ছেন আর এক হাতে বাচ্চাদের বিষ খাওয়াচ্ছেন—সেই ব্যাপারে কোন দেশের প্রশাসনকে কখনও সোচ্চার হতে দেখা যায় না। আশ্চর্য এমন কি প্রতিদিন যাঁরা গরম গরম বক্তৃতা করে থাকেন বা করতে হয় কোন দেশেরই সেই মিনিস্টার বা মন্ত্রীদের কাউকে কখনও শিশুহন্তা এই ড্রাগের কারবারিকে কঠিন শাস্তি দেওয়ার ঘোষণাটুকু পর্যন্ত শোনা যায় না।

হায় বৃথাই আমরা দেশ থেকে ড্রাগকে তাড়াতে চেষ্টা করছি।

ড্রাগের সঙ্গে লড়াই করতে গিয়ে কেনেডি আরো বেকায়দায় পড়ে গেলেন।

না। সিনথেটিক ড্রাগ নয় ফার্মাসিস্টদের তৈরি কোন স্টিমুলান্ট কি আপার বা ডাউন কোন ড্রাগ নয়—নয় মানুষের তৈরি কোন প্রতিবন্ধক। এ একেবারে প্রকৃতির মার। সেটা হল আমেরিকার ভৌগলিক অবস্থান। মেক্সিকোর বর্ডার পেরলেই সবুজ ফসলের বিস্তীর্ণ প্রান্তর—আমেরিকার সবুজ ঐশ্বর্য—Greening of America.

কিন্তু কিসের সবুজ—কোন্ ফসল?

মারিজুয়ানা!

যতদূর চোখ যায় একেবারে দিগন্ত পর্যন্ত প্রসারিত প্রান্তরে মারিজুয়ানা বা ক্যানাবিসের সবুজ গাছ বাতাসে মাথা দোলাচ্ছে। মেক্সিকোর উষ্ণ আবহাওয়ায় বড়

সাইজের ক্যানাবিসের চারা চড় চড় করে বেড়ে ওঠে। সমস্ত চারাটি লোমশ একটা জিনিসে পরিপূর্ণ তার থেকে আঠালো ব্রাউন রঙের রেজিন হয়। চারাটি শুকিয়ে গুঁড়ো করে নিলেই পাওয়া যায়—

মারিজুয়ানা।

রেজিনটাকে শক্ত কেকের মত করে নিলেই হল হ্যাসিস বা গাঁজা।

মারিজুয়ানা সস্তাদরের তামাক। গরীবদুঃখী মানুষের অথবা কালোমানুষদের ধূমপানের উপকরণ—It was generally smoked by the poor or Negro population। আগেও মারিজুয়ানা সম্বন্ধে অনেক তথ্যই দেওয়া হয়েছে।

গোড়ার দিকে মেক্সিকোর নাবিকরা জাহাজ বোঝাই করে নিয়ে আসত আমেরিকায় —মারিজুয়ানা। তারপরে তা স্মাগলার, পেডলাররা মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের বড় বড় শহরে ছড়িয়ে দিল এবং দিচ্ছে এই বিষ।

সানফ্রানসিসকোর এক নোংরা, ময়লার জঞ্জালে ভরা শহরতলী—হেইট আসবারি (Haight Asburry) হল মারিজুয়ানার নেশাখোরদের মক্কা। এখানকার আবছায়া অন্ধকারে ছেয়ে থাকা স্যাঁতসেঁতে গলিঘুঁজির ছোট ছোট দোকানে যেমন মারিজুয়ানা তেমনি এল. এস. ডিও খুব সস্তায় পাওয়া যায়। অতএব আমেরিকায় বিভিন্ন ইউনিভারসিটির ছাত্রছাত্রী, উঠতি বয়সের ছেলেমেয়ে এবং হিপিরা এখানে দলে দলে ঘুর ঘুর করে। কিন্তু—

ইদানীং আবার ইউনিভারসিটি স্টুডেন্টরা এল এস ডির দিক থেকে মুখ ফিরিয়ে নিয়েছে। তারা দেখেছে এল এস ডিতেও স্বপ্নের পাখায় ভর করে আকাশে ওড়া যায়, আকাশ কুসুম ভাবা যায়—কিন্তু মনটাকে দূরে অনেক দূরে একেবারে গভীরে নিয়ে যেয়ে স্থিত করতে পারে না—Reluctantly concluded L S D cannot control the mind…যেমন পারে আঞ্জেলডাষ্ট (গাঁজা) বা মেক্সিকান ব্রাউন (হ্যাসিসের আর এক নাম) যেমন পারে গোল্ডেন ট্র্যাঙ্গেলের স্ম্যাক (হেরোইন)। অতএব তারা হ্যাসিস কি হেরোইনের আকর্ষণে ছুটে আসে লস আঞ্জলসের বাজারে। এখানে হিপিদের সঙ্গে 'কিউ' করে দাঁড়িয়ে কেনে হেরোইন কিম্বা হ্যাসিস, যার যেটার ওপরে ঝোঁক। হিপিরা কিন্তু হ্যাসিসের চেয়ে ঢের বেশি পছন্দ করে এল এস ডি। কে বলেছে মনটাকে সংযত করতে পারে না এল এস ডি?

বাজে কথা।

তারা প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতা থেকে জানে, এল এস ডি বাস্তব পৃথিবী থেকে দূরে—বহু দূরে এক অজানা লোকে নিয়ে যেয়ে মনটাকে নির্বিকার, নিশ্চল এবং স্থিতগ্রস্ত করতে পারে—Certainly it can control the mind—and they liked it.

আমেরিকারড্রাগেরনেশায় আরবেশি করে ইন্ধন জুগিয়েছিল—ফ্রান্স। মার্সেলেসের ল্যাবরেটরি এবং ওষুধের কারখানায় হেরোইনকে রিফাইনিং করে বেশ সুন্দর রঙবেরঙের সেলোফেন কাগজে মুড়ে প্যাকেট করে আমেরিকার বাজারে ছাড়ত।

তাই জন কেনেডি কিছুই করতে পারলেন না। ড্রাগ প্রবলেম যেমন ছিল তার চেয়ে ঢের বেশি বেড়ে গেল। তারপরে প্রেসিডেন্ট হয়ে হোয়াইট হাউসে এলেন—

রিচার্ড নিকসন।

ড্রাগের বিরুদ্ধে মনে হয় তাঁর মত আর কোন প্রেসিডেন্ট এত তীব্র এবং জোরালো জেহাদ ঘোষণা করেননি। তাঁর দেশটাকে যে তিলে তিলে ধ্বংসের দিকে নিয়ে যাচ্ছে সেই ড্রাগ প্রবলেমকেই তিনি প্রথম সলভ করবেন—এটা হবে তাঁর প্রেসিডেন্ট হিসেবে প্রাথমিক এবং প্রধান কাজ।

ড্রাগ অ্যাবিউসকে নিকসন বলতেন 'দেশের এমন একটা ক্ষত, এমন একটা পীড়া, যার প্রকোপ দিনে দিনে বেড়েই চলেছে'—Rising sickness in our land···দেশের জনস্বাস্থ্যের মহাশত্রু Serious threat to public health···

১৯৭১ সালে জুন মাসেই তিনি এক এক্সিকিউটিভ অর্ডার জারী করে হোয়াইট হাউসের ভেতরেই খুলে ফেললেন এক স্পেশাল অ্যাকশান অফিস—Establishing within the White House a Special Action office for Drug Abuse Prevention. ম্যানিফাস্টোতে লিখলেন—এই স্পেশাল অ্যাকশান অফিসের কাজ হবে নেশাখোরদের ধরে এনে তাদের ড্রাগ উইথড্র করিয়ে দিয়ে চিকিৎসা করা। জানতে হবে—কেন এরা ড্রাগ খায়। কোন ফ্রাস্ট্রেশান তাদের অংকুশের খোঁচা মেরে হেরোইন খেতে নিয়ে আসে। চিকিৎসা করে সুস্থ হওয়ার পর তাদের কোন কাজে ভিড়িয়ে দেওয়া বা যাকে বলে পুনর্বাসন বা রিহাবিলিটিশান করবে তাঁর এই অ্যাকশান স্কোয়াড। শুধু কি তাই? আরও আছে—

রিহাবিলিটিশান করিয়েও সেই নেশাখোর হতভাগ্যগুলোকেকখনো ছাড়া হবে না। দস্তুরমত লেখাপড়া শেখানো হবে। বিশেষ করে ড্রাগ এডুকেশান। কোন—ড্রাগের কি কুফল সে সম্বন্ধে তাদের ওয়াকিবহাল করানো হবে।

মহৎ আদর্শ।

বলিষ্ঠ ঘোষণা—অস্বীকার করা যায় না। কিন্তু এসে পড়ল ১৯৭৫ সাল। সেই উনিশশো পঁচাত্তর সঙ্গে করে নিয়ে এল তাঁর চরম দুর্ভাগ্য—ওয়াটারগেটের কেলেঙ্কারিতে জড়িয়ে গেলেন। মাথা নিচু করে হোয়াইট হাউস থেকে বিদায় নিতে হল তাঁকে।

ইতিমধ্যে দুনিয়ার দেশে দেশে ড্রাগের বিরুদ্ধে আন্দোলন তীব্র হয়ে উঠেছে—মানুষ সচেতন হয়ে উঠেছে নেশার সর্বনাশা অভিশাপ সম্বন্ধে। নিখিল বিশ্বে আন্তর্জাতিক পটভূমিতেই শুরু হয়ে গেল ড্রাগের বিরুদ্ধে তীব্র প্রচার International Campaign against drugs···

নিকসনের পরে এলেন কার্টার। সালটা তখন ১৯৭৭। তিনি কিন্তু নিকসনের মত এত বেশি লম্ফঝম্ফ করলেন না। করেও বসলেন না কোন আস্ফালন কিম্বা ড্রাগের বিরুদ্ধে নিরলস সংগ্রামের কোন কঠিন শপথ। বরং উল্টে তিনি খানিকটা উদার মনের পরিচয় দিলেন। ঘোষণা করলেন—মারিজুয়ানা খেয়ে একটু আধটু নেশা করতে চায় করুক না। কারো কাছে যদি মারিজুয়ানা পাওয়া যায় তাহলেই তাকে হুট করে ধরে এনে জেলে ঢুকিয়ে দিও না। জেলের পরিবেশ এমন যে সেখান থেকে আরও বেশি নেশাখোর ক্রিমিনাল হয়ে ফিরে আসবে।

কিন্তু এই রাশ আলগা করতে গিয়েই মুস্কিল হয়ে গেল। হোয়াইট হাউসের সদস্যরা কেউ কোকেন, কেউ মারিজুয়ানা এনে দিব্যি নেশা করতে শুরু করল। মার্কিন প্রশাসনের কেন্দ্র একেবারে খোদ ঘাঁটিই হয়ে উঠল ড্রাগ অ্যাবিউসের লীলাক্ষেত্র। একজন চিকিৎসক সদস্য তো একটু বেশি বাড়াবাড়ি করে ফেললেন।

ডক্টর বোর্ণে।

তিনি নিজে ছিলেন পাকা কোকেনখোর। তাঁর মারিজুয়ানাও চলত বেশ। নেশা করে বুঁদ হয়ে থাকতেন দিনের বেশির ভাগ সময়। নেশার ঝোঁকে তিনি করে ফেললেন এক সাংঘাতিক কাণ্ড—

স্যার কি করি বলুন তো রাতে কিছুতেই ঘুম আসে না, হোয়াইট হাউসের এক ছোকরা অ্যাসিস্টাণ্ট বোর্ণের কাছে এসে মুখ কাঁচুমাচু করে দাঁড়াল।

ডাক্তার কোন কথা বললেন না।

তিনি কোকেন তামাকের সঙ্গে মিশিয়ে পাইপ টেনে একেবারে সমাধিস্থ হয়ে বসেছিলেন।

স্যার কোন ওষুধ প্রেসক্রাইব করবেন, একটু থেমে আবার ভয়ে ভয়ে বলল সে শুনেছি আপনি ডাক্তারিও করেন ভাল।

ডক্টর বোর্ণে এবার যেন একটু নরম হলেন।

ছেলেটির মুখের দিকে খরচোখে তাকালেন। তাকিয়েই রইলেন।

চোখের নিচে কালি পড়েছে। চোখের রঙও স্বাভাবিক নয়। একটু লালচে। গালের হাড়দুটোও ঠেলে ওপরে উঠতে চাইছে—সিম্পলি কেস অফ ইনসমনিয়া—আর কিছু বললেন না। নিজের প্যাডে ঘুস ঘুস করে ওষুধ লিখে দিয়েই ছিঁড়ে তার হাতে দিয়ে দিলেন প্রেসক্রিপশান—

মেথাকোয়ালন (Methaqualone)।

স্যার এই ওষুধ যে কোন দোকানে পাব তো ?

আরে বাপু—আর জ্বালিও না ডাক্তার এবার চটে গেলেন। নেশার সময় ঝুট-ঝামেলা করলে কার মেজাজ ঠিক থাকে। বললেন যাও না রাস্তায় তো কত ওষুধের দোকান আছে—তাদের কাছে যেয়ে একটু কষ্ট করে খোঁজ কর না—

অ্যাসিস্টাণ্ট চলে গেল।

কয়দিন পরই জানা গেল ছেলেটির অবস্থা ভয়ানক খারাপ। হড় হড় করে বমি করছে। হাতটা খিচোচ্ছে। বিছানা থেকে লাফ দিয়ে নেমে ছুটে বাইরে চলে যেতে চাইছে। দু-তিনজন জওয়ান তাকে জাপটে ধরেও আটকাতে পারছে না—

তার বাবা মা ওয়াশিংটনের এক নামী ডাক্তারকে কল দিয়ে নিয়ে এলেন। তিনি জিজ্ঞাসা করলেন—কোন ওষুধপত্র খাইয়েছেন নাকি—

হ্যাঁ। এই তো ওষুধটা দিয়েছেন ওদের হোয়াইট হাউসের ডাক্তার—ডক্টর বোর্ণে। বলে মেথাকোয়ালনের ট্যাবলেটগুলো দেখালেন।

ছিঃ ছিঃ একী করেছেন ডক্টর বোর্ণে। এটা যে অত্যন্ত বাজে একেবারে কমন স্ট্রীট ড্রাগ। দামে সস্তা—নানা ইম্পিউরিটিজ মেশানো থাকে—

ছেলেটির জীবন নিয়ে টানাটানি শুরু হল। ডক্টর বোর্ণেকে হোয়াইট হাউসের মেম্বারশিপ থেকে রিজাইন করাতে বাধ্য করা হল।

এই ঘটনার পর কার্টার খুব কড়া হয়েছিলেন। হোয়াইট হাউসের চৌহদ্দির ভেতরে বসে নেশা করা বন্ধ করে দিয়েছিলেন। তিনি বিপুল পরিমাণে যাকে বলে 'হিউজ' টাকাও ড্রাগযুদ্ধে খরচের জন্য স্যাংকশন করেছিলেন। ডলারের অংকটা—

৯০২, ১৬০,০০০। আর পাউণ্ডে—৪২৫,৪৭১,০০০।

কিন্তু—

যুদ্ধের খরচখরচা জোগালেই তো হবে না। যে ড্রাগন তার ধারাল দাঁত দিয়ে কামড়ে ধরেছে সারা দেশকে, সমস্ত জাতিকে ঝলকে ঝলকে তার উগ্র বিষ ঢেলেছে সারা মহাদেশে—সেই বিষ কে তুলবে ?

কার্টারের পরে রোনাল্ড রেগন।

সুদর্শন অভিনেতা। অসামান্য জনপ্রিয় মানুষ। কোমর বেঁধে নামলেন ড্রাগের সঙ্গে পাঞ্জা লড়তে। ইতিহাসে আছে আর কোন মার্কিন প্রেসিডেণ্ট বুঝি এত টাকা ঢেলে এত লোকলস্কর বা টাস্কফোর্স নিয়ে ড্রাগের বিরুদ্ধে লড়াইতে নামে নি—যতটা নেমেছিলেন রেগন।

ন্যান্সী রেগনও স্বামীর এই মহৎ ব্রত উদযাপনে হাত মিলিয়ে ছিলেন। জর্জ বুশ—এখন যিনি প্রেসিডেণ্ট তিনি তখন ভাইস প্রেসিডেণ্ট। এই বুশ ছিলেন টাস্ক-ফোর্সের চার্জে—অর্থাৎ লোকলস্কর নিয়ে আচমকা ড্রাগের রেইড করা, আসামীদের থানায় নিয়ে যাওয়া ইত্যাদি কাজের দায়িত্বে। কিন্তু—

রেগন, বুশ—মার্কিন দেশের দুই বড়কর্তাই দেখলেন—ড্রাগ অ্যাবিউস যেন বেনো জলের কচুরীপানা। আসছে তো আসছেই—শেষ নেই। সীমা নেই—সংখ্যা নেই—

এবার মার্কিন প্রেসিডেণ্ট রেগন সিনেটে ঘোষণা করলেন The time has come to cripple the power of mob in America…এবার সময় হয়েছে জনসাধারণের ভেতরে যারা ড্রাগের কারবার করছে তাদের দমিয়ে দিতে হবে।

এবার মার্কিন সরকার সারা দেশে জাল ফেলল কে কোথায় ড্রাগ পাচার করছে—তাতে দিনের আলোয় এল নিষিদ্ধ ড্রাগট্রেডের অনেক রোমাঞ্চকর তথ্য—

(ক) নিউইয়র্কের পথেঘাটে বাজারে যেখানে যাও হেরোইনের ছড়াছড়ি। নেশা-খোরদের মহলে চালু হয়ে গিয়েছে নিউইয়র্কের আর একটি নাম—হেরোইন ক্যাপিটাল অফ আমেরিকা।

(খ) নিউইয়র্কে, নিউজার্সিতে গা ঢাকা দিয়ে গোপনে বেআইনী ড্রাগের ব্যবসা অবাধে চালিয়ে যাচ্ছে ২৭টি মাফিয়া (ড্রাগ) পরিবার।

(গ) কিন্তু মাফিয়া পরিবার তাদের কারবার কিন্তু নিজেদের যেখানে বাস—নিউইয়র্কে কিম্বা নিউজার্সিতে করে না।

(ঘ) তাদের গোডাউন, প্রসেসিং ল্যাবরেটারি সব খুঁজে খুঁজে পাওয়া গেল—উত্তর আমেরিকার চৌহদ্দি ছাড়িয়ে মেক্সিকোও পেরিয়ে আরও-আরও দক্ষিণে এমন একটা দেশে যার উত্তরে ক্যারাবিয়ান সাগর, উত্তর-পশ্চিমে পানামা, উত্তর-পুর্বে

ভেনিজুয়েলা আর দক্ষিণ-পূর্বে ব্রেজিল। দেশটির নাম—

কলম্বিয়া।

আধুনিককালের পৃথিবীতে ড্রাগের স্বর্গরাজ্য—Drug Paradise. এখন মার্কিন সরকারের ঘুম কেড়ে নিয়েছে কলম্বিয়ার কোকেনলর্ড এবং ড্রাগ কিংরা।

২৬ আগস্ট, '৮৯ প্রায় ৮০ জন কোকেন এবং অন্যান্য ড্রাগের চোরাকারবারিদের আমেরিকা যুক্তরাষ্ট্রে গ্রেপ্তার করা হয়েছে…তারপরেই স্টাফ রিপোর্টারের বিবরণে আছে —কিন্তু যাদের অ্যারেস্ট করা হল তারা কিন্তু (স্মাগলাররা) প্রত্যেকেই কলম্বিয়ার নাগরিক। ইউ এসের ডিপার্টমেণ্ট অফ জাস্টিস থেকে তাদের নামের তালিকা প্রকাশিত হল।

(ক) প্যাবলো এসকোবার (Pablo Escobar Gaviria) পুরো নাম—প্যাবলো এসকোবার গ্যাভিরিয়া। পৃথিবীবিখ্যাত এক ইংরেজী দৈনিকের সেই স্টাফ রিপোর্টারের বিবরণে এব ফরচুন পত্রিকার একটি নিবন্ধ বলছে—প্যাবলো পৃথিবীর সবচাইতে বড়লোক। প্রথম দশজনের ভেতরে একজন—Out ten of the richest men of the world, he is one of them,

চোরাই কোকেনের কারবার করে অগাধ টাকা করছে। এই টাকার কুমীর কিন্তু তার জীবন শুরু করেছিল গাড়িচোর (Cartheft) হিসেবে।

জনাকীর্ণ কোন রাস্তায় সারি সারি দামী দামী ঝকঝকে গাড়ি পার্ক করা আছে। এমন গাড়ির চাবি সে তৈরি করিয়েছিল, যা দিয়ে যে কোন গাড়ি চোখের পলকে খোলা যায়। সেই চাবি দিয়ে গাড়ি খুলেই চম্পট। ড্রাইভিং-এ পাকা হাত। মোটর রেসিং-এ পুরস্কার পেয়েছে অনেক-অনেকবার।

শহর থেকে দূরে নির্জন কোন জায়গায় এসে গাড়ির নম্বর লেখা প্লেট বদলে অন্য একটা নম্বর বসিয়ে, গ্যারেজে গিয়ে নতুন করে অন্য কোন রঙ করিয়ে বাজারে দ্বিগুণ কি তিনডবল টাকায় বিক্রি করে লাভের অংকটা জমিয়ে রাখত।

এসব বিশ বছর আগেকার কথা। তারপর?

ম্যাগডেলেমা নদীতে * অনেক-অনেক স্রোত গড়িয়ে যায়। পেরিয়ে যায় বছরের পর বছর। গাড়ির ব্যবসায় প্যাবলোর টাকার অংক ফুলে ওঠে, ফেঁপে ওঠে। টাকা থাকলেই সমাজে প্রতিষ্ঠা আসে, সম্মান হয়। গাড়িচোর বেশ প্রভাবশালী লোক হয়ে ওঠে বোগোটায়*।

পয়সা এমন জিনিস যা মানুষের মনে লোভের আগুন জ্বালিয়ে দেয়। আরও—আরও চাই। প্যাবলো এবার শুরু করে কোকেনের চোরাকারবার—কোকেন স্মাগলিং-এ লক্ষ লক্ষ ডলার লাভ হতে লাগল। এত ডলার দিয়ে কি করবে এখন?

বিষয়বুদ্ধিতে সে বেশ পাকা। ১৩২৫ বিঘের একটা স্টেটই হ্যাসিণ্ডা ন্যাপোলেস (Hacienda Napoles) কিনে ফেলল। তৈরি করে ফেলল নিজস্ব বিমানবন্দর, বহু জন্তুজানোয়ার কিনে বানিয়ে ফেলল বিশাল এক চিড়িয়াখানা আর তার ভেতরেই সেই

* ম্যাগডেলেমা—কলম্বিয়ার সবচেয়ে দীর্ঘ বড় নদী।

* বোগোটা—কলম্বিয়ার রাজধানী শহর।

জুর (Zoo) ভেতরেই একটা ফাঁকা জায়গায় তৈরি করল বুলরিং (Bull-ring) বা ষাঁড়ের লড়াইয়ের জায়গা।

প্যাবলো কিন্তু থামল না। নাকেপসুখমস্তি—মানুষী প্রকৃতি···আরো আরো মিলিয়ন আরো বিলিয়ন ডলারের লোভে সে দৌড়াতে লাগল। কি রকম?

সময়টা ১৯৭৭।

ইতিমধ্যে ধনকুবের এসকোবার গ্যাভিরিয়া একটা স্মাগলিং চক্র গড়ে তুলেছিল মেডালিনে, বোগোটা থেকে কিছু দূরে কলম্বিয়ার দ্বিতীয় বড় শহরে স্মাগলারদের মহলে তার নাম মেডালিন চক্র। প্যাবলোর অনুচরেরা শুধু কোকেন নয়, চলে যেত রাতের অন্ধকারে ক্যারাবিয়ান সাগরের তীরে—যেখানে দিগন্তবিসারী প্রান্তরে অঢেল মারিজুয়ানাগাছ। যত খুশি তুলে নিয়ে যাও—তৈরি করে নাও মারিজুয়ানা হ্যাসিস—তোমার যা দরকার—। প্যাবলোর চক্রের কর্মীরা যত পারত লুটে নিয়ে আসত ভারে ভারে মারিজুয়ানা। বলা যায় পিস্তল, রাইফেল নিয়ে একরকম ডাকাতি করেই নিয়ে আসত। মারিজুয়ানার ক্ষেতের বেশ খানিকটা আবার পড়েছে পানামার সীমানার ভেতরে। পানামা পুলিশ বা সীমান্তরক্ষীর জওয়ানরা বাধা দিতে এলেই চালাও গুলি—

এদিকে আন্তর্জাতিক বাজারে কোকেনের দাম বেড়ে গেল। কারণ দুনিয়ার দেশে দেশে নেশাখোরদের ভেতরে কোকেন সম্বন্ধে আগ্রহ বাড়ল। প্যাবলো কোকেন পাচার করে প্রচুর পয়সা কামাতে লাগল।

এত বড় জমিদারি হ্যাসিণ্ডা নেপোলেস, বাড়িগাড়ি লোকলস্কর এত রমরমা কোথা থেকে হচ্ছে? পুলিশ জানত সব। কিন্তু প্যাবলো গ্যাভিরিয়া সমস্ত অপারেশনটা এমন কায়দা করে করত—পুলিশ তাকে বামাল ধরতে পারত না। নার্কটিক কখনো বামাল ধরতে না পারলে গ্রেপ্তার করা যায় না। কেস সাজানো যায় না— যায় না চার্জ ফ্রেম করা, পৃথিবীর সবদেশে নার্কটিক কেসের এই নিয়ম। আর—

গ্যাভিরিয়াকে পুলিশ ধরবে কেমন করে। তার নিজের আছে এয়ারপোর্ট। আছে নিজের একটা এরোপ্লেন। আইন মোতাবেক তার লাইসেন্সও আছে। দক্ষিণ আমেরিকার মোট ৬৭০টি ল্যাণ্ডিং গ্রাউণ্ডস বা বিমান অবতরণ ক্ষেত্রে তার নামার পারমিট করা আছে। তার নিজের এরোপ্লেনের ডাকোটা পেটের ভেতরে কোকেনের প্যাকেট ভরে নিয়ে উড়ে চলে গেল মেডিলিনের আকাশ পেরিয়ে বোগোটার বিশাল শহর (লোকসংখ্যা ৩৯,৮২,৯৪১—১৯২৫ আদমসুমারী) নিচে ফেলে রেখে আটলাণ্টিকের উপকূল ধরে ধরে একেবারে সেণ্টমার্টা বন্দরে আবার কখনো বা বোগোটা থেকে উড়ে চলে যায় প্রশান্ত মহাসাগরের তীরে বুয়েনা ভেঞ্চুরা বন্দরে। এই দুই মহাসাগরের পাড়ে দুই—

বন্দর—বুয়েনা ভেঞ্চুরা আর সেণ্টমার্টায় যাওয়ার কারণ দুটো—প্রথমত এখান থেকেই জাহাজে কোকেন লোড করে পাঠানো যায় পৃথিবীর দেশদেশান্তরে। আর দ্বিতীয়ত পুলিশকে বিশ্বাস নেই—যতই ল্যাণ্ডিং পারমিট থাক, যদি দৈবাৎ পিছে

লাগে, ধরে ফেলতে চায় তাহলে তার নিজের এরোপ্লেনের ভেতর থেকে মাল আনলোড করিয়ে হয় প্যাসিফিক রেলওয়ে না হয় আটলাণ্টিক লাইনের (রেলওয়ে) গুডস ট্রেনে চাপিয়ে দেয়। কলম্বিয়ার এই দুটি রেললাইনের শেষ মাথা হল প্রশান্ত মহাসাগরের তীরে বুয়েনা ভেন্তুরা আর আটলাণ্টিকের পাড়ে সেণ্টমার্টা! তবে—

যতই জনবল অর্থবল থাকবে তার তত বেশি শত্রু থাকবে। প্যাবলোর পিছনেও লেগেছিল কলম্বিয়ার এক প্রভাবশালী রাজনৈতিক দলের পাণ্ডা রবরিগো লারা বন্নিলা। বন্নিলার আক্রোশের কারণ গ্যাভিরিয়া দেশের রাজনীতিতেও মাথা গলাতে চেষ্টা করেছিল। অগাধ পয়সাওয়ালা লোক রাজনীতি বা পলিটিক্স করবে না, সিনেটের বা পার্লামেণ্টের মেম্বার হওয়ার বাসনা থাকবে না এ তো বিশ্বাস করা যায় না। কংগ্রেসের টিকিট নিয়ে একবার ইলেকশানে দাঁড়িয়েও ছিল প্যাবলো। জোর ক্যাম্পেন বা প্রচারও চালিয়েছিল। কিন্তু কলম্বিয়া পলিটিক্সে একেবারে নতুন মুখ তো! তাই হেরে গিয়েছিল খুব অল্প মার্জিনের ভোটে। কিন্তু হেরে গিয়ে গ্যাভিরিয়ার মনে এম পি হওয়ার স্বপ্নটা তার চেতনার ভেতরে নক্ষত্রের মত জ্বলজ্বল করতে লাগল।

বিরোধীপক্ষ সব সময় খুৎ খোঁজে, ছিদ্র কোথায় দেখে। বন্নিলা ঠিক করল—শালা কোকেন স্মাগলার হবেন কিনা এম. পি। কোকেন শুদ্ধু ব্যাটাকে ধরিয়ে অ্যারেস্ট করিয়ে একবার কনভিক্ট করাতে পারলেই ওর এম. পি হওয়ার দফারফা হয়ে যাবে। অতএব বন্নিলা এবং তার অনুচরেরা তক্কে তকে থাকল। প্যাবলোর এয়ারপোর্টের চারদিকে ছদ্মবেশে ঘুর ঘুর করে—কখনো ডাকোটায় চোরাই কোকেন ভরে—কিন্তু—

বন্নিলা বড় ভুল করেছিল। গোখরো সাপের লেজে পা দিয়েছিল। একদিন খুব ভোরে বোগোটার রাজপথে দেখা গেল বন্নিলার ডেডবডি। কলম্বিয়ার সমস্ত প্রভাতি কাগজের প্রথম পৃষ্ঠায় বড় বড় শিরোনামে বেরিয়ে গেল চাঞ্চল্যকর খবর কলম্বিয়ার কংগ্রেসের বিরোধীপক্ষের নেতা প্রধান রাজনীতিবিদ বন্নিলাকে অজ্ঞাতনামা আততায়ী গতরাত্রে গুলি করে হত্যা করেছে।

প্যাবলোই যে একাজ করেছে—তাতে কারো কোন সন্দেহ ছিল না। যদিও প্রমাণ ছিল না। তবুও কলম্বিয়া হাইকোর্টের জজ ভ্যালিনসিয়া তার বিরুদ্ধে শমনজারী করেছিল। কিন্তু জজসাহেব ক্যারোলেস এরমেন্টো ভ্যালেনসিয়ায়াও বন্নিলার মতই মস্ত ভুল করেছিলেন। প্রকাশ্য দিবালোকে বোগোটার রাস্তায় ভাড়াটে খুনী দিয়ে ভ্যালেনসিয়াকে মার্ডার করিয়ে দিয়েছিল প্যাবলো।

কলম্বিয়া পুলিশ গ্যাভিরিয়ার এতটা বাড়াবাড়ি সহ্য করতে পারছিল না। হাত নিসপিস করছিল। কিন্তু প্যাবলো দুনিয়ার দেশে দেশে কোকেন স্মাগলিং করে। কিন্তু কোথাও ভুলেও কোন প্রমাণের ছিটেফোঁটাও রাখে না। অ্যারেস্ট করবে কি করে?

অসুবিধা আরও আছে—প্যাবলো সাধারণ চোরাকারবারি নয়। শুধু যে মেডালিনে গোপনচক্র গড়ে তুলেছে তা নয় অনেক হেক্টর জলা জমি জলের দরে কিনে

তাকে ভরাট করে গরীব দুঃখীদের জন্য বাড়ি করে দিয়েছে। অসম্ভব তার জনপ্রিয়তা। তার যেখানে নিজের বাড়ি অ্যান্টিওকুইয়া তার হোম টাইনের দুঃস্থদেরও দু'হাতে সাহায্য করে থাকে। বোগোটার সাধারণ দরিদ্র মানুষের মনে সম্রাটের মহিমায় বিরাজ করে গ্যাভিরিয়া। তাছাড়া কলম্বিয়ার সবচেয়েপ্রভাবশালী রাজনৈতিক দল কংগ্রেসের নেতা। তাকে হুট করে অ্যারেস্ট করা যায় না। সহজ নয়।

সহজ নয় বলে তো হাত পা গুটিয়ে বসে থাকলে চলবে না। একটা লোক চুটিয়ে স্মাগল করে লক্ষ লক্ষ ডলার কামাবে, আর তার জোরেই সে এম. পি হবে। সমাজের কেষ্টু-বিষ্টু হবে। আর তাকে শায়েস্তা করা যাবে না। ওদিকে—

ওয়াশিংটন থেকে ঘন ঘন তাগাদা আসছে—স্টপ কোকেন স্মাগলিং—অ্যারেস্ট দি স্মাগলারস। সারা দেশে কোকেন অ্যাডিকশান অত্যন্ত বেড়ে যাচ্ছে। কলম্বিয়ার গভর্ণরও হুকুম দিলেন পুলিশকে—যেমন করে পার পয়লা নম্বরের কোকেন লর্ড এসকোবার প্যাবলো গ্যাভিরিয়াকে গ্রেপ্তার কর—

কিন্তু আগুনে হাত দেবে কে? তখনো বার্নিলা আর জজসাহেব ভ্যালেনসিয়ার নৃশংস হত্যাকাণ্ডের খবরের কালিও শুকোয়নি। তবুও গভর্ণরের অর্ডার—

গভীর রাতের ঘন অন্ধকারে কলম্বিয়া পুলিশের বড়কর্তা ফ্রাংকলিন কুইন্টেরো এক বিশাল ফোর্স আচমকা রেড করল মেডেলিনের সেই চক্রের ডেনে। কিছুই হল না। প্যাবলো আগেই খবর পেয়ে গা ঢাকা দিয়েছিল। সঙ্গীসাথীরাও এদিকে ওদিকে সরে পড়েছিল। কোকেনের একটি দানাও নেই মেডেলিনে প্যাবলোর স্মাগলিং ওপারেশান সেণ্টারের সেই প্রাসাদোপম অট্টালিকার কোথাও মাঝখান থেকে কি হল?

ডিরেক্টার জেনারেল অফ কলম্বিয়া পুলিশ কুইন্টেরোকে পৃথিবী থেকে সরে যেতে হল।

পার্লামেণ্টের ইলেকশান এসে পড়ল। কংগ্রেসের প্রার্থী হয়ে বিপুল ভোটে জয়ী হয়ে প্যাবলো এম. পি হল। সফল হল তার বহুকালের সাধ। কংগ্রেস জানত সে কোকেন লর্ড। কুখ্যাত স্মাগলার। তা হোক। রাজনৈতিক নেতাদের অমন এক আধটু স্ক্যাণ্ডাল থাকেই। থাকতে পারে। কিন্তু—

এসকোবারের মত অমন সিন্সিয়ার অমন দরদী জননেতা অত বিপুল পপুলারিটি তো আর কারো নেই। সে দাঁড়ালে সিওর জিতবে। সিটটা হাতছাড়া হওয়ার ভয় থাকবে না।

এম. পি হয়ে কোকেন লর্ড প্যাবলোর কোকেন স্মাগলিং-এর আরও সুবিধা হয়ে গেল। গায়ে এম. পির নামাবলী। অতএব ভেতরে ভেতরে চোরাকারবার করলে তার টিকি কে ধরছে।

মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের নিউইয়র্কে, মিসিসিপিতে বিভিন্ন রাজ্যে রাজ্যে কোকেনের বান ডেকে গেল। অঢেল কোকেন আসছে চোরাপথে। ওয়াশিংটনের মার্কিন কর্তারা মাথায় হাত দিয়ে বসে পড়ল।

কলম্বিয়া রিপাবলিক। তার যদিও আলাদা গভর্ণর আছে। পার্লামেণ্ট আছে। কিন্তু তার মাথার ওপরে আছে মার্কিন প্রেসিডেণ্ট। ওয়াশিংটনই ছড়ি ঘোরায়।

হোয়াইট হাউস থেকে অর্ডার গেল ইমিডিয়েটলি অ্যারেস্ট অল কোকেন লর্ডস—

প্যাবলো পয়লা নম্বরের কোকেন কিং, কলম্বিয়ার এম. পি চলে গেল আণ্ডার গ্রাউণ্ডে। বড়লোক মানুষ। আত্মগোপন করার অসুবিধে নেই। কিন্তু আমেরিকার ইউ.এস ডিপার্টমেণ্ট অফ জাস্টিস থেকে দাগী কোকেন স্মাগলারদের যে লিস্ট বেরিয়ে গেল। তার মাথায় প্যাবলো এসকোবার গ্যাভিরিয়ার নামের পাশে লাল কালিতে বড় বড় করে লেখা—Most wanted। তার নিচে প্রথমশ্রেণীর অর্থাৎ প্যাবলোর মতই কোকেন কিং জঞ্জালো রোড্রিগুয়েজ গাচা এবং জরলুইচ ওচোয়া ভ্যাচকুয়েজের নাম—তারপরে ছোটখাটো স্মাগলার ৮০ জনের নাম।

কিন্তু প্যাবলোকে পুলিশ হন্যে হয়ে খুঁজেও পেল না। তার নিজের এয়ার-পোর্টের হ্যাঙ্গারের ভেতরে গাঢ় অন্ধকারে একবার তাকে দেখা গিয়েছিল। পুলিশ বাহিনী ঝাঁপিয়ে পড়ল। কিন্তু চোখের পলকে কোথায় যে অন্ধকারে অদৃশ্য হয়ে গেল পুলিশ আর পাত্তাই পেল না।

লোকটা কি যাদু জানে? প্যাবলো যে কোন সময় যে কোন ছদ্মবেশ ধরতে পারত। কে জানে হয়ত তারই পোর্টের কোন পোর্টারের (কুলী) লাল ইউনিফরম পরে কোথায় চম্পট দিয়েছে।

আবার জোর তাড়া এল ওয়াশিংটন থেকে—তোমরা করছ কি? প্যাবলোকে অ্যারেস্ট করে। Please send him for extradition* অর্থাৎ তার বিচার হবে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে।

কিন্তু কোথায় প্যাবলো—

তাকে গ্রেপ্তার করতে পারলে তো ওয়াশিংটনে চালান করবে পুলিশ। তাকে কলম্বিয়ার ডিপার্টমেণ্ট অফ জাস্টিস থেকেও প্যাবলোর নামে শমন জারী হল। কলম্বিয়া পুলিশও আদা জল খেয়ে লাগল। কিন্তু—

রাখে কৃষ্ণ মারে কে। পানামায় শুরু হয়ে গেল সিভিল ওয়ার। রাজনৈতিক দলগুলোর কামড়াকামড়ি থেকে গৃহযুদ্ধ। পানামায় সরে পড়ল গ্রেট কোকেন কিং—

প্যাবলো এসকোবার গ্যাভিরিয়া।

এসব আগস্ট ১৯৮৯ সালের কথা। তারপরে প্যাবলোর আর কোন খবর জানা যায় না।

আর একজন কোকেন লর্ড

গঞ্জালো। বয়স ৪১। স্মাগলারদের মহলে তার নাম মেক্সিকান। কে জানে হয়ত মেক্সিকোতে তার কোন যোগাযোগ ছিল। প্যাবলো যেমন জীবন শুরু করেছিল গাড়ি চোর হিসেবে তেমনি গঞ্জালো হাত পাকিয়েছিল সামান্য খনিমজুর হয়ে কিন্তু পাকা খুনী। কারো সঙ্গে সামান্য কোন না কোন ঝগড়াঝাটি হল কি

* 'Extradition' কথাটির অর্থ হল পলাতক অপরাধীকে এক রাজ্য কর্তৃক অন্য রাজ্যে প্রত্যর্পন। আরও আছে বিদেশী অপরাধীকে বা ফরেন ক্রিমিন্যালকে বিচারের জন্য অন্য রাজ্যে পাঠানো। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র চেয়েছিল কুখ্যাত কোকেন কিংয়ের পানিশমেণ্ট দেবে তারা।

না হল, অমনি গঞ্জালোর পিস্তল থেকে গুলি ছুটবে। চোখের পলকে তার বডি রাস্তায় ছুড়ে ফেলে দিয়ে অন্ধকারে সরে পড়বে। খনির কুলী কাজ টাজ কিছু নয়, আসল পেশা খুন-খারাবি, রাহাজানি এককথায় বলতে গেলে বলতে হয় টেররিষ্ট।

খুন-টুন লুঠতরাজ করেই অনেক পয়সা কামিয়ে নিজের অবস্থা পাল্টে ফেলেছিল। আর সেই ব্যাঙ্কের মজুত টাকার খেই ধরে এসে গিয়েছিল পলিটিক্স। যা হয়েছিল প্যাবলোর বেলায়। টাকাপয়সা হাতে এলেই রাজনীতি করে কেষ্ট বিষ্টু এম. এল. এ, এম. পি নাহলে স্ট্যাটাস বাড়বে কি করে?

পেশাদার বা ভাড়াটে খুনী গঞ্জালোর পলিটিক্স এবং কোকেন স্মাগলিং-এর টেকনিকের আবার বেশ একটু অভিনবত্ব ছিল। কি রকম?

বলতে গেলে ছোকরা বয়স থেকেই কলম্বিয়ার লেফটউইং পার্টির অ্যাক্টিভ মেম্বর এবং হোলটাইমার ছিল। তাদের পার্টির মূল কাজ ছিল খুনজখম করে সন্ত্রাস বা টেরর সৃষ্টি করা। এই টেররিস্টদের আবার একটা গরিলাবাহিনীও ছিল। গঞ্জালো ছিল সেই গরিলা পার্টির চীফ। তার সঙ্গে ডেথস্কোয়াডের কাজকর্মও দেখাশোনা করত। তাকে দেখতেই হবে—তার মত নিষ্ঠুর আর নৃশংস জল্লাদ তো বড় একটা দেখা যায় না। তার বিরোধী পক্ষের রাইটউইং পার্টির ৮০০ সভ্যকে এক হাতে খুন করেছিল গঞ্জালো। কোনদিন পঞ্চাশ কোনদিন বা সত্তর—আবার কোনদিন বা একশো লোককে একসঙ্গে লাইন করে দাঁড় করিয়ে দুমদুম গুলি করে সাবাড় করে দিত কলম্বিয়ার টেরর—গঞ্জালো।

তার গরিলাবাহিনীকে দিয়ে কি করাতো গঞ্জালো? রাজনীতির কাজ দলে দলে সংঘাত সংঘর্ষের ভেতরে নাক গলিয়ে দিয়ে খুন করাই ছিল তাদের রুটিন ওয়ার্ক। কিন্তু যেই রাত ঘন হয়ে নামত তখন গরিলাপার্টির জওয়ানেরা কাঁধে রাইফেল কোমরে পিস্তল নিয়ে মার্চ করে চলে যেত দূরে বহু দূরে প্যাচো (গঞ্জালোর হোম টাউন) থেকে আরও দূরে মেগডালামা নদী পেরিয়ে ডেন্স ফরেস্টে বা গভীর বনে। তার ভেতরে বড় বড় গাছগাছালি দিয়ে ঘেরা গঞ্জালোর বিস্তীর্ণ ক্ষেত। প্রায় দশবারো বিঘা জমি জুড়ে সেই মাঠে যতদূর চোখ যায় ঘন সবুজ গাছ। মারিজুয়ানা—তার পাশের প্লটেই আবার পপিপ্ল্যান্ট বা আফিমগাছ। ক্ষেতের শেষ প্রান্তেই আছে গোডাউন। তার পাশেই আছে আধুনিক সাজসরঞ্জাম দিয়ে সাজানো বিশাল ল্যাবরেটরি। গোডাউনের বিশাল মেঝেতে বসে কুলীরা স্তুপ করে রাখা মারিজুয়ানাগাছের কাঠি বাছাই করছে। সেই গাছের রেসিন থেকেই ল্যাবরেটারিতে প্রসেসিং করে তৈরি হচ্ছে হ্যাসিস বা গাঁজা। পপিপ্ল্যান্ট থেকে তৈরি করা হচ্ছে আফিম বা কালো মানিকের দলদের—নেশারুদের মহলে আফিম-এর আর এক নাম। আবার কেটে কেটে প্যাকেট করা হচ্ছে। লোকচক্ষুর আড়ালে বিশাল কর্মযজ্ঞ চলছে। তার কর্মকর্তা হল—গঞ্জালো।

গরিলা পার্টির জওয়ানেরা পালা করে পাহারা দেয়—দিতে হয় এই সম্পূর্ণ কমপ্লেক্সটা। গঞ্জালো বলে মাই ওন প্রসেসিং প্ল্যান্ট কমপ্লেক্স। শয়ে শয়ে লোক কাজ করছে ছবির মত। একটু তেড়িবেড়ি করেছ কি মারিজুয়ানার ক্ষেতে লাস পড়ে

থাকবে। কর্মীরা গঞ্জালোকে ভয় করে ভক্তিও করে। এমপ্লয়িদের প্রত্যেককে মোটা মাইনে দেয়—দেয় ঠিক হয় উইকলি, না হয় মান্থলি বেসিসে। উপরন্তু কারো ছেলে কি বৌয়ের অসুখ করল হাত পাতলেই গঞ্জালো তাকে মোটা টাকা অ্যাডভান্স করে দেবে।

যতই উগ্র সন্ত্রাসবাদী হোক, নৃশংস হত্যাকারী হোক—দিলটা বড়—মস্ত বড়। পাচোতে এমন একটিও দুঃস্থ পরিবার নেই যারা গঞ্জালোর দয়াদাক্ষিণ্য দানের সাহায্যে খেয়েপরে বেঁচে নেই, শুধু তার প্রসেসিং প্ল্যান্ট কমপ্লেক্সের চৌহদ্দিতেই নয় প্যাচোতেও সে রীতিমত সম্ভ্রান্ত এবং সম্মানিত মানুষ। প্রায় প্যাবলোর মতই ছিল সামাজিক প্রতিষ্ঠা। কলম্বিয়ার প্রশাসনও তাকে সহজে ঘাটায় না।

কোকেন স্মাগলিং-এর আরও এক দুর্ধর্ষ কুশীলব।

জরজ লুইস ওচোয়া।

বয়স ৩৯।

মেডেলিন স্মাগলিং চক্রের সবচেয়ে বড় চোরাকারবারি। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের রাজ্যে রাজ্যে বিভিন্ন ভ্যারাইটির কোকেন সাপ্লাইতে তার জুড়ি মেলা ভার। কোকেনের হেভী ডিমান্ডের কারণ হল গোল্ডেন ট্র্যাঙ্গেলের মিয়ামি থেকে নিয়ে আসা পৃথিবীর সেরা আফিম বা হেরোইন মেশানো হয়ে থাকে তার কোকেনে।

লুইসও অগাধ সম্পত্তির মালিক।

এডুয়ারডো মারটিনেজ রোমিরো।

কলম্বিয়ায় আর এক কোকেন লর্ড। একবার-মাত্র একবার বুঝি পুলিশ তাকে কোনরকমে অ্যারেস্ট করতে পেরেছিল। সঙ্গে সঙ্গে গঞ্জালো কোথা থেকে বাজপাখির মত ঝাঁপিয়ে পড়ে থানার হাজতঘর রেড করে তাকে উদ্ধার করে নিয়ে উধাও হয়ে গিয়েছিল।

সে পাঁড় স্মাগলার নয়। গঞ্জালো কিম্বা এসকোবারের মত দুনিয়ার দেশে দেশে চোরাই মাল পাঠিয়ে অগাধ টাকা কামানোর নেশা নেই তার। পলিটিক্সে ঢুকে নাম কেনার কোন দুর্বাসনাও নেই তার। সে কলম্বিয়ার ভেতরেই টুকটাক স্মাগলিং করে যা কামায় সেটা সে সুদে খাটায়। সে হল মেডেলিনচক্রের বিশিষ্ট মহাজন জামিলোন্ডার। বেশির ভাগ সময় বাড়িতেই থাকত। পয়সা রোজগারের ছুটো-ছুটি করার দরকার কি। ছোট বড় স্মাগলার কার না টাকার দরকার হয়। মহাজন রোমিরোর কাছে হাত পাতো—টাকা পেয়ে যাবে। কিন্তু ডবল তিনডবল (অর্থাৎ যার কাছ থেকে যেমন দাঁও মারতে পারে) সুদে টাকা দিয়ে দেবে চোরাইমাল বয়ে রাত বিরেতে প্রাণের ঝুঁকি নিয়ে বাইরে যাওয়ার প্রয়োজন কি।

রোমিরো।

একত্রিশ বছরের তরতাজা জওয়ানী খুব স্ফূর্তিবাজ। হুল্লোড়ে। রঙ্গ রসিকতায় তার দোসর নেই। পুলিশ তাকে একবার হাজতঘর দেখিয়েছিল। উত্তর কলম্বিয়ায়

তাঁর হোমটাউন টুঙ্গুয়ের লোকাল পুলিশ নয়—একেবারে বোগোটার বড়কর্তাদের সঙ্গে বেশ মাথা খাটিয়ে করে ফেলল বড় ভয়ংকর একটা রঙ্গ। কিন্তু—

তার আগে কলম্বিয়ার তখনকার পরিস্থিতি সম্বন্ধে একটু বলা দরকার। কোকেন লর্ডরা এমন সাংঘাতিক বাড়াবাড়ি শুরু করেছিল যে কলম্বিয়ার প্রেসিডেন্ট বার্কো জরুরি অবস্থা বা এমারজেন্সি ঘোষণা করবেন কি না ভাবছিলেন। অবস্থা আরও জটিল আরও ঘোরাল হয়ে উঠল তখন যখন কোকেন স্মাগলাররা ভাড়াটে খুনী দিয়ে দুম করে খুন করে বসল নামজাদা এক পলিটিকাল লিডার লুইস কারলস সারমিয়েন্টোকে। তিনি ছিলেন সিনেটর (সিনেটের সভ্য) এবং ১৯০০ তে কলম্বিয়ার প্রেসিডেন্টও হয়ে যেতে পারেন—এইরকম সম্ভাবনাও ছিল।

বার্কো আর একটুও দেরি না এমারজেন্সি ডিক্লেয়ার করে দিলেন। দেশজুড়ে ব্যাপক ধরপাকড় শুরু হয়ে গেল। ট্রাফিকারদের গোপন আস্তানাগুলোতে পুলিশ রেড করতে লাগল। অবস্থা যখন একেবারে বারুদের স্তূপের মত ঠিক তখন—

দেখা গেল বোগোটার এয়ারপোর্টের রানওয়েতে তিন মাস আগে চুরি যাওয়া সরকারি হেলিকপ্টারটা চুপচাপ করে নিরীহ একটা পাখির মতই দাঁড়িয়ে রোদ পোহাচ্ছে। কিন্তু বিমানবন্দরের কর্মীরা যেই ছুটে যেয়ে তার দরজা খুলল অমনি প্রচণ্ড আওয়াজ করে একটা বিস্ফোরণ ঘটল। ৫00 কেজির একটা ডিনামাইট ভরে দিয়ে হেলিকপ্টারটা ফেরৎ পাঠিয়েছিল রোমিরো। কপাল ভাল। পোর্টের ওয়ার্কাররা কেউ জখম হয়নি। হেলিকপ্টারের ভেতরে একটা চিঠি। বেশ রসিয়ে লেখা—দোহাই আপনাদের আমাদের পিছনে লাগবেন না ; আমরা কারো পাকা ধানে মই দেইনি। আপনাদের টিকটিকিগুলোর অত্যাচারে জীবন অতিষ্ঠ হয়ে গিয়েছে। লক্ষ লক্ষ টাকার ড্রাগের ব্যবসা মার খাচ্ছে। তাই আমরা ঠিক করেছি ড্রাগের স্মাগলিং আমরা ছেড়ে দেব। একেবারে লক্ষ্মীছেলে হয়ে সুবোধ বালকের মত থাকব—

ও হ্যাঁ—গঞ্জালোই যে কপটারটা নিয়ে উধাও হয়ে গিয়েছিল—সেটাই আমরা ফেরত দিয়ে গেলাম।

ডিনামাইটটা প্রেজেন্টেশান।

এবার কি করবে কলম্বিয়ার কর্তারা আর কিই বা করতে পারে ওয়াশিংটনের বড়কর্তা ?

তাহলে এবার কিন্তু ডেলি ইংরেজী নিউজ পেপারের পাতা উল্টাতেই হবে। কেননা এসব একেবারে কারেন্ট অ্যাফেয়ারাস।

ব্যারানকুইলা (কলম্বিয়া)। অপূর্ব সুন্দর প্রাকৃতিক দৃশ্যের সম্পদে সমৃদ্ধ ক্যারাবিয়ান সমুদ্র তীরে যে ড্রাগবিরোধী শীর্ষ সম্মেলন হয়ে গেল কার্টাসেনায় সেই বৈঠকে মার্কিন প্রেসিডেন্ট বুশ, কলম্বিয়া, পেরু এবং বলিভিয়া অ্যানডিয়ান গ্রুপের* এই তিনটি দেশের প্রেসিডেন্টও যোগ দিয়েছিলেন। উত্তর এবং দক্ষিণ আমেরিকায়

ড্রাগ অ্যাবিউসের বিরুদ্ধে নিরলস সংগ্রামের এক চুক্তিনামায় স্বাক্ষর করে তাঁরা এই প্রথম তৈরি করলেন অ্যাণ্টি ড্রাগ কারটেল (Anti drug cartel) বা ড্রাগ বিরোধী লড়াইয়ের একটা কমন প্ল্যাটফরম। কার্টাসেনা থেকে উড়ে এসে বুশ এক সাংবাদিক সম্মেলনে অত্যন্ত সংক্ষিপ্ত ভাষণে তিনি শপথ করে বললেন ড্রাগ অ্যাবিউস প্রতিরোধের জন্য তিনি ২২০ কোটি ডলার সাহায্য করবেন এব অ্যানডিয়ানের যেসব অঞ্চলে অপর্যাপ্ত পরিমাণে কোকো জন্মায়—সেই কোকোয়া গাছগুলোকে নির্মূল করে অন্য কোন ফসলের উৎপাদন করা যায় কি না তারও ব্যবস্থা তিনি অতি সত্ত্বর করবেন।

কলম্বিয়ার প্রেসিডেণ্ট ভারগিলিও বার্কোও উদ্দীপ্ত হয়ে বলেছেন এই শীর্ষ সম্মেলন থেকেই মাদকদ্রব্যের বিরুদ্ধে সংগ্রামের এক নতুন যুগের শুরু হল।

খবর এইখানেই শেষ হল। এই সামিট কনফারেন্স প্রসঙ্গেই রয়টারও সারা দুনিয়ায় ঢক্কানিনাদ করে ঘোষণা করল কলম্বিয়া, পেরু, বলিভিয়া—তিনটি দেশের তিন প্রেসিডেণ্ট মার্কিন প্রেসিডেণ্ট বুশকে অগ্রনায়ক করে শুরু করলেন বুলিয়ন ডলার ড্রাগট্রেডের বিরুদ্ধে সংগ্রাম·····

কথাগুলো তো বেশ গালভরা মিষ্টি মিষ্টি। কিন্তু আসলে কাজের বেলায় কি হল, কি হয়েছিল? কলম্বিয়ার কোকেন লর্ডরা সব ছেড়েছুড়ে দিয়ে সাধুপুরুষ হয়ে গিয়েছিল—কি হয়েছিল, কি হয়নি সেসব পরের কথা। যখন অ্যানডিয়ানের দেশগুলোর কর্ণধাররা ড্রাগ ট্র্যাফিকারদের শায়েস্তা করার জন্য কোমর বেঁধে নামছেন, তখুনি এমন একটা কেলেঙ্কারি—একটা স্ক্যাণ্ডেল করে বসলেন বুশের ঘনিষ্ঠ বন্ধু, ওয়াশিংটনের মেয়র ম্যারিয়ন বারি, যে দেশ থেকে ড্রাগকে হটানোর উৎসাহের আগুনে ঠাণ্ডা জল পড়ে গেল।

বারিসাহেবের বাড়িতেই চোরাই কোকেন পাওয়া গেল।

বুশের মুখে চুনকালি পড়ল। সেই যে লম্ফঝম্ফ করে কোকেন কিং এসকোবার, গঞ্জালো, রোমিওদের এক্সট্রাডিশানের জন্য চেয়ে পাঠিয়েছিল মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র সেসব ধামাচাপা পড়ে গেল।

কলম্বিয়ার পত্রপত্রিকায় বেশ ফলাও করে ওয়াশিংটনের পৌরপিতার চরিত্র হনন করে রসালো লেখা বের হতে লাগল বেশ কয়েকদিন ধরে। কিন্তু শুধু কলম্বিয়ায় নয়—ল্যাটিন আমেরিকার সমস্ত দেশগুলোতে বারিসাহেবকে নিয়ে ছিঃ ছিঃ পড়ে গেল। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র তথা বুশের ড্রাগ অ্যাবিউসকে নির্মূল করার সৎ ও মহৎ সমস্ত প্রচেষ্টাকে চরম ধিক্কার জানিয়ে দক্ষিণ আমেরিকা বা ল্যাটিন আমেরিকার একটি পত্রিকার সম্পাদকীয় নিবন্ধে লেখা হল—

ওয়াশিংটনের মেয়র ম্যারিয়ন বারির বাড়িতে চোরাই কোকেনের অনেকগুলো প্যাকেটের সন্ধান পাওয়া নিঃসন্দেহে প্রমাণ করে তিনি স্বয়ং কোকেন স্মাগলিংচক্রের সঙ্গে যুক্ত। মাননীয় মার্কিন প্রেসিডেণ্ট বুশের অন্তরঙ্গ সুহৃদ তিনি। মহামান্য প্রেসিডেণ্ট কি জানতেন না, সরষের ভেতরেই ভূত আছে?

যাই হোক বারির এই ব্যাপারটা চোখে আঙুল দিয়ে দেখিয়ে দেয় আমেরিকায় ড্রাগ অ্যাবিউসের সমস্যা কি ভয়াবহ—Showing the dimensions of the problem

in U. S. A. শুধু তাই নয় মেয়রসাহেবের কেসটিতে বুঝতে পারা যাচ্ছে এই ড্রাগ অ্যাবিউসের কুফল বা 'ইভিল'টা মার্কিন দেশের মধ্যবিত্ত এবং অভিজাত সমাজের রন্ধ্রে রন্ধ্রে ছড়িয়ে পড়েছে। এমন কি জনগণের নির্বাচিত প্রতিনিধি হোয়াইট হাউসের উচ্চপদস্থ অফিসার এবং মিনিস্টাররাও, যারা হবেন যুবসমাজের আদর্শ, যারা নতুন প্রজন্মকে সৎ ও মহৎ পথে পরিচালিত করবেন তাঁরাই মাদকসেবনে লিপ্ত, তারাই দেশের মানুষদের ভেতরে যুবকদের ভেতরে এই বিষ ছড়িয়ে দিচ্ছেন আর ছড়িয়ে ঘোরাচ্ছেন ল্যাটিন আমেরিকার ওপরে—

Highest elected officials of White House supposed to serve as role models for the young themselves indulging in the vice and then blaming the Latins for it.

ষোল

কফি হাউস—বাঘা বাঘা বুদ্ধিজীবি, লেখক, কবিদের আড্ডা বসত একদা যেখানে—সেখানে এখন সবচেয়ে বড় হেরোইন ডেণ। সবচেয়ে দুঃখের অ্যাডিক্টদের ভেতরে মেয়েদের সংখ্যাটা ক্রমশ বেড়েই চলেছে।

কলকাতা কোথায় ?

বেশ মন দিয়ে স্ক্রিপ্ট পড়ে বলেছিলেন সমাজসেবী প্রতিষ্ঠানের সেক্রেটারি। তাঁর প্রশ্নগুলো নোট করে রাখা হয়েছিল—

(ক) কলকাতায় মোট মাদকসেবী বা অ্যাডিক্ট কত ?

(খ) হেরোইন, গাঁজা, চরস, এল এস ডিতে আসক্তের সংখ্যা কত ?

(গ) ড্রাগ ভিক্টিম বা ড্রাগের শিকার হয় যারা তাঁরা কোন্ শ্রেণীর মানুষ ? তারা কি ছাত্র না শ্রমজীবি ? সাধারণ মানুষের ভেতরেই বা কতজন নেশাভাঙ করে ?

অত্যন্ত কঠিন, প্রতিটি প্রশ্নই খুব শক্ত।

কলকাতা।

কলকাতা যেমন বিশাল তেমনি বড় ভয়ানক জটিল। এই শহরের প্রায় জন্মের সময় থেকে ইংরেজদের বাণিজ্যিক বীর্যে সৃষ্টি কলকাতা মহানগরী মিছিল মিটিং আন্দোলনের শহর। এই শহরের বাতাসে নিশিদিন তীব্র একটা উত্তাপের রেশ। সংগ্রামের উত্তাপ, লড়াইয়ের উত্তাপ। একটু কান পাতলেই শোনা যাবে—ইনকিলাব জিন্দাবাদ—সেই উচ্চকিত ধ্বনি—

অফুরন্ত এই শহরের প্রাণশক্তি। সবসময় সে উচ্ছল। কে জানে কিসের উত্তেজনায় সে ছুটছে, ছুটছে দুর্দান্ত গতিতে। উচ্ছৃংখল, বেহিসেবী এবং অত্যন্ত বেপরোয়া তার চালচলন। এখানে কোন নিয়মকানুনেরই কেউ ধার ধারে না। যেমন মানে না মানতে চায় না রাস্তায় চলার নিয়ম আর মেনে হবেটাই বা কি ?

'ফুটপাত' বলে যে একটা জিনিসের অস্তিত্ব ছিল তার তো কোন চিহ্নই নেই। হয় কাঠ বাঁশ দিয়ে ঘেরা বেশ পাকাপোক্ত না হয় পলিথিনের শীট খাটিয়ে সেখানে জমজমাট দোকান বসে গেছে। রমরমা ব্যবসা চলছে। সেখানে যেমন দমঠাসা ভিড়, তেমনি বর্ষার নতুন জলের আহ্লাদের মত মেয়েদের হাসি, টুকরো টুকরো কথা—দরদামের টাগ অফ ওয়ার চলছে। রাস্তায় ট্রাম বাসের একটা একটানা সরোষ গর্জনকেও ছাপিয়ে শোনা যায়—দিদি, মাসীমা, বৌদি, মা—

মনে হতে পারে—হওয়া খুব স্বাভাবিক। কলকাতার ড্রাগ অ্যাবিউসের বা ড্রাগের সর্বনাশা এবং বিধ্বংসী প্রতিক্রিয়ার সঙ্গে কলকাতার সম্বন্ধ কেন—কেন ধান ভানতে শিবের গীত ?

আছে। একেবারেই উটকো বেনোজলের মত ঢুকে পড়েনি কলকাতার শহরে

জীবনের নিন্দামন্দ। তাই ড্রাগের সঙ্গে কলকাতার রাস্তায় চলার নিয়ম ইত্যাদি কথাগুলোর যোগসূত্র কোথায় ?

ফুটপাত।

কলকাতা শহরের ফুটপাত যেমন বিচিত্র তেমনি অত্যন্ত জটিল ও রহস্যময়। একেবারে ভরদুপুরে কি রাতে এখানে হয় না এমন কোন নোংরা কাজ নেই। মনে হয় এই শহরের ফুটপাত যেন 'মৃচ্ছকটিকের' সেই বয়স্কা বেশ্যা, যে কিশোরী কি উঠতি বয়সীদের পোড়খাওয়া জীবনের অভিজ্ঞতা থেকে বলে, ওরে আমরা হলেম গিয়ে নৌকো—যাতে সাধুসন্ত থেকে শুরু করে যোগী ভোগী খুনী তস্কর যার যখন মনে হাউস (শখ) হয় দরকার হয় সে চড়ে বসে—

কলকাতার ফুটপাত।

একশো কি সওয়াশো বছর আগে পায়ে চলা সাধারণ এবং গাড়িবিহীন গরীবদুনো মানুষের জন্য তৈরি রাস্তার লাগোয়া খালি পায়ে চলা পথ বা ফুটপাতে রান্নাবান্না খাওয়া মলমূত্র ত্যাগ—প্রতিটি কর্মই একেবারে বিনা বাধায় হয়। কেউ বাধা দেবে না—কেউ আইনটাইন দেখাবে না। আর দেখাতে গেলেই বা কি—দেবে পাঁচটা খারাপ কথা শুনিয়ে। কটু কথার ঝড় বয়ে যাবে—

দৈনন্দিন জীবনের প্রতিটি পর্বই যখন ফুটে হয় হয়ে থাকে তাহলে নেশা করাটাই বা চলবে না কেন ? অতএব ড্রাগের বিকিকিনি, চোরাচালান এবং পচাভাত বাখর ও মহুয়া দিয়ে মদ চোলাইয়ের ফলাও কারবার চলে ফুটপাতে।

একটু নজর করে চললেই নজরে পড়বে—নিশ্চয়ই পড়বে কোন গাছের নিচে নীলাভ ছায়ায় তাড়ির (তালের রস) বা চোলাই মদের হাঁড়ি নিয়ে চট পেতে বসে দিব্যি বিক্রি করছে একেবারে ব্রডডেলাইটে (Broad day light.)

শুধু কি তাই, ফুটে স্যারি সারি দোকান, প্রতিটি স্টল তিনদিকেই হয় অ্যাসবেস্টস না হয় টিন দিয়ে ঘেরা। তাই ফুটপাত থেকে রাস্তা যেমন দেখা যায় না তেমনি রাস্তা থেকে ফুটপাতে কি হচ্ছে না হচ্ছে দেখা যায় না। দুই স্টলের মাঝখানে সামান্য স্পেশটুকুতে কোন জায়গায় থাকে দোকানীদের খাওয়ার জলের কলসী, বাসনকোসন, তাদের সংসারের টুকিটাকি কি। আবার কোনটা থাকে ফাঁকা, সেখানে দুই দোকানের আড়াল বলেই কেমন ছায়া ছায়া অন্ধকার। সেখানেই চলে ড্রাগের ফলাও কারবার। ব্রাউন সুগারের পুরিয়া, হ্যাসিসের পাতা (গাঁজা) কি চরস বা মারিজুয়ানার অবাধে বিক্রি—খদ্দের হকারদের স্টলের শৌখীন মেয়েপুরুষ ক্রেতাদের ভিড়ের ভেতরে নিজেকে মিশিয়ে রাখে কিম্বা অন্ধকারে আড়ালে আবডালে ঘাপটি মেরে থাকে। পেডলার বা চোরাকারবারিও খদ্দের হয়েই তাদের ভিড়ের জটলার ভেতর থেকে তীরগতিতে বেরিয়ে এসেই ঠিক লোকের হাতে মাল গুঁজে দিয়েই পয়সা পকেটে পুরে মুহূর্তে আধো অন্ধকারে ভিড়ের ভেতরে মিশে যায়।

এবার রাহুর মত ফুটপাত গ্রাস করে দোকান বাজারের মহল্লা শ্যামবাজার, কলেজস্ট্রীট কি গড়িয়াহাট ছাড়িয়ে চলে আসুন ছিমছাম সাহেবপাড়ায়। সন্ধ্যার অন্ধকারে দেখবেন পান সিগারেটের দোকানে উজ্জ্বল নিওন আলো জ্বলছে। আলোর

রেখা বাঁকা হয়ে পড়েছে গাঢ় অন্ধকার মোড়া ফুটপাতের। সেই আলোর বৃত্তে দেখবেন গুটিকয়েক ছায়ার জটলা। উঠতি বয়সের ছেলেছোকরা লালটুকটুকে সাহেব সুবোর মতই দেখতে। পয়সাওয়ালা ঘরের ছেলে। মনে হয় ইংলিশ মিডিয়ামের নামী নামী স্কুল-কলেজ পড়ুয়া। তারা একে একে সেই পানের দোকানের সামনে এসে দাঁড়ায়। ভঙ্গিটা এমন যে পানটান কি নিদেন পক্ষে একটা সিগারেট কিনতে এসেছে। হয়ত কেনে, কিন্তু সেই পানের খিলির প্যাকেটের ভেতরেই থাকে কাকা (১) কি ড্রিমার (Dreamer) (২) কিম্বা হেভেনলি সানসাইনের (৩) (Heavenly Sunshine) পুরিয়া। ছেলে কোটের পকেটে সেই বিষের প্যাকেট পুরে বাড়িতে ফিরে নিজের স্টাডিতে গিয়ে খিল দেয়। মা ভাবেন অনেক উঁচু ক্লাস। বড় শক্ত শক্ত সাবজেক্ট।

ছেলে মন দিয়ে পড়বে বলেই ঘরে খিল দিল। কিন্তু নামী কলেজের ভেরি গুড কন্ডাক্ট এবং পড়াশুনায় 'স্যাটিসফ্যাক্টরি' ছাত্রটি যে আসলে কি করছে তা মা কল্পনাও করতে পারে না। পারে, পারে জানতে, বুঝতেও পারে সব তখন অনেক—অনেক দেরি হয়ে গিয়েছে। ছেলে তখন ধুঁকছে। ঘুমের ভারে ঢুলে ঢুলে পড়ছে। মুখের দুপাশে লালা গড়িয়ে পড়ছে।

কলকাতার পুলিশের রেকর্ডে আছে পার্কস্ট্রীট, সাডারস্ট্রীট বা সদরস্ট্রীট এলাকা হেরোইন ডেন। কলকাতার ড্রাগ অ্যাবিউস বা ড্রাগের সর্বনাশা প্রতিক্রিয়ার চিত্র ভয়াবহ। অত্যন্ত জটিল। আর দূরপ্রসারী। বিষাক্ত সেই অক্টোপাশের শুঁড়গুলো যে কত দূরে দূরে ছড়িয়ে পড়েছে তা কেউ কখনো বলতে পারবে না। পারবে না, সঠিক পরিসংখ্যান দিতে ঠিক কতজন মাদকসেবী বা অ্যাডিক্টেড। সরকারি বা বেসরকারি কোন সংস্থা কি কখনো সমীক্ষা বা সারভে করেছিল ?

এসব কথাই মনের ভেতরে আনাগোনা করছিল সমাজসেবা প্রতিষ্ঠানের সম্পাদকের সেই নির্দেশের পরে। কি করা যায়, কোথায় কার কাছে গেলে কলকাতার ড্রাগের বিধ্বংসী প্রতিক্রিয়ার বাস্তব চিত্রটা পাওয়া যাবে ?

নেশা করার থিয়োরিটা কি জানেন ?

বললেন কলকাতার একসাইজ কালেক্টর অমিয় ভূষণ চক্রবর্তী। অ্যাডিক্টরা হল সুখের পাখি। এরা শুধু সুখ খোঁজে, স্বপ্নের জগতটায় পৌঁছানোর জন্য হন্যে হয়ে ঘোরে—থামলেন তিনি। অত্যন্ত বিদগ্ধ লোক। যেমন পাণ্ডিত্য তেমনি মদ, গাঁজা, চরস, মারিজুয়ানার অ্যাডিক্টদের সম্বন্ধে তাঁর বিপুল অভিজ্ঞতা। কিন্তু বয়স হলে যা হয়, কথা বলতে বলতে খেই হারিয়ে ফেলেন।

কিন্তু স্যার, আমি জানতে চাই হ্যাসিস-চরস-আফিম কারা খায়, তাদের সংখ্যা—

আমার কথাটা যেন শুনতেই পেলেন না। বললেন—

শুনুন—মাদকসেবীদের সম্বন্ধে কত সুন্দর কথা বলেছেন গ্রেটবৃটেনের এক বুদ্ধিজীবি এইচ এল মেনকেন (H. L. Menken) Haunting fear that someone, some where may be happy অর্থাৎ নেশার শিকার হওয়ার আগে তাদের মনে

(১) হেরোইনের স্প্যানিশ নাম (২) মর্ফিয়া (৩) এল. এস. ডি।

একটা দুশ্চিন্তা কি ভয়ের কমপ্লেকস থাকে—এই বুঝি তার বন্ধু পাতা (গাঁজা) খেয়ে তোর বেল্লা ফতে করে দিয়েছে। সুখের খোঁজ পেয়ে গিয়েছে—পেয়ে গিয়েছে তার স্বপ্নের জগৎ, হঠাৎ থেমে গেলেন। কয়েক মুহূর্ত কী ভাবলেন। নিজেকে সংযত করে বললেন মোট কত অ্যাডিক্ট তার একসজ্যাক্ট ফিগার বলার চেয়ে মনে হয় আকাশের তারা গোনা সহজ আর হ্যাসিস কি ওপিয়াম খেলে তো কোন অপরাধ হয় না—আইনে কোন বাধা নেই—

তাহলে—

ইল্লিসিট অর্থাৎ বেআইনি চোরাই ড্রাগ খেলে কি ক্যারি করলে কিম্বা পজেশানে অর্থাৎ কাছে রাখলে আমরা অ্যারেস্ট করি—মাল 'সিজ' করি—

তাহলে তো বলতে পারবেন কলকাতায় কী টাইপের কোন্ স্তরের লোক নেশা করে এবং ড্রাগের চোরাকারবার বা স্মাগলিং করে ?

প্রশ্নটা শুনে খুব খুশি হয়েছিলেন। হাসির আলোয় তাঁর মুখখানা উজ্জ্বল হয়ে উঠেছিল।

বেশ কয়েকবছর আগেকার কথা।

আফিম রেশন করা হয়েছিল। গাজীপুরে (উত্তরপ্রদেশ) পুরো সরকারী তত্ত্বাবধানে যেখানে পপিপ্ল্যাণ্টের চাষ হয়—যেখান থেকে সারা ভারতে আফিম সাপ্লাই হয়ে থাকে সেখানে লেবার স্ট্রাইক হয়েছিল। প্রোডাকশান হুহু করে ফেল করে গেল। কলকাতায় লাইসেন্সড ভেণ্ডারদেরও কোটা কমিয়ে দেওয়া হল—যে উইকলি পাঁচ কি ছয় তোলা পায়—তাকে দেওয়া হল আড়াই তোলা। বলাবাহুল্য ভেণ্ডাররাও তাদের রেগুলার খদ্দেরদের যার যেটুকু দরকার—তাও দিতে পারল না। বেধে গেল হৈচৈ। আফিমখোররা কালেক্টরেটে এসে ভিড় করতে শুরু করল। ভেণ্ডাররা বলেছিল কালেক্টরসাহেবের কাছ থেকে স্যাংশান করে নিয়ে এস—বেশি দেব—

একদিন এল একটি অল্প বয়সী বৌ। বেশ টল ফিগার। ছিমছাম চেহারা। চোখ দুটো বড় বড় আর খুব টানা টানা। কিন্তু সে চোখে কেমন একটা ব্যথার ছায়া।

স্যার—আমার একটু বেশি আফিম লাগবে।

কেন ?

আমার একটা নির্দিষ্ট ডোজ আছে—সেই পরিমাণ না খেলে আমার ঘুম হয় না। আর কোমরের—বলতে বলতে হঠাৎ চুপ করে গেল। নিজেকে সামলে নিল। কিন্তু কোমরে হাত বুলোতে লাগল। মনে হল—ভেতরে ভেতরে তীব্র কোন যন্ত্রণা দাঁতে দাঁত চেপে ধরে সহ্য করছে।

আপনি কী অসুস্থ ?

হ্যাঁ স্যার, কাল রাতে তো আফিম খেতে পারিনি—বলতে বলতেই মনে হল টলে উঠল। কোনরকমে কালেক্টরের টেবিলটা ধরে নিজেকে সামলে নিল—থেমে গেলেন অমিয়বাবু। তাঁর চোখদুটো যেন সাবেক স্মৃতির ভারে কেমন অগাধ হয়ে

উঠল। আবার থেমে থেমে যেন অনেক—অনেক দূর থেকে বললেন, কেন, আফিমের নেশা ধরেছিল সে, কেন একটা পার্টিকুলার ডোজ না খেলে সে একেবারে অচল হয়ে পড়ে—সে সব বৃত্তান্তই বলেছিল—

সে অনেক কথা। দীর্ঘ ইতিহাস। মেয়েমানুষ। অতএব কথা বলতে বলতে কান্নার দমকে গলাবন্ধ হয়ে আসা—সেসব বাদ দিয়ে এখানে বলা হল—কেন সে নেশার দিকে ঝুঁকেছিল।

বিয়ে হয়েছিল ধনেখালিতে। ছেলে সরকারি চাকরি করে। ক্লাস ফোর স্টাফ। শুধু এক ছেলে আর মা। ছেলে—বংশের প্রদীপ। শিবরাত্রির সলতে। মা-র নয়নের মণি।

মুশকিলটা বেধে গেল সেইখানেই। মা যেমন ছেলেকে তোলা তোলা করে রাখে, ছেলেও তেমনি মা-র খুব নেওটা। নমিতা ক্লাস ইলেভেন পাশ। বেশ বুদ্ধিশুদ্ধি আছে। এক আধটু ঝাঁজও আছে ব্যক্তিত্বের। মেজাজ নেহাত কম নেই। অতএব—

দেখ মা, তুমি যদি দিনরাত বইতে মুখ গুঁজে থাক—

কি করতে হবে বলুন না, ঠ্যাস মেরে কথা বলবেন না।

যাও টিউকল থেকে জল নিয়ে এস—তুমি তো জান পুঁটির মা আজ আসবে না—

কোন কথা না বলে জল আনতে যায় নমিতা। যেতেই হয়। অভ্যেস নেই। সেও বাবা-মার একমাত্র সন্তান। যথেষ্ট আদরে মানুষ। বাবা হরিপালের এক ছোটখাটো জোতদার।

নমিতা ফিরে আসে। কোমরটা টনটন করছে। বুকের ধড়পড়ানি তখনো থামেনি তখুনি শাশুড়ি বলে উঠলেন, একী তুমি যে বসলে বড়। ছাতে বড়ি শুকোচ্ছে সেসব কি আমি দেখব—

এইখানেই শেষ নয়। ছেলে খেটেখুটে ফিরে এলে তার কাছে আবার সাতকাহন করে লাগাতেন। ছেলে আগে আগে বৌকে তেড়ে আসত। এখন মনটা একটু নরম হয়েছে বৌয়ের ওপরে। বেশ বুঝতে পারে মা রীতিমত 'টর্চার' করছে নমিতার ওপরে। কিন্তু মার ওপরে কোন কথা বলতে পারে না। নিজেকে কেমন বোকা এবং অসহায় মনে হয়।

সংসারে যখন চাপা অশান্তির আগুন ধিকিধিকি জ্বলছিল তখনই বেধে গেল আর এক ফ্যাসাদ—টিপ টিপ বৃষ্টি হচ্ছিল। ধনেখালির এঁঠেলে মাটির রাস্তা হয়ে গিয়েছিল দারুণ পিছল। নমিতা পা পিছলে পড়ে গেল কলসী ভর্তি জল নিয়ে। কোমরে প্রচণ্ড চোট পেল।

সঙ্গে সঙ্গে যেন একেবারে অন্য মানুষ হয়ে গেল শাশুড়ি। নিজেই ছুটোছুটি করে ডাক্তার ডেকে নিয়ে এলেন। এক্সরে করালেন। দেখা গেল হাড়টাড় ভাঙেনি। কিন্তু ব্যথা আর কমে না। ট্যাবলেটগুলো খেলে টেম্পরারি রিলিফ হয়। পরে আবার যে কে সেই।

নমিতার মামাশ্বশুর। মৃত্যুঞ্জয়ের (নমিতার স্বামী) আপন মামা, হুগলীঘাটে

ঘ্টিয়াবাজারে কবরেজি প্র্যাকটিশ করেন। খ্ব পসার। বিরাট ডিসপেনসারি তিনিই নমিতাকে আফিমের প্রেসক্রিপশান করেছিলেন। মাসখানেক আফিম খেতেই কোমরের সেই অসহ্য ফিক ব্যথা কোথায় উবে গেল। কিন্তু—

নমিতা লক্ষ্য করল, আফিম বন্ধ করলেই ঘ্ম আসে না। শরীরের ভেতরটা আনচান করে। গোপনে আফিম কন্টিনিউ করতে লাগল। তার যে ব্যথা বেদনার কোন চিহ্নই নেই—সে কথা স্বামী শাশ্বড়ির কাছে বেমাল্ম চেপে গেল। দিনে দিনে তার আফিমের ডোজ গেল বেড়ে। পয়সা হাতে থাকে না। খ্ব গোপনে বাপের দেওয়া দ্ব একটা করে র্বলি বিক্রি করে সে আফিম কিনতে লাগল। সে প্ররোপ্রির ড্রাগের খপ্পরে পড়ে গেল—থেমে গেলেন অমিয়বাব্। একটা দীর্ঘশ্বাস ছেড়ে বললেন, জানেন, নেশা যে কতরকম কারণেই করে—তা কেউ বলতে পারে না—

আর ড্রাগ অ্যাবিউস, ড্রাগ অ্যাবিউস বলে এত চিৎকার চেচাঁমেচি যে হচ্ছে অমিয়বাব্ বিষাক্ত কট্ট গলায় বললেন, কেউ কি একবারও ভাবে—ম্বল গলদটা আমাদের—

কি রকম?

ছেলেকে শাসন করি, সময় সময় মারপিটও করি ড্রাগ খায় বলে কিন্তু ঘরের ছিট-কিনি তুলে দিয়ে বাপ মদ গেলে—

আরো একটা অদ্ভুত ঘটনা বললেন তিনি যেমন নাটকীয় তেমনি আছে এডুকেটিভ ভ্যাল্—

পাতিপ্কুরে রেলব্রীজের নিচে যেখানে ছোট ছোট ঝুপড়িগ্বলো আছে, সেইখানে রেইড করতে গিয়েছিলেন তিনি। শীতের সন্ধ্যা চারিদিকে ঘন কুয়াশা। কতগ্বলো লোক গোল হয়ে বসে ইটের উনানে কি সব হাঁড়িকুঁড়ি চাপিয়ে বোধহয় রান্নাবান্না করছিল—তার খ্ব কাছে বসে কতগ্বলো ছোকরা একটা মাটির হাঁড়ি থেকে খ্ব খেয়ে যাচ্ছে ধেনো মদ—

তিনি তার সেপাইদের নিয়ে ঘিরে ফেললেন তাদের। সঙ্গে সঙ্গে সেই জ্বলন্ত উনানের সামনে বসে থাকা লোকগ্বলো সেই হাঁড়িকুঁড়ি ফেলে রেখে কুয়াশায় ভরা অন্ধকারে পালাতে চেষ্টা করল। কিন্তু তাদের দ্ব-একজনকে ধরে ফেললেন। তারা পচাভাত আর বাখর (কাত বা তলানি) দিয়ে মদের ভাটি চাপিয়েছিল—বেআইনি চোলাই মদ। তাদের বামাল ধরে ভ্যানে তুলে ফেললেন।

ছেলেগ্বলো একেবারে কাঁচা বয়সের। কারোই মনে হয় বিশটা গ্রীষ্ম কি বর্ষাও পেরোয়নি। সবে গোঁফের কালো রেখা উঁকিঝুকি মারছে। তোমরা এই বয়সে মদ খাচ্ছ—

কি করব স্যার, একটা বেশ সপ্রতিভ ছেলে বলে উঠল বাবা ছ্বতোনাতা কারণে রীতিমত টর্চারই বলতে পারেন, একটু থেমে বলল আবার প্রচন্ড মারপিট করেন—চাকরি-বাকরি করি না। তাঁর অন্ন ধ্বংস করছি—তার ওপর আবার করতে শ্বর্ করেছি নেশাটেশাও—

পড়াশ্বনা?

মাইনে দিতে পারিনি বলে স্কুলের খাতা থেকে নাম কেটে দিয়েছে কবে—

কিন্তু ধেনো খেলেই কি সব প্রবলেম সলভ হয়ে যাবে বাবা—স্মার্ট বুদ্ধিদীপ্ত ছেলেটির জন্য চক্রবর্তীসাহেবের মনটা সহানুভূতিতে কেমন ভিজে ভিজে হয়ে উঠেছিল।

যতক্ষণ নেশার ঝোঁকটা থাকে, ততক্ষণ তো দুঃখ যন্ত্রণা সব ভুলে থাকা যায় স্যার। এইজন্যেই তো নেশা করি—

পয়সা পাও কেমন করে ?

কেন এই ভাটিখানার চোলাই মদ ফুটবল ব্লাডারে ভরে নিয়ে চলে যাই গঙ্গা পেরিয়ে বালি কি বেলুড়ে, একটু থেমে পুলিশের ইউনিফরম পরা লম্বা চওড়া চেহারাটার দিকে তাকিয়ে ভয়ে ভয়ে বলল, স্যার চোলাই মদ খেয়েছি বলে আপনি অ্যারেস্ট করবেন—

তুমি যা বলেছিলে—মদ ব্লাডারে ভরে নিয়ে বেলুড়ে কার কাছে যাও—

কিন্তু—তার কথা আর শোনা হল না। একটা লম্বা ঢ্যাঙ্গামত লোক কালো চাদর মুড়ি দিয়ে হন হন করে ভাটিখানার দিকে আসছিল। ছেলেটিকে দেখেই ভূত দেখার মত চমকে উঠল। অন্ধকারেও ঠাহর করা গেল ছাইয়ের মত সাদা হয়ে গেল তার মুখখানা। বিদ্যুতগতিতে মুখ ঘুরিয়ে হন হন করে হেঁটে দূরে অন্ধকারে সরীসৃপের মত মিলিয়ে গেল।

ও কে তুমি চেন ?

কেউ না স্যার—চিনি না—

তার গেলাসের বন্ধুদের ভেতরে এক ফক্কড়মত ছোকরা হো হো করে হেসে দুলে দুলে বলল, দুলালের বাবা স্যার—থেমে গেলেন আবগারি ডিপার্টমেন্টের কালেক্টর। মুখে বিষাদের ছায়া থমথম করতে লাগল। কেমন অস্পষ্ট আর ঝাপসা গলায় বললেন ছেলে মদ খায় বলে শাসন করে যে বাবা সে একই ভাটিখানা থেকে ধেনো গেলে। একজন আগে। আর একজন পরে—

আমার চাকরির একেবারে গোড়ার দিকের ঘটনা। অমিয়বাবু আবার নিজের ভেতরে মগ্ন হয়ে বললেন কী মর্মান্তিক আর কী করুণ—একটু থেমে আবার বললেন, আমি বাবাকে লিখেছিলাম—আবগারির এই চাকরি আমি করতে পারব না, কিছুতেই না—তীব্র আবেগে উত্তেজনায় তিনি আর কিছু বলতেই পারলেন না। পরে বলেছিলেন তাঁর বিচিত্র অভিজ্ঞতা এখানে তাঁর বক্তব্য অত্যন্ত সংক্ষেপে দেওয়া হল—

সোদপুরে গোপাষ্টমীতে মস্ত মেলা বসে। পুন্যার্থীরা কেউ খেজুরের পাতা কেউ বা কচি ঘাস আবার কেউ খোল ভূষি নিয়ে যেয়ে গরুদের খাওয়ায়। মেলার মাঠের শেষে সারি সারি করে গরু বাছুর বাঁধা থাকে। এই মেলায় আর সব ধর্মের ছিটেফোটা মাখানো মেলার মতই পশ্চিমের সাধুসন্তদের জমজমাট ভিড় হয়। দু-একটি নাগা সন্ন্যাসীকেও দেখা যায়। একেবারে দুমদুম ন্যাংটো হয়ে ঘুরছে। আর থেকে থেকেই কখনো আকাশের দিকে ত্রিশূল উঁচিয়ে আবার কখনো বা চিমটের খট খট শব্দ তুলে কর্কশ কণ্ঠে ধ্বনি দিচ্ছে হর হর মহাদেও—

আবগারির ডিডিতে (ডিটেক্টিভ ডিপার্টমেন্ট) খবর এল নেপাল, ইউ. পি (উত্তর প্রদেশ) থেকে প্রচুর পরিমাণে গাঁজা স্মাগল্ড হয়ে এসেছে মেলায়। আর সেই ইল্লিসিট গাঁজা এবং আফিমের কেরিয়ার হল সাধুবাবা। তাদের কাছে থেকে লোকাল স্মাগলাররা আবার কলকাতায়, বারাকপুরে, টিটাগড়ে—শিল্পাঞ্চলে বা ইন্ডাস্ট্রিয়াল বেল্টে অত্যন্ত চড়া দামে বিক্রি করে বেশ পয়সা পিটছে—

সাধু সন্ন্যাসীর ভেক নিয়ে যারা ড্রাগের চোরাকারবার করে তাদের ট্যাকল করা ভেরি ডিফিকাল্ট। গেরুয়া, ত্রিশূল, চিমটে ইত্যাদি উপকরণ নিয়ে যারা ঘোরাফেরা করে তাদের সম্বন্ধে দেশের মানুষের সেন্টিমেন্ট প্রায় জ্বরের মত তাই অন্য রাস্তা ধরতে হল।

হর—হর—মহাদেও—নমস্তে সাধুজী উদাত্ত কণ্ঠে বললেন সন্ন্যাসী—অমর রহে বেটে—

পাতার খদ্দের তার কানের কাছে মুখ নিয়ে চাপা গলায় ফিসফিস করে বলল নেপালকী আসলি চীজও হ্যায় ?

হ্যায়—লেকিন জাদা দাম, বলতে বলতেই ঝুলি থেকে বের করে তার হাতে মাল দিয়ে পয়সা ট্যাকে ভরল। লোকটা অন্ধকারে মিলিয়ে গেল। ঠিক তার কিছুক্ষণ পরেই সেই সাধু বাবার কাছেই এল আর একটি অল্পবয়সী বৌ—সেও গাঁজার পুরিয়া ব্লাউজের ভেতরে টুক করে ফেলে দিয়ে বি টি রোডের দিকে হাঁটতে লাগল। কেন যেন মেয়েটিকে তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে 'ওয়াচ' করছিল আর একটা লোক। বেশ তাগড়া চেহারা। সেই বৌটির চেয়ে অল্প বড় হবে। সেই লোকটা এদিকে ওদিকে ভয়ে ভয়ে তাকিয়ে বিদ্যুতগতিতে সেই গাঁজার বড় স্মাগলার সন্ন্যাসীর কাছ থেকেই চোরাই গাঁজা কিনে নিয়ে সেই মেয়েটিকে অনুসরণ করতে লাগল ঝড়ের গতিতে—থেমে গেলেন আবগারির বহুদর্শী কালেক্টর। একটা বড় নিঃশ্বাস ফেলে বললেন, আমি যেন রহস্যময় কোন নাটকের শেষ অংক দেখছি—সেই সন্ন্যাসী থেকে শুরু করে সেই স্ত্রীলোক এবং পুরুষটি—সেই সমস্ত চেনটাকে আমরা ওয়াচে রেখেছিলাম—

তারপরের ঘটনা সংক্ষিপ্ত। সন্ন্যাসীকে গ্রেপ্তার এবং তার পজেশানে এক আধ তোলা নয় দস্তুরমত প্রায় ১২ কেজির গাঁজা পাতা পাওয়াও বড় কথা নয়—সেসব তো গতানুগতিক। থ্রিলটা বা ড্রামাটিক সাসপেন্সটা হল—সেই জোড়াকে অ্যারেস্ট করতে গিয়ে।

বলা নিষ্প্রয়োজন। দুজনের কাছেই ইল্লিসিট গাঁজা পাওয়া গেল। লক্ষ্য করলেন অমিয়বাবু কেন যেন কেমন হিংস্র বিষাক্ত দৃষ্টিতে মেয়েটির দিকে তাকাচ্ছে লোকটা ওকে চেনে না কি ? যাই হোক, ওসব নিয়ে মাথা ঘামানোর সময় নেই তার। তোমার জামিন কেউ হবে না গারদ খাটবে ?

আমি গারদে যাব, মুখ নিচু করে বলল লোকটা। আবার যেন অসহ্য কোন তীব্র যন্ত্রণা দাঁতে দাঁত চেপে ধরে সহ্য করতে করতে বলল, কী হবে বাইরে থেকে—

তুমি—তুমি বেল নেবে ?

আমিও জেল খাটব দারোগাবাবু—বৌটাও বেশ সহজ সপ্রতিভ গলায় বলেই

আড়চোখে সেই লোকটার দিকে তাকাল। তার চোখে তীব্র একটা ঘৃণার ধিক্কার জ্বলজ্বল করছিল।

এক্সাইজের ডাকসাইটে অফিসার পড়ে গেলেন মহাবিপদে। এসব বেলেবল (জামিনযোগ্য) অফেন্স। আসামীদের গারদে পুরে রাখার বায়নাক্কা আর ঝামেলা আছে ঢের। হঠাৎ তাঁর সন্দেহ হল—এরা দুজনেই গারদে থাকতে চায় কেন? ব্যাপার কি বল তো তোমরা দুজনেই গারদে থাকতে চাও কেন? তোমাদের কী চেনাশোনা আছে এবার চক্রবর্তীসাহেব পুলিশ সুলভ রুক্ষ কর্কশ কণ্ঠে চিৎকার করে বললেন।

ও আমার বৌ স্যার—থেমে গিয়েছিলেন অমিয়বাবু। মুখখানা কেন যেন আস্তে আস্তে কঠোর ও গম্ভীর হয়ে উঠছিল।

বেশ কিছুক্ষণ পরে বেশ তাচ্ছিল্যের সঙ্গে বলেছিলেন ড্রাগ অ্যাবিউস বা ড্রাগের কুফল বলে চেঁচালে তো হবে না—তার আগে দেশের সমাজ ব্যবস্থা অর্থনৈতিক কাঠামো ঢেলে সাজাতে হবে—

কি রকম?

কলম্বিয়ার বা ভারতের ধনকুবের ড্রাগ কিংদের মত মুষ্টিমেয় কিছু লোক ছাড়া 'কমনফোক' বা সাধারণ গরীব ও মধ্যবিত্ত মানুষ স্মাগলিংএ ইনভলভড হয়ে পড়ে হতেই হয় শুধু বাঁচার জন্য—

ওরা স্বামীস্ত্রী কী খুব গরীব। লোকটা কোন কাজকম্ম করে না?

বেলঘরিয়ায় পটারির কারখানায় লেবারের কাজ করত—ছাঁটাই হয়ে যায়। তারপরে যেমন হয়—গরীবঘরে মা ষষ্ঠীর কৃপাটা বেশি হয়—৬টি ছোট ছোট ছেলে মেয়ে—একটু থামলেন অমিয়বাবু। আবার একটু কেমন ম্লান হেসে ঝাপসা গলায় বললেন এদিকে ঠুনকো প্রেসটিজ বৌকে বাইরে কোন কাজ করতে দেবে না। বাচ্চাদের ক্ষিদের জ্বালায় চিৎকার কান্নাকাটি সহ্য করতে পারে না মা। অতএব—দুইজনেই বেশ কিছুদিন ধরে এসব করছে—আর একটা কথাও বললেন না কলকাতার এক্সাইজের কালেক্টর অমিয় চক্রবর্তী। তাকে কেমন ক্লান্ত আর অবসন্ন মনে হল।

কিন্তু সমস্যা হল—মোট অ্যাডিক্টের পরিসংখ্যা পাওয়া যায় কি করে?

সমাজসেবী প্রতিষ্ঠানের সেক্রেটারি যে চেয়েছেন। কোন সমাজকল্যাণ সংস্থা কি সরকারি উদ্যোগে কখনো অ্যাডিক্টদের সার্ভে করেছে—সেরকম কোন রেকর্ড ন্যাশনাল লাইব্রেরিতেও তন্ন তন্ন করে খুঁজে পাওয়া গেল না। অতএব—

লালবাজারের শরণাপন্ন হতেই হল। স্পষ্ট জানা আছে পত্রপত্রিকার খবরেও জানা যায় কলকাতা পুলিশের আলাদা একটা নার্কটিক সেল আছে—

এই তো বিপদে ফেললেন মশায় বেশ হেসে হেসে বললেন লালবাজারের নার্কটিক ডিটেক্টিভ ডিপার্টমেন্টের অ্যাসিস্টেন্ট কমিশনার, কোথায় কত চোরাই গাঁজা কি আফিম কিম্বা হেরোইন 'সিজ' করেছি বলতে পারি—কিন্তু—নেশাখোর বা অ্যাডিক্টদের কোন স্ট্যাটিস্টিক তো—বলতে বলতে একটু যেন বিব্রত হয়েই থেমে গেলেন। তাঁর

ফাইলপত্র পুরোনো রেকর্ড সব নাড়াচাড়া করতে করতে হেসে বললেন এই দেখুন আপনার সঙ্গে কথা হওয়ার পরেই আমার সব ডকুমেণ্ট একেবারে রেডি করে রেখেছি—

কী আর বলব আপনাকে, খুশিতে কৃতজ্ঞতায় আর তীব্র আবেগে বোধহয় থ্যাংক ইউ কিম্বা সো কাইণ্ড অফ ইউ গোছের কিছু একটা বলতে যেতেই—

হাত তুলে বাধা দিলেন, বললেন পুলিশের থিয়োরিই হল—Dealing with only the sin and prevent the sin not the sinners —

সঙ্গে সঙ্গে বিদ্যুতচমকের মত মনে পড়ে গেল কলকাতার এক্সাইজ কালেক্টর মিঃ চক্রবর্তীর কথা। তিনি এই প্রসঙ্গে ইংরেজ চিন্তাশীল এক মনস্বী প্রাবন্ধিক বা এসেসিট (Essaysit) রিচার্ড হফস্টেডারের (Richard Hofstader) একটি চমৎকার উক্তি কোট করেছিলেন—

Reformers who begin with the determination to stamp out sin, usually and by stamping out the sinners, অর্থাৎ যাঁরা সমাজকে ড্রাগের অভিশাপ বা পাপ থেকে মুক্ত করতে চান তারা ড্রাগে আসক্ত সেই হতভাগ্যদেরই সমাজ থেকে একেবারে বাতিল করে দিতে বা নির্বাসিত করে দিতে চান—

কি ভাবছেন?

ভাবছি—হঠাৎ থেমে যেয়ে তাঁর হাসি হাসি প্রসন্ন মুখখানার দিকে তীক্ষ্ম চোখে জরিপ করার মত করে তাকিয়ে বললাম, আপনার হাতে সময় নষ্ট করছি না তো মিঃ রায়চৌধুরী—

এই রে বেশ তো আমরা বন্ধুর মতই কথাবার্তা বলছিলাম—আবার ফরমালিটি শুরু করলেন, বেশ শব্দ করে হেসে হেসে আমার মনের অস্বস্তি আর দুর্ভাবনা এবং লালবাজারের লালবাড়িগুলোর অপার রহস্যময় গাম্ভীর্যটাকেই যেন উড়িয়ে দিয়ে কোন চিন্তা নেই—আমি আপনার জন্য সারাটা দিনই সময় করে রেখেছি, কোন কাজ রাখিনি—

কী বলে যে আপনাকে ধন্যবাদ দেব, হঠাৎ থেমে বলেছিলাম, আপনার এখানে আসার আগে ক্যালকাটা এক্সাইজ ডিপার্টমেণ্ট ঘুরে এসেছি—

স্যারের সঙ্গে দেখা হল?

স্যার?

কেন ক্যালকাটা এক্সাইজ কালেক্টর অমিয়ভূষণ চক্রবর্তী—একটু থেমে আবার বললেন, আমি তাঁর ছাত্র ছিলাম। এক্সাইজে জয়েন করার আগে তিনি কলেজে মাস্টারি করতেন—বলতে বলতেই তার চোখদুটো গভীর শ্রদ্ধায় কেমন অগাধ হয়ে উঠল। যেন নিজের মনকেই শুনিয়ে শুনিয়ে বললেন—অত্যন্ত পণ্ডিত মানুষ—

অমিয়বাবুর মতে দুঃখ যন্ত্রণা থেকে মুক্তি চাওয়া বা ভুলে থাকার জন্য নেশা করা আর ইকনমিক ক্রাইসিসের জন্যই ড্রাগ স্মাগলিং একটু থেমে তাঁর অত্যন্ত মূল্যবান কথাগুলো মনের ভেতরে গুছিয়ে নিয়ে বললাম—তিনি বললেন ড্রাগ ওয়ার্ল্ডের দুটো মিনেস (অভিশাপ) ড্রাগ অ্যাবিউস আর ড্রাগ স্মাগলিং—দুটোরই আড়ালে ঘাপটি মেরে বসে আছে দুটো হিংস্র দৈত্য—

দুঃখ কষ্ট যন্ত্রণা।

অভাব।

অ্যাসিস্টাণ্ট কমিশনার—নার্কটিক ডিটেক্টিভ ডিপার্টমেণ্ট তাঁর কেস রেকর্ড থেকে যেসব তথ্য দিয়েছিলেন সেগুলো সংক্ষেপে বলা হল—

(ক) কিছুদিন আগে ইউনিভারসিটির Dept. of Appllied Psychology অ্যাডিক্টদের যে সমীক্ষা করেছিলেন, সেই সার্ভে'তে জানা যায়।

(১) কলকাতায় মোট নেশাখোরের সংখ্যা—৬৮,০০০।

১৫ থেকে ২৫ বছর বয়সের শতকরা		৫০
২৫ „ ৪০ „ „	„	৪০
১৫ বছরের নিচে	„	৫
স্ত্রীলোক	যে কোন বয়সের শতকরা	৪'৫

কিন্তু কলকাতা পুলিশের বিশ্বাস সমীক্ষার এই অঙ্কের চেয়ে অনেক অনেক বেশি হবে মাদকসেবীদের সংখ্যা। কেননা ড্রাগের বৈচিত্র যেমন দিনে দিনে বাড়ছে তেমনি অপর্যাপ্ত পাওয়া যায়। একদিকে আফিম হেরোইন অধ্যুষিত সেই গোল্ডেন ট্র্যাঙ্গল স্বর্ণত্রিভুজের তিনভূখণ্ড ব্রহ্মদেশ, থাইলাণ্ড আর লাওস আর একদিকে ভারতের পশ্চিম সীমান্তবর্তী গোল্ডেন ক্রিসেণ্ট (Golden Crescent) পাকিস্তান, আফগানিস্থান এবং ইরান। এই দুই অঞ্চলের ড্রাগের (আফিম এবং হেরোইন) বিপুল পণ্যসম্ভার স্মাগল হয়ে যাতায়াতের পথের ঠিক মাঝখানে এই হতভাগা শহর—

কলকাতা।*

নিউজউইকের একটি সার্ভে বলছে কলকাতায় মাদকাসক্তের সংখ্যা হল ৫০,০০০ হাজার। তার ভেতরে মাত্র ২০০ জন নার্সিংহোম বা হসপিটালে আসে ট্রিটমেণ্টের জন্য।

কিন্তু যারা হাসপাতালের ধার মাড়ায় না—গোপনে কোন ভাঙ্গা বাড়ির পিলারের আড়ালে, কি পড়ো বাড়িতে কিম্বা কোন ঝাপড়া গাছের নিচে জমাট অন্ধকারে নিজেকে লুকিয়ে নেশা করে তাদের স্ট্যাটিস্টিক কে দেবে? এই পর্যন্ত রেকর্ড থেকে ডিক্টেড করে থেমে গেলেন রায়চৌধুরীসাহেব। তাকে কেমন হতাশ আর অবসন্ন মনে হল—

অ্যাডিক্টেডের স্ট্যাটিস্টিকে পয়েণ্ট ছেড়ে দিন—প্রায় অস্পষ্ট এবং ক্লিষ্টকণ্ঠে বললেন এবার আমাদের রেকর্ডে ড্রাগ অ্যাবিউসের যে পিকচারটা আছে সেটা নোট করে নিন—

কিন্তু রেকর্ড থেকে মেটিরিয়েল সাপ্লাই করার আগে মিঃ রায়চৌধুরী হেসে হেসে বললেন শুরু করার আগে একটা ঘটনা বলি—

বালিগঞ্জে না হয় পার্কস্ট্রীটে থাকে হয়ত। পুরোদস্তুর বাঙ্গালি সাহেব। গাড়ি হাঁকিয়ে এসে উপস্থিত হলেন লালবাজারে।

---

* কেন ড্রাগের আমদানি বেশি। এসম্বন্ধে আগে অনেক আলোচনা হয়েছে।

ড্রাইভার বা সোফার তাড়াতাড়ি এসে দরজা খুলে দিল। কিন্তু ভদ্রলোক কেন যেন নামলেন না। ভেতরে আর একজন কাউকে বুকের ভেতরে জড়িয়ে ধরে আদর করে বলল—জয় নামো বাবা—চল—আমার হাত ধর—

কি ব্যাপার, অসুস্থ মানুষ নিয়ে লালবাজারে এসেছেন কেন ?

ভদ্রভাবে কথা বলবেন—সাহেব দাঁতমুখ খিঁচিয়ে গর্জন করে উঠলেন—

বলুন আপনার কি দরকার, আমি সেন্ট্রাল ক্যালকাটার ডি সি—

আমার একমাত্র ছেলে। ড্রাগ খেয়েছে—

ভদ্রলোকের কথা শেষ হওয়ার আগেই ডি. সি বললেন আপনি ওকে নিয়ে বাড়িতে ফিরে যান পুলিশের কিছুই করার নেই—

এসব ১৯৬৯ সালের কথা।

কিন্তু এই ঘটনায় পুলিশের চোখ খুলে গেল। আর শুরু হল ওয়াচ করতে কারা ড্রাগ খায়—কোন্ ক্লাসের লোক ধীরে ধীরে মাদকাসক্ত হচ্ছে—

দেখা গেল সাহেবি বড়লোকদের স্কুলগুলোতে ড্রাগের নেশা ক্রমশঃ চালু হচ্ছে—থেমে গেলেন মিঃ রায়চৌধুরী। তারপর একটা বড় নিশ্বাস ফেলে আস্তে আস্তে বললেন, তারপরে তো অনেক অনেক বছর কেটে গিয়েছে—সেই ভয়াবহ সামাজিক রোগের অক্টোপাশের হাত সমাজের নানা স্থানে ছড়িয়ে গিয়েছে—

এবার ড্রাগ অ্যাবিউস বা ড্রাগের বিধ্বংসী প্রতিক্রিয়ার চিত্রটা দেখুন—

তিনি তাঁর রেকর্ড থেকে ডিক্টেড করে গেলেন—

কলকাতার ৫০,০০০ হাজার অ্যাডিক্টের অধিকাংশই টিনএসজার—১৩থেকে ১৯ বছর বয়সী। তার ভেতরে প্রতিদিন মাত্র ৩০০ নেশা করতে গিয়ে ধরা পড়ে। অত্যন্ত বেশি পরিমাণে ড্রাগ খাওয়ার জন্য প্রতিদিন মারা যায় ৫ জন।

বলা যায় শহরে হেরোইনের নেশাটা প্রায় মহামারীর মত হয়ে দেখা দিয়েছে আর কলকাতার সমাজজীবনকে একেবারে আচ্ছন্ন করে দিয়েছে। কলেজের ছাত্র থেকে রিক্সাওয়ালা এবং ট্যাক্সি ড্রাইভার, ধনী অভিজাত থেকে বস্তির বাসিন্দাদের ভেতরে অনেকেই হেরোইনে আসক্ত।

চৌরঙ্গি থেকে পার্কস্ট্রীট এলাকায় হেরোইন, কোকেন এবং এল এস ডি পান সিগারেটের দোকানে কিম্বা কখনো পেডলারও মালের জোগান দিয়ে থাকে। খুব পাড় নেশাড়ু—বব, ঠেক বা টোনিয়া (বড়লোক বাঙালি ঘরের ছেলে)। রুস্তম আলি এবং কার্তিক ইত্যাদি নামগুলো স্ম্যাকারদের মুখে মুখে ফেরে—বলতে বলতে থেমে গেলেন অ্যাসিস্টান্ট কমিশনার নার্কটিক ডিটেক্টিভ ডিপার্টমেন্ট। আবার খুব মনযোগ দিয়ে তাঁর রেকর্ডের ভেতরে একটা নোট দেখে নিয়ে বললেন, কলকাতার একটি বিখ্যাত সাপ্তাহিক পত্রিকার রিপোর্টার কলকাতার বিভিন্ন এলাকা ঘুরে ঘুরে এসব ইনফরমেশান সংগ্রহ করেছিলেন—আমরা নিজেদের কাজের সুবিধার জন্য পত্রিকার কাটিং রেখে দিয়েছি।

শেখ ফিরোজ, রাজা, মন্নু।

কলাবাগান থেকে মার্কাস স্কোয়ার এলাকায় এই কয়জন নামকরা নেশাড়ুর নাম শোনা যায়। এরা দিনরাত হেরোইন কি কোকেনের নেশায় বুঁদ হয়ে থাকে। স্ম্যাকার সার্কেলে এরা রথী মহারথী।

কলকাতার কয়েকজন স্বনামধন্য ব্যক্তির নামও আছে ড্রাগ ডি. আই. পিদের তালিকায়। তাঁদের নাম বললে তাঁদের সামাজিক প্রতিপত্তি এবং সুনাম ক্ষতিগ্রস্ত হবে।

এবার পুলিশের অর্থাৎ পশ্চিমবঙ্গের পুলিশের গোয়েন্দা বিভাগ বা ডিটেক্টিভ ডিপার্টমেণ্ট এবং সায়কিয়াটিস্টদের কাছ থেকে নিচের ইনফরমেশানগুলো সংগ্রহ করা হয়েছে—

ক। কলকাতার ড্রাগ পেডলার বা ডিলাররা শুধু হেরোইন নয়, গাঁজা, চরস, মারিজুয়ানা এবং কোকেনও বিক্রি করে।

খ। এই শহরে হেরোইনের চলতি নাম হল 'সুগার'। দুইরকমের মিহি দানার সুগার কলকাতার বাজারে পাওয়া যায়। আফিমের সঙ্গে কিছু কেমিক্যাল মিশিয়ে আর একটা হাইড্রেড দিয়ে তৈরি হয়—হেরোইন। আর ব্রাউন সুগার ম্যানুফাকচার করা হয়ে থাকে। আন্তর্জাতিক বাজারে ১ কেজি ব্রাউন সুগারের দাম প্রায় ১ লাখের কাছাকাছি। আর বলাবাহুল্য হোয়াইট সুগার যার ধক অনেক বেশি, যাকে বলে ডেঞ্জারাস, বেশি মাত্রায় খেলে মাদকসেবী মরেও যেতে পারে তার দাম ব্রাউনের চেয়ে ঢের বেশি। কিন্তু ইদানীং কলকাতার বাজারে বেশি পরিমাণে আসছে বলে মূল্য কিছু কমেছে।

১৯৮১ সালে ১ গ্রাম ব্রাউন সুগারের দাম ছিল ১০০ টাকা এখন মাত্র ২২ টাকাতেই ১ গ্রাম এই সুগার মিলে যাচ্ছে কলকাতার বাজারে। রিপোর্টের শেষে কনক্লুশানটা রয়েছে সেটা পড়ে শোনালেন অ্যাসিস্টাণ্ট কমিশনার নার্কটিক ডি. ডি—More cheap in Calcutta markets, so the crowds of addicts are gradually swelling…

ক্যালকাটা পুলিশের ডিটেক্টিভ ডিপার্টমেণ্ট এবং অ্যাডিক্টদের চিকিৎসার জন্য নার্সিংহোমের ডাক্তার সায়কিয়াটিস্টদের রেকর্ড থেকে জানা যাচ্ছে একেবারে কাঁচা বয়সের কলেজ স্টুডেণ্টরাই সবচেয়ে বেশি সংখ্যা হেরোইনের খদ্দের। ড্রাগ পেডলার বা ড্রাগ বিক্রেতাদের জেরা করে জানতে পারা গিয়েছে তাদের খদ্দেরদের বয়স ১৬ থেকে ২৬ এর ভেতরে। কিন্তু সবচেয়ে বেশি আশঙ্কার এবং দুঃখের ব্যাপার হল অ্যাডিক্টদের ভেতরে মেয়েদের সংখ্যা ক্রমাগত বেড়েই চলেছে। বেশ কিছুদিন ধরে তদন্ত করে এবং প্লেন পোশাকে কলকাতার পাড়ায় পাড়ায় ঘোরাফেরা করে গোয়েন্দা পুলিশ জানতে পেরেছে স্কুলের উঁচু ক্লাসের ছাত্ররাই হল—বোনাফাইড স্ম্যাকার বা নিয়মিত পাঁড় নেশাখোর। তাদেরই অ্যাডিকশান সার্কেলে বা নেশারচক্রে মক্ষিরানীর মত মেয়ে অ্যাডিক্টরাও থাকে। মিষ্টি হাসিতে গানে গল্পে এবং সঙ্গসুখে হেরোইনের নেশার মাদকতাকে নিশ্চয়ই ছন্দো সুরভিত করে তোলে।

কফিহাউস।

কলকাতার কফিহাউসগুলোয় একদা বাঁধা বাঁধা বুদ্ধিজীবি লেখক কবি এবং কলেজ পড়ুয়াদের মিলনক্ষেত্র বা রেন্দেজেভাস, এখন কলকাতার সবচেয়ে বড় হেরোইনের আড্ডা—Biggest den of Heroin circle

ড্রাগ অ্যাবিউস।

কলকাতায় ড্রাগের সর্বনাশা অবক্ষয়ের এইখানেই শেষ নয়। কলেজের এবং কফিহাউসের চৌহদ্দী ডিঙ্গিয়ে ড্রাগের অক্টোপাশ এখন কলেজগুলোর হোস্টেলের ভেতরেও সেঁধিয়েছে।

বয়স—১৯।

বিখ্যাত এক মিশনারী কলেজে পড়াশুনায় ব্রিলিয়াণ্ট ছাত্র। হোস্টেলের বাথরুমে বসে লুকিয়ে লুকিয়ে ব্রাউন সুগার খাচ্ছে বছর তিনেক ধরে। কর্তৃপক্ষ বা হোস্টেল সুপারিনটেণ্ডেণ্ট জানতে পারেন। ভাল ছাত্র বলে বোধহয় একটু সফট কর্ণার ছিল। তাই ওয়ার্ণিং দেন। কিন্তু—

হেরোইন। সেই বেনারসের দীনেশ যাজ্ঞির কথা—Once hooked hooked, forever. হেরোইন একবার খেলে আর তার নাগপাশ থেকে কিছুতেই বেরোন যায় না।

আবার ধরা পড়তেই ছেলেটিকে তাড়িয়ে দেওয়া হয়। বাড়িতে অসময়ে ফিরে আসতেই বাবা-মা অবাক হলেন। কিন্তু কলেজের ছাপমারা খামে অফিসিয়াল চিঠি এসে হাজির হল।

বাবারা যা করে থাকেন ছেলেকে বেধড়ক পিটিয়ে বাড়ি থেকে মেজাজ দেখিয়ে দিলেন তাড়িয়ে। একমাত্র ছেলে। মার বুকের ভেতরটা টনটনিয়ে উঠল। তিনি কয়েকবার হাসপাতালের সায়ক্রিয়াটিস্টদের কাছে ছেলেকে নিয়ে গেলেন। কিন্তু—

কিছুই হল না। একদিন কি দুইদিন, বড়জোর দিন তিনেক হয়ত সুগার না খেয়ে থাকল, উইথড্রয়ালের যে ভয়ংকর এফেক্ট—সেই হড়হড়িয়ে বমি, মৃগী রোগীর মত দাঁত কড়মড় করা সেই সব সিম্পটম দেখা যেত। মা, মেয়েমানুষ, ছেলের কষ্ট সহ্য করতে না পেরে নিজে হাতে একটু করে বিষ ঠেকিয়ে দিত। তাতে কি আর হয়? দিনে দিনে তার ডোজ বেড়েছে। একবারের জায়গায় চারবেলায় চারটি 'ফিক্স' না হলে তার চলে না। আর চারটি 'ফিক্সে' গুণে গুণে দিতে হয় এক একবারের জন্য ১০টি টাকা। ৪০ টাকা তাকে কে দেবে?

অতএব—

বিখ্যাত সেই কলেজের একদা ব্রিলিয়াণ্ট ছাত্র এখন মোটর মেকানিক।

একদিন বুঝি কালিঝুলি মেখে গাড়ির নিচে চট পেতে শুয়ে কলকব্জা ঠুকঠাক করছিল, তখন পুলিশ তাকে জেরা করতে শুরু করে। কলকাতার বিভিন্ন হেরোইন ডেনের খোঁজখবর জানতে চায়। সে যেটুকু জানে সব মন খুলে বলেছিল।

পুলিশ অফিসারের মনটা নরম হয়ে গিয়েছিল। বলেছিল এ আপনি কী করলেন আপনার কী ব্রিলিয়াণ্ট—

আর দয়া করে কাটা ঘায়ে নুনের ছিটে দেবেন না স্যার, হাতজোড় করে বলেছিল

যার এক পা আছে বলার খোসার ওপরে, আর এক পা আছে কবরে, আমার এখন দরকার একটু 'পুস'—ধাক্কা। তার শেষের দিকের কথাগুলো কেমন অস্পষ্ট শোনাচ্ছিল কান্নার আবেগে। কাতরকণ্ঠে বলেছিল উপদেশ আর দেবেন না—স্যার—তাড়াতাড়ি যদি বরং কেওড়াতলায়—

এই টাইপের আরও অনেক অনেক কেস জানা গেছে। সেই সর্বনাশের নেই আলাদা কোন রং, কোন সুর। তাই অবাস্তব। অপ্রয়োজনীয়। এখন যে ড্রাগটির প্রভাব কলকাতার অ্যাডিক্টদের মহলে, সেই হেরোইন বা ব্রাউন সুগার শহরের কোথায় কোথায় খুচরো বিক্রি হয় এবং দাম পুলিশ রেকর্ড থেকে তুলে দেওয়া হল :—

কলকাতায় হেরোইন বিক্রির জায়গা

পাইকারি

(১) পূর্বে রাজাবাজার। (২) মধ্যকলকাতায় টেরিটিবাজার, বড়বাজার। (৩) পশ্চিমে একবালপুর, ওয়াটগঞ্জ, খিদিরপুর, মোমিনপুর এবং মেটিয়াবুরুজ।

খুচরো

(১) মেহেদিবাগান (২) পার্কসার্কাস (৩) এণ্টালি (৪) বৌবাজার (৫) চিৎপুর (লোয়ার) (৬) চিৎপুর (আপার) (৭) কলেজ স্ট্রীট (৮) শ্রীমানী মার্কেট (৯) রাজাবাজার (১০) খিদিরপুর (১১) মার্কেট স্ট্রীট (১২) টেম্পল স্ট্রীট।

কলকাতার বাইরে পশ্চিমবঙ্গে হেরোইনের পাইকারি বিক্রির হাটও বেশ জমজমাট। দক্ষিণবঙ্গ (রিষড়া)। উত্তরবঙ্গ (শিলিগুড়ি)।

কলকাতার বাইরে খুচরো বিক্রির জায়গা—সন্তোষপুর, যাদবপুর, বারাসাত, তিলজলা, বারাকপুর, হাওড়া, হুগলি বর্ধমান, খড়্গপুর এবং শিলিগুড়ি।

হেরোইনের খুচরো বিক্রির দাম

১/১৬ গ্রাম	এক	প্যাকেট	৫ থেকে ৮	টাকা
১/৪ "	"	"	১০ থেকে ১৫	"
১/২ "	"	"	৪০ থেকে ৬০	"
১ "	"	"	৮০ থেকে ১২০	"

কোন্ ড্রাগ মাদকসেবীরা কি ভাবে খায়—

ক্যানাবিস বা গাঁজা

সিগারেটের ভেতরে নিয়ে আবার কখনো গাঁজার সরু কলকে টেনে।

কোকেন

নস্যির মত শুঁকে, কেউ কেউ আবার ইনজেকশানের মাধ্যমেও নেয়। তাতে কখনো কখনো চামড়া ক্ষত হয়ে যায়।

হেরোইন

শুঁকে, সিগারেটের মত ফুঁকে, কখনো চিবিয়ে এবং ইনজেকশান করে।

মা-বাবা এবং অভিভাবকস্থানীয় লোকের জানা দরকার কি কি লক্ষণ দেখলে বুঝতে পারা যাবে ড্রাগে আসক্ত—

(ক) নেশাখোরদের নড়াচড়া অন্যদের চেয়ে শিথিল।

(খ) এদের চুলকানি বেশি হবে। বিশেষ করে নাকের দিকে।

(গ) খিদে কমে যাবে, ওজন কমে যাবে।

(ঘ) অস্থিচর্মসার, রুগ্ন কঙ্কালের মত দেখাবে।

(ঙ) যৌন দুর্বলতা দেখা দেবে—এ জিনিসটা মা-বাবার টের পাওয়া মুস্কিল। মেয়েদের ঋতুঘটিত অনিয়ম দেখা দেবে।

(চ) চোখের দিকে তাকালেও কিছুটা জানা যাবে—হেরোইন ও আফিম খোরদের চোখ ছোট হয়ে আসে কিন্তু অন্যসব ড্রাগের নেশায় চোখদুটো প্রসারিত হয়ে যায়।

এই প্রসঙ্গেই বলা দরকার, পাঠকদের হয়ত মনেও আছে কাশীর সেই অ্যাডিক্ট দীনেশ যাজ্ঞি আক্ষেপ করে বলেছিল, মা-বাবারা শুধু শাসন করতেই জানেন। জানেন না বা জানতেও চান না ড্রাগ খেলে কি কি সিম্পটম দেখা যায়।

এবার অ্যাসিস্টাণ্ট কমিশনার নার্কটিক তাঁর রেকর্ড থেকে বললেন একটি ঘটনা—

শেষরাতের দিকে আগরতলা শহরের ভেতর দিয়ে ঊর্ধ্বশ্বাসে ছুটে চলেছিল একটা প্রাইভেট কার। পুলিশের কাছে ইনফরমেশান ছিল—গাড়িতে চোরাই ড্রাগ আছে। গাড়ি আটকানো হল। পাওয়া গেল প্রায় তিন লক্ষ টাকার বার্মার তথা সেই গোল্ডেন ক্রিসেণ্টের খাঁটি লায়ন ব্রাণ্ড পয়লা নম্বরের হেরোইন।

এতকাল পশ্চিমবঙ্গ তথা কলকাতা পুলিশের ধারণা ছিল, কলকাতায় হেরোইন এবং আফিম আসে উত্তরপ্রদেশ থেকে। সেখানে (গাজিপুরে) পপিপ্ল্যাণ্টের চাষ হয় সরকারি তত্ত্বাবধানে। সুতরাং ধরে নেওয়া যেতে পারে সরকারি বাগানের ধারে কাছে গোপনে বেআইনি চাষও কিছু হয়—আফিমের নেশা প্রতিরোধের জন্য আইন তৈরি হল Opium Act (১৮৫৭)। সেটা আবার সংশোধিত বা অ্যামেণ্ডমেণ্ড হল ১৮৭৮ সালে। তবুও আফিমের নেশা বেড়েই চলল। তাই ১৯৩০ সালে হল—Dangerous Drugs Act. তাতে জেল জরিমানার অনেক ব্যবস্থাই ছিল। কিন্তু যেই আফিম থেকে দেদার হেরোইন তৈরি শুরু করল, সেই সর্বনাশকে রোধ করার জন্য তৈরি হল নতুন আর একটা আইন—Narcotic and Psychotropics Substance Act. এই আইনে সব ফাঁকফোকর বন্ধ হয়ে গেল বটে। কিন্তু কলকাতায় আরও বেশি আফিম এবং হেরোইন আসতে শুরু করল। কেমন করে?

কলকাতা পুলিশের ধারণা ঠিক নয়, পূর্বে স্বর্ণত্রিভুজখণ্ড বার্মা, লাওস এবং থাইলাণ্ড থেকে যেমন তেমনি পশ্চিমের গোল্ডেন ক্রিসেণ্ট—পাকিস্তান, আফগানিস্থান এবং ইরান থেকেও কলকাতায় আসে—আগেও এসব তথ্য বলা হয়েছে। তবে আরও কিছু রোমাঞ্চকর তথ্যও জানা গেছে।

১৯৮২ সালে এক ড্রাগ বিশেষজ্ঞ ফরাসী সাহেব ফ্রেঞ্চ স্মিথ (French Smith) ঠিক করলেন, এশিয়ার সবচেয়ে বেশি ড্রাগ তৈরি হয় যেখানে, তার কাছাকাছি যতদূর

সম্ভব যাওয়া যায় যেতে হবে, দেখতে হবে, কেমন করে এত অপর্যাপ্ত পরিমাণে আফিম এবং হেরোইন তৈরি করে তারা।

নভেম্বর মাস।

কাছে দূরে পাহাড়ের মাথায় মাথায় বরফের মুকুট। আর পাহাড়ের গায়ে গায়ে সাদা খরগোসের ছানার মত খেলা করছে মেঘের দল। স্মিথ এসে দাঁড়ালেন লাণ্ডি-কোটাল বাজারে।

কিন্তু বাজারে কি দেখেছিলেন সেই বিদেশী—সেসব পরে হবে, তার আগে লাণ্ডি-কোটালের ভৌগলিক এবং রাজনৈতিক অবস্থাটা বলা দরকার Landikotal is sunbleached gateway of Khyber pass…অর্থাৎ লাণ্ডিকোটাল হল খাইবারপাশ গিরিপথের সূর্যালোকিত গেট বা তোরণ। যার ভেতর দিয়ে আরও পশ্চিমে আফগানিস্থানের রাজধানী শহর কাবুলে চলে যাওয়া যায়। আর পূর্বে পাকিস্তানের উত্তরপশ্চিম সীমান্ত রাজ্যের ক্যাপিটাল পেশোয়ারে আসা যায়—তাই স্মিথের বিবরণে আছে—Linking KABUL in Afganisthan and with PESHWAR provincial Capital of North western province, ভৌগলিক দিক থেকে পেশোয়ার পাকিস্তানের অন্তর্গত হলেও স্থানীয় প্রশাসন যেমন তেমনি ইসলামাবাদ পাকিস্তানের কেন্দ্রীয় সরকারও তাকে শাসন করে না। লাণ্ডিকোটালের রাস্তায় বাজারে কোথাও পাকিস্তানেরপুলিশ দেখা যাবে না। কোন আদালত নেই, কোন পুলিশ স্টেশন বা থানা নেই—কোন প্রশাসনই নেই। তাহলে শাসন করে কে? কোন অন্যায় অবিচার কি দুর্নীতির শিকার হলে কি হয়, স্মিথ বলেছেন Gun rules Landikotal. আফ্রিদ, খাণ্টকে, ওয়াজির, ওরাকাজিয়া, বাঙ্গাস, তুরিজ এবং মুশাদ এই সাতটি ট্রাইব বা উপজাতি সম্প্রদায়ই আসলে লাণ্ডিকোটালের দণ্ডমুণ্ডের মালিক। এখানে বিচার মানে, কোন অন্যায়ের প্রতিকার মানেই বন্দুকের গুলি। এরা পাহাড়ের আড়াল থেকে কথায় কথায় গুলি চালায়।

লাণ্ডিকোটাল বাজারটা নোংরা, এখানে জঞ্জাল, এখানে রুটি কি বাসি খাবারের উচ্ছিষ্ট ছিটানো—এশিয়ার বিভিন্ন দেশের বাজারের যেমন হতশ্রী চেহারা হয় আরকি।

গোটা পাঁচেক মুদিখানা এবং মশলাপাতির দোকান, তার সামনের সারিতে গুটি তিনেক মিস্টির দোকান আর তারপরেই প্রায় অগুণতি দোকান আছে বন্দুক এবং কার্তুজের। সবচেয়ে বেশি জনপ্রিয় পণ্য হল—

বন্দুক।

ব্যাটারি দিয়ে চালানো কিছু ভিডিওর দোকান আর তারপরেই দেখা যাবে বর্ণাঢ্য রেশমবস্ত্রের সম্ভার—কত রকমারি গাঢ় উজ্জ্বল রঙের সমারোহ, কত নিখুঁত কারুকাজ মেয়েদের শালে, কিছুক্ষণ তাকিয়ে থাকলে চোখ ধাঁধিয়ে যায়। কিন্তু—

এই বাহ্য প্রতিটি খদ্দের জানে লাণ্ডিকোটাল বাজারের মূল পণ্য হল, আসল মাল হল শতকরা ৯০ ভাগই খাঁটি হেরোইন। স্মিথ বলেছিল বাজারের ভেতর দিয়ে যেতে যেতে আপনাকে থমকে দাঁড়িয়ে পড়তে হবে—পোশাকের প্যাকেটে

দোকানের কাউণ্টারে যেমন সেলোফোনে মোড়া ছোট ছোট ফ্রক, জামা, প্যাণ্ট থাকে—তেমনি লাল, নীল, হলুদ নানারঙের সেলোফোনে মোড়া প্যাকেটে এসব কি ?

90% pure HEROIN Cellaphone wrapped and laid out openly for inspection and purchase. যার যত খুশি দেখ, যত পার কিনে নাও—কোন বাধা নেই। পাকিস্তান, আফগানিস্থান এবং ইরান—এই তিনটি দেশ থেকে অঢেল হেরোইন আসে এই লাণ্ডিকোটালের মার্কেটে।

বাজারে ঘুর ঘুর করছে যেমন পাইকারি খদ্দের তেমনি আফগান বিদ্রোহীরা—ঘুরছে সন্ত্রাসবাদী বা টেররিস্টরা। পাইকারদের লক্ষ্য হচ্ছে চোরাই ব্যবসা বা স্মাগলিং। আর চেষ্টা হচ্ছে কোনরকমে এখানকার হেরোইন মার্কিন দেশে পাঠানো। নিউইয়র্ক, ওয়াশিংটনের বাজারে ১ কেজি হেরোইনের দাম—২০ মিলিয়ন ডলার।

হেরোইন।

লাভের কড়ি। মা লক্ষ্মীর ঝাঁপি। এই হেরোইন কাকে, কোন্ শ্রেণীকে না সাহায্য করছে। আফগান রিবেলসরা পাকিস্তানি এবং আফগানি হেরোইন বেচে আমেরিকা থেকে অস্ত্রশস্ত্র কিনছে। টেররিস্টরাও এই হেরোইন বিক্রি করেই রাইফেল কিনছে, পিস্তল কিনছে। তাদের অস্ত্রের গোপন ভাণ্ডার ভরিয়ে ফেলছে। আর—

যেখানে টাকার গন্ধ আছে, লাভের ব্যবসা আছে সেখানে আমেরিকা নাক গলাবে না—তা তো আর হয় না। তবে নাক গলায়নি করেছে এবং করছে তার চেয়েও মারাত্মক কাণ্ড—

ইরানের এবং পাকিস্তানের হেরোইনের টাকায় মার্কিন সরকার নিকারাগুয়ার বিদ্রোহী কণ্ট্রাদের অস্ত্রশস্ত্র দিয়ে সাহায্য করেছিল।

স্মিথ বলেছেন এখানকার বা লাণ্ডিকোটালের বাজারের বেশ বিপুল পরিমাণ হেরোইন ভারতে চালান যায়। পাঞ্জাবের টেররিস্টরা প্রায় প্রত্যেকেই Drug Smuggler। ড্রাগের চোরাকারবারে তাদের ইনভল্ভড হতেই হয়—উপায় কি। ড্রাগে প্রচুর টাকার খেলা। টাকা না হলে অস্ত্র কিনবে কি করে? শোনা যায় পাকিস্তানের প্রয়াত প্রেসিডেণ্ট এই সন্ত্রাসবাদীদের ভেতর থেকেই বেছে বেছে পাকা পাকা কিছু ড্রাগ স্মাগলারকে তাঁর ঘনিষ্ঠ অনুচর করেছিলেন। এবং প্রেসিডেণ্ট সাহেবের সাইড বিজনেসই ছিল ড্রাগ স্মাগলিং—। কিন্তু থাক এসব কথা—থামলেন রায়চৌধুরীসাহেব। বললেন—আমরা অর্থাৎ ক্যালকাটা পুলিশের নার্কটিকসেল কোন্ কোন্ বছরে কি কি ড্রাগ ধরেছিল লিখুন—লিখুন কোন্ কোন্ থানায় ড্রাগের আনাগোনা বেশি জোড়াসাঁকো, এণ্টালি, তালতলা, পার্কস্ট্রীট, বেনিয়াপুকুর, কড়েয়া, একবালপুর, ওয়াটগঞ্জ, গার্ডেনরীচ, কাশীপুর, চিৎপুর।

১৩½ কেজি হেরোইন, ৪৯ কেজি চরস, ১½ কেজি গাঁজা।

৪ কেজি হেরোইন, ১১½ কেজি গাঁজা, ৫০০ গ্রাম চরস, ৫০০ গ্রাম আফিম।

১৩½ কেজি হেরোইন, ২০ গ্রাম চরস, ২ কেজি গাঁজা, ৫০০গ্রাম আফিম।

২ কেজি হেরোইন।

লক্ষ্য করুন, কেমন পরিমাণ কমে যাচ্ছে—কারণ কলকাতার পাবলিক ড্রাগের কুফল সম্বন্ধে সচেতন হয়ে উঠেছে—বলতে বলতে আবেগে উদ্দীপ্ত হয়ে উঠলেন. ড্রাগের নেশা প্রতিরোধের জন্য মিছিল মিটিং আন্দোলন জোরদার হয়ে উঠেছে—

আপনি কি এসব যথেষ্ট মনে করেন ?

নট অ্যাট অল, একটু উত্তেজিত হয়ে বললেন, ড্রাগ অ্যাবিউস বা ড্রাগের কুফল বলে চিৎকার করলেই তো হবে না—অ্যাডিক্টদের বোঝাতে হবে—তাদের ভালবেসে কাছে টেনে—হঠাৎ কব্জির ঘড়ির দিকে তাকিয়েই উঠে দাঁড়ালেন এখুনি একটা প্রেস কনফারেন্স আছে—আপনি যদি বেহালার বিবেকানন্দ এডুকেশন সোসাইটিতে চলে যান—এই ওয়েলফেয়ার অর্গানিজেশানটি প্রচুর কাজ করছে—আপনার অনেক মাল-মশলা পাবেন—

সতের

নেশাখোরদের ভালবাসতে হবে ঘৃণা নয়, তাদের অবহেলা নয়। তাদের মনে আত্মবিশ্বাসের প্রদীপ জ্বালিয়ে দিতে হবে—তবেই হবে তাদের রিহাবিলিটেশান।

এবার বোধহয় বলা দরকার, এই বিবেকানন্দ এডুকেশান সোসাইটি বেহালার সমাজ-সেবী সংস্থার উৎসাহে এবং উদ্যোগ লেখা হচ্ছে—এই বই। সমস্যাটা বুঝিয়ে বললাম—সেক্রেটারিকে—

আপনারা রিহাবিলিটেশান বা নেশাখোরদের সেই অন্ধকার জগত থেকে সর্বনাশের রসাতল থেকে ফিরিয়ে নিয়ে আসার জন্য কতটুকু কি করেছেন—যদি বলেন—

আপনি আমাদের সোসাইটির সবচেয়ে এফিসিয়েণ্ট ওয়ার্কার—যিনি ফিল্ডে কাজ করেন—ভারতীর কাছে চলে যান—তিনি বোধহয় পাশের ঘরেই আছেন এখন—

আচ্ছা ম্যাডাম, কোন মিলনান্তক ঘটনা—কোন কমেডি বলতে পারবেন?

ঠিক বুঝলাম না—

ড্রাগ খেয়ে ধ্বংসের দিকে যায়। নিজের শরীর মন নষ্ট করে—এসব জানা আমাদের। কিন্তু ড্রাগ ছেড়েছে—সুখী উজ্জ্বল জীবনে ফিরে এসেছে এইরকম কেস—আপনার কত চাই?

আমার প্রশ্ন শুনে খুশি হয়েছিলেন ভারতীদেবী, তাঁর বক্তব্য এখানে সংক্ষেপে বলা হল—

একদিন আমাদের সোসাইটির নার্সিংহোমে এল এক অ্যাডিক্ট। সঙ্গে মা বাবা কি অভিভাবক কেউ নেই।

দেখুন আমি মাথা তুলতে পারছি না। উঠে দাঁড়াতে গেলেই মাথাটা রিল করছে—চোখে অন্ধকার দেখছি—

কি ড্রাগ চলছে এখন?

হেরোইন।

কত বছর ধরে খাচ্ছেন?

বছর চারেক হবে—

কেন ড্রাগ ধরেছিলেন?

সে অনেক ব্যাপার—

চিকিৎসার সুবিধের জন্য সেই অনেক ব্যাপারটাই একটু ক্রাইলি বলুন—

বলেছিল তার বিচিত্র জীবন বৃত্তান্ত—তার বয়স এখন ত্রিশ। বি. কম. পড়তে পড়তে পড়া ছেড়ে দেয়। পৈতৃক ব্যবসা দেখাশোনা করে নামমাত্র। অধিকাংশ সময়েই নেশায় বুঁদ হয়ে থাকে।

এবার ভারতী বসু সোসাইটির সাইকোলজিস্ট পেশেণ্টের কার্ডে রেকর্ড করা

রোগীর চারিত্রিক বৈশিষ্ট্যটা দেখলেন। স্বভাবগম্ভীর। নিজের ভেতরে গুটিয়ে থাকতে ভালবাসে। বাবা অসম্ভব দাম্ভিক এবং আত্মকেন্দ্রিক। মা স্বার্থপর। তাঁরা কেউ কোনদিন ডেকে কোন কথা বলেছে, তা মনে করতে পারে না—

ছেলেটি মা-বাবার নিষ্ঠুর উদাসীনতার শিকার হয়েছিল। বাড়িতে সেই শ্বাস-রোধী পরিবেশ। যখন তার ভবিষ্যৎ অনিশ্চিত অন্ধকারে আচ্ছন্ন। কিন্তু তার জীবনের নিশ্ছিদ্র অন্ধকারে রামধনুর নানারঙের ঝিলিমিলি ফুটে উঠল।

প্রেম এল তার জীবনে।

এসেছিল বছর তিনেক আগেই। কিন্তু যে মুহূর্তে বাবা জানতে পারলেন, ছেলে লুকিয়ে প্রেমট্রেম করছে, অমনি রেগে আগুন হয়ে উঠলেন। মা অন্নজল ত্যাগ করলেন। বাড়িতে গভীর শোকের ছায়া নেমে এল। পিতৃদেব ঘোষণা করে দিলেন, যদি পাশের বাড়ির কুঞ্জবাবুর মেয়েকে ঘরে তোলো তাহলে তাকে ত্যজ্যপুত্র করবেন। তাকে স্থাবর-অস্থাবর সম্পত্তি থেকে বঞ্চিত করবেন। তবুও—

তারা লুকিয়ে চুরিয়ে দেখা করত। তখুনি সে ড্রাগ ধরেছিল। বাড়ির পরিবেশকে এবং মা-বাবার নিষ্ঠুর অমানবিক ব্যবহারকে ভুলে থাকার জন্যই হেরোইন খেতে শুরু করেছিল।

মঞ্জু নিষেধ করত। তার হাতে হাত রেখে বলত—নিজের জীবনটাকে নষ্ট করে দিও না—বলতে বলতে তার চোখদুটো ফেটে জল এসে পড়ল। যখন এই অবস্থা চলেছে তখন হঠাৎ স্ট্রোকে—ফার্স্ট অ্যাটাকেই বাবা মারা গেলেন।

খিদিরপুরে কাপড়ের দোকানের এবং সংসারের দায়দায়িত্ব এসে পড়ল তার কাঁধে। মা-ও পিছনে লাগলেন। দোকানের ঝক্কি সামলে খেটেখুটে ফিরে এলেই বলতেন—ডেলি বিক্রির হিসেবটা দে—

রোজ রোজ হিসেব দেওয়া আমার পক্ষে অসম্ভব—

কিন্তু তুমি দিতে বাধ্য—

সেই নিয়ে শুরু হল বচসা। তার সঙ্গে কান্নাকাটি, চিৎকার, চেঁচামেচি শুরু হয়ে গেল। কিন্তু এখন থাক সেসব প্রসঙ্গ—

ইতিমধ্যে একটা কাণ্ড ঘটে গেল। রাত প্রায় আটটা বাজে। আমাদের সোসাইটির অফিস বন্ধ করতে যাচ্ছি। শীতের রাত। রাস্তা জনমানবহীন। এমন সময় নজরে পড়ল আপাদমস্তক কালো চাদর মুড়ি দিয়ে দাঁড়িয়ে আছে একটি মেয়ে—

কি চাই ?

আপনার সঙ্গে একটা কথা ছিল—আপনাদের এখানে ট্রিটমেন্ট করাতে আসে যে ছেলেটি (অ্যাডিক্টের নামটা বলল) আমি তার বাগদত্তা—একটু থেমে বলল আবার, আপনাদের কথায় ড্রাগ বন্ধ করে দিয়েছিল। কিন্তু এখন ভয়ঙ্কর অস্থির হয়ে উঠেছে —একটু হেরোইনের জন্য আমার পা ধরছে—

আপনি যেখানে থাকেন সেখান থেকে তার বাড়ি কতদূর ?

পাশেই—একটা মাত্র কমন দেওয়াল। ওদের বাড়ির সব কথা শোনা যায়—

মেয়েটিকে কিছুক্ষণ স্টাডি করলাম। অত্যন্ত ধারাল মুখশ্রী। বড় আর কালো দুটো ডাগর চোখে বুদ্ধির ছাপ। ব্যক্তিত্বের আভাস পাওয়া যায় তার খাড়া নাকে। নিটোল চিবুকে।

আমার মনে হল পারবে—ও পারবে। নিশ্চয়ই তাকে ফেরাতে পারবে। একটা অত্যন্ত বিপজ্জনক বুদ্ধি ও পরামর্শ দিলাম। দিতেই হল। আর তাছাড়া কোন উপায়ও তো ছিল না। বেশ মনে আছে—সে চলে যাওয়ার সময় শুধু বলেছিলাম মনে রেখ ভাই, আমি যা বললাম। ঠিক তেমনি করে করতে পারলে মেডিসিনের চেয়ে অনেক বেশি এফেক্টিভ হবে—

প্রায় একমাস কেটে গেল সোসাইটির অফিসে কেউ এল না। না ছেলেটি না মেয়েটি। দিল না কোন খবরও। দুশ্চিন্তার জ্বরে আমি পুড়ে পুড়ে খাক হয়ে যাচ্ছি—যদি ধরা পড়ে যায়। তাহলে যে মঞ্জুর কী সাংঘাতিক হেনস্তা হবে। হয়ত তাই হয়েছে। হয়ত মঞ্জুর মা-ও জানতে পেরেছেন ব্যাপারটা—যখন আকাশ পাতাল ভাবছি আর দিনগুলো যেন পায়ে ভারি পাথর বেঁধে গুটি গুটি কাটছে এমন সময়ে একদিন সকালে সোসাইটির দরজা খুলতেই চমকে উঠলাম—

এ কী তোমরা?

মঞ্জুর সেইরুক্ষ সাদা সিঁথি সিন্দুরে রক্তিম হয়ে উঠেছে। দুজনেই আমাকে প্রণাম করল। ছেলেটির মুখে আত্মপ্রসাদের হাসি ঝিকমিক করছে। মেয়েটিকে মনে হল, কিসের যেন তীব্র খুশির আভাসে কেমন আবিষ্ট হয়ে যাচ্ছে।

ছেলেটি ড্রাগ ছোঁয় না। বিয়ে করে ঘরসংসার করছে।

কী পরামর্শ দিয়েছিলেন?

ড্রাগ খেয়েছে বলেই তাকে বকবে না। কটু কথা বলবে না। কখনো অবহেলা কি নিন্দা বা ঘৃণা করবে না। তুমি মেয়ে। মায়ের জাত। তোমারই দেহের রক্ত মাংস মজ্জার রসে একটু একটু করে পুষ্ট হয়ে ওঠে তোমাদেরই গর্ভে আর একটা প্রাণ। তুমি ওকে ভালবেসে তোমার কাছে টেনে নেবে। বলবে—কিসের দুঃখে, কোন্ আক্ষেপে সে এসব ছাইভস্ম খায়—কোন্ ব্যথা বেদনা ভুলতে চায় সে।

যদি সম্ভব হয় রাত্রে ওর ঘরে যাবে। তোমাকে একটু বেশি রিস্ক নিতে হবে। ভুলো না—তুমি বেহুলা এবং সাবিত্রীর সমগোত্রীয়। ওঁরা যদি মৃতস্বামীকে ফিরিয়ে আনার জন্য অসাধ্য সাধন করতে পারেন—তুমি—তুমি একটা জ্যান্ত তরতাজা যুবককে ফেরাতে পারবে না কেন—দোষের ভেতরে একটু হেরোইন খায়—

মঞ্জু বার তিনেক রাত্রে ছেলেটির ঘরে গিয়েছিল। তার বিছানায় তার পাশে বসে তার চুলে নরম আঙুল দিয়ে বিলি কাটতে কাটতে মধুর কোন গানের সুরের মত স্নিগ্ধ কণ্ঠে বলত—আমি তোমার পাশে আছি—তোমার ভয় কি—তোমার সব দুঃখ, সব দুঃশ্চিন্তা, সব ব্যথা, তোমার সব দায়দায়িত্ব তুমি আমাকে দাও—

ছেলেটি একটা অসহায় শিশুর মতই মঞ্জুর কোলে মাথা রেখে ঘুমিয়ে পড়ত।

থেমে গেলেন ভারতীদেবী। আবার একটা দীর্ঘশ্বাস ফেলে বললেন সোসাইটির বহুদর্শী বর্ষীয়ান সমাজসেবিকা—আমি অনেক—অনেক ভেবেছি—অনেক দেখেছি বুঝলেন—রিঅ্যাডিক্ট বা রিহ্যাবিলিটেশানের গোড়ার কথাই হল—

লাভ। প্রেম। ভালবাসা।

আরো একটি ঘটনা—আরো একটি কেস ভারতীদেবী আমাকে বলেননি, শুধু আভাসে ইঙ্গিতে বুঝিয়ে দিয়েছিলেন—এসব থিয়োরিটিকাল গল্প শুনে কী হবে—আপনি আগামী শুক্রবার ঠিক বিকেল চারটায় সোসাইটির অফিসে আসবেন—একটা প্র্যাকটিকাল কেস নিজের চোখে দেখবেন—

শুক্রবারে কী ?

সোসাইটির রিঅ্যাডিক্ট সেণ্টার এবং নার্সিংহোমের দ্বিতীয় প্রতিষ্ঠা বার্ষিকী দিবস—

সোসাইটির হলঘরে মিটিং বসেছে। বেহালার জ্ঞানীগুণী বুদ্ধিজীবীরা অনেকেই উপস্থিত ছিলেন। মঞ্চে বিশিষ্ট জ্ঞানীগুণী অভ্যাগতদের পিছনে শোভা পাচ্ছে লালসালুতে সাদা রঙে লেখা—ড্রাগের নেশা—

সর্বনাশা !

আমার নজরে পড়ল। পড়ে গেল। আপনি থাকলে আপনারও চোখে পড়ত একটি বছর আঠারো-উনিশের ছেলে শোলা কেটে কেটে নিপুন ছন্দে ফুল তৈরি করছে। করছে লতাপাতার ঝালর। আবার কখনো কোন শোলা দিয়ে বানাচ্ছে হাতি কি ঘোড়া—শুধু যে দক্ষ শিল্পীর মত শুধু সৃষ্টিই করে চলেছে তা নয়। যা তৈরি করছে সেসব মঞ্চে সুন্দর করে সাজিয়ে দিচ্ছে একাই। আর সেই মঞ্চসজ্জার ভেতরে পরিস্ফুট হয়ে উঠছে তার নিখুঁত ও পরিচ্ছন্ন শিল্পদৃষ্টি। মঞ্চের দিকে হঠাৎ তাকালে মনে হয়—যেন স্বর্গের নন্দনকাননই যেন কোন্ যাদুমন্ত্রে নেমে এসেছে মঞ্চে।

মিটিং শুরু হল।

কয়েকজনের বক্তৃতার পরেই সোসাইটির সেক্রেটারি চন্দনগোপাল চন্দ্র মঞ্চে এলেন। মৃদুকণ্ঠে ডাকলেন—ধীরাজ—তুমি মঞ্চে এস—

সেই শোলাশিল্পী মুহূর্তে কেমন লজ্জায় সংকোচে যেন মাটির সঙ্গে মিশে যেতে চাইল।

না—না ধীরু ভয় পেও না—লজ্জাও কর না—মিষ্টি কিন্তু তীব্রকণ্ঠে বলে উঠলেন চন্দ্রসাহেব—ডোণ্ট মেক ডিলে—প্লীজ ডোণ্ট ফরগেট ইউ আর অ্যান আর্টিস্ট—অ্যাণ্ড ইউ আর দি ডেকরেটার অফ দিস স্টেজ টুডে—

এবার কাজ হল।

ধীরাজ এবার তার চওড়া বুকটা টান করে ফুলিয়ে গট গট লম্বা লম্বা পা ফেলে হেঁটে মঞ্চে এসে দাঁড়াল। চন্দনবাবু পরমস্নেহে তার পিঠে হাত রেখে হেঁকে বললেন অডিয়েন্সকে—

ধীরাজ দাস। আমাদের নার্সিংহোমের পয়লা পেশেণ্ট। ক্যানাবিশ খেয়ে খেয়ে

মরতে বসেছিল—একটু থেমে আবার সঙ্কুচিত হয়ে বলল, আমাদের এখানে ট্রিট-মেন্টের জন্য নিয়ে এসেছিলেন এক মহিলা—থেমে গেলেন চন্দ্রসাহেব। বোধহয় চেঁচিয়ে চেঁচিয়ে নিজেদের কৃতিত্ব জাহির করতে লজ্জা পেলেন।

সংক্ষেপে ধীরাজের জীবনের রূপরেখা হল—বাবা লেদের কারখানায় কাজ করে। মা নিজের নয়—দ্বিতীয়পক্ষ। ধীরাজের মা মারা গেছেন প্রায় বছর সাতেক আগে। ছয়টা মাস যেতে না যেতে আর একটা বসন্তকাল গাছে গাছে নতুন কচিপাতা আর নানা রঙের ফুলের সমারোহ নিয়ে আসতে না আসতেই আর একটি মেয়ের মাথায় সিঁদুর চড়িয়ে নিয়ে এসে ঘরে তুলল তার বাবা।

এই মহিলাটির যদি একেবারে মিনিমাম উদারতা এবং অ্যাফেকশানও থাকত মা-মরা বারো বছরের ছেলেটির ওপরে তাহলে ধীরাজকে গাঁজা খেতে হত না। ড্রাগ ধরতে হত না।

কথায় কথায় স্বামীর কাছে ধীরুর নামে নালিশ—ঝুড়ি ঝুড়ি মিথ্যে কথা। দ্বিতীয়-পক্ষের ওপরে একটু বেশি টান ভালবাসার কথা কারো অজানা নয়। নতুন মার কথা শেষ হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে শুরু হয়ে যেত কিল চড় ঘুসির বৃষ্টি।

ধীরাজ চলে এল। আসতে হল তাদের পাড়ার রক্ষাকালীর মণ্ডপে। মন্দিরের পিছনে একটা পাকুড়গাছের চারিদিকে শান বাঁধান জায়গায় বসে তার বন্ধুদের গাঁজার আসর। বন্ধুরা বৃত্তান্ত শুনেই হো হো করে হেসে তার ভয়-ভাবনা সব—সব উড়িয়ে দিয়ে হাতে ধরিয়ে দিল গাঁজার কলকে।

ওরে ধীরু—একবার ব্যোম বলে টানদে দেখি তো বাবা—এক ছোকরা মাতব্বর নেশাড়ু ধীরাজের কানের কাছে মুখ নিয়ে এসে ফিস ফিস করে বলল—তুই—তুই সব ভুলে যাবি রে—

ধীরাজ হ্যাসিস ধরল।

প্রথম প্রথম সকালে একবার সন্ধ্যায় একবার—মাত্র দুটো ডোজ নিত। তাতে নেশা ধরত, কিন্তু চট করে তার এফেক্টটা চলেও যেত। কিন্তু ধীরাজ একবার কখনো তিনবার এবং শেষের দিকে চারবেলায় চারটি ডোজ খেয়ে একেবারে সর্বনাশের রসাতলে অত্যন্ত দ্রুতবেগে নামতে লাগল। কুফলগুলো দেখা দিতে লাগল—সময় সময় প্রচণ্ড পেট ব্যথা করে। বমি হয়। রক্ত আমাশা হয়। তার দিকে ঘুরেও কেউ তাকায় না। বাবা কারখানা থেকে ফেরার পথে মদ গিলে এসে রাত আটটা বাজতে না বাজতে বৌ নিয়ে বিছানায় ওঠে।

ধীরাজ ফেরে গভীর রাতে।

বাপের বন্ধ ঘরের দিকে তাকিয়ে আনন্দে স্ফূর্তিতে ডিগবাজী খেতে ইচ্ছে হয়। আবার কখনো নিজেকে সারা বিশ্বব্রহ্মাণ্ডের রাজা বলে মনে হয়—

ইতিমধ্যে আর এক কাণ্ড ঘটল। পাড়ার এক কাউন্সিলার—করপোরেশনের—বোধহয় মাথায় একটু আধটু আদর্শের পোকা ঢোকা ছিল। তিনি কালীমণ্ডপের গাঁজার ঠেকের পিছনে আদাজল খেয়ে লাগলেন। যারা যারা নেশা করে, তাদের বাবা-

মাকে জানালেন—পুলিশেও ডায়েরি করলেন। বুকে চাপড় মেরে রাস্তার মোড়ে দাঁড়িয়ে সদম্ভ ঘোষণা করলেন—তিনি পাড়া থেকে এই ঠেক তুলে ছাড়বেন—গেঁজেলদের গারদে পুরবেন—তা নাহলে তাঁর নাম নরেশ পাইনই নয়—

লেদমেশিনের হারানমিস্ত্রি সেই প্রথম জানল ছেলে গাঁজা টানে। ঘরের চালে ঝুলিয়ে তাকে পেটাতে শুরু করল। পাড়ার লোক এসে ঠেকাল। পরদিন পুলিশের ভ্যান এসে অ্যান্টিসোশাল এলিমেণ্ট বলে আড্ডার সবকটাকে নিয়ে হাজতে ভরল—এই পর্যন্ত বলে থেমে গিয়েছিলেন বিবেকানন্দ এডুকেশান সোসাইটির সেক্রেটারি কাম ডিরেক্টর চন্দনগোপাল চন্দ্র। তারপরে বেশ উদাত্তকণ্ঠে বলেছিলেন—নেশাখোরদের রিহাবিলিটেশান বিশেষজ্ঞরা, গবেষকরা বার বার সতর্ক করে বলেছেন—For obvious reasons the Society does not take kindly to an addict.

ধীরাজের জনক যেমন, তেমনি লোকাল কমিশনার একবারও ভাবলেন না কেন ছেলেগুলো গাঁজা খাচ্ছে—কি চায় তারা! কেউ এতটুকু সহানুভূতি দেখাল না।

জেল থেকে ফিরে এল ধীরাজ আরো বড় গেঁজেল হয়ে। জেলে গোপনে গাঁজা হেরোইনের পুরিয়া সাপ্লাই হয় আজ আর অজানা নেই। ধীরাজ যখন খুব অসুস্থ, মরণাপন্ন—তখন যে মহিলাটি নার্সিংহোমে নিয়ে এসেছিলেন তিনি হারানের পুরানো প্রেয়সী। তার বিলাসের সুখসহচরী। তিনি গণিকা। হোক তার ঘরে নিত্য রাত্রে বারোবাসরের লীলা। হৃদয়ের ঐশ্বর্যে, মহত্বে তিনি দেবী। তিনি তার প্রণয়ী হারানের ছেলের সেই শোচনীয় পরিণতি জেনে ছুটে তাকে নিয়ে এসেছিলেন আমাদের নার্সিংহোমে।

আমাদের সাইকোলজিস্ট তাকে জেরা করে করে ফ্যামিলি হিস্ট্রি জেনে নিলেন খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে। তাকালেন নেশাখোর ধীরাজের দিকে।

একমাথা ঘন কোঁকড়ানো কালো চুল। টানা টানা দুটো বড় বড় চোখে কেমন নিষ্পাপ দৃষ্টি। নাক, মুখ, চিবুক যেন কোন ভাস্কর্যের নিপুণ হাতে বাটালি দিয়ে কেটে কেটে গড়া পাথরের দেবমূর্তি—সাইকোলজিস্ট মহিলার বুকের ভেতরটা হু হু করে ওঠে। তার মাথায় পরমস্নেহে হাত রেখে বললেন, আচ্ছা ধীরু আমি তো তোমার দিদি—আমি তোমাকে যা যা জিজ্ঞেস করব বলবে তো?

বেশ মনে আছে তাঁর, ধীরাজ কেমন ভয় পাওয়া বড় বড় চোখে তার দিকে তাকিয়েছিল—এত মিষ্টি, এত নরম, এত মধুর স্নিগ্ধকণ্ঠে তার সঙ্গে কেউ কখনো কথা বলেছে বলে তো তার মনে পড়ছে না। আবার নতুন কোন ফ্যাসাদে ফেলবে না তো দিদি—

তুমি যখন পড়তে তখন স্কুল থেকে এসে কি করতে?

বন্ধুদের সঙ্গে মাঠে খেলতে যেতাম—

তারপরে বাড়িতে ফিরে এসে কি করতে?

কখনো মাটি দিয়ে মূর্তি তৈরি করতাম—কখনো বা লাল নীল কাগজ কেটে কেটে ফুলের—পুষ্পহার—

সত্যি—সত্যি বলছ—ধীরাজ। আনন্দে উত্তেজনায় প্রদীপের মত জ্বলে উঠলেন মনস্তত্ত্ববিদ। বললেন তোমাকে যদি কাগজ কাঁচি সব দিই তুমি আমাদের নার্সিংহোমে বসে মালা তৈরি করে দেবে?

নিশ্চয়ই, কেন দেব না দিদি? তবে দিদি কাগজ নয় আমাকে শোলা কিনে দিন দেখবেন কত সুন্দর সুন্দর ফুল—এই পর্যন্ত বলে থেমে গিয়েছিলেন চন্দনগোপালবাবু। সাফল্যের আলোয় ঝকঝক করছিল তার মুখখানা।

আমরা কোন সায়কিয়াটিস্টকে একদিনের জন্যও ধীরাজকে দেখাইনি—দেখতে হয়নি। কোন মেডিসিন দেইনি—শুধু ওর propensity দেখে—ওর ভেতরের potentialities-গুলোকে একটু উসকে দিয়েছিলাম মাত্র—আর কোনদিন ড্রাগ স্পর্শ—

হাততালির প্রচণ্ড শব্দে ডুবে গেল চন্দ্রের কণ্ঠস্বর।

আমার কানে বাজতে লাগল বিশিষ্ট মানবতাবাদী এবং মাদকসেবীদের পুনর্বাসন (Rehabilitations) বিশেষজ্ঞ প্রফেসার লাঙ্গের (Pro. Lang)-এর কথাগুলো—Known number of addicts weaned for correct handling—In this I include not only good Psychiatric attention but also love and patience of the parents and other near and dear ones—অর্থাৎ ঠিক মত সহানুভূতির সঙ্গে ভালবেসে স্নেহ মমতা দিয়ে তাদের সঙ্গে ব্যবহার করে বহু অ্যাডিক্টকে সুস্থ জীবনে ফিরিয়ে নিয়ে আসা সম্ভব হয়েছে। তারা ড্রাগের নেশা ছেড়েছে। দরকার মা-বাবা এবং তাদের প্রিয়জনদের ধৈর্য এবং স্নেহপ্রীতি। আরও বলেছেন অনেকে যুক্তি দিয়ে বলতে পারেন বদখেয়ালে নেশাভাঙ করেছে তাদের সঙ্গে আবার সদয় ব্যবহার করা কেন? বরং এমন নিষ্ঠুর নির্দয় ব্যবহার করা উচিত যা সে সারা জীবনে ভুলতে পারবে না। তারা তো ঘৃণার পাত্র—কিন্তু এই মানসিকতা কখনো নেশাখোরকে সুস্থ করে তুলতে তো পারবেই না বরং ধাক্কা দিয়ে অবক্ষয়ের অতল অন্ধকারে খাদে ফেলে দেবে—সে হারিয়ে যাবে চিরকালের মত—Pushes him to deeper abyss and he is gone for ever···সবশেষে তিনি বলেছিলেন—Remember the responsibility must lie primarily with the parents....

ড্রাগের সবচেয়ে বড় কুফল কি জানেন? ভারতীদেবী উদ্দীপ্ত কণ্ঠে বলেছিলেন মাদকসেবীর আত্মবিশ্বাস একেবারে নির্মূল করে দেয়—আবার একটু থেমে আস্তে আস্তে বলেছিলেন কেসহিস্ট্রির ভেতরে ডুব দিয়ে মুক্ত খোঁজার মত করে তন্ন তন্ন করে খুঁজতে হয়। এমন কোন সূত্র—এমন কোন আশার আলো আছে কিনা—যা দিয়ে তার ভেতরের ডরম্যান্ট সেলফ কনফিডেন্সকে জ্বালিয়ে দেওয়া যায়—এখানে যেমন ধীরাজের ভেতরে শিল্পীসত্তা ছিল বলে আমার সুবিধে হল—

আরো একজন। তাঁর আরও একটা সাকসেসের কথা তিনি বলেছিলেন। বয়স ২৫/২৬ হবে।

স্মার্ট চেহারা। ব্যাকব্রাশ করা ঘন কালো চুল। পরণে পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন ট্রাউজার

আবির রঙের লাল টকটকে বুশসার্ট। সে এসেই কোন ভূমিকা না করে সোজা ভারতীর টেবিলে চাপড় মেরে বলেছিল—দিদি আমি হেরোইন খাই—চেষ্টা করছি কিন্তু কিছুতেই ছাড়তে পারছি না—কিন্তু—

কিন্তু কী—বল—বলে ফেল—সব খুলে বল—

I feel I have some qualifications which I am sure you will acknowledge and if I get a chance I will shine—

বাঃ কী তোমার কোয়ালিফিকেশান ভাই?

আমি গান করতে পারি—আমি গানে ডুবে থাকতে চাই। কিন্তু বাড়িতে কেউ গানবাজনা পছন্দ করে না। বাবা মনে করেন—

শোন ভাই—সুজয় গান, লেখা—এসব মঙ্গলময় ঈশ্বরের আশীর্বাদ ছাড়া হয় না—এসব সুকুমার শিল্প—fine arts. একটু থেমে আবার ভারতী বলেছিলেন রোজগারপাতি হয় না বলে তোমাকে কেউ ব্যাক করবে না—

তাই তো দেখছি দিদি—কী করি বলুন তো—আমি গান করতে পারব না? তার কথাগুলো কেমন কাতর কান্নার মত শোনাল।

পারবে ভাই, নিশ্চয়ই পারবে স্নিগ্ধ মৃদুকণ্ঠে বললেন মনস্তাত্ত্বিক—কিন্তু তুমি যে সুইসাইড করছ ভাই—গান করতে দিচ্ছে না—তুমি গান করতে পারছ না বলেই তুমি বিষ খাবে?

কি করব?

সব—সব বলে দেব। কিন্তু তুমি তার আগে প্রমিজ কর—তুমি হেরোইন ছেড়ে দেবে—

কোন কথা বলল না। বলতে পারল না বি-এ অনার্সের ছাত্র সুজয় চক্রবর্তী।

মনে হল, কি যেন চিন্তা করছে—

আমি তোমার গানের ব্যবস্থা করে দেব—

দেবেন—পারবেন দিদি—পারবেন? আনন্দে তীব্র উত্তেজনায় কাঁপতে লাগল।

সুজয়ের কেসহিস্ট্রি অত্যন্ত গতানুগতিক। সাদামাটা। বাবা কি একটা এয়ারওয়েজ কোম্পানির অ্যাডমিনিস্ট্রেটের বড় চাকরি করে। তার ভ্যানিটির মেকআপই তাঁর মুখে এঁটে থাকে। মা রুগ্ন। ব্যক্তিত্বহীন। নরম মনের মানুষ। তিনি তাঁর ঘরের কোণে পড়ে থাকেন—থাকতে হয় একটা পুরনো বাতিল আসবাবের মত। দাপট, হাঁকডাক, তর্জন গর্জনটা বাবারই একচেটিয়া—

এসব বদখেয়াল ছেড়ে পড়াশুনা কর—বাবাকে কেমন হিংস্র মনে হয় সুজয়ের।

কাকে বদখেয়াল বলছ?

ওই তোমার গানবাজনা—

গান কখনো বদখেয়াল কি খারাপ জিনিস হতে পারে না বাবা—সুজয়ও কেমন মরিয়া হয়ে উঠেছিল। ক'কিয়ে চিৎকার করে বলেছিল—তোমার কথা আমি মানি না—

কী যত বড় মুখ নয় তত বড় কথা—সুরেশবাবুর ভ্যানিটিতে ধাক্কা খেল। রেগে দিশ্বিদিক জ্ঞান হারিয়ে ফেললেন। উনিশ বছরের জওয়ান ছেলেকে বসার ঘরে বন্ধ করে ওয়াকিং স্টিক দিয়ে পেটাতে শুরু করলেন—হয়ত মরেই যেত। সুজয়ের চিৎকার, কান্নাকাটি, ধপাধপ লাঠির আওয়াজ শুনে পাশের বাড়ির মণ্টুকাকু এসে বাবার খপ্পর থেকে যদি তাকে ছিনিয়ে না নিত—

মণ্টু ঘোষাল।

সোশাল ওয়ার্কার। তাগড়া জওয়ান চেহারা। লোকে আড়ালে আড়ালে বলে 'মস্তান'। কিন্তু মস্তানি মণ্টু কখনো করে না। কিন্তু কোন বেচাল কি অন্যায় সহ্য করতে পারে না।

হোয়াই—হোয়াই হ্যাভ ইউ কাম হিয়ার—অ্যাডমিনিস্ট্রেটরের কায়দায় কিছু বলতে যেতেই—

সাট আপ—আপনার ছেলে বলেই—ইউ ক্যান নট মার্ডার হিম—এমন গর্জন করে উঠল মণ্টু। ভয় পেয়ে গেল এয়ারওয়েজ কোম্পানির দুঁদে প্রশাসক।

সেদিন থেকেই সুজয় আরও বেশি করে হেরোইন খেতে শুরু করল। ডোজ বাড়ল। ফিক্সের নম্বরও বাড়ল। দিনে দুইবারের জায়গায় চারবার নিতে শুরু করল। কিন্তু মাঝে মাঝেই নেশার ঘোরে আচ্ছন্ন চেতনার ভেতর থেকে হঠাৎ একবার জ্বলে ওঠে দপ করে একটা আলো—সেই আলো নাড়িয়ে নাড়িয়ে কে যেন তাকে বলে—তুমি শিল্পী হবে—মস্ত নায়ক হবে—তুমি আত্মঘাতি হচ্ছ কেন? এ তুমি কী—কী করছ—ছিঃ ছিঃ—সেই ধিক্কারের কথাগুলো যেন ঘরের দেওয়ালে দেওয়ালে ঠোক্কর খেয়ে খেয়ে তার কানের কাছে ঝনঝন করে বাজতে থাকত। কিন্তু নেশার দমকের ঢেউ এসে সেসব কোথায় তলিয়ে নিয়ে যেত—

তারপরের ঘটনা খুব সংক্ষিপ্ত। ভারতী সোসাইটির প্রতিনিধি হিসেবে সুরেশ-বাবুর কাছে গিয়েছিলেন। সমস্যাটা বুঝিয়ে বলেছিলেন। বলেছিলেন সুজয় তো পড়বে বলেছে—কিন্তু গানবাজনা করতে দিতে হবে এক আধটু—

প্রচণ্ড দাম্ভিক মানুষ। সহজে কি কনভিনসড হয়। রাগ রাগ গলায় বললেন, আপনি কী ওর গান শুনেছিলেন—কী গান গায়?

আপনি বাবা—আপনি শোনেননি?

আমার সময় কোথায়—ওসব ফালতু—

ফালতু—ফালতু নয় মিঃ চক্রবর্তী কঠোর গলায় ভারতীদেবী বলেছিলেন—আপনার ছেলে রবীন্দ্রনাথের ব্রহ্মসঙ্গীত গায়। ওর গানের গলা খুব মিষ্টি—একটু থেমে আবার ব্যাকুলকণ্ঠে বলেছিলেন—আপনি ওকে একটু সুযোগ সুবিধে করে দিলে—সুজয় বড় শিল্পী হবে—

সুরেশবাবুর মন নরম হয়েছিল।

এখন সুজয় বেতারশিল্পী।

সোসাইটির মনস্তত্ত্ববিদ ভারতীদেবীর কাছে সুজয়ের বৃত্তান্ত শুনতে শুনতে আমার মনের ভেতরে এসে দাঁড়িয়ে পড়ল সুজয়েরই সমবয়সী আর এক হতভাগা নেশাখোর—

বেনারসের দীনেশ যাজ্ঞি। সুজয়ের কোয়ালিফিকেশান অর্থাৎ গানের গলা ছিল। রবীন্দ্রসঙ্গীত বুঝত। বুঝত রবীন্দ্রনাথকেও। একদিন না কি কথায় কথায় ভারতীদেবীকে সুজয় বলেও ছিল, জানেন দিদি যখুনি হেরোইনের জন্য মনটা আনচান করে তখন কি করি জানেন?

কি?

মৃদুকণ্ঠে গেয়ে শুনিয়েছিল—

চিরবন্ধু, চিরশান্তি, চিরনির্ভর

তুমি হে প্রভু—

তুমি চিরমঙ্গল সখা হে—

আমার নির্ভর করার জন্য একজন আছেন। আমার মাথার ওপরে একজন আছেন যিনি আমার বন্ধু—যিনি আমার চিরকালের শান্তি—জানেন দিদি গানের এই কথাগুলো ভাবতে ভাবতেই নেশার সেই দুষ্টু—সেই খতরনক দৈত্যটা ঘাড় থেকে নেমে যায়—

রবীন্দ্রনাথের ব্রহ্মসঙ্গীতের কথাগুলো একটু তলিয়ে বুঝে পড়লে শুধু নেশা কেন—আরো অনেক দুঃখ যন্ত্রণা থেকে রেহাই পাওয়া যায়—ভারতীদেবী এই কথাগুলোই বলেছিলেন—

নিঃসন্দেহে এসবই সুজয়ের কোয়ালিফিকেশান—তার মূলধন। তার মূলধনের জোর ছিল বলেই পায়ের নিচে শক্ত জমি ছিল। তাই মাথা তুলে দাঁড়াতে পেরেছিল—বেঁচে গিয়েছিল—

দীনেশ বুদ্ধিমান। স্মার্ট। কিন্তু সুজয়ের মত কোন কোয়ালিফিকেশানের জোর তার ছিল না। ছিল না ভারতীদেবীর মত কোন গাইড। তাই তার নিজের অভিশপ্ত জীবনের স্মৃতি কথায় একেবারে শেষ পাতায় লিখেছিল—

আমি আর ড্রাগ ছাড়তে পারলাম না। বাবা মা ভালবাসেন ঠিকই। বাসতে হয় তাই বাসেন—যেন রুটিন ওয়ার্ক। কোন সিমপ্যাথি নেই—কোন দরদ নেই। আর তাদের সঙ্গে আমার কোন আন্ডারস্ট্যান্ডিং ছিল না বলেই কোনদিনই বাবাকে ফ্রাঙ্কলি বলিনি—বলতে পারিনি। বললে ডেফিনেটলি অত্যন্ত উণ্ডেড হতেন—দুঃখ পেতেন, আঘাত পেতেন। কিন্তু কিছুতেই সহজভাবে নিতেন না—নিতে পারতেন না—

শুধু বাবা কেন এমন কাউকে কখনো দেখিনি যিনি বিশ্বাস করেন মানুষ পেট থেকে পড়েই ড্রাগ খায় না। কেউ চায় না নেশা করে বা ড্রাগ খেয়ে তিলে তিলে কবরের দিকে যেতে। মানুষ নানা পারিপার্শ্বিক অবস্থার চাপে পড়ে বা Circumstances-এর প্রেশারে এই বিষগুলো খেতে বাধ্য হয়। তাই—

অ্যাডিক্টের সঙ্গে কোন রূঢ় কোন অন্যায় ব্যবহার করা উচিত নয় কখনো। তাকে

ভালবেসে কাছে টেনে নিয়ে জানতে হবে—ঠিক কোন্ ব্যথাটা, কোন্ অসুবিধাটা তাকে পুস করে এই সর্বনাশের জগতে নামিয়েছিল।

আরও একটা চিন্তার কারণ আছে দীনেশ লিখেছিল—যাঁরা অ্যাডিক্টদের নেশা ছাড়াতে চান, যাঁরা তাদের সুস্থ ও স্বাভাবিক জীবনের অবারিত আলোর রাজ্যে ফিরিয়ে আনতে চান তাঁরা অবশ্যই মনে রাখবেন, গত ২০/৩০ বছরে বিজ্ঞান ও প্রযুক্তিবিদ্যার (Technology) বিস্ময়কর বিপুল উন্নতি হয়েছে—এখনকার ১৮/১৯ বছরের ছেলেমেয়েরা কিন্তু তিন কি চার দশক আগের ছেলেমেয়েদের চেয়ে ঢের বেশি বোঝে—অনেক—অনেক বেশি তাদের perception এবং অনেক—অনেক বেশি চালাক (clever)। অতএব তাদের সঙ্গে খুব সতর্ক হয়ে ব্যবহার করতে হবে। ঠিক কাঁচের জিনিসের পেটির বা বাক্সের ওপরে—যেমন রক্তের অক্ষরে বড় বড় করে লেখা থাকে—Please handle with Care।

কোন Redeeming feature না থাকলে কিন্তু কিছুই করতে পারিনি—আবার বুকভাঙ্গা একটা দীর্ঘশ্বাস ফেলে খুব অস্পষ্ট আর কেমন ঝাপসা গলায় বললেন, ভারতীদেবী যেমন পারিনি নয়ান মেমসাহেবের কেসে, পারিনি আরও বহু বহু—

নয়ান মেমসাহেব।

কোন কথা বললেন না ভারতী। বলতে পারলেন না মনে হয় 'নয়ান মেমসাহেব' নামে কোন রমণীর জীবনের কোন গভীর ট্র্যাজেডিই তাকে স্তব্ধ করে দিয়েছে। অবরুদ্ধ একটা ব্যথার উজান ঠেলে মৃদুকণ্ঠে বললেন, হ্যাঁ—ভাই নয়ান মেমসাহেব। এই নামেই বৌবাজার—ইডেন হসপিটাল রোডের গোটা মহল্লায় তাকে সকলে এই নামেই ডাকত—তবে—আবার তীব্র যন্ত্রণা ভেতরে ভেতরে সহ্য করতে করতে বলছিলেন যদিও—বলেছিলেন কিন্তু বেশ—কিন্তু আবার থেমে গেলেন—মাথা নিচু করে নিজের ভেতরে ডুব দিয়ে টেবিলের ওপরে আঙুল দিয়ে কি সব আঁকিবুকি করছিলেন—

আজ না হয় থাক ম্যাডাম। পরে আবার কোন মিটিং-এ—

আরে না—না। একটু স্থির হয়ে বসুন তো। এবার ষাটের কোঠা পাড়ি দিয়ে আসা প্রৌঢ়া মহিলাটি হেডমিসট্রেস বা বড় দিদিমণিসুলভ কঠোর গাম্ভীর্যে বললেন—ছটফট করলে এসব বলা যায় না—আজ মুড আছে—হাতে কাজও কম। পরে—

আচ্ছা ম্যাডাম—এই বসছি। আপনি না বললে নড়ব না—

আমাকে—একটু গুছিয়ে নিতে দিন ভাই—কথা বলবেন না। আমি—আমি খেই হারিয়ে ফেলব। কেমন করুণ আর কাতর কান্নার মত শোনাল ভারতীদেবীর কথাগুলো।

খুব—খুব ফাস্ট লাইফ নয়ান মেমসাহেবের। অসম্ভব সুন্দরী। তাই তার লাইফ হিস্টিও যেমন থ্রিলিং তেমনি ভ্যারিড (varied) তার এক্সপিরিয়েন্স, থামলেন ভারতীদেবী তার মুখে কেমন যন্ত্রণার চিহ্ন ফুটে উঠল। বললেন কোথায় থেকে শুরু

কী বলুন তো—সেই রানাঘাট—কলকাতা শেষরাতের ফার্স্ট লোকাল? না, খাস আমেরিকান আর্মি'র মটোর সাইকেলের পিছনে চড়া এক রূপসী যুবতী—

এক কাজ করুন ম্যাডাম—যা মনে আসে এলোপাথারি বলে যান। আমি বেশ একসাইটেড হয়ে বললাম—তার কেসহিস্ট্রি সাজিয়ে গুছিয়ে লেখার দায়িত্ব আমার—

বলেছিলেন নয়ান মেমসাহেবের লাইফ হিস্ট্রি—এলোপাতারি নয়—বেশ গুছিয়েই—

কিন্তু তার আগে বলা দরকার নয়ান মেমসাহেবের এখনকার হাল হকিকৎ। বলা দরকার—কী সূত্রে ভারতীদেবীর সঙ্গে তার কনট্যাক্ট হয়েছিল—

কলকাতার উইমেন ওয়েলফেয়ার অর্গানিজেশানের সেণ্ট্রাল কমিটি থেকে সেক্রেটারিই ডেকে পাঠিয়েছিলেন ভারতীদেবীকে—তার এফিসিয়েন্সির জন্য—

নয়ন নদীয়ার প্রাচীন বর্ধিষ্ণু গ্রাম বীরনগরের এক তান্ত্রিক ব্রাহ্মণ পরিবারের কন্যা। অসম্ভব সুন্দরী। দুধে আলতা মেশানো গায়ের রঙ। চোখদুটো যেন মনে হয় কাজল কালো জলে ভরা কোন দীঘি—কেমন টলমল করছে।

পাড়ার ছেলে-বুড়োর দল তো সবসময় তার পাশে ছোঁক ছোঁক করত—কাঁচা ডাসা পেয়ারা দেখলে যেমন করে থাকে ছেলে-ছোকরারা—এদেরই একজনের সঙ্গে প্রথম ঘরের বাইরে পা বাড়িয়েছিল নয়নতারা ভালবেসে। বিয়ে করে ঘরসংসার করবে। স্বামীকে ভালবাসবে তার প্রেমভালবাসা পাবে—একটি কি দুটো ফুটফুটে বাচ্চা হবে।

উথাল-পাথাল ষোল বছরের মেয়েরা যেমন ভাবে। রোমাণ্টিক স্বপ্ন-টপ্ন দেখে আর কি! কিন্তু—যার সঙ্গে নয়নতারা পাখা মেলে ঝাঁপিয়ে পড়েছিল উড়বে বলে—উড়ে উড়ে আকাশের সীমান্ত পেরিয়ে যাবে বলে, সেই ছোকরা একটি—মাকালফল।

দেখতে শুনতে অসম্ভব সুন্দর। রূপবান বা কন্দর্পকান্তি—ইত্যাদি বিশেষণ অনায়াসেই দেওয়া যায়। তার বাবার ঘনিষ্ঠ বন্ধু পরেশ মোক্তারের ছেলে ইন্দুভূষণ।

নয়নতারার স্বপ্নের—নয়নতারার প্রথম প্রেমের মাধুরী দিয়ে গড়া! ইন্দু—

না। ইন্দু তাকে ঠকায়নি। বা তাকে নিয়ে লোফালুফি করে তার ইজ্জতটা লুটেপুটে নিয়ে লুঠেরাদের মত রাতের অন্ধকারে চম্পট দেয়নি। ইন্দুর কোন ক্ষমতাই ছিল না। প্রেম করতে হলে এবং লুকিয়ে ছাপিয়ে ম্যারেজ রেজিস্ট্রারের বাড়ির ড্রইংরুমেই ছাদনাতলার স্ত্রী আচারগুলো—সেই শুভদৃষ্টি—সেই বৈদিকমন্ত্রের ইন্দ্রজাল—শুভবিবাহের ক্রিয়াপ্রকরণগুলো সেরে নিতে হলে পুরুষটির যে বুকের পাটা দরকার যেমন মনের জোর দরকার—সেসব ছিটেফোটাও ছিল না ইন্দুর।

তবুও নয়ন তাকে ভালবেসেছিল।

ষোড়শীর সেই উদ্দাম প্রেম—ভালবাসা। যা মাতলা হাতির মত কিম্বা বাঁধ ভাঙ্গা উত্তাল বন্যার মত উল্লাসে ঝাঁপিয়ে পড়ে। কোন বাছবিচার কি দ্বিধাসঙ্কোচের ব্যাপারই নেই। ওসব শিকেয় তুলে রেখে সে তীব্রবেগে চারিদিক ভাসিয়ে দিয়ে ডুবিয়ে দিয়ে যেদিকে দুচোখ যায়—চলে যায় তার অপর্যাপ্ত সলিল সম্ভার নিয়ে—

কিন্তু মুস্কিল হল—আর সেটা যে নয়ন জানত না তা নয়। ইন্দু ডাউনরাইট

কাওয়ার্ড—পয়লা নম্বরের ভিতু। পালিয়ে বাড়ি থেকে এসেছে তাও আবার ডবগা একটা ডাগর মেয়েকে নিয়ে, বলে ভয়ে রাতে ঘুমত না।

নয়ন বারে বারে তাকে বলেছিল, আমি তো বলছি—আমি নিজের ইচ্ছায় এসেছি—তোমাকে ভালবেসে এসেছি—তোমাকে বিয়ে করব—এসব বললেই দেখবে পুলিশ আর তোমাকে কিছু বলতে পারবে না—

তাও ভয় কাটে না ইন্দুর। ভয় শুধু পুলিশকে নয় ভয় বাবাকেও। দুঁদে মোক্তার—পরেশের নামে বাঘেগরুতে এক ঘাটে জল খায়। যা ভেবেছিল তাই হল—

পরেশবাবু মেয়ের ঠাকুরদাদা তান্ত্রিক অঘোর চট্টোপাধ্যায়ের বিরুদ্ধে থানায় ডায়েরি করলেন মন্ত্রতন্ত্র করে তার ছেলেকে ভুলিয়ে বশ করে তার দস্যি ডানপিটে গেছো নাতনীটার ভোগে লাগাবে—এসব ক্যামোফ্লোজিং—স্রেফ অঘোরনাথের বুজরুকি—ষড়যন্ত্র—কনসপিরেসি—

তার দুদিন পরেই পুলিশ একটা হোটেল থেকে দুজনকে অ্যারেস্ট করে গারদে পুরে দিল। নয়ন ঘাবড়ানোর মেয়ে নয়—বলেছিল সে সাবালিকা—ওকে বিয়ে করব বলে এসেছে—কিন্তু ভয়ে উত্তেজনায় আশঙ্কায় পুলিশের কাছে হাউ হাউ করে কেঁদে ফেলল ইন্দু। কাঁদতে কাঁদতে বলল—আমি বাবার কাছে যাব—

আর নয়ন—নয়নতারার কি হল ?

তার বাবা নেই। মা প্যারালিটিক। পক্ষাঘাতে অবশ হয়ে সংসারের একটা বাড়তি গলগ্রহ হয়ে আছেন পুরো পাঁচ-পাঁচটি বছর ধরে। অভিভাবক—সত্তর বছরের বৃদ্ধ তান্ত্রিক অঘোরনাথ চট্টোপাধ্যায়।

বয়স তার দাঁত বসাতে পারেনি, পাকা বাঁশের মত দীর্ঘ শক্ত চেহারাটায়। তিনি একটা সংস্কৃত শ্লোক আউড়ে—চিৎকার করে তার অর্থটা পড়শীদের শোনালেন যে গাভী নব নব তৃণ ভক্ষণের জন্য নিত্যি নতুন প্রান্তরের খোঁজ করে—সে পাপিষ্ঠা, অসতী—নয়নতারা আমার দৌহিত্রী নয়—বলেই দড়াম করে সদর দরজা লাগিয়ে দিলেন।

ভেসে গেল নয়নতারা।

কলকাতায় এসেছিল চাকরির খোঁজে। শহর কলকাতা। ষোল বছরের রূপসী মেয়ে। চারিদিকে হিংস্র শ্বাপদসঙ্কুল, অরণ্যে যেমন নিরীহ খরগোস ছানা—তেমনি করে তাকে ছিঁড়েকুঁড়ে, মাংস খুবলে খেয়ে ফেলল ভদ্রলোকের মুখোসধারী কামুক পশুর দল।

নয়নতারা মদ চোলাই করতে শুরু করল।

কি করবে—পেট চালাতে হবে তো। চোলাই মদে—লাভ অনেক। দুটো পয়সা হল। নিত্যি নতুন পুরুষ—জুটিয়ে আনে। তারপর দিনতিনেক বাদে তাকে লাথি মেরে তাড়িয়ে দেয়—রাগ—রাগ—পুরুষজাতটার ওপর রাগ আর ঘৃণা।

মদ চোলাই করে। পুলিশ—আবগারি পুলিশ রেড করে মাল সিজ করল। নয়নতারা বলল—স্যার—আমাকে গারদে দিন কিন্তু আমার মদ নেবেন না—মদ না খেলে আমি বাঁচব না—

প্লিশ শ্নল না। চোলাই মদ কনকিসকেট করে নিয়ে গেল। সেদিন থেকে নয়নতারা বাড়িতে কুকুর রাখল। প্লিশের গাড়ি দেখলেই—চিৎকার করে ডাকতে থাকে। দ্টো বানর প্ষল, ঘরের প্রাচীরে বসে থাকে—উটকো লোক কেউ এলেই ঝাঁপিয়ে পড়ে। তাকে খামচে কামড়ে রক্ত বের করে ছাড়ে। বেচারি পালাতে পথ পায় না!

প্লিশের লোক সহজে তার বাড়ির পথ মাড়ায় না। নয়নতারা এখন ফুলপ্যাণ্ট—হাওয়াই সার্ট পরে। ম্খে জ্বলন্ত সিগারেট। হাতে মদের গ্লাস। পাড়ার লোক বলে—নয়ান মেমসাহেব।

এই পর্যন্ত বলে থেমে গিয়েছিলেন সোসাইটির সাইকোলজিস্ট ভারতীদেবী। বললেন—আমি যখন গেলাম তখন নয়ন মদে চ্র।

বললাম—কেন—ওসব খাচ্ছেন।—দিদি—

আমার দিকে এমন করে তাকাল যেন মনে হল—বহ্—বহ্ দ্রের কোন অজানা গ্রহের জীব দেখছে। জড়িয়ে জড়িয়ে বলল, কী করতে হবে আপনার মত সতী-লক্ষ্মী সাজতে হবে। বলেই পিক করে একদলা পানের পিক মেশান থ্ থ্ ফেলল। সমাজের ওপরে—বিশ্ব সংসারের ওপরে—তার তীব্র ধিক্কারের আর ঘৃণার থ্ থ্।

সেই রক্তের দলার মত থ্ থ্র দিকে তাকিয়ে মনে হয়েছিল—যার দেহের রক্ত ধারায় তান্ত্রিকের জপ তপস্যার ঐতিহ্য বয়ে চলেছে হয়ত তারই কোন যোগ বিভূতি মেশান আছে সেই রক্তের ডেলায়। ওকে ঘাঁটান চলবে না। ওকে বোঝান যাবে না কিছ্ই—কোন ভাল কথা শোনার মত সুস্থ মন বহ্দিন আগে সে হারিয়েছে। এখন থ্ থ্ ফেলেছে—এরপরে আরও জঘন্য—আরও নারকীয় কোন কিছ্ করবে—

দিদি—যদি কখনো সাহায্যের প্রয়োজন হয় এই ঠিকানায় যোগাযোগ করবেন, বলে ভারতী তার ভিজিটিং কার্ড দিয়েছিল।

কার্ডটা দ্মড়ে ম্চড়ে দলা পাকিয়ে দ্রে ছ্ড়ে ফেলে দিয়ে কেমন হিংস্র দৃষ্টিতে তার দিকে তাকিয়ে দাঁতে দাঁত ঘসে বলেছিল—হেল্প? হেল্প—মী? হো-হো করে তাচ্ছিল্যের হাসি। ঘেন্নার হাসি হেসে বলেছিল আপনি কী প্লিশের স্পাই? শ্নে রাখ্ন আমিও বৌবাজার থানার ইনফরমার—মেয়ে সার্চার—মেয়েদের বডি সার্চ করি—বলেই নয়ান মেমসাহেব তার হাণ্টারটা হাতে নিয়ে উঠে দাঁড়িয়েছিল—বলেছিল যান—বহ্ সময় ফালতু নষ্ট করেছেন—অনেক ওয়েল ফেয়ার আমি দেখেছি—

ভারতী চলে এসেছিল।

একটা দীর্ঘশ্বাস ফেলে বলেছিল ভারতী নয়নের লাইফে কোন রিডিমং ফীচার ছিল না, কোন লাইফ বেল্ট ছিল না যা দিয়ে অথৈ জল থেকে তাকে তোলা যায়—এরকম ফেলিওর কেস—আমার আরও—অনেক—অনেক আছে—

বল্ন না ম্যাডাম—

না ভাই, কী হবে শ্নে মান্ষের অবক্ষয়ের কাহিনী। শ্নতে নেই—মনে ডিপ্রেশান আসে, তার দ্টো চোখে ঘন বর্ষার মেঘের মত কি যেন টলমল লাগল।

আমি নিঃশব্দে বেরিয়ে এলাম।

আঠারো

ড্রাগের নেশা, ড্রাগের চোরাকারবারের পিছনে আছে মানুষের লোভ—টাকার লোভ অ্যাডিক্টদের আছে স্বপ্নের জগতে যাওয়ার দুর্ধার লোভ—তাই ড্রাগের অ্যাবিউস কখনো কি নির্মূল করা যাবে ?

এইবার শেষ।

বর্তমান এই লেখকের শেষ পরীক্ষা! পরীক্ষক, সোসাইটির রিঅ্যাডিক্ট সেণ্টারের ডাক্তার সায়ক্রিয়াটিস্ট দেবাশীষ ভট্টাচার্যের মুখোমুখি হতে হল। তিনি পড়ে সবুজ সঙ্কেত না দিলে বিবেকানন্দ এডুকেশান সোসাইটির কর্তা চন্দনগোপাল চন্দ্র স্ক্রিপ্ট অ্যাপ্রুভ করবেন না।

ডাক্তার পড়ছেন।

পড়ছেন খুব—খুব মন দিয়ে। কখনো ভ্রূদুটো কুঁচকে উঠছে, কখনো আবার তাঁর ধারাল মুখখানা চাপা হাসির আলোয় উজ্জ্বল হয়ে উঠছে। কিন্তু—যেই তাঁর পড়া শেষ হল অমনি—

ভয়ে অস্বস্তিতে উত্তেজনায় আমার চেতনা যেন বিকল হয়ে এল। ডাক্তার ভট্টাচার্য অমন ভয়ঙ্কর কঠোর আর গম্ভীর হয়ে গেলেন কেন। সোসাইটির সেই এক্সপিরিয়েন্সড এবং এজেড সাইকোলজিস্ট মহিলা ভারতীদেবীর কোন বক্তব্যে, কোন কেসের ট্রিটমেণ্টে কি কোন গলতি আছে—কে জানে। হয়ত নয়না মেমসাহেবের কেসটাই তাঁর কাছে অ্যাবসার্ড মনে হয়েছে। আবার হয়ত নয়নতারাকে ভারতীদেবী নোংরা পাঁকের ভেতর থেকে টেনে তুলতে পারেননি, নিচ্ছিদ্র অন্ধকারের সেই শ্বাসরোধী কারাগার থেকে অবারিত আলো বাতাসের পৃথিবীতে ফিরিয়ে নিয়ে আনতে পারেননি। ব্যর্থ হয়েছেন। কেন না—নয়নতারার ঘাটে ঘাটে ঠোক্কর খেয়ে দোমড়ান মোচড়ান বিকৃত জীবনের ভেতরে এমন কোন বৈশিষ্ট্য এমন কোন গুণ—কোন Redeeming Feauture পাননি। যার শক্ত জমির ওপর নয়নতারাকে দাঁড় করান যায়। কিন্তু—

ডাক্তার দেবাশীষ ভট্টাচার্য ভয়ানক গম্ভীর হয়ে গেলেন। পাণ্ডুলিপি সম্বন্ধে একটি কথাও উচ্চারণ করলেন না। তাঁর দুটো বেশ বড় বড় চোখে চিন্তার ছায়া। বলা দরকার—

কেন—কেন এত দুশ্চিন্তা একজন চিকিৎসককে নিয়ে। তাঁর মত একজন এম বি বি এস তো এই দুঃস্বপ্নের শহর এই মুমূর্ষ নগরী—যাই বলুন—এই কলকাতার অলিগলিতে কিন্তু—ডক্টর ভট্টাচার্য—

বয়সে তরুণ। শিল্পী। ছবি আঁকেন। সেসব ছবি পিকাসো না ভান গগের মত কিম্বা কিউ বিক—ইম্প্রেশানিজমের (impressionism) ছাপ আছে কিনা—সেসব এই লেখকের এক্তিয়ারের বাইরে। তবে ছবির ব্যাপারে একেবারে মুখ্যুসুখ্যু মানুষের সহজ সরল চোখে যা নজরে পড়ে—ওঁর ছবিতে আছে একটা দুরন্ত গতি—স্পীড।

গতিরও তো একটা সৌন্দর্য আছে। সেই সৌন্দর্যে তাঁর ছবি সম্বন্ধ। একাডেমি অফ ফাইন আর্টসে তাঁর ছবির প্রদর্শনী মাঝে মাঝেই হয়ে থাকে।

কথা বলেন সুন্দর। কণ্ঠস্বর অত্যন্ত মিষ্টি এবং স্নিগ্ধ। মনে হয় লোকের তথা মানসিক বিকলনের রোগীর মনের ভেতরের জট খুলতে হলে সায়কিয়াটিস্টের সুরেলা কণ্ঠে কথা বলার কৌশলটি আয়ত্ব রাখা দরকার।

যেখানে বসে ড্রাগের এই বই নিয়ে আলাপ আলোচনা চলছে, সেইখানে সেই ঘরেই তিনি ড্রাগঅ্যাডিক্টদের আউটডোর করে থাকেন। সেদিন এল তাঁর কাছে এক পেশেণ্ট। মাদকাসক্ত। ছাব্বিশ থেকে ত্রিশের ভেতরে বয়স হবে। অসহ্য যন্ত্রণায় তার শরীর কেমন এঁকে বেঁকে দুমড়ে দুমড়ে উঠছে। লাল চোখদুটো ঢুলুঢুলু। টেনে মেলে ধরতে পারছে না।

কি হয়েছে তোমার—কী কষ্ট ভাই, বললেন ডাক্তার।

ডাক্তারবাবু আমার ছেলে—বললেন প্রৌঢ় এক ভদ্রলোক। গায়ে নামাবলী। কপালে চন্দন তিলক। টিকিতে বাঁধা একটি রক্তজবা। বললেন—ওই ব্রাউন সুগার না হোয়াইট সুগার না কি অতিরিক্ত খেয়েছে—একটু থেমে আবার ভার ভার গলায় বললেন আমার একমাত্র ছেলে ডাক্তারবাবু—

ডক্টর ভট্টাচার্য—ওঁকে ইসারা করে থামতে ইঙ্গিত করলেন।

কি ড্রাগ খেয়েছ।

ব্রাউন সুগার কেমন অস্পষ্টভাবে চোখ বুজেই বলল নেশাখোর।

তুমি কবে থেকে খাচ্ছ?

বছর দুই থেকে হবে—

কেন ওসব ছাইভস্ম খাও ভাই—

কোন কথা বলল না পেশেণ্ট, একবার শুধু বাবার দিকে আর একবার ডাক্তারের দিকে তাকাল। কেমন ভয়ানক হিংস্র সেই দৃষ্টি যেন একটা বন্য হিংসা ধু ধু করছে তার দুটো চোখে।

ডাক্তারবাবু সেই নিষ্ঠাবান ব্রাহ্মণকে বাইরে ভিজিটিং রুমে অপেক্ষা করতে বললেন। এইবার সায়কিয়াটিস্ট তাঁর ট্রিটমেণ্ট শুরু করলেন। বড় বিচিত্র তার সেই মানসিক চিকিৎসার অদ্ভুত কৌশল।

কিন্তু তার আগে পেশেণ্ট—প্রণবের ফ্যামিলি হিস্ট্রীটা বলা দরকার।

বাবা—গিরিজাচরণ বন্দ্যোপাধ্যায় পৌরহিত্য করেন। যুগ-যুগান্তর ধরে এবং বংশ পরম্পরায় কালীঘাটের মায়ের সেবাইত এবং পুরোহিত হালদারদের সঙ্গে লতায় পাতায় কেমন রক্তের সম্বন্ধ আছে তাদের। আর সেই ব্যাপারে গিরিজাবাবু বেশ কনসাশ এবং যথেষ্ট দেমাকও আছে। বাড়িতে বাড়িতে ঘুরে ঘুরে লক্ষ্মীপুজো—সরস্বতীপুজো থেকে শুরু করে দুর্গাপুজো—কালীপুজোও করেন। কিন্তু যত দিন যাচ্ছে—পুজোপাঠের রেয়াজও কমে আসছে। অনেক বাড়িতে নিজেরাই

নমো নমো করে পুজো সেরে নেয়। তাই তেমন পাওনা গণ্ডা হচ্ছে না। সংসারে অশান্তি লেগেই আছে।

সকাল সন্ধ্যায় বাপ-ছেলে কালীঘাটে মায়ের মন্দিরের রাস্তায় দাঁড়িয়ে লোক পাকড়াও করতে চেষ্টা করে। মুখে তোতাপাখির মত এক বুলি—পুজো দেবেন—দেবেন—পুজো দেবেন—আসুন আমার সঙ্গে মায়ের পা ছুঁইয়ে দেব—মা-কে দর্শন করিয়ে দেব—

কেউ শোনে, আবার কেউ শোনে না। তাদের বেশির ভাগই বাঁধা দোকান আছে। সেখানে ভোগের সন্দেশ কেনে—তাদেরই পাণ্ডা দেখিয়ে দেয়। মক্কেল ফসকে গেলেই গিরিজাচরণ ছেলের ওপর খিঁচিয়ে ওঠে—তুমি হাঁ করে আরো দাঁড়িয়ে থাক—মুখ দিয়ে তোমার বাক্যি সরে না—

অনেকবার বললাম তো—আর কি করব—পা ধরব—প্রণবও ঝাঁঝিয়ে ওঠে। প্রণবের এসব ভাল লাগে না। মন বিষিয়ে ওঠে। বাপের ওপরে রাগে বিরক্তিতে জ্বলে যায়। আরও তার মন বিষাক্ত হয়ে ওঠে যখন তার বাবা তার ক্লায়েন্টের কাছে মন্ত্রপড়ার মত করে বলেন, আরে ভক্তদের ভেতরে যারা বুড়ো হাবড়া কি মেয়েছেলে কোনরকমে তাদের নিয়ে গিয়ে মায়ের সামনে জমাট ভিড়ের ভেতর ঠেলে দিয়ে তোর পাওনাটা বুঝে নিয়ে তুই কেটে পড় না—তোর অত কিসের সিন্সিয়ারিটি—এ যুগে ওসব সেণ্টিমেণ্টের কানাকড়ি মূল্যও নেই—

প্রণব কথা বলে না। বাবার মুখের দিকে অবাক হয়ে তাকায়। কালীঘাটের পুরোহিত না জল্লাদ! কিন্তু কিছু বলে না। বলতে পারে না। এখন বাপের অন্ন ধ্বংস করছে। একটা ওষুধ তৈরি কারখানা—নন্দন ফার্মাসিউটিক্যাল কোম্পানিতে লেবারের চাকরি করত। ওষুধের বাক্সটাক্স প্যাকিং করত। তাদের বিজনেসে মন্দা পড়ল। তাকে ছাঁটাই করে দিল। এখন কপালের ফেরে বাবার পাপচক্রের ভেতরে এসে সেঁধিয়ে যেতে হল।

তাহোক।

বাবা যদি ভক্তদের পাকড়াও করেই সন্তুষ্ট থাকতেন তাহলে কোন কথা ছিল না। কোন ক্ষোভ ছিল না। কিন্তু বাবার চালচলন, ধরনধারণ সবটাই কেমন নোংরা পাঁক লাগান। কুৎসিত। পঙ্কিল—এই পর্যন্ত বলে প্রণব থেমে গিয়েছিল। নেশার আচ্ছন্নতায় কেমন নেতিয়ে পড়েছিল—

কি রকম পঙ্কিল ভাই, একটু থেমে ডাক্তার দেবাশীষ বললেন তোমার মনের জট খোলার জন্যই তুমি আমাকে খুলে বল—

কালীঘাটে যারা চুপচাপ মালাবদল করে বিয়ের হাঙ্গামাটা চুকিয়ে ফেলতে চায়—সেই কপোতকপোতীকে ধরে গিরিজাচরণ। আদি গঙ্গার শানবাঁধানো ঘাটে তাদের পাশাপাশি বসিয়ে হোম, যজ্ঞ, সপ্তপদী—বৈদিক মন্ত্রপাঠ ইত্যাদি ক্রিয়াপ্রকরণ কি মাঙ্গলিক কোন কাজ শুরু করার আগেই ছেলেটির কানের কাছে মুখ নিয়ে এসে ফিস-ফিস করে বলে—কি বাবা—বাড়িতে জানিয়ে এসব করছ তো—যদি গোপনে—

সিক্রেটলি করতে চাও তাহলে বাবু সব দায়দায়িত্ব আমার—ফি হাজার টাকা। ধূর্ত কুটিল একটা অভিসন্ধির হাসি হেসে আবার বলে মামলা মোকদ্দমা হলে আমি সাক্ষী দেব—

এসব বিয়ে তো মা-বাবা কি অভিভাবকের কাছে গোপনই থাকে। ছেলেটার মুখ অন্ধকার হয়ে যায়। আর কনে ভয়ে উত্তেজনায় কাঁদতে থাকে। দরকষাকষি করে বরের সিল্কের পাঞ্জাবীর চোরাপকেট থেকে ট্যাঁক পর্যন্ত ঝেড়েঝুড়ে যা পায় তাই আদায় করে একেবারে নিঃস্ব করে ছেড়ে দেয়। সেইদিন—

সেদিন সন্ধ্যার পরে আর গিরিজাচরণকে মায়ের মন্দিরের চত্বরের কোথাও পাওয়া যায় না। কে জানে যায় কোথায়। প্রণবের সমবয়সী পাণ্ডারা তার বাবার সম্বন্ধে অকথা-কুকথা আড়ালে আবডালে বলে। তার কানে পড়ে। কিন্তু বিশ্বাস করে না। করতে চায় না—হাজার হোক বাবা তো। জন্মদাতা। পিতা—জনক।

একদিন নেহাতেই কিউরিওসিটির বশেই প্রণব বাবার পিছু নিয়েছিল। কিন্তু না নিলেই বোধহয় ভাল করত। হয়ত ভাল হত—হয়ত তাকে ড্রাগ খেতে হত না। কিন্তু ডেস্টিনি—অদৃষ্ট।

প্রণব নিজের চোখ দুটোকে বিশ্বাস করতে পারেনি। সেই নামাবলী টিকিতে বাঁধা রক্তজবা। কপালে চন্দন তিলকের সাজ নিয়ে নিষ্ঠাবান ব্রাহ্মণ পুরোহিত কি না গরম পেঁয়াজি, আলুর চপ, চাটনির চাট নিয়ে তাড়ি খাচ্ছে। তাঁর চারিদিকে মন্দিরের সুইপার—ফরাস—ধাঙড়রা তাড়িয়ে এ ওর গায়ে গড়িয়ে পড়ছে। তাড়ির মিষ্টি গন্ধে রাতের বেলাই দোকানে মাছি খুক খুক করছে।

প্রণব যেমন গিয়েছিল তেমনি নিঃশব্দে চলে এল।

তার চেতনা বিকল হয়ে গেল। সেদিন থেকেই প্রণব হেরোইন ধরল। ধরতে বাধ্য হয়েছিল—থেমে গিয়েছিল প্রণব।

এই হল অ্যাডিক্ট প্রণব ভট্টাচার্যের কেসহিস্ট্রি! এবার ডাক্তার ট্রিটমেণ্ট শুরু করার আগে আমাকে উদ্দেশ্য করে বললেন ড্রাগের কত বড় কাজ করছেন—কিন্তু—আপনার লেখায় দেখলাম কোথাও নেই এই পয়েণ্টটা—

কি?

Drugs kill not only the addicts but entire societies as a whole by undermining its culture and destabilizing its economy অর্থাৎ ড্রাগ শুধু নেশাখোরকেই ধ্বংস করে না—সমস্ত সমাজকে তার সংস্কৃতিকে তার অর্থনীতিকেও একেবারে বিপর্যস্ত করে দেয়, একটু থেমে আবার বললেন—২৮মে, ১৯৮৭ সালে কলকাতায় ইউ এস ইনফরমেশানে (International Control of Drug Traffic) শীর্ষক একটি সেমিনারে এই কথাগুলো বলেছেন U.S. Drug Information Agency-র ডাইরেক্টার ব্রুশ আপচার্চ (Bruce Upchurch)।

তারপর ব্যাখ্যা করে বুঝিয়ে দিলেন ডাক্তার, গিরিজাচরণ নিজে অ্যাডিক্টেড এবং অত্যন্ত স্বার্থপর জঘন্য চরিত্রের মানুষ বলেই তার ওপর ক্ষোভে অভিমানে হতাশায়

ছেলে ড্রাগ খেতে শুরু করল। মানুষ তো একা নয়। সে সমাজবদ্ধ জীব। প্রণবদের সংসারে শোকের ছায়া নেমে এল। সংসারটা একেবারে যখন ভেসে যায় তখন গিরিজাচরণ ছেলেকে নিয়ে এসেছে ডাক্তারের কাছে! এইভাবে এক নেশাখোর থেকে আর একজন, তার থেকে গোটা সংসার এবং মাদকসেবীদের অশান্তির এবং যন্ত্রণা ও দুঃখ কষ্টের সেই হতচ্ছাড়া পরিবারের প্রভাবে সারা সমাজ ধীরে ধীরে রসাতলে চলে যায়—যাচ্ছে—

এতটা বড় করে ভাবিনি ডাক্তারবাবু—

আর একটা কেস শুনুন আমার কথা যেন শুনতেই পেলেন না ডক্টর ভট্টাচার্য, উদ্দীপ্ত হয়ে বললেন—

স্যার, অনারেবল চীফ মিনিস্টার—অনুগ্রহ করে আমার বাবাকে ফিরিয়ে দিন, তিনি কেন মদ খাচ্ছেন কি গাঁজা কি হেরোইন খাচ্ছেন—আমি জানি না—বুঝতে চাই না—সেসব নিয়ে স্যার আপনারা মাথা ঘামাবেন—আমি শুধু—আমার বাবাকে ফিরে পেতে চাই। বলতে বলতে তীব্র কান্নায় ভেঙে পড়ল টুয়েলভ ক্লাসের ছাত্রী দীপালি। মহারাষ্ট্রের মুখ্যমন্ত্রী মিঃ শারদ পাওয়ারের পায়ের ওপর আছড়ে পড়েছিল চোদ্দ পনের বছরের সেই সুন্দরী ফুটফুটে মেয়েটা, থেমে গেলেন ডাক্তার। আবার একটা দীর্ঘশ্বাস ফেলে আস্তে আস্তে বললেন, আমি টাইমস অফ ইণ্ডিয়া (বোম্বে এডিশানে) এই ঘটনাটি পড়েছি—

'অ্যাডিকশান' বা ড্রাগের নেশা কেমন করে নেশাখোরকে এবং গোটা সমাজকেই তিলে তিলে মৃত্যুর দিকে নিয়ে যায়—Drugs Kill the Society as a whole তারই আর একটি উদাহরণ দিতে গিয়ে তিনি যা বলেছিলেন—তিনি যা কাগজে পড়েছিলেন—সেই ইতিহাস দীর্ঘ এবং ক্লান্তিকর—এখানে সংক্ষেপে বলা হল—

পুণের উপকণ্ঠে শান্ত নিরিবিলি পরিবেশে মুক্তাগাঁও ডি-অ্যাডিকশান সেণ্টারের তৃতীয় প্রতিষ্ঠা বার্ষিকী উৎসব উপলক্ষে যে সভা হয়েছিল সেইখানে মহারাষ্ট্রের মুখ্যমন্ত্রী শারদ পাওয়ার বিখ্যাত মারাঠি লেখক এবং মানবতাবাদী ও অসামান্য উদার মনের মানুষ মিস্টার পি. এল দেশপাণ্ডে, স্বনামধন্য লেখিকা ও সমাজসেবী অনীতা অচ্যুত প্রমুখ বিশিষ্ট বুদ্ধিজীবি ও হাজার জনতার সামনে মঞ্চে দাঁড়িয়ে আকুল কান্নায় ভেঙে পড়ে বলেছিল দীপালি—জানেন স্যার—অনারেবল চীফ মিনিস্টার এবং দেশপাণ্ডেজী আপনারা কল্পনাও করতে পারবেন না কী ভয়ঙ্কর দুর্দিন আমাদের গিয়েছে—বাড়িতে বন্ধুবান্ধব আত্মীয়স্বজন কাউকে আসতে বলতে পারতাম না। তারা কেউ আসতে চাইলেও বাধা দিতাম—নানা ছলছুতো করে অ্যাভয়েড করতাম। বাড়িতে দৈবাৎ কেউ এসে পড়লেও দেখত বাবা মদ খেয়ে উঠোনে গড়াগড়ি খাচ্ছেন কি হেঁড়ে গলায় গান জুড়েছেন কিম্বা ছুটে মা-কে মারতে যাচ্ছেন। তিনি অ্যালকোহল খেয়ে আরও কতরকমের ইণ্ডিসেণ্ট বিহেভিয়ারই (indecent behaviour) যে করতেন—সেই বীভৎস দিনগুলোর কথা মনে হলেই আমার চেতনা কেমন আড়ষ্ঠ হয়ে আসে। আমরা যেমন তেমনি আত্মীয়স্বজন এবং বন্ধুরাও আমাদের ঘেন্না

কুকুরের মত এড়িয়ে যেত—

আরো অনেক দুঃখের কথাই বলেছিল দীপালি। তার বাবা একা মদ খেতেন না তাঁর বোতলের বেশ কয়জন বন্ধুও জুটিয়ে নিয়েছিলেন। তাদের মেয়ে-বৌরা এসে দীপালিদের বাড়িতে চড়াও হত। তার মাকে অভিশাপ দিত। যা মুখে আসত তাই বলে গালাগাল করত। তারা হয়ে গিয়েছিল তাদের মহল্লায় ঘৃণা এবং উপহাসের পাত্র—বলতে বলতে হঠাৎ দীপালি তীব্র আবেগে উত্তেজনায় দুপুরের রোদে জ্বলে আকাশের দিকে দুহাত বাড়িয়ে উদাত্ত কণ্ঠে বলেছিল—মঙ্গলময় ঈশ্বরকে এবং মুক্তাগাঁও পুর্ণবসতি কেন্দ্রকে (de-addiction centre) ধন্যবাদ আমার বাবা আজ এই ডি-অ্যাডিকশান সেণ্টারের ডাক্তার, নার্স এবং কর্মীদের নিরলস পরিশ্রমে, সহানুভূতিতে সম্পূর্ণ সুস্থ—He has recovered—আর তিনি মদ স্পর্শ পর্যন্ত করেন না—বলতে বলতে তীব্র আনন্দে আবেগে তার চোখ দুটো জলে ভরে উঠেছিল। কান্নায় ভার ভার গলায় বলেছিল—আমাদের প্রায় ভেঙ্গে চুরমার হয়ে যাওয়া দুঃখের অশান্তির সংসারে হাসির আলো শান্তির আলো জ্বালিয়েছে মুক্তাগাঁও—

শ্রোতাদের হাততালির তীব্র শব্দে দীপালির কণ্ঠস্বর তলিয়ে গেল।

মঞ্চে এলেন আর একজন।

উল্লসিত শ্রোতাদের হাসি, গুঞ্জন এবং টুকরো টুকরো কথার ফিস ফিসানির চাপা ঝড় থেমে গেল।

আমি দশ বছর ধরে ব্রাউন সুগার খেতাম অনারেবল চীফ মিনিস্টার কেমন উত্তেজিত হয়ে চিৎকার করে বললেন বত্রিশ তেত্রিশ বছরের এক একটা—অ্যাডিক্ট বা প্রাক্তন হেরোইনসেবী আমিও দশ-বারজন বন্ধুকে হেরোইন খেতে ধরিয়েছিলাম—আমি কালান্তক যমদূতের মত মৃত্যুর বীজ সমাজে ছড়িয়ে দিচ্ছিলাম—একটু থামলেন তিনি। আবার মাথা নিচু করে কেমন ভার ভার গলায় বললেন আমি হেরোইন খেয়ে খেয়ে এবং ইনজেকশান দিয়ে বডিতে ড্রাগ 'পুস' করে করে যখন আধমরা তখন আমার এক আত্মীয় আমাকে দিয়ে এসেছিলেন এই মুক্তাগাঁও ডি-অ্যাডিকশান সেণ্টারে—

আবার হাততালির ঝড় উঠল।

ভদ্রলোক বললেন—আমি কিছুতেই এখানে আসতে চাইনি—আমি তখন জীবন সম্বন্ধে একেবারে হতাশ হয়ে গিয়েছি। তখন আমার পিশেমশায় অত্যন্ত রাশভারি মানুষ কোন একটা কলেজের প্রিন্সিপাল চিৎকার করে ধমকে বলেছিলেন It is never too late···

আমি এখানে এসেছিলাম—কিন্তু মনে মনে ঠিক করেছিলাম হয় হেরোইন ছাড়ব যদি না পারি তাহলে সুইসাইড করব—It is either drugs or life···

২৮ আগস্ট ১৯৮৯।

এই সভা অনুষ্ঠিত হয়েছিল ডক্টর দেবাশীষ ভট্টাচার্য তাঁর হাতে টাইমসের নিউজকাটিং এর দিকে চোখ রেখেই কথা বলছিলেন। সভার শেষে লেখিকা ডক্টর অনীতা অচ্যুতও বলেছিলেন—Addiction is a Psychological and Social

disease—and it was essential for parents of addicts and the soceity to take more sympathetic attitude towards one addicts···অর্থাৎ ড্রাগের নেশা মনস্তাত্ত্বিক এবং সামাজিক অসুখ—বাবা মা এবং গোটা সমাজের উচিত—অ্যাডিক্টের প্রতি সহৃদয় এবং সহানুভূতিশীল ব্যবহার—

এবার ডক্টর ভট্টাচার্য প্রণবের ট্রিটমেণ্ট করলেন আশ্চর্য কৌশলে।

আচ্ছা ভাই প্রণব তুমি কি মনে কর হেরোইন খেলেই তোমার সব সমস্যার সমাধান হয়ে যাবে? একটু থেমে আবার বললেন, তোমার বাবার মতিগতি পাল্টে যাবে—তিনি মদ খাওয়া ছেড়ে দেবেন?

কোন কথা বলল না প্রণব।

শুধু টকটকে লাল দুটো চোখে কেমন অসহায় শূন্য দৃষ্টি মেলে ধরে ডাক্তারের দিকে তাকিয়ে রইল। তারপর কেমন অস্পষ্ট আর অস্ফুটস্বরে বলল কিছুক্ষণ ভুলে তো থাকা যায় ডাক্তারবাবু—

তাতে কি লাভ—আবার তো তোমাকে বাবার সঙ্গে মায়ের মন্দিরের সামনে দাঁড়াতে হবে—ভক্ত পাকড়াতে হবে। ফাঁকি দিয়ে পুজো করিয়ে দিয়ে ভক্তদের কাছ থেকে গলায় গামছা দিয়ে পয়সা আদায় করতে হবে—ডক্টর ভট্টাচার্য থেমে গেলেন। তীক্ষ্ণ চোখে প্রণবের চোখেমুখে কি যেন খুঁজতে লাগলেন।

প্রণবের মুখে অন্ধকার নেমেছে ঘন হয়ে।

একটা নিদারুণ গ্লানির অপচ্ছায়ায় আর গভীর অনুশোচনায় এবং তার বুকের ভেতর থেকে ঠেলে ঠেলে ওঠা কান্নার নিঃশব্দ দমকে তাব মুখখানা কেমন এঁকেবেঁকে দুমড়ে কুৎসিত হয়ে উঠেছে।

প্রণব তুমি ভগবান মানো?

কোন কথা বলল না অ্যাডিক্ট। সে যেন সেই অন্ধকার গোলকধাঁধায় এখনও ঘুরে ঘুরে মরছে। ডাক্তার যেন বহু—বহু দূরের অন্য কোন গ্রহ থেকে কথা বলছেন। তাঁর কথাগুলো প্রণবের কানে পেঁাচ্ছচ্ছে না।

আচ্ছা প্রণব, তুমি তো বাবার নমো নমো করে বা ফাঁকি দিয়ে পুজো করা একেবারে সমর্থন করতে না—তাই না?

ধক করে জ্বলে উঠল প্রণবের ঘোলাটে চোখদুটো। মুহূর্তে যেন নেশাটেশার জড়তা কেটে গেল। দাঁতে দাঁত চেপে ধরে বলল, আচ্ছা আপনিই বলুন ডাক্তারবাবু—এসব কি পুজো—না পুজোর নামে স্রেফ ভণ্ডামি—বুজরুকি—

আচ্ছা প্রণব—তোমার মতে একটা বেশ আদর্শ সুরুচিপূর্ণ পবিত্র ভাবে পুজোর বিবরণ দাও তো—

কোন কথা বলল না প্রণব।

আস্তে আস্তে চোখের দৃষ্টি কেমন গভীর আর অপলক হয়ে উঠল। আর কেমন একটা অপার্থিব আলোর আভায় তার মুখখানা উজ্জ্বল হয়ে উঠল। মৃদু গম্ভীর

কণ্ঠে বলল যে দেবতা বা দেবীর পুজোয় বসেছেন তাঁর মূর্তিটাকে মনের ভেতরে প্রদীপের মত বা অনির্বাণ দীপালির মত জ্বালিয়ে নিতে হবে—আপনার দুটো চোখের স্থির দৃষ্টি থাকবে মূর্তির চোখদুটোর দিকে—থেমে গেল প্রণব। কিসের যেন যন্ত্রণায় আবেগে তার শরীর কাঁপতে লাগল। কেমন অস্ফুটস্বরে বলল আপনার দৃষ্টির শেকল দিয়েই দেবীকে বেঁধে রাখবেন—আপনি চোখের পলক ফেলবেন না—ফেললেই তিনি পালিয়ে যাবেন। তারপর দেবীর চোখে চোখ রেখে মন্ত্রোচ্চারণ করতে হবে—

ইন্দ্রিয়ানাম অধিষ্ঠাত্রী ভূতানাঞ্চ খিলেকুচ
সততং ভূসৈ ব্যাপ্তি নারায়ণী নময়ো স্তুতে।

উদাত্ত কণ্ঠে মন্ত্র বলে চলেছে হেরোইন অ্যাডিক্ট। ধীরে ধীরে তার কণ্ঠ উচ্চ থেকে উচ্চতর গ্রামে উঠছে। মন্ত্রের কথাগুলো ঘরের দেওয়ালে দেওয়ালে প্রতিধ্বনিত হয়ে সোসাইটির সেক্রেটারির চেম্বারের চৌহদ্দি ছাড়িয়ে আরকেডিয়ার* এলাকা পেরিয়ে বাতাসে কাঁপতে কাঁপতে যেন লোকলোকান্তর সীমানাও ডিঙ্গিয়ে কোন্ সুদূর এক অজানা জগতে বিলীন হয়ে যাচ্ছে।

প্রণবকে দেখে মনে হল সেও যেন আর এই মাটির পৃথিবীতে নেই। উদার মহৎ একটা অনুভূতিতে আবিষ্ট হয়ে সে এই গ্রহ থেকে দূর কোন্ গ্রহান্তরের উদ্দেশে পাড়ি দিচ্ছে—

হঠাৎ তাকিয়ে দেখি প্রণব কেমন অসাড় হয়ে পড়ে আছে ডাক্তারের রোগী পরীক্ষার লম্বা টেবিলে। মরে গেল না কি! আমার বুকের ভেতরটা ছ্যাঁত করে উঠল। দেবাশীষ বললেন ঘুমিয়ে গিয়েছে, পরম শান্তিতে ঘুমোচ্ছে—

কেমন করে ঘুমিয়ে গেল ডাক্তারবাবু?

প্রণব মন্ত্রের কথাগুলোর অর্থ বুঝতে পারে। ধ্বনি মাধুর্য তার চেতনার মর্মে গিয়ে দোল দেয়—এসবের মাদকতা ড্রাগের চেয়ে অনেক—অনেক গুণ বেশি—

পরে কানে পড়েছিল প্রণবকে ডক্টর ভট্টাচার্য একেবারে অন্য মানুষ করে দিয়েছিলেন। বলেছিলেন—তোমার বেস (Base) খুব ভাল—তোমাকে নিজের পায়ে দাঁড়াতেই হবে। তোমার self confidence টাকে জাগিয়ে তোল আর সবশেষে কানে কানে বলেছিলেন একটি মন্ত্র—

না। নিশ্চয়ই গতানুগতিক সংস্কৃত মন্ত্র নয়। তিনি শিল্পী। পরিচ্ছন্ন রুচির মানুষ। তার মন্ত্রে অভিনবত্ব আছে। বলা দরকার—সেই অভয়বাণী তার সাইকোলাজিক্যাল ট্রিটমেন্টেরই একটি অঙ্গ। অতএব ট্রেড সিক্রেট এবং আমরা দেখব আরো অনেক অ্যাডিক্টের ট্রিটমেন্টেও তিনি তাঁর সেই যাদুমন্ত্রই ব্যবহার করেছেন। আবার প্রকারান্তরে অন্য কোন নেশাখোরের কেসে সময় সুযোগ করে সে মন্ত্র বলা হয়ত যাবে।

---

*বিবেকানন্দ এডুকেশান সোসাইটির ঠিকানা—২৫/১ এ ডি. এইচ. রোড. আরকেডিয়া, কলকাতা-৭০০০৩৪। এইখানেই Drug counnselling unit। এইখানে ডক্টর ভট্টাচার্যের আউটডোর চেম্বার।

সে যাই হোক—প্রণব ভট্টাচার্য আর কখনো হেরোইন স্পর্শ করেনি।

বর্তমান লেখকের স্ক্রিপ্ট নাড়াচাড়া করতে করতেই বললেন সায়কিয়াটিস্ট ডাক্তার দেবাশীষ ভট্টাচার্য—আর একটি প্রসঙ্গ আপনি আলোচনা করেননি—

কি? ভয়ে ভয়ে বললাম। সঙ্কোচে লজ্জায় মাটির সঙ্গে মিশে যেতে ইচ্ছে করল। অত্যন্ত সসঙ্কোচে বললাম—আমার নলেজের পরিধিও খুব লিমিটেড ডাক্তারবাবু।

আরে রাগ করলেন না কি। হো হো করে হেসে অস্বস্তিকর পরিবেশটাকে যেন সহজ করতেই বললেন অবশ্যই সেই পয়েন্টে আপনি অনেক—অনেক কথাই বলেছেন—প্রচুর বলেছেন! অনেকবার—অনেক জায়গায় কিন্তু ছাড়া ছাড়া—কমপ্যাক্ট হয়নি—

পয়েন্টটা কি?

নার্কটেররিজম (Narco-terrorism)। একটু থেমে আমার বিব্রত মুখের দিকে তাকিয়ে বললেন, বুঝতে পারলেন না? এই কথাটিও বলেছিলেন U.S. Drug Enforcement Agencyর ডিরেক্টার রুশ আপচার্চ কলকাতার সেই International Control of Drug Traffic-এর আলোচনা সভায় বা সেমিনারে—

তাঁর ভাষণের হুবুহু বঙ্গানুবাদ এখানে দেওয়া হল—

সারা পৃথিবী জুড়েই দেখা যাচ্ছে যত দিন যাচ্ছে ততই ড্রাগের স্মাগলিং ক্রমাগত বেড়েই চলেছে। বাড়তে বাড়তে এমন চূড়ান্ত পর্যায়ে পৌঁছে গিয়েছে যাকে বলা যায় সমস্ত জগৎব্যাপী আইনশৃঙ্খলার এক চরম বিপর্যয় বা Global lawlessness। তার হাত ধরে এসেছে সন্ত্রাস (terrorism) এবং দেশে দেশে বৈধ এবং চালু প্রশাসনের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ এবং কোন কোন জায়গায় গণঅভ্যুত্থান। ড্রাগের ভয়াবহ প্রতিক্রিয়া বা ড্রাগ অ্যাবিউস সাম্প্রতিকালে এমন ভয়ঙ্কর ও বীভৎস রূপ ধারণ করেছে যাকে বলা যেতে পারে একটা নতুন বিস্ময়জনক ঘটনা—New phenomenan। ড্রাগের সন্ত্রাস বা Narco—terrorism—

আমি তো কলম্বিয়ার ড্রাগ কিংদের ক্ষেত্রে এসব কথা—

আপচার্চসাহেবও প্রায় নয় মাস ধরে প্রশান্ত মহাসাগর তীরে কলম্বিয়ার উপকূল রেখায় ঘুরে ঘুরে হন্যে হয়ে খুঁজে বেড়িয়েছেন ড্রাগ এজেন্ট এবং স্মাগলারদের। ফিরে এসে—থেমে গেলেন ডক্টর দেবাশীষ ভট্টাচার্য।

কলম্বিয়া থেকেই কলকাতায় এসেছিলেন?

না। ইন্ডিয়া গভর্ণমেন্টের আমন্ত্রণে দিল্লীতে এসেছিলেন এবং ছিলেনও বেশ কিছুকাল ভারতের নার্কটিক কণ্ট্রোল ব্যুরোকে তাঁর বুদ্ধি পরামর্শ দিয়ে সহায়তা করার জন্য—একটু থেমে ম্লান হেসে আবার বললেন, আপচার্চের মতে ভারতে ড্রাগের বিধ্বংসী প্রতিক্রিয়ার বা ড্রাগ মিনেসের (Drug Menace) বিরুদ্ধে সংগ্রাম এখনও শৈশবের পর্যায়েই পড়ে আছে—Fight against the Drug menace is still in the stage of infanty in India.

তারপর আবার অনুবাদ রিডিং পড়ে গেলেন—শুধু ভারতে নয় সারা পৃথিবীতে ড্রাগ অ্যাবিউস প্রতিরোধে তিনি কতগুলো সাজেশান দিয়েছেন—ড্রাগের অভিশাপকে রুখতে হলে একসঙ্গে পৃথিবীব্যাপী আঘাত Global attack করতে হবে। প্রত্যেকটি দেশের গুপ্তচর বিভাগ (Intelligence dept.) থাকবে। অন্যান্য দেশের ইন্টেলিজেন্স ডিপার্টমেন্টের সঙ্গে আবার তাদের নিবিড় যোগাযোগ থাকবে। প্রতিটি দেশের পুলিশ তাদের দেশের ড্রাগের চোরাকারবারিদের খুঁজে খুঁজে একটা তালিকা তৈরি করবে। সেই লিস্টের কপি অন্যান্য দেশে বিলি করবে—এইরকম করে ড্রাগ অ্যাবিউসের মহানায়ক ড্রাগ স্মাগলারদের ধরার জন্য পৃথিবীতে জাল বিস্তার করতে হবে Worldwide Intelligence network.

তারপরেই তিনি আক্ষেপ করে বলেছেন তাঁর নিজের (মার্কিন) দেশের কর্তৃপক্ষ বর্তমান দশকের আগেও ড্রাগের স্মাগলিং সম্বন্ধে ভ্রূক্ষেপ করেননি। তাই সেখানে পরিস্থিতি ভয়াবহ হয়ে আয়ত্তের একেবারে বাইরে চলে গিয়েছে। তাঁর দেশ আমেরিকাই এখন বেআইনি চোরাই ড্রাগের সবচেয়ে বড় কনজিউমার। ভারতে এখন থেকে স্টেপ নেওয়া উচিত যাতে ড্রাগ অ্যাবিউসের ভয়াল স্রোতকে প্রতিহত করা যায়, যাতে এই বিষবৃক্ষকে একেবারে গোড়া থেকে নির্মূল করা যায়। তা নাহলে মার্কিন দেশের মত মহামারীর আকার ধারণ করবে।

তিনি আরও বলেছেন ড্রাগের অ্যাবিউসের বিধ্বংসী প্রভাবকে কমাতে হলে গোড়াতেই ড্রাগের—সাপ্লাই নয়—ড্রাগের ডিমাণ্ড তার চাহিদাকে কমাতে হবে—পৃথিবীর নানা দেশের কনফারেন্সে মিটিং-এ ড্রাগ অ্যাবিউসের অনেক—অনেক আলোচনায় চূড়ান্তভাবে স্বীকৃত হয়েছে—Fight against drugs cannot be won unless one wins fight against demand ড্রাগের বিরুদ্ধে যুদ্ধে কিছুতেই জয়ী হওয়া যাবে না। যদি ড্রাগের চাহিদা কমানোতে সফল হওয়া না যায়।

২৮ মে, ১৯৮৭ কলকাতায় অনুষ্ঠিত এই সেমিনারেই ঢাকায় মার্কিন দূতাবাসের আঞ্চলিক মেডিকেল অফিসার Regional Medical officer ডক্টর স্টিফেন জনসন বললেন, কলকাতায় যে ড্রাগ অ্যাবিউস অত্যন্ত দ্রুত হারে বেড়ে চলেছে বেশ বুঝতে পারা যায় কেন না তার একেবারে লাগোয়া আর একটি প্রতিবেশি রাষ্ট্রের রাজধানী শহর ঢাকাতে ড্রাগের সর্বনাশা প্রভাব প্রায় মহামারীর মত হয়ে দেখা দিয়েছে—একটু থেমে আবার বলেছিলেন আমার ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতা থেকে একটা ঘটনা বলি—

একদিন সকালে আমার চেম্বারে গাড়ি করে এল এক পেশেণ্ট। আঠাশ কি ত্রিশ বছর বয়স। ঢাকাই এক ধনী ব্যবসায়ী বাঙ্গালী মুসলমান ইয়াসিন মিঞার ছেলে নুরুদ্দিন। পরণে ভজ্জের মসলিনের বড় ঘেরের পায়জামা আর বুটিদার পাঞ্জাবী। চুলগুলো উসকো খুসকো, যেন কাকের বাসা। চোখদুটো গর্তে ঢোকা। পাকা ড্রাগ অ্যাডিক্টের চেহারা।

কি হয়েছে ?

সাহেব ব্রাউন সুগার না হোয়াইট সুগার কি বলে তাই খেয়েছে—একটু থেমে

ইয়াসিন আবার বললেন, কলেজের বন্ধুদের পাল্লায় পড়ে একদিন ব্ঝি খেয়েছিল—আর ছাড়তে পারছে না হুজুর—

Once hooked, hooked forever. হেরোইন একবার ধরলে আর কখনো ছাড়া যায় না—এসব কথা ডক্টর জনসনের মুখে এসে গিয়েছিল। কিন্তু বললেন না ইয়াসিন মিঞা আপসেট হয়ে যাবেন—

সাহেব এখন আবার নুরু আমার ওপর খুব ক্ষেপেছে মাথা নিচু করে কেমন অস্পষ্ট গলায় বলল ইয়াসিন—আমার ওপরে প্রতিহিংসা নেওয়ার জন্য আরও বেশি করে হেরোইন খাচ্ছে—আমার একমাত্র ছেলে যদি ইলেকট্রিক শক টক দিয়ে নেশাটা ছাড়িয়ে দিতে পারেন—বলতে বলতে তার চোখদুটো ভিজে উঠল।

আপনার ওপরে চটেছে কেন ?

কোন কথা বললেন না ইয়াসিন। জনসন বেশ বুঝতে পারলেন—কিছু একটা চাপতে বা লুকোতে চেষ্টা করছে।

আরে—সাইকোলজিক্যাল ট্রিটমেণ্টে সব জানার দরকার আছে। ডক্টর স্টিফেন এবার বেশ বিরক্ত হয়ে ইংরেজীতে বললেন—Dont waste my time—

সাহেব কলেজের কোন হিন্দু ব্রাহ্মণ পরিবারের মেয়ের প্রেমে পড়েছে আমার নুরু—তাকেই সাদী করে ঘরে নিয়ে আসবে বলে—

যদি মেয়েটির বাড়িতে কোন অবজেকশান না থাকে, তাহলে লাগিয়ে দিন সাদী—

বাবা ! ইয়া আল্লাহ মুসলমান ছেলেকে বিয়ে করবে বামনের মেয়ে ! আপত্তি থাকবে না—

তাহলে হেরোইন কখনো ছাড়তে পারবে না নুরু—ডক্টর জনসন স্রেফ জবাব দিয়ে দিলেন—

ফাঁকা চেম্বারে একা বসে রইলেন ডক্টর স্টিফেন জনসন। তিনি অনেক—অনেকদিন ইণ্ডিয়ায় এবং বাংলাদেশে কাটিয়েছেন। দেখেছেন—এই দুটো জাত—হিন্দু আর মুসলমান যুগের পর যুগ ধরে পাশাপাশি বাস করলেও তাদের ভেতরে উত্তর মেরু—দক্ষিণ মেরুর ব্যবধান পূর্ব আর পশ্চিমের মত—they shall never meet. আর দুটো জাতই নানাবিধ সংস্কার এবং ট্যাবুজ (Taboos) বা অন্ধ বিশ্বাসের জগদ্দল পাথর বুকে নিয়ে বাস করছে—যেমন বিড়ি সিগারেট খেলেই ছেলে খারাপ হয়ে গেল, মদ খেলে গোল্লায় গেল—বেজাতের মেয়ের প্রেমে পড়লে ইহকাল-পরকাল রসাতলে গেল—এইসব সংস্কার এবং বিধিনিষেধ বা রেস্ট্রিকশানের জন্যই ইয়ংদের ভেতরে ড্রাগের চাহিদা বেড়েই চলেছে। আরও বেড়ে যাবে—under increasing social pressure to use the drug অর্থাৎ কতগুলো মিথ্যা ভিত্তিহীন সংস্কার দিয়ে তৈরি সমাজব্যবস্থার চাপই তাদের ড্রাগ খেতে বাধ্য করছে।

এই ঘটনাটি খুব সংক্ষেপে বর্ণনা করে কলকাতার ইউ. এস. ইনফরমেশানের অডিটোরিয়ামে অনুষ্ঠিত সেই সভায় ডক্টর জনসন বললেন—এদেশের হিন্দু-মুসলমানের দুটো জাতিরই যুগযুগান্তর ধরে বংশপরম্পরায় তাদের রক্তে প্রবাহিত এই সংস্কার বা

ট্যাবুজ তাদের সংস্কৃতিকে, জীবনচর্যাকেও বিষাক্ত করে তুলেছে এটাই হল Culturally patterned behavionr. এই নাগপাশ থেকে উদ্ধারের কোন আশা নেই—তাই—ব্যক্তিগতভাবে কোন অ্যাডিক্টের সাইকোলপ্যাথোলজিক্যাল ট্রিটমেন্টের কোন গুরুত্ব নেই—Individual Psychopathological aspect is less important. তাই—

অ্যাডিক্টদের ভয় দেখিয়ে—ড্রাগ খেলে তুমি মরে যাবে বা তাদের ওপর টরচার করে তাদের ড্রাগ ছাড়ানো কখনো যাবে না। দরকার জনমানসের ভেতরে জাগিয়ে তুলতে হবে একটা চেতনা—ড্রাগ ব্যবহার করব না—শত দুঃখকষ্টেও ড্রাগ স্পর্শ করব না। যেমন আমেরিকার অ্যান্টি ড্রাগ বা ড্রাগ প্রতিরোধের স্লোগান তুলেছেন স্বয়ং মিসেস রেগান—Just say—No' থেমে গেলেন ডক্টর ভট্টাচার্য। নারকো টেররিজমের নিউজ কাটিংটা কভার ফাইলে রেখে দিলেন। কিন্তু কেন যেন তাঁর মুখে চেপে নেমে এল আষাঢ়ের কালো মেঘ।

কি হল ডাক্তারবাবু ?

ডাক্তার স্টিফেন জনসন বলুন আর আপচার্চই বলুন—এঁদের কথাগুলো খুবই সুন্দর এবং গুরুত্বপূর্ণ কিন্তু—

কিন্তু কি ?

এহ বাহ্য। এসবই বাইরের ব্যাপার, ডাক্তার ভট্টাচার্য একটু থামলেন। মনে হল যা বলতে চেষ্টা করছিলেন—সেগুলো গুছিয়ে নিচ্ছেন। বললেন, আমাদের দেশে কিন্তু ড্রাগের সমস্যার শিকড় অনেক—অনেক গভীরে এবং সুদূর প্রসারি। একটু থেমে চোখদুটোকে দূরে ছড়িয়ে দিয়ে আবার আস্তে আস্তে বললেন, সেই বিষবৃক্ষের ডাল-পালা বহু—বহু দূরে দূরে ছড়ানো—

কি রকম ?

এই সেমিনারের বক্তা মি· এ কে দত্ত—আই জি (I G Crime) বলেছিলেন—এখন বোম্বাই শহর হয়ে উঠেছে আমেরিকা ও ইউরোপগামী বেআইনি চোরাই হেরোইনের ক্লিয়ারিং হাউস। পশ্চিমের গোল্ডেন ক্রিসেন্ট অর্থাৎ আফগানিস্থান, পাকিস্তান, ইরানের আফিম বা হেরোইন আগে আসত পাঞ্জাবের ভারত-পাকিস্তান সীমান্তের বেড়া ডিঙ্গিয়ে রাতের অন্ধকারে। পাঞ্জাবে গোলমাল বলে এই বর্ডার সীল করে দেওয়া হয়েছে। এখন নতুন রুট গজিয়েছে রাজস্থান গুজরাটের ভেতরে দিয়ে। এই পথে বোম্বাই হল মাঝামাঝি জায়গা। বোম্বাই না এসে যাওয়ার কোন উপায় নেই। এই বোম্বাই থেকেই কলকাতায় দিল্লীতে খুচরো বিক্রির জন্য হেরোইন প্রচুর চালান যায়—আর এই হেরোইন খেয়েই নতুন প্রজন্মের নেশাখোরদের দল তৈরি হচ্ছে—giving riseto a new generation of addicts···

হবে না—কিছুই হবে না—হতাশ হয়ে মাথা ঝাঁকিয়ে বললেন ডক্টর দেবাশীষ ভট্টাচার্য ড্রাগ অ্যাবিউস কোনদিনই এদেশ থেকে—পৃথিবী থেকে মানুষের সভ্য সমাজ থেকে যাবে না—

কেন? আমি সূত্র ধরিয়ে দিয়ে বললাম—আপনি বলছিলেন বিষবৃক্ষের ডালপালা বহু বহু দূরে দূরে ছড়ানো—একটু থেমে গেলেন তিনি। আবার যেন বিদ্যুত চমকের মত তাঁর কিছু মনে পড়ে গিয়েছে—মনে হল—সারা মুখখানা কেমন ঝকমক করে উঠল। বললেন, তাহলে একটা ঘটনা বলি—শুনুন—শুনলেই বুঝতে পারবেন—ড্রাগের সর্বনাশা বীভৎসতা কত কতদূর ছড়িয়েছে।

সন্ধ্যার অন্ধকার নেমে আসছিল।

সলিল সেন—আবগারির এস· আই বা সাবইন্সপেক্টার হন্যে হয়ে ঘুরছেন শ্যামনগরের উপকণ্ঠে চব্বিশ পরগনার গ্রামে গ্রামে। সঙ্গে তাঁর দুই অনুচর—দুটো লাঠিধারী সেপাই—পায়রাজ আলি এবং শিউচরণ। তাদের চোখের সন্ধানি দৃষ্টি সার্চলাইটের মত আছড়ে আছড়ে পড়ছে তালগাছের মাথায় মাথায়।

বলা দরকার প্রত্যেকটি তালগাছের গায়ে টিনের চাকতিতে নম্বর লেখা থাকে। সেই নম্বরের আবার ডিটেলস অর্থাৎ গাছের বা বাগানের মালিকের নাম, যাকে বাগান বিক্রি করা হয়েছে—সেই তাড়ি ভেন্ডার বা তাড়ির কারবারির নাম ইত্যাদি লেখা থাকে আবগারির শ্যামনগর সার্কেলের আবগারির দারোগাবাবুর রেজিস্টারে। শুধু ভেন্ডারের নাম নয়—সেই ভেন্ডার আবার কোন্ কোন্ গাছুয়াকে দিয়ে তালগাছ থেকে রস বা তাড়ি নামাবে সেই গাছুয়াদের নামধামও থাকে। কিন্তু তার বাইরে লুকিয়ে ছাপিয়ে উটকো লোক গাছে উঠে রস পাড়তে চেষ্টা করলেই—সঙ্গে সঙ্গে গ্রেপ্তার জেল কিম্বা জরিমানা। কিন্তু—

যা হয়—যা হয়ে থাকে। আইন থাকে—আইনের মত কাগজে কলমে। ইনপ্রাকটিশ বা বাস্তবক্ষেত্রে বেআইনি অন্যায় কাজ চলতে থাকে পুলিশের নাকের ডগায়। প্রায়ই অন্ধকার গভীর রাতে কি খুব ভোরে যখন শেষ রাত্রির অন্ধকার গাছের পাতায় পাতায় বাদুড়ের মত ঝুলতে থাকে তখন চুরি করে গাছে উঠে রস পেড়ে নেয়। ছাঁড়িটা যেমন টাঙান ছিল তেমনি রেখে দিয়ে চলে যায়।

ধরা পড়লে শ্রীঘর। তবে প্রায়ই ধরা যায় না। তবুও আবগারির লোক এবং বাগানের মালিক তক্কে তক্কে থাকে। রাত জেগে গাছ পাহারা দেয়। সেদিন সলিলবাবু এসেছিলেন রাত তিনটার সময়। প্রায় দশ-বারোজন উটকো গেছোকে ধরে ফেলেছেন। চুরি করে তাড়ি পাড়ছিল। তাদের গ্রেপ্তার করে ভ্যানে তুলেছেন। তাড়ি সিজ করেছেন। তবুও—

তবুও সন্তুষ্ট নয় সলিলবাবু। খুশি নন। পরিতৃপ্ত নন। খুশি হওয়ার কথাও নয়। ছোকরা সুপারিন্টেডেন্ট সলিলের ডায়েরিতে খুব খারাপ কমেন্ট করে টেনে লাল কালিতে নোট দিয়েছেন—আপনার কেস ফিগার ফল করছে—প্লিজ এক্সপ্লেন হোয়াই। নোট পেয়ে অবধি রাগে অস্বস্তিতে জলে যাচ্ছেন। সুপারিন্টেডেন্ট সাহেব ডবলিউ বি· সি· এস দিয়ে সাহেব হয়ে মাথার ওপর বসেছেন—তাঁর কি প্রাকটিকাল কোন এক্সপিরিয়েন্স আছে—তিনি কি জানেন, শ্যামনগর সুতোকলে অটোমেটিক মেশিন বসেছে। চল্লিশজনকে ছাটাই করেছে। এখন তাড়ি কি গাঁজার

স্মাগলিং তো বাড়বেই। বেকার হয়ে যাওয়া মানুষগুলো পেট চালাবে কি করে? আরে আবগারির বড়সাহেব হলেই হয় না—অভিজ্ঞতা থাকা চায়। রাগে বিরক্তিতে ঘেন্নায় পিক্ করে একদলা থুথু ফেলেন আবগারির সাবইন্সপেক্টার সলিল সেন।

বেলা বাড়ে।

সূর্য চড় চড় করে মাথা ঠেলে ঠেলে ওপরে ওঠে। পায়রাজ আলি বলে দারোগাবাবু এবার চলুন—আর কেস হবে না। বেলা গড়িয়ে গেছে—

চল—ক্লান্ত অবসন্ন কণ্ঠে বলেন সলিলবাবু। বড়সাহেবের কুটিল মুখখানা তার মনের ভেতরে জ্বলজ্বল করে। তাঁকে বলে কি না—কেস ফিগার—ডাউন—হোয়াই?

আরে! হঠাৎ সলিলবাবুর মাথায় রক্ত চলকে উঠল। হেঁকে বললেন—গাছে কে রে?

অনুচরদের ডেকে বললেন পায়রা—জ—শিউ—চরণ—দেখ তো গাছে কে—

এই শালে শুয়ার কী বাচে—নেমে আয়—পায়বাজ খিস্তি করতে লাগল।

আউর একঠো কেস হয়িন গেল, গোঁফে তা দিয়ে বলল শিউচরণ।

আসামী নেমে এল।

হতাশ হয়ে গেলেন সলিলবাবু। দশ কি এগার বছরের এক অবোধ বালক। তার হাতে তাড়ির ভুঙ্গি (হাঁড়ি)—

এই কে রে তুই?—কি নাম তোর—কেন গাছে উঠেছিলি বল—

কোন কথাই বলল না ছেলেটি। ভয়ও পেল না। শুধু তাড়ির হাঁড়িটা বুকের ভেতরে চেপে ধরল।

তুই কি নেশা করিস—তাড়ি খাস?

না।

তাহলে তাড়ি নিয়ে তুই কি বিক্রি করবি?

না।

তাহলে বল হারামজাদা তাড়ি পেরেছিস কেন, বলেই সলিলবাবু তাকে এক থাপ্পড় কশিয়ে দিলেন গালে। আশ্চর্য! অত জোরে একটা চড় খেয়েও কিন্তু ছেলেটি কাঁদল না। শুধু তাড়ির হাঁড়িটা জাপটে ধরে বলল, আমারে জেলে দাও—ফাঁসিতে লটকে দাও কিন্তুক তাড়িটা নিয়ো না গো—

সলিলবাবু অবাক হলেন।

নেশা করে না। বাজারে বিক্রি করে না। কিন্তু তাড়ির ওপরে তাহলে এত আকর্ষণ কেন?

তোর বাড়িতে কে কে আছে রে?

বেধবা মা। আর খুব ছোট ছোট গেঁড়ি চারটে ভাইবোন—

তোদের চলে কি করে?

মা ধানকলে কাজ করে। যেদিন কাজে লাগায়—সেদিন মজুরি পায়—সেদিন

আমরা পেট ভরে খাই বাবু—

আর যেদিন পায় না ?

সেদিন হরিমটর—অত্যন্ত স্মার্ট ও সপ্রতিভ ছেলেটির মুখে ব্যথার ছায়া ফুটে উঠল। বলল, মুশকিল কি হয় জানেন বাবু—খিদের জ্বালায় বাচ্চাগুলো কাঁদে—ওরা তো বোঝে না—

তুই এখন এই তাড়ি নিয়ে কি করবি ?

মা তো কলে গেছে। বাড়িতে পা দিয়েই দেখব—ভাইবোনগুলো খিদেতে চিৎকার করে কেঁদে কেটে একেবারে হুলুস্থুলুস বাধিয়ে বসে আছে—

তা তুই কি করবি ?

ওদের সামান্য দুটোখানেক মুড়ি ছিটিয়ে তাড়ি খাইয়ে দেব হুজুর। তাড়ির স্বাদ তো মিষ্টি মিষ্টি ওরা পেট পুরে খেয়ে নেবে—নেশার ঝোঁকে ঘুমিয়ে কাদা হয়ে যাবে—আমারও হাড় জুড়বে—

সলিলবাবুর মনে হয়েছিল যে থাপ্পড়টা ছেলেটাকে দিয়েছিলেন সেই থাপ্পড়টাই তার গালে এসে পড়ল আরও জোরে। দূরে দূরে রোদে পোড়া তালগাছগুলো পাতায় পাতায় বাতাসে খর খর শব্দ উঠছে। যেন সর্বনাশের করতাল বাজছে। আর তারা যেন মাথা নেড়ে নেড়ে একটা—একটা প্রশ্নই করছে—

কেন—কেন এই অভাব অনটন—কেন এই দারিদ্র্য। অভাবের কষ্ট যন্ত্রণা আছে বলেই তো বেআইনি কাজ করতে হয়। পুলিশ ধরবে—জেল দেবে—আর এরা গোপনে অন্যায় কাজ করেই চলবে হয় স্মাগলিং না হয় ইল্লিসিট ড্রাগ চালান দেবে—বাঁচার জন্যই দিতে হবে—

এর শেষ কোথায় ?

এবার বুঝতে পারছেন—সমস্যা কত গভীরে গম্ভীর হয়ে গেলেন ডক্টর ভট্টাচার্য বললেন, ড্রাগ অ্যাবিউসকে রোখার জন্য চেষ্টা তো নেহাত কম হচ্ছে না—

একটু থেমে তাঁর নোটবুক থেকে দেখে দেখে বললেন—

(ক) এই বিবেকানন্দ এডুকেশান সোসাইটিরই উদ্যোগে অনুষ্ঠিত ড্রাগ প্রতিরোধের সভায় সমাজকল্যাণ দপ্তরের কেন্দ্রীয় মন্ত্রী শ্রীমতী বাজপেয়ী ঘোষণা করে গেলেন ৮৭-৮৮ সালে ড্রাগ অ্যাবিউসকে প্রতিহত করার জন্য ইণ্ডিয়া গভর্ণমেণ্ট ১'১৪ কোটি টাকা অনুমোদন করেছে—ড্রাগ অ্যাবিউসের বিরুদ্ধে যুদ্ধের জন্য একটা সংস্থা বা ব্যুরো তৈরি করতে হবে—

(খ) শার্ক (SAARC) বা South Asian Association for Regional Co-operation এর সভায় দক্ষিণ এশিয়ার সাতটি দেশ একযোগে ড্রাগের বিরুদ্ধে সংগ্রামে অবতীর্ণ হওয়ার মহৎ সঙ্কল্প নিয়েছে। শার্কের স্ট্যাণ্ডিং কমিটি নিচের প্রস্তাবগুলো নিয়েছে—

(১) প্রত্যেকটি দেশে একটি করে ড্রাগ প্রতিরোধ সংস্থা তৈরি করতে হবে।

(২) খুব উন্নত ধরনের টেলিকমিউনিকেশানের মাধ্যমে প্রতিটি দেশের এনফোর্সমেণ্ট এজেন্সি অর্থাৎ পুলিশের এবং ড্রাগের চোরাকারবারিদের সংঘাতের খবর আদানপ্রদান করতে হবে।

(৩) নেশাখোরদের অত্যন্ত সহানুভূতি এবং সহৃদয়তার সঙ্গে চিকিৎসা করে তুলতে হবে ? আজও পৃথিবীর কত দেশে—কত সংস্থাই যে এই ড্রাগের সর্বনাশা বীভৎসতার বিরুদ্ধে লড়াই করছে তার শেষ নেই। বিশদ বিবরণ অবান্তর। সবচেয়ে বড় কথা ড্রাগের কুফল সম্বন্ধে সচেতনতা জেগেছে দুনিয়ার দেশে দেশে মানুষের মনে।

কাস্টমস, পুলিশ, এনফোর্সমেণ্টও বসে নেই। এই সেদিন মগরা (হুগলী) চেকপোস্টে ১ হাজার কে. জি হ্যাসিস ধরেছে পুলিশ, যার বাজার মূল্য—৮ কোটি টাকা—সৌদি আরবে পাচার করছিল দুই চোরাকারবারি।

নাগালান্ড পুলিশ কিছুদিন আগে ৩৭৫ গ্রাম হেরোইন ধরেছে। তার অফিসিয়াল ভ্যালু ১,৫০,০০০ টাকা আর বাজার মূল্য ২,২৫,০০০ টাকা।

আরও কত বেআইনি ড্রাগ আটক করার খবর তো বর্তমান গ্রন্থেরও এখানে সেখানে ছড়িয়ে ছিটিয়ে আছে। এখন প্রশ্ন হচ্ছে—

ড্রাগ ট্রাফিকিং বিন্দুমাত্র কমেছে কি ?

স্মাগলিং কমেছে কি ? কেমন উত্তেজিত হয়ে উঠলেন ডাক্তার। বললেন—চোরাকারবারের পিছনে থাকে হয় মানুষের লোভ—অন্তহীন, সর্বগ্রাসী লোভ না হয় নিষ্করুণ ও হিংস্র দারিদ্র্য। একটু থেমে একটা দীর্ঘশ্বাস ফেলে আবার বললেন এসব সমস্যার সমাধান কে করবে—মানুষের লোভ আর গরীবির সঙ্গে লড়াই করবে কে ?

আমি অনেক—অনেক ভেবেছি বুঝলেন, ডক্টর ভট্টাচার্য আবার আস্তে আস্তে বললেন, এই শ্বাসরোধী অন্ধকার কারাগার থেকে উদ্ধার পাওয়ার কোন রাস্তাই নেই জানেন—একটু থেমে আবার বললেন, দিনে দিনে মানুষের লোভ যে বেড়েই চলেছে—তাই পাপও বাড়ছে তবে একটা—একটাই আশার কথা আছে।

কি ?

জানেন ড্রাগের ওপরে একটা নতুন বই বেরিয়েছে দেবাশীষ যেন আমার কথা শুনতেই পেলেন না। বললেন—বইটির নাম—Drugs in Perspective। তাতে দেখেছি—অ্যাডিক্টদেরই একটা Conciousness—সচেতনতা এসেছে ড্রাগ যে সর্বনাশা। বিশেষ করে সাইকো-অ্যাক্টিভ (Psychoactive) ড্রাগ ক্যানাবিস, এল এস ডি এবং হেরোইন যে প্রচণ্ড ক্ষতি করে তা বুঝতে পেরেছে—হঠাৎ থেমে বললেন—পরে বলব—আজ খুব—ক্লান্ত—

উনিশ

নেশাখোরদের প্রতি তার বাবা-মার কর্তব্য এবং বাবা মার মানসিকতার ওপরেই নির্ভর করে তাদের সুস্থ জীবন, সবচেয়ে বড় চিকিৎসা হল —তাদের প্রতি ভালবাসা-মমতা।

জন স্টেনলি স্ট্র্যাণ্ড থেকে শুরু করে ড্রাগ বিশেষজ্ঞ এবং শিশুমনস্তত্ত্ব বিদ্যার পণ্ডিত রস (Ross) ড্রাগে আসক্ত ছেলেমেয়ের বাবা মা এবং অভিভাবকদের কি করা উচিত তার একটা প্রোগ্রাম করে দিয়েছেন—সেটা নিচে দেওয়া হল—

(১) বাবা মা ছেলেমেয়েদের সঙ্গে বন্ধুর মত অন্তরঙ্গ হয়ে মেলামেশা করবেন। আপনার দুঃখকষ্ট সব খোলাখুলি বলবেন। তারা ছোট বলে দূরে সরিয়ে রাখবেন না। তাদের কাছে টেনে নেবেন। কখনো যেন তারা নিজেদের বিচ্ছিন্ন না ভাবে।

(২) আপনি কি আপনার ছেলে বা মেয়েকে বাড়িতে না হোস্টেলে রেখেছেন? আপনি কি মনে করছেন সে মন দিয়ে পড়াশুনা করছে—আপনি কি বছরে একবার হোস্টেলে গিয়ে আপনার ছেলেকে দেখে এসে কর্তব্য সারেন—না নিয়মিত যান—খুব ঘন ঘন যাবেন—পড়াশুনার প্রগ্রেস দেখবেন নিজে। হেডমাস্টার কি সুপারিণ্টেডেণ্টের রিপোর্ট জেনেই চলে আসবেন না।

(৩) আপনার ছেলের সঙ্গে দেখা করার পরই আবার স্কুলের হেডমাস্টার কিম্বা কলেজের প্রিন্সিপালের সঙ্গেও আলাদা করে দেখা করবেন। তাঁদের ইমপ্রেশানটাও আপনার ছেলের সম্বন্ধে জেনে নেবেন।

(৪) আপনি কি হেডমাস্টার এবং স্টাফদের কোন উপহার দিয়ে থাকেন—আপনার ছেলেকে ভাল করে দেখাশোনা করবে বলে? অনুগ্রহ করে এসব করবেন না। আপনার ছেলের মনে হবে—বাবার সঙ্গে হেডস্যারের দারুণ খাতির—অতএব সিগারেট কি গাঁজা খেলেও স্যার কিছু বলবেন না।

(৫) আপনার ছেলে বা মেয়ে যখন ছুটিছাটায় হোস্টেল থেকে বাড়িতে আসবে, ছুটির সেই কয়টা দিন আপনি এমন করে প্রোগ্রাম করবেন যাতে বেশির ভাগ সময় (Maximum time) তার সঙ্গে কাটাতে পারেন।

(৬) যদি আপনার ছেলে হোস্টেলে না থেকে বাড়ি থেকেই পড়াশুনা করে তাহলে জানবেন আপনার দায়িত্ব অনেক বেশি।

(ক) অফিস থেকে ক্লাবে আড্ডা দিয়ে রাত করে আসা চলবে না (খ) অফিসের কাজে লম্বা দিনের জন্য ট্যুরে যাওয়া উচিত হবে না (গ) সন্ধ্যাবেলা বাড়িতে ফিরে এসে হয় আপনি অফিসের ফাইলে মুখ গুঁজলেন না হয় বন্ধুদের সঙ্গে আড্ডায় কি তাস খেলায় মেতে উঠলেন কি টেলিফোনে আত্মীয়বন্ধুদের সঙ্গে যোগাযোগ করে চললেন—ওদিকে বললেন—আমি তো ছেলের পড়াশুনা দেখে থাকি—এই কপটতা

কখনো করবেন না। (ঘ) সন্ধ্যায় সব কাজ ছেড়ে ছেলের পড়ার টেবিলে আধঘণ্টা কি পনের মিনিট হলেও বসবেন।

(৭) আপনি আপনার অফিসের কি ব্যবসার কাজে এত বেশি ব্যস্ত থাকবেন যে আপনার ফ্যামিলির দিকেও তাকাতে পারবেন না—তা যেন না হয়। ছেলে যেন না ভাবে—আপনি এক দূর কোন অজানা গ্রহের মানুষ।

(৮) আপনি যখন তখন আত্মীয়স্বজন কি বন্ধুর বাড়িতে একা একা নিমন্ত্রণ খেতে চলে যাবেন—তা কখনো করবেন না। সম্ভব হলে স্ত্রী এবং ছেলেমেয়েদের সঙ্গে নিয়ে যাবেন।

(৯) আপনি কি আপনার ছেলেমেয়ের সামনেই মদ খেয়ে থাকেন, পরে যুক্তি দেন অত্যন্ত টায়ার্ড 'এক্সহসান' এবং এক্সসাইটমেন্ট বা উত্তেজনা কমানোর জন্য খাচ্ছেন, খেতে হচ্ছে—কখনো করবেন না এসব। আপনার সন্তান আপনার মদ্যপানের স্বপক্ষে কোন যুক্তিই শুনতে চাইবে না—মানবে না। পরিণাম হবে বিষময়।

(১০) আপনি কি আপনার ছেলেমেয়েব সামনেই আপনার স্ত্রীর সঙ্গে ঝগড়া-ঝাঁটি কি কটু কথার ঝড় তোলেন—অনুগ্রহ করে নিজেদের সংযত করবেন। মনে রাখবেন—একটা সুখী পরিবার একটি সুমধুর সঙ্গীতের মত তার তাল লয় রাগ সব ঠিক ঠিক থাকবে—কোথাও এতটুকু বেসুর হল কি তাল কেটে গেল। মনে রাখবেন সুখ ও শান্তির সংসারের কোন ছেলে কি মেয়ে কখনো ড্রাগের কবলে পড়ে না। শতকরা ৯০ জনই পারিবারিক অশান্তি ভুলতে হেরোইন খায়।

(১১) যদি দেখেন আপনার ছেলে ড্রাগ ধরেছে। কখনো তার সঙ্গে রূঢ় কর্কশ ব্যবহার করবেন না। মারপিট করে বাড়ি থেকে তাড়িয়ে দেবেন না—অবশ্যই আপনার শুভাকাঙ্ক্ষীরা বলবে আচ্ছা করে বেতিয়ে দিন তাতে কিন্তু তাকে ধাক্কা দিয়ে আরও গভীর অন্ধকার খাদে ফেলে দেওয়াই হবে—আপনার ছেলে চিরকালের মত হারিয়ে যাবে।

(১২) দৈবাৎ ড্রাগ খেলেও অনুগ্রহ করে উদ্বিগ্ন হবেন না ছেলের সম্বন্ধে। জানবেন—অসৎ সঙ্গে পড়ে তার সাময়িক মতিভ্রম হয়েছে। আপনি ভালবাসলেই সে ড্রাগ ছেড়ে দেবে। কিন্তু রূঢ় আচরণ করলেই উল্টো হবে। কখনো ভাববেন না আপনার ছেলে ড্রাগ খেয়েছে বলেই আপনার সামাজিক প্রতিপত্তি সুনাম ক্ষুন্ন হয়েছে—এটা আপনার কমপ্লেকস। আপনাকে তার বন্ধুর মত বলতে হবে—তোমার দুঃখ কি বাবা, তোমার কষ্ট কি, আমি এখনও বেঁচে আছি।

খুব সাবধান—কাঁচের জিনিস বোঝাই বাক্সের ওপরে যেমন লাল কালিতে লেখা থাকে PLEASE HANDLE WITH CARE। কখনো বাবা মা এবং সন্তানের সুমধুর সম্বন্ধটা যেন ভেঙ্গে তচনচ না হয়ে যায়। মনে রাখবেন—আপনার ছেলে তার নেশাখোর বন্ধুদের পাল্লায় পড়ে তাদের কুপ্রভাবে ড্রাগের শিকার হয়েছে। আপনার পিতা হিসেবে কর্তব্য—সেই হিংস্র মাংসাশী জন্তুর অর্থাৎ ড্রাগের থাবা থেকে তাকে রক্ষা করা—কেমন করে করবেন?

ভালবেসে।

ভালবাসা, সহানুভূতি, মমতার চেয়ে তাদের ফিরিয়ে নিয়ে আসার আর কোন বড় অস্ত্র নেই—

LOVE—BIGGEST WEAPON

মা-কে ভাবতে হবে

(ক) আপনি কি সমাজসেবা করে নাম কিনতে অভিলাষি—আপনি কি কেরিয়ারিস্ট?

(খ) আপনি ঘর-গেরস্থালীর কাজ নিজে করেন, না—ঝি চাকরের ওপর নির্ভর করে থাকেন? আপনার ছেলেমেয়েরা যেন মনে না করে আপনি সংসার থেকে আলাদা একটা জগতের মানুষ।

(গ) আপনি সম্ভব হলে নিজে রান্না করবেন—নিজে দাঁড়িয়ে থেকে তাদের খাওয়াবেন—কখনো পরিচারিকার ওপরে ভার দেবেন না—তাদের খাওয়ার সময় বেরিয়ে যাবেন না।

(ঘ) আপনি আপনার সাবালক ছেলে কি সাবালিকা মেয়ের সন্ধ্যায় বাড়ি ফেরা নিয়ে কখনো কড়াকড়ি করবেন না। দেরি হলেও বন্ধুর মত কাছে গিয়ে জানতে চাইবেন কেন দেরি হল—কখনো কোন কুটিল সন্দেহ করবেন না।

(ঙ) আপনি দেখবেন—বাড়িতে তারা স্কুলের হোমটাস্ক নিয়মিত করছে কি না।

(চ) আপনি তাদের ব্যক্তিগত স্বাস্থ্য ও পরিষ্কার পরিচ্ছন্নতার দিকে নজর দেবেন—তখুনি বুঝতে পারবেন—ড্রাগ ধরেছে কিনা।

(ছ) আপনি আপনার প্রতিটি ছেলেমেয়েকে সমান ভালবাসবেন—কাউকে বিশেষ প্রিয়পাত্র করবেন না।

(জ) কখনো ছেলেমেয়েদের সামনে স্বামীর সঙ্গে খিটিমিটি করবেন না। রূঢ় কর্কশ ব্যবহার কি কটু কথা বলবেন না। আপনার সন্তানের মঙ্গলের দিকে তাকিয়ে নিজেকে সংযত করবেন। তারা যেন বুঝতে না পারে—বাবা মার সঙ্গে ভেতরে মিলমিশ নেই।

মনে রাখবেন—মা-বাবার ভেতরে মনোমালিন্য, ঈর্ষা, বিদ্বেষ সন্তানের মনে হতাশার জন্ম দেয়—তারা ড্রাগের শিকার হয়ে পড়ে।

কোন্ কোন্ লক্ষণ দেখলে বুঝবেন ড্রাগ ধরেছে।

(১) আপনার সন্তান অলস হয়ে পড়বে। ক্লান্তিতে তার শরীর ভেঙে আসবে—সীমাহীন একটা জড়তা তাকে ঘিরে ধরে থাকবে।

(২) তার বিছানা টেবিল নোংরা করে রাখতে ভালবাসবে। ঘর পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন করতে গেলে, বিছানার চাদর পালটাতে গেলে বিক্ষুব্ধ হয়ে উঠবে।

(৩) আপনার ছেলে হয়ত খেলাধ্লায় খ্ব ইণ্টারেস্টেড ছিল—ড্রাগ খেলেই দেখবেন আর খেলতে যাবে না। অন্ধকার ঘরে বসে থাকতে ভালবাসবে।

(৪) পড়াশ্নায় অবনতি ঘটবে দ্রুত। হ্যাসিস তখন তাকে এক অলীক স্বপ্নের জগতে নিয়ে গিয়েছে—সে তখন বিশ্বব্রহ্মাণ্ডের রাজা। পড়াশ্নার কোন প্রয়োজনই নেই।

(৫) নেশাখোর তার সৎ বন্ধ্দের অ্যাভয়েড করে—তার গেঁজেল বন্ধ্দের সঙ্গে ওঠাবসা করবে। ব্যবহার হয়ে যাবে র্ঢ় কর্কশ। আপত্তি করা তুচ্ছ কারণে রেগে যাবে—'ইরিটেডেড' হয়ে উঠবে। তার কোন নিন্দা বা সমালোচনা একেবারে সহ্য করতে পারবে না।

(৬) হেরোইনে নেশাগ্রস্তরা তার বাবা-মাকে এড়িয়ে চলবে। তার নিকট আত্মীয় এবং বন্ধ্—তার শ্ভাকাঙ্ক্ষীদের ছায়া মাড়াবে না।

পরিশেষে—স্টেনলি স্ট্র্যাণ্ড এবং রস কতগ্লো ম্ল্যবান কথা বলেছেন পিতামাতার উদ্দেশে।

(ক) ছেলেমেয়ের বয়স ১২ ছাড়িয়ে ১৩ তে পেঁছালেই মদ গাঁজা বা ড্রাগের কুফল সম্বন্ধে তাদের ওয়াকিবহাল করাবেন। স্কুলে কলেজের শিক্ষায় কোথাও ড্রাগের বীভৎসতার কথা নেই। তাই বাবা মা-কে আগে জানতে হবে—ড্রাগের ভয়ঙ্কর পরিণতি।

(খ) বাড়িতে নববর্ষ কি রবীন্দ্র জয়ন্তী কি বিজয়াতে একটা ঘরোয়া অন্ষ্ঠানের আয়োজন করবেন। আপনার ছেলেমেয়েকে তাতে অংশ নিতে বলবেন—যে যা এবং যেট্কু পারে করবে—মোটের উপর—to keep your children involved in nableprojects.

(গ) কখনো আপনার ছেলেমেয়েকে তাচ্ছিল্য করে উড়িয়ে দেবেন না—বলবেন না—এখনকার দিনের ছেলেমেয়েদের কোন নীতি নেই, নিয়মশ্ঙ্খলা নেই। তাতে তারা আহত হতে পারে এবং ড্রাগের দিকে ঝুঁকতে পারে।

(ঘ) আপনাকে মনে রাখতে হবে হ্যাসিস বা গাঁজা, মারিজ্য়ানা, হেরোইন খ্ব সহজে পাওয়া যায় বলে শতকরা ৯0% ক্ষেত্র এইসব ড্রাগে তারা আসক্ত হয়ে থাকে।

বাসি ডাক্তারবাবু—খুব বাসি—কিন্তু এত—এত নিচে নেমে গেছে—যাচ্ছে—

ভুল সুনীল—ভুল, পিঠে চাপড় দিয়ে বেশ উত্তেজিত হয়ে বললেন হেরোইন খেলেই মানুষ নিচে নেমে যায় না—তুমি—তোমার পারসোনালিটি একসার্ট করে তোমার বুদ্ধি দিয়ে আরতিকে অন্ধকার কারাগার থেকে উদ্ধার করতে পার না ?

কোন কথা বলল না সুনীল। তাকে খুব চিন্তিত মনে হল।

পুরুষের ধর্মই তো তাই সুনীল, ডাক্তার এবার মিষ্টি করে বললেন, তুমি যেন কতদূর পড়াশুনা করেছ বলেছিলে—

গ্র্যাজুয়েট ডাক্তারবাবু—১৯৮৫ সালের বি এ. পাশ—

তোমার কি কি কম্বিনেশান ছিল ?

প্লেন আর্টস ডাক্তারবাবু, ফিলসফি—

ফিলসফি ? ডাক্তারের চোখদুটো এবার প্রদীপের মত জ্বলে উঠল। বললেন তুমি তাহলে শাংখ্য পড়েছ—পড়েছ পুরুষ প্রকৃতির থিওরি, তীব্র আবেগে টগবগ করে তন্ময় হয়ে বলে গেলেন প্রকৃতি অন্ধ। আর পুরুষ কিন্তু—খঞ্জ—খোঁড়া—নেংচে নেংচে চলে। কিন্তু তার আছে দুটো চোখ—আছে দৃষ্টি। সে প্রকৃতিকে ঘাড়ে নেয় —সেই পরিচালনা করে প্রকৃতিকে—একটু থেমে আবার গম্ভীর ও কঠোর কণ্ঠে বললেন, তুমি যে যাচ্ছ না—প্রায় যাওয়াই ছেড়ে দিয়েছ বলছ—তার দুটো কারণ থাকতে পারে—

না—কোন কারণ নেই ডাক্তারবাবু—

থাম সুনীল—থাম। ভুলে যেও না আমি সায়িক্রিয়াটিস্ট—এক—হয় তুমি আরতিকে ভালবাস না হয় তুমি ভীতু—কাওয়ার্ড এবং তুমি—তুমি এসকেপিস্ট—

চুপ করে গেল সুনীল।

তুমি যদি সত্যিই ভালবাস—তাহলে মেয়েটাকে ওদের খপ্পর থেকে বাঁচাও, হঠাৎ সুনীলের দিকে তীক্ষ্ণ চোখে তাকিয়ে ডাক্তার বললেন—তোমাকে আরতি এখনো ভালবাসে তো ? আগের মতই পছন্দ করে—

হ্যাঁ ডাক্তারবাবু—আমাকে নিরিবিলি পেলেই কান্নাকাটি করে—বলে তুমি সরকারি চাকরি পেয়েছ—এবার তুমি—

ব্যস—ঠিক আছে—। শোন—বলেই ডাক্তার তাকে কতগুলো পরামর্শ দিয়ে বিদায় করে দিলেন। যাওয়ার সময়ও বললেন—আমি যা যা বলেছি—ঠিক ঠিক করবে কিন্তু সুনীল—ভয় পেও না—থেমে গেলেন ডাক্তারবাবু—

ছয়মাস পর।

সুনীল, ডক্টর দেবাশীষ ভট্টাচার্য এবার সাফল্যের হাসি হাসতে হাসতে বললেন আমার চেম্বারে এসেছিল। সঙ্গে আরতি—তার সিঁথিতে সিন্দুর, পরণে লাল টকটকে কাঞ্জিভরম শাড়ি—কী সুন্দর যে লাগছিল—

ডক্টর শান্তি করুনাকরণও আমার মতই অ্যাডিক্টদের বলতেন—ভয় পেও না—

ডক্টর কর্নাকরণ ?

সে কী এত বড় একটা বই লিখে ফেললেন ড্রাগের ওপরে আর ডক্টর কর্নাকরণের নাম শোনেননি ? একটু থেমে আবার বললেন—আপনার আর দোষ কি জানবেনই বা কি করে—মাদ্রাজের হিন্দু দৈনিকে ১৩ এপ্রিল, ১৯৮৫ বেরিয়েছিল খবরটা—হিন্দু তো সহজে হাতে পড়ে না—

ডাক্তারবাবু—তাঁর হিন্দুর নিউজ কাটিং থেকে যা বলেছিলেন তা এখানে সংক্ষেপে বলা হল—

ডক্টর শান্তি কর্নাকরণ এবং মি· জোসেফ কুরিয়ান দুজনই মাদ্রাজের বিখ্যাত এক সমাজসেবা প্রতিষ্ঠানের প্রতিষ্ঠাতা সভ্য। প্রতিষ্ঠানে আছে De-addiction Center। যুবসমাজকে ড্রাগের নেশা থেকে মুক্ত করে এবং তাদের পুনর্বসতি করে সুস্থ স্বাভাবিক জীবনে ফিরিয়ে দেওয়ার কাজ করে চলেছে প্রায় দুই বছর ধরে।

প্রতিষ্ঠান এ পর্যন্ত ৩০ জন অ্যাডিক্টকে রিয়্যাবিলেট করেছে। তারা আর ড্রাগ স্পর্শ করে না। অথচ তারা এক একজন ছিল পাঁড় নেশাখোর। কি করে —এই অসম্ভবকে সম্ভব করেছিলেন ডক্টর কর্নাকরণ এবার তাঁর নিজের জবানীতে শুনুন—

আমি আমার অভিজ্ঞতা থেকে দেখেছি—উঠতি বয়সের ছেলেছোকরারা বা ছাত্ররা বেশির ভাগই কৌতূহলি হয়ে কিম্বা কলেজের বখাটে ছোকরাদের পাল্লায় পড়ে হেরোইন ধরে—ওরা জানে না হেরোইনের কী ভয়াবহ পরিণতি। শুধু হেরোইন কেন—এল এস ডি, ক্যানাবিস ইত্যাদি সাইকোঅ্যাক্টিভ কোন ড্রাগেরই এফেক্ট ওদের নলেজের বাইরে। বন্ধুদের সঙ্গে মজা করতে যেয়ে ফাঁদে পড়ে যায়। কিন্তু—

তারা যে ড্রাগের খপ্পরে পড়ে গেছে বা পোকার মত জালে আটকে গিয়েছে—সেই ব্যাপারে তারা অত্যন্ত কনসাস। অতএব তাদের রিহাবিলেট করতে কোন অসুবিধা নেই। তবে আমি বা আমাদের প্রতিষ্ঠানের রিহাবিলেট করার কতগুলো প্রসেস আছে—

(১) স্মরণ রাখতে হবে—Environment played an important part in rehabilitating the drug addicts. নেশায় আসক্তদের সুস্থ করে তোলার ব্যাপারে পরিবেশের বিশেষ ভূমিকা আছে—

(২) আমরা করি কি—আগে দেখি অ্যাডিক্ট আছে কোথায়—কলেজ হোস্টেলে না বাড়িতে ? সে ব্রাউন সুগার কোথায় বসে খাচ্ছে। যেখানে বসে নেশা করছে সেই সারাউন্ডিংস থেকে তাকে শিফট করিয়ে দেই নতুন কোন জায়গায়। যেখানে সে নতুন করে জীবন শুরু করতে পারবে—

প্রতিষ্ঠানে এল মাদ্রাজ শহরের এক অ্যাডিক্ট। তাকে বাঙ্গালোরে একটা লেকের ধারে এক সুন্দর বাড়িতে শিফট করিয়ে দিলাম। ছেলেটি ছবি আঁকত। রংতুলি ইজেল ক্যানভাস প্রতিষ্ঠান থেকেই সাপ্লাই করা হল। ছবি নিয়ে মত্ত হয়ে গেল সে। হেরোইন খেতে ভুলে গেল।

(৩) কনসার্নের দৃঢ় বিশ্বাস কোন মেডিসিন নয় কি বড় সায়কিয়াটিস্ট নয়

স্নেহ মমতা এবং সহানুভূতি দিয়ে তাদের সঙ্গে যদি সৌহাদ্য পূর্ণ ব্যবহার করা যায় তাদের মনের ভেতরের গ্লানির অপচ্ছায়া (personality complex) কেটে যাবে। তারা সুস্থ জীবনের অবারিত আলোয় এসে দাঁড়াতে সক্ষম হবে—The Organisation believed in injcting LOVE ANDAFFECTION to the victims along side treatment and councelling as most victims suffored from personality complexes···

এপর্যন্ত concern ৩০ জনকে ডাক্তার এবং সায়ক্রিয়াটিস্টের সহায়তায় ধীরে ধীরে এই ড্রাগের নেশা ছাড়াতে পেরেছে—overcome slowly the dreaded habit মিঃ কুরিয়ান মাদ্রাজ ফার্টিলাইজারসের চেয়ারম্যান—বলেন তাঁদের সংস্থা মাঝে মাঝে ওয়ার্কশপ এবং সেমিনারের আয়োজন করে থাকেন—তার সঙ্গে যাতে অ্যাডিক্টরা কোন চাকরি পেতে পারে তার জন্য বৃত্তিমূলক (vocational unit) শিক্ষার ব্যবস্থাও করে থাকে—ডক্টর ভট্টাচার্য থেমে গেলেন।

Drugs in perspective বইটির কথা কি বলছিলেন ? আবার খেই ধরিয়ে দিতে চেষ্টা করলাম—

শুনুন—ড্রাগ ভিক্টিমদের সবচেয়ে বড় ট্রাজেডি কি জানেন? ডক্টর ভট্টাচার্য আবার বললেন—তাদের আত্মবিশ্বাস একেবারে ধূলিসাৎ হয়ে যায়।

একটু থেমে আবার বললেন, তাদের এই সেলফ কনফিডেন্স যেমন করে হোক ফিরিয়ে নিয়ে আসতে হবে। আবার আর একটা খবরের দিকে চোখ রেখে ডাক্তার বললেন জানেন—Drug Dependence Unit of Mandsey and Bethleham Royal Hospital, U.K-এর ডিরেক্টর ডক্টর জন স্টেনলি স্ট্রাঙ খুব সুন্দর একটা কথা বলেছেন—Addiction was self curable if the addicts could be made aware of that responsiblity—তাদের সুস্থ হতে হবে—সমাজের প্রতি, পরিবারের প্রতি যে তাদের একটা দায়িত্ব আছে এটা যদি তাদের মনে গেঁথে দেওয়া যায়—তাহলে তারা নিজেরাই সুস্থ হয়ে উঠবে—সুস্থ হয়ে ওঠার মত পোটেনশিয়ালিটি (potentiality) তাদের আছে—বলতে বলতে কেমন উদ্দীপ্ত হয়ে উঠলেন সায়ক্রিয়াটিস্ট ডক্টর ভট্টাচার্য। স্ট্রাঙ জানিয়েছেন ইংলাণ্ডে অ্যাডিক্টদের জন্য self-help Booklet পাওয়া যায়—যারা ড্রাগের অভ্যাস ছাড়তে চায় তাদের জন্য।

আরও জানালেন Drugs in perspective বইটির লেখক ঠিক এই কথাগুলোই বলেছেন—Psycho-active Drug অর্থাৎ হেরোইন, হ্যাসিস, এল এস ডির অ্যাডিক্টদের সুস্থ হওয়ার চেষ্টাটা তাদের চেতনার ভেতরে লুপ্ত হয়ে থাকে—তাকে শুধু উসকে দিতে হবে—জাগিয়ে দিতে হবে।

সাইকো-অ্যাক্টিভ ড্রাগ হল মনটাকে বদলে দেওয়ার (Mind altering) ড্রাগ। গোড়াতে যাতে নেশাগ্রস্ত না হয়ে যায়—ব্যালান্সড এবং র‍্যাশানাল অর্থাৎ মেপে এবং ঠিক যেটুকু দরকার, তাই খায়! লেখক আরো জানিয়েছেন—সাইকো-অ্যাক্টিভ

ড্রাগ যদি মেপে মডারেটভাবে খাওয়া যায়, তাহলে কোন ক্ষতি হয় না—Most Psycho-active drugs can sometimes be taker in moderation and without harm—but if misused or may give rises to problem-even tragedies if taken in appropriately or excessively—কিন্তু যদি অপব্যবহার করা হয়, তাহলে সমস্যা হয় এমন কি গভীর দুঃখজনক পরিণতি হয়—হতে পারে যদি বেহিসেবি এবং অত্যন্ত বেশি ডোজে খায়···

আপনি একটা মন্ত্রের কথা বলেছিলেন ডাক্তারবাবু বললাম, যা আপনি অ্যাডিক্টকে কানে কানে বলেন—

ডক্টর ভট্টাচার্য কোন কথা বললেন না। নিজের ভাবনার ভেতরে তলিয়ে বসে রইলেন, কিন্তু তাঁর ধারাল মুখখানা কেমন একটা অপার্থিব আলোয় উজ্জ্বল হয়ে উঠল। আস্তে আস্তে যেন বহু-বহু দূর থেকে বললেন অস্ফুটস্বরে শুধু একটা কথা—

ড্রাগ অ্যাবিউস! ড্রাগের সর্বনাশা প্রতিক্রিয়া! বলে সারা দুনিয়া আজ চিৎকার করছে। কিন্তু—আবার থেমে গেলেন তিনি। মুখখানা কেমন গম্ভীর ও কঠোর হয়ে উঠল। কটুগলায় বললেন—কিন্তু আসল কথাটা কেউ এক বাক্যে বলছে না—ভাবছে না—

আসল কথাটা কি?

ড্রাগ অ্যাবিউসের মূল কারণ কি বলুন তো? লোভ—লোভ—মানুষের অন্তহীন লোভ। টাকার লোভ, প্রতিপত্তির লোভ—কলম্বিয়ার ড্রাগ লর্ডস থেকে শুরু করে নাগালান্ডের কি মনিপুরের স্মাগলার—সকলের লক্ষ্যই টাকা—ডাক্তারবাবুর মুখখানা উত্তেজনায় জ্বলজ্বল করতে লাগল, বললেন ড্রাগ অ্যাডিক্টদেরও একটা—লোভ যদি হেরোইন খেয়ে দুঃখকষ্ট যন্ত্রণা ভুলতে পারা যায়। আর নতুন কোন অবারিত আনন্দের স্বপ্নের জগতে পেঁছিনো যায়। মানুষ কখনো তার সেই স্বপ্নের—সেই অবারিত আনন্দের জগতে যেতে পারবে না, একটু থামলেন। আবার হঠাৎ উত্তেজিত হয়ে বললেন, আচ্ছা বলুন তো—মানুষ তো চাঁদেও গিয়েছে—মঙ্গলগ্রহেও জীবনের সন্ধান করছে—তবুও কি মানুষের তৃপ্তি আছে—স্বস্তি আছে?

না—আমি মাথা ঝাঁকালাম।

কোনদিন তৃপ্তি পাবে না, ডাক্তার আবার আবেগে উদ্দীপ্ত হয়ে বললেন, তার শুধু মনে হবে হেথা নয়—হেথা নয়—অন্য কোথাও আরও দূরে—বহুদূরে কোথাও গেলে হয়ত শান্তি পাবে—একটু স্বস্তির আশায়, শান্তির আশায় সে উদ্দাম বেগে ছুটেছে; তার এই ছোটা কোনদিন শেষ হবে না—থেমে গেলেন ডক্টর—

তাহলে ড্রাগ অ্যাবিউস—কোনদিনই নির্মূল হবে না?

না—মনে হয় না, ভবিষ্যদ্বাণীর মত করে বললেন মানুষ তো শান্তি পাবে না, তার পায়ের নিচে তো কোন অবলম্বন নেই, নেই কোন বিশ্বাসের শক্ত ভিত—থেমে গেলেন ডক্টর ভট্টাচার্য।

নিস্তব্ধ চেম্বারে শুধু ঘড়ির একটানা টিক টিক আওয়াজ বেজে যেতে লাগল।

ঈশ্বর পাপপুণ্য ধর্মবিশ্বাস—সব কিছুর ওপর মানুষ বিশ্বাস হারিয়েছে—একটু থেমে আবার বললেন পশু বিশ্বাস ছাড়াও বাঁচতে পারে—কিন্তু মানুষের বেঁচে থাকার জন্য একটা বিশ্বাস চাই—একটা অবলম্বন চাই—কি নিয়ে বেঁচে থাকবে সে, বলতে বলতে হঠাৎ উত্তেজিত হয়ে উঠলেন—দাঁতে দাঁত চেপে ধরে বললেন, বেঁচে থাকার ভেতরে কোন আনন্দ কোন কারণ যখন খুঁজে পায় না—তখন আসে তার মাথায় ডেথউইস বা আত্মঘাতী চিন্তা, আসে বিধ্বংসী ড্রাগ খেয়ে তিলে তিলে মৃত্যুর দিকে এগিয়ে যাওয়ার চিন্তা তাই—থেমে গেলেন ডক্টর ভট্টাচার্য। উত্তেজনায় তাঁর চোখ দুটো জ্বলতে লাগল।

তাহলে তো দেখছি ড্রাগ তাকে খেতে হবেই।

হ্যাঁ, খেতে হবে—ড্রাগ অ্যাবিউস তাই গ্লোবাল ক্রাইসিস, একটু থেমে আবার বললেন একটা—একটাই তার বাঁচার পথ আছে—

কি ?

রিলিজিয়াস টিচিং—ইয়ং ছেলেমেয়েদের মনে ঈশ্বরচিন্তা বা ধর্মবোধ পাপপুণ্য বোধ জাগাতে হবে—আবার একটা নিউজ কাটিং থেকে পড়ে শোনালেন।

৮ সেপ্টেম্বর ১৯৮৬ কলকাতায় Prevention of Drug abuse and alcoholism in Calcutta শীর্ষক একটি আলোচনাচক্রের উদ্বোধন করে কলকাতা হাইকোর্টের জজ এম. জি. মুখার্জী (M. G. Mookherjee) বলেছেন—Religious teaching among the young may help to tackle this growing menace অর্থাৎ যুবকদের ধর্মীয় শিক্ষা বা আধ্যাত্মচিন্তা—ক্রমবর্ধমান এই ড্রাগের সমস্যাকে প্রতিরোধে কিছুটা হয়ত সাহায্য করতে পারে—থামলেন ডাক্তারবাবু। আবার গম্ভীর হয়ে বললেন, এত অজস্র ভুরি ভুরি যে ড্রাগ লিটারেচার পড়েছি তার কেউ কোথাও বলেনি এই ধর্মের কথাটা—থেমে গেলেন ডক্টর ভট্টাচার্য। আর কেন যেন কিসের প্রেরণায় তার চোখদুটো জ্বলজ্বল করতে লাগল। বললেন, আমি কিন্তু ডাক্তার হিসেবে—একজন সায়ক্রিয়াটিস্ট হিসেবে এই লাইনে চেষ্টা করে থাকি—

কেমন করে ?

কেন কালীঘাটের সেই ব্রাহ্মণ পুরোহিতের ছেলে প্রণবের ট্রিটমেন্টের কথা তো আপনাকে বলেছি—ইন্দ্রিয়ানাম অধিষ্ঠাত্রী ভূতানাঞ্চ খিলেষু চ—বলতে বলতে হেরোইনখোর কেমন শান্তিতে ঘুমিয়ে গিয়েছিল। থেমে গেলেন ডক্টর ভট্টাচার্য। আবার গম্ভীর হয়ে বললেন এবার যে কথাগুলো বলব সেসব আপনার বইতে ইনক্লুড করবেন কি করবেন না—সেটা আপনার ব্যাপার—আমি আমার লাইন বলছি—

(১) অ্যাডিক্টের বা নেশাখোরের কেসহিস্ট্রি খুব মন দিয়ে শোনার পরই নিজের ডায়েরিতে নোট করা। নোটের ভেতরে সাগরের জলে ডুবুরির মুক্তো খোঁজার মত করে খুঁজতে হয় ড্রাগে আসক্ত এই পেশেন্টের ব্যথাটা কোথায়, কিসের দুঃখ, কিসের আঘাত।

(২) হয় বাবা মার ভেতরে সংঘাত, যাকে বলা যায় ফ্যামিলি ডিসকর্ড, না হয়

মা বাবার উদাসীনতা। আবার কোন কোন ক্ষেত্রে বাবা কি মার চরম উচ্ছৃংখলতা বা চরিত্রহীনতার জন্য তার মনে জ্বলে ওঠে প্রতিহিংসার আগুন—সেই রিভেঞ্জ চরিতার্থ করতে ড্রাগ খাওয়া।

(৩) কোন একটা স্বপ্নের অবিশ্বাস্য জগতে যাওয়ার দুর্দম্য বাসনা, জীবনের যন্ত্রণা, দুঃখ কষ্টকে ভুলে থাকার লোভ—

সাধারণতঃ—এসবের বাইরে ড্রাগ খাওয়ার কোন কারণ খুঁজে পাওয়া যায় না। যেতে পারে না। তারপর দেখতে হয় তার ব্যাকগ্রাউণ্ড—সামান্য লেখাপড়াও কি জানে? যদি জানে—তাহলে বলি—

তুমি ভগবান মানো?

কোন কথা বলে না নেশাখোর। এসব প্রশ্নের তো উত্তরও দেওয়া যায় না। যে কষ্টের বা দুঃখের জন্য তুমি ড্রাগ খেয়ে থাক তার সব দায়দায়িত্ব তুমি ঈশ্বরের ওপরে ফেলে দাও না ভাই, কেন না—

সত্য মঙ্গল প্রেমময় তুমি, ধ্রুবজ্যোতি তুমি অন্ধকারে—

যতদূর সম্ভব কণ্ঠে মিষ্টি ঢেলে দিয়ে মধুর করে বলি আবার তুমি জানবে ভাই—ধ্রুব জাগবে অমৃতময় দেবতা আছেন আমাদের এই হৃদয় মন্দিরে—

অসীম সাগরে ভুবন ভেসে চলেছে
অমৃত ভবন কোথা আছে তাহা কে জানে
হেরো আপনার হৃদয় মাঝে ডুবিয়ে
অন্ধ অমৃতময় দেবতা সতত বিরাজে এই
মন্দিরে—এই শুদ্ধানিকেতনে

অ্যাডিক্টের চোখের দৃষ্টি কেমন নরম আর মেদুর হয়ে ওঠে। সেখানে ঘনবর্ষার মেঘের মত কি যেন টলমল করে, আমার উৎসাহ বেড়ে যায়। আবার বলি কখনো নিজের ওপরে বিশ্বাস হারাবে না ভাই, বলি—

কেমনে রাখিবি তোরা তাঁরে লুকায়ে
চন্দ্রমা তপন তারা আপন আলোকছায়ায়

চাঁদ তারা যেমন তেমনি মানুষের ব্যক্তিত্ব ও আত্মবিশ্বাস সুপ্ত থাকে—তাকে উসকে দিতে হয় প্রদীপের মত জ্বালিয়ে রাখতে হয়।

পেশেণ্ট অবাক হয়ে তাকায়। আস্তে আস্তে বলে—ডাক্তারবাবু—আপনি কী সুন্দর কথা বলেন। একটু থেমে আবার বলে—এসব কি কবিতা?

না ভাই—এসব রবীন্দ্রনাথের ব্রহ্মসঙ্গীত—

আরও দু একটা বলুন না—

তোমার ভাল লাগছে। তাহলে এই চন্দ্রমা তপন তারা গানটি শেষটা শোন—

হে বিপুল সংসার সুখে দুঃখে আঁধার।
কতকাল রাখিবি তারে আত্মা তোমার কুহেলিকায়?
আত্মবিহারী তিনি, হৃদয়ে উদয়তার
নব নব মহিমা জাগে, নব নব কিরণ ভায়,

জানবে ঈশ্বর—পরম করুণাময় ভগবান তোমার আত্মাতে বিহার করেন তোমারই হৃদয়ে তাঁর উদয় হয়, তাঁর নতুন নতুন মহিমা তোমারই ভেতরে জাগছে, তিনিই তোমাকে নতুন নতুন করুণা বিকিরণ দিয়ে তোমাকে উদ্দীপ্ত করছেন—ডাক্তার থেমে গেলেন। বললেন--প্রায়ই দেখি হয় অ্যাডিক্ট ঘুমিয়ে পড়ে—পরম শান্তিতে ঘুমিয়ে যায়, না হয় বলে এসব কথা ঈশ্বরের অস্তিত্বের কথা কখনো এমন করে কেউ কখনো বলেনি ডাক্তারবাবু…

শোন ভাই, ভুলে যেও না ড্রাগ খেলে সাময়িক শান্তি হয়ত পাবে হয়ত অলিকস্বপ্নের জগতে কিছুক্ষণ থাকতেও পারবে কিন্তু—

যেই নেশা কেটে যাবে অমনি শুরু হবে যন্ত্রণা—দুঃখ কষ্ট—থামলেন ডাক্তার ভট্টাচার্য, বললেন, জানো—সুদূর আমেরিকা থেকে ইয়ং ছেলে-মেয়েদের দল ছুটে আসছে ইণ্ডিয়ায় গেরুয়া কাপড় পরে, মাথা ন্যাড়া করে বৈষ্ণব হয়ে—হরে কৃষ্ণ-হরে রাম, হরে রাম-হরে কৃষ্ণ মাদকতায় ডুবে আছে—ওরাও এক-একজন অঢেল ঐশ্বর্যের ভেতরে লালিত, কিন্তু সম্পদে সুখ পাচ্ছে না শান্তি পাচ্ছে না—তাদের মনের ভেতরে কোন বিশ্বাসের ভিত নেই, কোন অবলম্বন নেই, তাই তাদের অস্থিরতা মনের যন্ত্রণার লাঘব হচ্ছে না—ভাবছে হয়ত ঈশ্বরের নামগানে শান্তি পাবে—ভাই জেনে রেখ সারা পৃথিবীকে একদিন অধ্যাত্মবাদের পথেআসতে হবে, আসতেই হবে—ভাই—

একটু থেমে আমার দিকে প্রদীপ্ত চোখে তাকিয়ে বললেন এই হল আমার ট্রিটমেণ্ট—আমার মন্ত্র—আমার নিজস্ব ট্রেড সিক্রেট—

আমি চুপ করে থাকলাম। শ্রদ্ধায় বিস্ময়ে আমার চোখদুটো কেমন অগাধ হয়ে উঠল। বললাম কখনো কোন মেডিসিন দেন না?

না প্রয়োজন হয় না—ডাক্তার দৃঢ়প্রত্যয়ের সঙ্গে বললেন, আমি আগে অ্যাডিক্টের এলিমেণ্টটা দেখি যদি বুঝি ভাল সুস্থ হওয়ার সামান্যতম ইচ্ছাও আছে তাহলেই এসব কথা বলি। কানের কাছে চিৎকার করে বলি—তোমার জীবন নষ্ট হয়ে যাচ্ছে—তুমি হতাশ হয়ে পড়ছ বলে কখনো ভয় পেও না—ঈশ্বরের অভয়শংখ বাজছে দিবানিশি।

সংসারে ভয় নাহি, নাহি
ওরে ভয়চঞ্চল প্রাণ, জীবনে মরণে সবে
রয়েছি তাঁহারি দ্বারে॥
অভয় শংখ বাজে নিখিল অম্বরে সুগম্ভীর
দিশি দিশি দিবানিশি সুখে শোকে
লোকে লোকান্তরে॥